অজেয় রায়
অ্যাডভেঞ্চার
সমগ্র

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

যেদিন প্রথম ছোটদের জন্য দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প লেখা শুরু হয়েছিল, সেদিন থেকে শিশুসাহিত্যের একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেছিল। বলা বাহুল্য, এর সূচনা হয়েছিল ইয়োরোপে। এবং সে সময়ে শিশুসাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ রত্ন দিনের আলোর মুখ দেখেছিল। রবার্ট লুইস স্টিভেন্‌সনের, 'ট্রেজার আইল্যান্ড', 'কিডন্যাপ্‌ড', জুল ভের্নের ছোটবড় সকলের জন্য লেখা নানান বিজ্ঞানভিত্তিক কিংবা অসমসাহসিক অভিযানের নানান বইয়ের গুণ আজ পর্যন্ত ম্লান হয়নি। পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য বিস্ময়ের দিকটা চিরকালই ছোটদের মুগ্ধ করেছে। এ-ও তাদের বড় হওয়ার একটা বলিষ্ঠ দিক; অজ্ঞাতকে জানবার, দুর্গমকে জয় করবার, প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে লড়বার, দেহ-মনের বল আহরণের প্রবল একটা দিক।

অনেক দিন আগেই বাংলায় এই ধরনের কিছু কিছু বই বেরিয়েছে, লেখকদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নাম করতে হয়। তাছাড়া আরো আছেন। এই বইখানির রচয়িতা অজেয় রায় সেই জাতের লেখক, যাঁরা দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প অতিশয় সরস ও সহজ ভাবে লিখতে পেরেছেন। এর মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংবলিত আছে। অজেয় রায় কোনো তথ্য পরিবেষণ করার আগে, সেটি নির্ভুল কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা করে নিতে যত্নবান হন। এইটি তাঁর বিশেষত্ব। এমন কি দুটো একটা বিদেশী কথা ব্যবহার করতে হলেও, আগে শব্দগুলি সম্বন্ধে নিজে নিঃসন্দেহ হন, তারপর লেখেন। ছোটদের বইতে ভুল লিখলে চলে না।

এই ধরনের বই কোনো কোনো অভিভাবক স্রেফ রোমাঞ্চময়, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লেখা বলে অপছন্দ করেন। তাঁরাও এই বইখানি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেন, এর কাল্পনিকতা তথ্যপুষ্ট বলেই এত আকর্ষণীয়। রস ও কল্পনাশক্তিই হল সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। এ ছাড়া হাজার জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ হলেও রচনা উত্‌রোয় না। ছোটরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করলে তবে না তাদের জন্য গল্প লেখা সার্থক হয়।

অজেয় রায়ের ছাত্র-জীবনের ও কর্ম-জীবনের পটভূমিকা হল গিয়ে শান্তিনিকেতন, কল্পনায় ভরা স্থান। তাঁর বয়স চল্লিশের অনেক কম। ছোটদের আদর্শ লেখক তিনি।

কলকাতা
১৫ মে, ১৯৭৫

লীলা মজুমদার

ভূমিকা

কোনো বাঙালি ছেলের পক্ষে আফ্রিকা যাওয়াই একটা বিরাট অ্যাডভেঞ্চার। তার ওপরে সেখানে গিয়ে যদি তাকে সব লোমহর্ষক ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা! ডার-এস-সালাম পৌঁছনোর কিছুদিন পর থেকেই আমার জীবনে যেসব ঘটনা ঘটেছিল, আজ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসে সেগুলোর কথা ভাবলে স্বপ্নের মতো মনে হয়। অথচ যখন ঘটেছিল তখন সেগুলো ছিল বিস্ময় ও বিভীষিকা মেশানো এক বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চার। কত কথাই না মনে পড়ছে আজ!...মামাবাবুর সেই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মুহূর্তটা ; ঢ্যাঙা উইচ ডক্টর কামাউ, টোটো, ডক্টর হাইনে, অল্পক্ষণের জন্য দেখা ডেয়ারিং বিল! আর মনে পড়ছে রুফিজি নদীর মোহনার সেই প্রলয়ঙ্করী ঝড়, যে ঝড় না হলে আমার কাহিনি একেবারে অন্য চেহারা নিত ; কিংবা সে-কাহিনী হয়তো লেখাই হতো না।...

আফ্রিকা যাবার ব্যাপারটা যেভাবে ঘটেছিল সেটা অবিশ্যি তেমন চমকপ্রদ কিছু নয়। এর জন্য দায়ী আমার বন্ধু সুনন্দ। ঘটনাটা ঘটল সেপ্টেম্বর মাসে আমার শোবার ঘরে। তখন রাত এগারোটা। আমি বিছানায় শুয়ে বেশ জমিয়ে একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছি, এমন সময় সুনন্দর আবির্ভাব। সময়টা বেয়াড়া, তবে সুনন্দর পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক নয়। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই সে প্রশ্ন করল, 'কীরে অসিত—আফ্রিকা যাবি?'

'কোথায়?'

'ইস্ট আফ্রিকা। টাঙ্গানিকা।'

'রাতদুপুরে এসে রসিকতা! কেটে পড়।

'বইটা বন্ধ কর। রসিকতা নয়। সিরিয়াসলি বলছি। সম্প্রতি মামাবাবুর বন্ধু জার্মান বৈজ্ঞানিক ডক্টর হাইনে ডার-এস-সালাম-এর মিউজিয়ামের কিউরেটর হয়েছেন। তিনি মামাবাবুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কিছুদিনের জন্য তাঁর অতিথি হতে। ডক্টর হাইনে আফ্রিকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণী ও উদ্ভিদের অনুসন্ধান করছেন। সে-কাজে তিনি মামাবাবুর সাহায্য চান।

আমি হাত থেকে বই রেখে উঠে বসলাম।

'কিন্তু যাতায়াতে অনেক টাকার ধাক্কা।'

'তারও একটা সুরাহা হাইনে করেছেন। তিনি ব্যবস্থা করেছেন যে ডক্টর ঘোষ—মানে মামাবাবু আফ্রিকায় গিয়ে কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাকেন্দ্রে বক্তৃতা করবেন। তাতে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। হিসেব করে দেখেছি ওতে আমাদের তিনজনের এক পিঠের

ভাড়া কুলিয়ে যাবে। সুতরাং তোর খরচ হচ্ছে সিঙ্গল ফেয়ার, ডবল জার্নি। আর থাকা-খাওয়া ফ্রি, কারণ ওখানে তুই হবি মামাবাবুর অর্থাৎ হাইনের গেস্ট।'

প্রস্তাবটি অতি লোভনীয় সন্দেহ নেই। মামাবাবু অর্থাৎ বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী প্রোফেসর নবগোপাল ঘোষ এবং তাঁর ভাগনে আমার বাল্যবন্ধু সুনন্দর সঙ্গে আমি দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় ঘুরেছি। মনে কর্তব্য স্থির করে ফেললাম, কিন্তু বাইরে কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে একটু ভুরু কুঁচকে বললাম, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি।'

পরদিন সকালে বাড়িতে ঘোষণা করলাম, 'এবার পুজোয় আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। আফ্রিকা। সুনন্দের সঙ্গে।'

তারপর টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সুনন্দর নম্বরটা ডায়াল করলাম।

এক

পূর্ব আফ্রিকার টাঙ্গানিকা প্রদেশের প্রধান বন্দর হল ডার-এস-সালাম। অনেক কালের শহর। শহরের কিছু কিছু অংশে যেমন আদ্যিকালের নোংরা গলিঘুঁজি, পুরনো আমলের ঘর-বাড়ি রয়েছে, তেমনি অন্যান্য অংশে গড়ে উঠেছে অতি আধুনিক অট্টালিকা, হোটেল, আলো ঝলমল রাজপথ, দোকানপাট।

মিউজিয়ামটি শহরের বাইরে। নগর-বন্দরের কোলাহল থেকে দূরে। প্রায় চার-একর জমি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে বড় বড় গাছ ও বাগান। মাঝখানে মিউজিয়ামের বাড়ি। মিউজিয়াম মানে লম্বা লম্বা পাঁচ-ছটা একতলা হলঘর। কম্পাউন্ডের একপ্রান্তে ডক্টর হাইনের বাংলো প্যাটার্নের কোয়ার্টার। একজনের পক্ষে যথেষ্ট বড়। তারই একাংশ তিনি আমাদের জন্য ছেড়ে দিলেন।

ডক্টর হাইনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আশ্বস্ত হলাম। ভয় ছিল অমন ঘোরতর পণ্ডিত ব্যক্তি, কে জানে যদি গোমড়ামুখো বদমেজাজী হন! মামাবাবুর খাতিরে মুখে কিছু না বললেও হয়তো আমার মতো এক উটকো ছোকরার আগমন মোটেই সুনজরে দেখবেন না। সুনন্দ না হয় প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু আমি তো এ-লাইনে স্রেফ মুখ্যু। মিউজিয়াম ঝাঁট দেওয়া ছাড়া আমার দ্বারা তাদের কোনো উপকার হবে না।

কিন্তু দেখলাম, এ এক যুবক বৃদ্ধ।

মাঝারি লম্বা। দাড়ি-গোঁফ কামানো গোল মুখখানা ভারি হাসিখুশি। মাথায় চুল আর টাক সমান সমান জায়গা অধিকার করেছে। একটু ব্যস্ত মানুষ। প্রচুর এনার্জি। হন্ হন্ করে চলেন। লাফ দিয়ে টপকে টপকে সিঁড়ি ভাঙেন। যখন তখন দরাজ গলায় হো-হো করে কী হাসি! ভদ্রলোক বেশ ইংরেজি জানেন, কাজেই কথা বলতে অসুবিধা নেই।

প্রথম আলাপেই আনন্দের আতিশয্যে 'হ্যাল্লো' বলে আমার পিঠ এমন চাপড়ে দিলেন যে বেশ কিছুক্ষণ ব্যথা ছিল।

মিউজিয়ামের ইতিহাস শুনলাম।

মিউজিয়ামটি ছিল এক লক্ষপতি জর্মন কফিবাগিচার মালিকের। জীবজন্তুর স্পেসিমেন সংগ্রহ করা ছিল ফন স্লীমান-এর নেশা। বহু কষ্টে ও অর্থব্যয়ে বিশাল আফ্রিকা মহাদেশের দূর দূর প্রান্ত থেকে তিনি হাজার হাজার জীবজন্তুর মৃতদেহ জোগাড় করে এনে মিউজিয়াম তৈরি করেন। এছাড়াও আফ্রিকার আরও অনেক বিচিত্র দুর্লভ জিনিস তিনি জোগাড় করেছিলেন। বছর পাঁচেক হল স্লীমান মারা গেছেন। উইলে তিনি তাঁর সাধের মিউজিয়াম

ও তৎসংলগ্ন বাড়িঘর বাগান সরকারকে দান করে যান। তারপর থেকে মিউজিয়ামটি তালাবন্ধ অবস্থাতেই পড়ে ছিল। তেমন যোগ্য কাউকে পাওয়া যায়নি মিউজিয়ামের ভার দেবার মতো। এমন সময় মাত্র কয়েক মাস ডক্টর হাইনে টাঙ্গানিকায় আসেন নিজের গবেষণার কাজে। ডক্টর হাইনে শুধু বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী নন, মিউজিয়াম পরিচালনার কাজেও তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা। টাঙ্গানিকা সরকার এমন সুযোগ হাতছাড়া করেনি। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর হাইনেকে অনুরোধ জানানো হয় অন্তত কিছুদিনের জন্য মিউজিয়ামটির দায়িত্ব নিতে। মিউজিয়ামকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজিয়ে গুছিয়ে আরও বড় করে দিতে।

ডক্টর হাইনে রাজি হয়ে গেলেন। ভাবলেন মন্দ নয়। পরের পয়সায় একটা ভালো আস্তানা হবে। মিউজিয়ামের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের গবেষণাও চালিয়ে যেতে পারবেন। এখনো অবশ্য আসল কাজ কিছুই এগোয়নি। বাগান পরিষ্কার, ঘর-দোরের ধুলো ঝাড়তেই সময় কেটে গেছে।

মিউজিয়ামে ঢুকেই প্রথমে নজরে পড়ল দরজার দু'পাশে দাঁড় করানো দুটি প্রকাণ্ড হাতির দাঁত। হাইনে বললেন, প্রত্যেকটা দাঁত লম্বায় ন-ফুটেরও বেশি এবং ওজন দুশো পাউন্ডের ওপর। ঘরগুলোর মধ্যে টেবিল, টুল এবং বড় বড় কাঁচ-ঢাকা শো-কেসে অজস্র জন্তু-জানোয়ার, পাখি, কীট-পতঙ্গের মৃতদেহ। জন্তু ও পাখিগুলির মধ্যে খড়কুটো কাঠের গুঁড়ো ভরে 'স্টাফ' করা। নানা ভঙ্গিতে সাজানো। দেখলে মনে হয় জীবন্ত। ফর্মালিন ভর্তি বড় বড় কাঁচের বয়ামে ডোবানো পোকা-মাকড়, সাপ। শো-কেসে পিচবোর্ডের গায়ে পিন আঁটা রকমারি প্রজাপতি, ফড়িং ইত্যাদি। এদের মধ্যে বেশিরভাগ প্রাণী আমি কলকাতার

মিউজিয়ামে দেখেছি। তবে স্লীমানের মিউজিয়ামের এক বিশেষত্ব আছে। ফন স্লীমান যেনতেন প্রকারে একটা স্পেসিমেন সংগ্রহ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল এই মিউজিয়ামের প্রতিটি সংগ্রহ হবে একেবারে সেরা।

আমি ও সুনন্দ যখন তৃতীয় হলঘরটায় ঢুকেছি, মামাবাবু ও ডক্টর হাইনে কিন্তু তখনো প্রথম ঘরটাই শেষ করে উঠতে পারেননি। প্রতিটি স্পেসিমেনের খুঁটিনাটি নিয়ে দু'জনে আলোচনা করছেন, মাঝে মাঝে তর্ক হচ্ছে।

মিউজিয়ামের একেবারে শেষ ঘরটায় কোনো জীবজন্তু নেই। নানা ধরনের জিনিসে ঘর ভর্তি। বিভিন্ন উপজাতিদের পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, মুখোশ। কতকগুলো বিচিত্র কাঠ ও পাথরের মূর্তি। অদ্ভুত তাদের চেহারা, আশ্চর্য খোদাই কাজ।

ছোট এক শো-কেসের মধ্যে দেখি একটা প্রকাণ্ড ডিম। বাস্‌রে কী পেল্লায়! অস্ট্রিচের ডিমের অন্তত সাত-আট গুণ বড়। সঙ্গে রাখা কার্ডে লেখা—ফসিল্‌ড এগ। এলিফ্যান্ট বার্ড। আঙুলে টোকা দিয়ে দেখলাম শক্ত পাথর। কেবলমাত্র মাদাগাস্কারে এই পাখির হাড় ও ডিম ফসিল অবস্থায় পাওয়া গেছে।

আপাতত মামাবাবু লেগে গেলেন ডক্টর হাইনের সঙ্গে মিউজিয়ামের স্পেসিমেনের ক্যাটালগিং করতে। দিন চারেক পরে মামাবাবু লেকচার-ট্যুরে বেরোবেন। এখানে বলে রাখি, মামাবাবুর বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে মিসিং লিঙ্ক বা হারানো সূত্র। মানুষের পূর্বপুরুষ যে 'বাঁদর' একথা সকলেই জানে। কিন্তু বাঁদর আর মানুষের মাঝখানে যে একটা নর-বানর অবস্থা, সেটার কোনো হদিস আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এটাকে তাই বলা হয় মিসিং লিঙ্ক। অবিশ্যি মামাবাবু যে মিসিং লিঙ্ক নিয়ে বক্তৃতা দেবেন, সেটা কিন্তু মানুষের ব্যাপার নয়। সেটা পাখির ব্যাপার। পাখি এসেছে সরীসৃপ থেকে! সবচেয়ে পুরনো যে পাখির ফসিল পাওয়া যায়, তাকে বলে আর্কিয়প্‌টেরিক্স। এই পাখিতে সরীসৃপের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু মামাবাবুর ধারণা, এর চেয়েও প্রাচীন পাখি নিশ্চয়ই ছিল, যেটাকে বলা যেতে পারে সরীসৃপ আর পাখির ঠিক মাঝামাঝি অবস্থা। এটাই পাখির মিসিং লিঙ্ক—আর এটার কোনো নমুনা বা ফসিল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

ছ-সাত দিন লাগবে মামাবাবুর বক্তৃতা শেষ করতে। তারপর আমরা টাঙ্গানিকার একটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে ক্যাম্প ফেলব। ডক্টর হাইনে সেখানে নাকি একটি অতি প্রাচীন গুহার সন্ধান পেয়েছেন। তাতে নাকি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কিছু কিছু চিহ্ন তিনি দেখেছেন। কাজেই সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি হবে, আদিম পৃথিবীর মানবজাতির ইতিহাস আবিষ্কারের চেষ্টা চলবে।

আমি এই সুযোগে ডার-এর-সালাম ভালো করে ঘুরে দেখে ফেললাম। মাঝে মধ্যে সুনন্দ মামাবাবুর সাকরেদিতে ফাঁকি দিয়ে সঙ্গে জোটে। আমাদের গাইড হচ্ছে ডক্টর হাইনের অ্যাসিস্ট্যান্ট—সাড়ে ছ'ফুট লম্বা কাফ্রি যুবক ওকেলো।

মাঝারি শহর। জাহাজঘাটায় অগুন্তি নৌকো, লঞ্চ ও ছোট-বড় জাহাজ সর্বদা গিসগিস করছে। শহরে পাঁচমিশেলি জাতের ভিড়। আফ্রিকান ছাড়াও এখানে কিছু ইউরোপীয় এবং বহু ভারতীয় ও আরবদেশীয় লোকের বাস। বাঙালি অতি অল্প। ব্যবসা বা খেতখামার করে তারা অনেকেই পূর্ব আফ্রিকায় কয়েক পুরুষ ধরে বাস করছে। পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য

জায়গার মতো এখানকারও প্রধান ভাষা সোয়াহিলি। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই অল্প-বিস্তর ইংরেজি জানে।

আসার আগে আমি ও সুনন্দ মামাবাবুর কাছে সোয়াহিলি ভাষায় কিছুটা তালিম নিয়েছিলাম। ভাষাটা আরও রপ্ত করতে আপাতত ওকেলোকে পাকড়ালাম। আমরা ওকেলোর সঙ্গে সমস্ত বাক্যালাপ চালাতে লাগলাম সোয়াহিলিতে। সেই দুর্বোধ্য সোয়াহিলি শুনতে শুনতে বেচারা ভালোমানুষ ওকেলোর প্রাণ ওষ্ঠাগত। অর্ধেক মর্ম উদ্ধার করতে পারে না। ক্রমাগত ভুল শুনে তার নিজেরই মাতৃভাষা গুলিয়ে যেতে লাগল।

দুই

আরও দু'দিন কেটেছে।

আমরা প্রত্যেকদিন ডক্টর হাইনের সঙ্গে সকালবেলা একটা ঝাঁকড়া বাদামগাছের নিচে চেয়ার-টেবিল পেতে প্রাতরাশ করি। তৃতীয় দিন চায়ের আসরে যোগ দিতে গিয়ে দেখি একজন অপরিচিত ব্যক্তি বসে হাইনের সঙ্গে গল্প করছেন।

হাইনে বললেন, 'আসুন আলাপ করিয়ে দিই—ইনি হচ্ছেন—'

আগন্তুক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ইয়া চওড়া একখানা পাঞ্জা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার নাম উইলিয়াম হার্ডি।'

'না না, বলুন ডেয়ারিং বিল। যে নামে আপনাকে সারা পূর্ব আফ্রিকা চেনে—হাইনে বললেন।

উইলিয়াম হার্ডি ওরফে ডেয়ারিং বিল, অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, 'তা বটে, তা বটে, ও-নামটা বড্ড চালু হয়ে গেছে। আসল নামটা বোধহয় ভুলেই গেছে লোকে।'

হাইনে বললেন, 'মিস্টার হার্ডি একজন বিখ্যাত শিকারী। দেশ—স্কটল্যান্ড। তবে আফ্রিকাতেই স্থায়ীভাবে আড্ডা গেড়েছেন। বোধহয় আর দেশে ফেরার ইচ্ছেও নেই। কী বলেন—মিস্টার হার্ডি?'

ডেয়ারিং বিলের ঠোঁটের কোণে একটা পাইপ কামড়ানো ছিল। পাইপটা হাতে নিয়ে বললেন, 'রাইট! ত্রিশ বছর আফ্রিকায় আছি। বনে বনে ঘুরে জংলি বনে গেছি। এখন আপনাদের সভ্য জগতে ফিরে গিয়ে আর খাপ খাওয়াতে পারব না। তাই এখানেই থেকে গেছি। ভালোবেসে ফেলেছি দেশটা। আমি একা মানুষ। কেনিয়ায় নাইভাসা হ্রদের কাছে একটি ছোট্ট কুটির বানিয়ে বাস করছি। আজকাল অবশ্য শিকার ছেড়ে দিয়েছি। নেহাৎ প্রয়োজন না হলে রাইফেল ধরি না। অনেকদিন ঘুরেছি কিনা, তাই পা দুটোকে রেস্ট দিচ্ছি! বাড়িতে বসে খাই-দাই বই পড়ি। আত্মজীবনী লিখি। আর কুটিরের বারান্দায় বসে বসে দেখি আফ্রিকার রহস্যময় প্রকৃতি। হ্রদের নীল জল। দূরে পাহাড়-জঙ্গলের রেখা। অজস্র জীবজন্তু, পাখি। আর ন'মাসে ছ'মাসে দরকার পড়লে শহরে আসি। দিব্যি কাটছে।

ডেয়ারিং বিল-এর চেহারা রোদে-জলে পোড় খাওয়া দীর্ঘ পাকা বাঁশের মতো ; বয়স ধরা যায় না। মুখের দিকে তাকালে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘন ভুরুর নিচে একজোড়া উজ্জ্বল নীল চোখ। দৃঢ় চোয়াল। উন্নত নাসা। মাথায় কোঁকড়া চুল, রগের কাছে সামান্য পাক ধরেছে।

মিউজিয়ামের অনেক সংগ্রহ বিলের পূর্বপরিচিত। স্পেসিমেনগুলি সংগ্রহের ইতিহাস তিনি বলতে থাকেন।

শেষ ঘরটায় ঢুকে সেই বিচিত্রদর্শন মূর্তিগুলোর সামনে বিল স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘন ঘন পাইপ টানছেন। মুখ দেখে মনে হল যেন অতীত স্মৃতির রোমন্থনে তাঁর মন তোলপাড় হচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'এই মূর্তিগুলোর পরিচয় জানেন কি?'

'মনে হচ্ছে আফ্রিকার নানা উপজাতির শিল্প কাজ।'—হাইনে বলেন।

'হ্যাঁ। তবে শুধু শিল্পকর্ম বললে ভুল হবে। এদের মধ্যে অনেকগুলি ছিল আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতির উপাস্য দেবতা।'

'তাই নাকি?' আমরা নতুন আগ্রহে মূর্তিগুলোকে দেখি।

বিল বলে চলেন, 'স্লীমানের এই এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল। উপজাতিদের বিগ্রহমূর্তি ছলে-বলে-কৌশলে সংগ্রহ করা। এজন্য কয়েকবার তাকে ভীষণ বিপদেও পড়তে হয়েছে। তবে হ্যাঁ, একটা মূর্তি সে জোগাড় করতে পারেনি। সেটা মিউজিয়ামে আনতে না পারার আপশোস সে কখনো ভোলেনি।

'কীসের মূর্তি?' প্রশ্নটা আমাদের সকলের গলা থেকে একই সময় বেরিয়ে এল।

'সে এক অদ্ভুত বিগ্রহ। আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।' পাইপে তামাক টানতে টানতে বিল বলেন, 'প্রায় সতেরো-আঠারো বছর আগেকার কথা। একবার ঘুরতে ঘুরতে আমি টাঙ্গানিকার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে উপকূলের কাছাকাছি এক উপজাতির গ্রামে গিয়ে হাজির হই। পৌঁছলাম যখন বিকেল। সেদিন গ্রামে কোনো উৎসবের আয়োজন হচ্ছিল। মস্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বালাবার জোগাড়-যন্ত্র চলেছে। গ্রামের সব মেয়ে-পুরুষ জড়ো হচ্ছে চারপাশে। একটু পরেই আরম্ভ হবে উৎসব। আমার একজন সঙ্গী ছিল। সেও আফ্রিকান, কিন্তু ভিন্ন উপজাতির লোক। আমরা দুজনেই বেজায় ক্লান্ত। ইচ্ছে ছিল রাতটা ওখানে আগুনের পাশে বসে নাচ-গান দেখে কাটিয়ে দিই। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। একটা ঢ্যাঙা মতো লোক, বোধহয় তাদের উইচ-ডক্টর—আমাদের বলল চলে যেতে। উৎসবের সময় তাদের বিগ্রহ উন্মোচিত করা হবে। সেই পুণ্য দেবমূর্তি দর্শন করা নাকি কোনো বিদেশির পক্ষে নিষিদ্ধ। স্বাভাবিক কৌতূহলবশে সেই দেবমূর্তির সন্ধানে চারদিকে চাইতে দেখি যেখানে অগ্নিকুণ্ড তৈরি হচ্ছে সেখানে কাঠের গাদার পাশে বেদির ওপর একখানা চৌকো বড় পাথর শোয়ানো। চামড়া দিয়ে ঢাকা। ঐ পাথরের গায়েই নিশ্চয় কোনো মূর্তি খোদাই করা আছে।

'যাহোক বাধ্য হয়ে তখন আমরা বিদায় নিলাম। আমার মনে কিন্তু কৌতূহল চাড়া দিয়ে উঠল। মূর্তিটা দেখতে কেমন? গ্রামবাসীদের চোখের সামনে দিয়ে, তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ঘাসবনের পথ বেয়ে অনেকখানি সোজা গিয়ে আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। তারপর রাত্রি নামে অন্ধকার ঘন হয়। আমি আমার সঙ্গীকে অপেক্ষা করতে বলে ফের গ্রামের পথে ফিরলাম।

'দূর থেকে সমবেত কণ্ঠের হুঙ্কার আর ঢাকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। ঘাসবন আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি গ্রামের কাছে এসে উপস্থিত হলাম। একটা ঝোপের আড়ালে গোপনে বসে দেখলাম—প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। আগুনের একধারে আরম্ভ হয়েছে উন্মত্ত নাচ। বড় বড় ঢাক বাজছে। আর অগ্নিকুণ্ডের পাশেই সেই বেদির

গায়ে চৌকো পাথরের খণ্ডটা ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। পাথরের গায়ে আঁকা মূর্তিটা ভালো করে দেখতে বায়নোকুলার চোখে লাগালাম—

'যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম তা জীবনে ভুলব না।

'হাত দেড়েক লম্বা, হাতখানেক চওড়া, ইঞ্চি চারেক পুরু একটা কালচে পাথরের খণ্ডের গা কেটে এক কিম্ভূত কঙ্কাল আকৃতির রূপ দেওয়া হয়েছে। মূর্তির রঙ কিন্তু কালো নয়। হালকা হলুদ রং করা। আফ্রিকার আনাচে-কানাচে বহু দুর্গম জায়গায় আমি ঘুরেছি। বহু উপজাতির গ্রামে গেছি, তাদের বিগ্রহ দেখেছি। কিন্তু এমন অদ্ভুতদর্শন ভাস্কর্য কোথাও চোখে পড়েনি।'

মামাবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করেন, 'ওরকম কালচে রঙের পাথর ওরা পেল কোথায়? কাছাকাছি কোথাও ছিল নাকি?'

'হ্যাঁ। কাছে এক উপত্যকায় ঐরকম পাথর আমি দেখেছি। বোধহয় সেখান থেকেই পাথরের খণ্ডটা ওরা জোগাড় করে।'

'তারপর? তারপর কী হল?' আমি ও সুনন্দ অধীর হয়ে পড়ি।

'হ্যাঁ, তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে গোপনে তাদের উৎসব এবং দেবতাকে দেখে আমি নিঃশব্দে ফিরে গেলাম।'

এই কাহিনি হয়তো এখানেই ইতি হত, কিন্তু গোলমাল পাকালো স্লীমান। এ-ঘটনার চার মাস পরে তার সঙ্গে আমার দেখা। সেই অদ্ভুত বিগ্রহের গল্প শুনে সে ক্ষেপে উঠল, ঐ মূর্তি তার চাই।

এ-ব্যাপারে আমার মোটেই উৎসাহ ছিল না। জানতাম ও-মূর্তি জোগাড় করা রীতিমতো দুঃসাহসিক কাজ। কেন মিছিমিছি ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ি! কিন্তু স্লীমানের জেদ চেপে গেছে। তার অনুরোধে বাধ্য হয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে আবার সেই গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিলাম।

গ্রামে পৌঁছে আমরা স্তম্ভিত। কুটিরগুলো ভাঙাচোরা ; জনমানবশূন্য। যেন একটা প্রলয় ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। অনেক খুঁজে কয়েকজনকে আবিষ্কার করলাম—সবাই অথর্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। জানলাম পাশের এক উপজাতির সঙ্গে তাদের শত্রুতা ছিল। তারাই অতর্কিতে আক্রমণ করে গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছে। অনেকে নিহত বা বন্দী হয়েছে। বাকিরা পালিয়েছে। তাদের বিগ্রহের ভাগ্যে কী ঘটেছে তারা জানে না।

গেলাম সেই আক্রমণকারী উপজাতির গ্রামে।

তারাও মূর্তিটার কোনো খবর বলতে পারল না। খুব সম্ভব যারা পালিয়েছে তারাই সঙ্গে নিয়ে গেছে।

মূর্তিটা সংগ্রহ করতে না পারায় স্লীমান অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। আমি কিন্তু মনে মনে খুশি হই। চাইলে কেউ তাদের দেবতাকে দেবে না। অর্থাৎ চুরি করতে হত এবং নির্ঘাত এক ফ্যাসাদ বাধত। তাছাড়া বিগ্রহ চুরি ব্যাপারটা আমি ঠিক পছন্দ করতাম না, যদিও পাল্লায় পড়ে দু-একবার করেছি।

ডেয়ারিং বিল সেদিন আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেলেন।

প্রচুর রকমারি সুস্বাদু খাদ্যবস্তুর আয়োজন করা হয়েছিল। বিল পরম তৃপ্তিভরে খাওয়া শেষ করে বললেন, 'আঃ! দারুণ খাওয়ালেন। জংলি মানুষ, মাঝে মাঝে শহরে এলে

গপ্তেপিণ্ডে গিলে যাই। স্লীমানের কাছে যখন আসতাম সেও আমাকে ভূরিভোজ করাত। তার প্রতিদানে আমি প্রত্যেকবার তার মিউজিয়ামের জন্য কিছু-না-কিছু নিয়ে এসেছি।'

'বটে! তাহলে আমাদের বেলা শূন্য হাত কেন?' ডক্টর হাইনে হেসে বললেন। 'কী দোষ করলাম আমরা। আমাদের নেমন্তন্নটা বুঝি হেয়? স্লীমানের স্ট্যান্ডার্ডে হয়নি?'

'আরে না না, কী যে বলেন!' বিল প্রবল প্রতিবাদ করে। 'সত্যি চমৎকার হয়েছে রান্নাগুলো।' তারপর একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বললেন, 'তাছাড়া আপনাদের জন্য যে খালি হাতে এসেছি জানলেন কী করে? একটা খবর আছে। তবে জানি না আপনাদের কতটা কাজে লাগবে।'

'কী খবর? বলুন শিগগির।'

'দেখুন, আমি পূর্ব উপকূলের কাছে মাফিয়া দ্বীপ থেকে আসছি। একটা কাজে গিয়েছিলাম। সেখানে কয়েকজন গ্রামবাসী রাস্তা তৈরির জন্য খুঁড়তে খুঁড়তে কয়েকটা অদ্ভুত আকৃতির পাথর পায়। দৈবাৎ আমি তখন সেখানে ছিলাম। পাথর কটা দেখে আমার সন্দেহ হয় এগুলো সাধারণ পাথর নয়, ফসিল। কোনো আদিম বিশাল জন্তুর হাড় জমে পাথর হয়ে গেছে। আমি গ্রামের লোকদের বলে-কয়ে রাজি করিয়েছি যেন তারা পাথরগুলো যত্ন করে রেখে দেয়। আর খোঁড়াখুঁড়ি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখে। আমি গিয়ে বিশেষজ্ঞদের এ-বিষয়ে বলছি। তারা এসে পরীক্ষা করে দেখুক।'

ডক্টর হাইনে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'আপনি তো মশায় বেশ! এমন দামি খবরটা এতক্ষণ স্রেফ চেপে রেখেছিলেন!'

বিল বললেন, 'আমি তো এ-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই। ওগুলোর কোনো মূল্য আছে কিনা কে জানে! আমার ভুল হতে পারে। তাই এসেই দুম করে ফসিলের খবর ঘোষণা করতে সংকোচ হচ্ছিল।'

তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'খবরটা শুনেই আপনারা যেরকম ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সকালে বললে কী আর দুপুর অবধি আমার সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটাতেন! ব্রেকফাস্ট খাইয়েই হয়তো বিদেয় দিতেন। তা যাক, কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্টে কোনো ক্ষতি হবে না। ঠিকানা দিচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে যান।'

উইলিয়াম হার্ডি আমাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, আপনারা সার্ভেতে বেরিয়ে যদি কেনিয়া যান, দীনের কুটিরে একবার পদার্পণ করবেন।

ডক্টর হাইনে পরদিন মাফিয়া দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আর তার পরের দিন মামাবাবু বেরলেন লেকচার-ট্যুরে। ব্যস, আমি সুনন্দ তখন বাঁধন-ছাড়া মুক্ত জীব। হাইনের জিপগাড়িটা চালিয়ে আমরা শহরের বাইরে লম্বা লম্বা পাড়ি জমাতে লাগলাম। ওকেলোকে বললাম, 'রাখো তোমার মিউজিয়াম। তোমার বস্ ফিরে এলে যত ইচ্ছে ডিউটি কোরো। আপাতত আমাদের ক-দিন আফ্রিকা দেখাও।' একটু গাই-গুঁই করে সে রাজি হয়ে গেল।

শহর ছাড়িয়ে অনেকখানি গেলে আরম্ভ হয় পথের দু-পাশে দিগন্তবিস্তৃত তৃণভূমি। সেখানে অজস্র তৃণভোজী জন্তু দলে দলে চরে বেড়ায়— নানা জাতের হরিণ, লম্বা গলা জিরাফ, সাদা-কালো জার্সি আঁটা জেব্রারা। অস্ট্রিচদের কৌতূহল বেশি। অন্য জন্তুদের মতো গাড়ির আওয়াজে দূরে সরে যায় না। গলা বাড়িয়ে চোখ পাকিয়ে দেখে—এমন বদখৎ শব্দ করতে করতে আসছে, কে হে বটে?

একদিন দূরে কয়েকটা বুনো মোষ দেখেছিলাম। ওকেলো কাছে যেতে বারণ করল। বড় বদমেজাজী প্রাণী। তবে সিংহ দেখা হল না। ওকেলো বলল, 'সেরেনগেটি রিজার্ভ ফরেস্টে যাও, যত খুশি সিংহ দেখবে। একেবারে পোষমানা হয়ে গেছে! মানুষ দেখলে কেয়ার করে না। সেরেনগেটি অনেক দূরে, ঠিক হল মামাবাবু ফিরে এলে যাব।

কটা দিন তোফা কাটল। সারাদিন টো-টো করি ; সন্ধেবেলা বাড়ি এসে রাঁধুনে ইসমাইলের অমৃত সমান গরম খানা। তারপর টেনে ঘুম।

তিন

মামাবাবু ডার-এস-সালাম ফিরলেন ছ-দিন পরে। আমি ও সুনন্দ তখন বারান্দায় বসে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সব ভালো তো? উঃ, খুব ঘুরেছি। একেবারে হারিকেন ট্যুর। তারপর ডক্টর হাইনের খবর কী? ফিরেছেন?'

'না।' সুনন্দ জবাব দেয়।

'কোনো চিঠিপত্র?'

'কয়েকটা চিঠি আছে আপনার নামে। একটা এসেছে মাফিয়া থেকে, হয়তো হাইনের চিঠি।'

'বেশ চল, দেখছি।'

জিনিসপত্র রেখে হাত-মুখ ধুয়ে, পোশাক পাল্টে মামাবাবু খাবার ঘরে ঢুকে হাঁক দিলেন, 'ইসমাইল, এককাপ গরম কফি দাও। বড্ড টায়ার্ড।'

সুনন্দ তাঁকে তিনটে চিঠি দিল।

একটা খাম বেছে তুলে নিয়ে মামাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এই তো ঠিকানায় দেখছি হাইনের হাতের লেখা।' অন্য দুটি চিঠিতে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি খামটা খুললেন।

চিঠি জর্মন ভাষায় লেখা। মামাবাবু গভীর আগ্রহে তার পাতার ওপর ঝুঁকে পড়েন। আমরা দু'জন উৎসুক চিত্তে তাঁর মুখপানে চেয়ে থাকি।

পড়তে পড়তে হঠাৎ মামাবাবু বলে ওঠেন, 'বাঃ, জোর খবর দিয়েছে ডেয়ারিং বিল।'

সুনন্দ তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে, 'কী লিখেছেন হাইনে? ফসিলটা কীসের, কিছু বুঝতে পেরেছেন?'

'হুঁ, পেরেছেন। কোনো অতিকায় ডাইনোসরের। দাঁড়াও বলছি সব। আগে পুরোটা পড়ে নিই।'

পশ্চিমের খোলা জানলাটা দিয়ে শেষ বিকেলের রশ্মি এসে ঘরে পড়েছে। বাইরে দেখা যাচ্ছে মিউজিয়ামের বাগানের একাংশ। ঘন পাতা ভরা বড় বড় ডালগুলোর ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো গোধূলির আকাশ। মস্ত ডাইনিং রুমে আমরা তিনটি প্রাণী। মাথার ওপরে ঝোলানো বৈদ্যুতিক আলোয় মেহগনি কাঠের কালো পালিশ করা টেবিলটা চকচক করছে। সামনে বসে মামাবাবু পত্র পাঠে নিমগ্ন। উল্টোদিকে আমি ও সুনন্দ পাশাপাশি বসে। চারদিকে নিঝুম নিস্তব্ধ। শুধু রান্নাঘর থেকে টুংটাং কাপ-ডিসের আওয়াজ ভেসে আসছে।

'সুনন্দ প্রস্তুত হও।' মামাবাবু চিঠি থেকে মুখ তুললেন। 'আমরা পরশু দিন মাফিয়া রওনা দেব। ডক্টর হাইনে অনুরোধ করেছেন, আমরা যেন যত শীঘ্র সম্ভব মাফিয়া গিয়ে তাঁর সঙ্গে কাজে যোগ দিই। পুরো ফসিলটা উদ্ধার করতে হবে।'

'কিন্তু কী পেয়েছেন তিনি, বললেন না তো?' সুনন্দ প্রশ্ন করে।

'পেয়েছেন কঙ্কালের খুলি এবং আরও কতকগুলো অংশ। একটা পাঁজরার হাড় পেয়েছেন প্রায় আট ফুট লম্বা। দেখো আমি বলে দিচ্ছি এ নির্ঘাত ব্রাকিওসরাস। এত বড় পাঁজরের হাড় আর কোনো প্রাণীর হতে পারে বলে তো জানি না। যাও তুমি এখুনি গোছগাছ শুরু করে দাও। আমি কফিটা শেষ করি আর লিস্টটা পড়ে নিই। হাইনে পাঠিয়েছেন—যাবার সময় কয়েকটা জিনিস নিয়ে যেতে হবে।'

সুনন্দ পাশের ঘরে যাওয়া মাত্র আমি জিজ্ঞেস করি, 'ব্রাকিওসরাস কী মামাবাবু?'

'শুনলে তো একধরনের অতিকায় ডাইনোসর। জুরাসিক যুগের অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় সতেরো-আঠারো কোটি বছর আগেকার সরীসৃপ। পূর্ব আফ্রিকায় ব্রাকিওসরাসের ফসিল পাওয়া গেছে।'
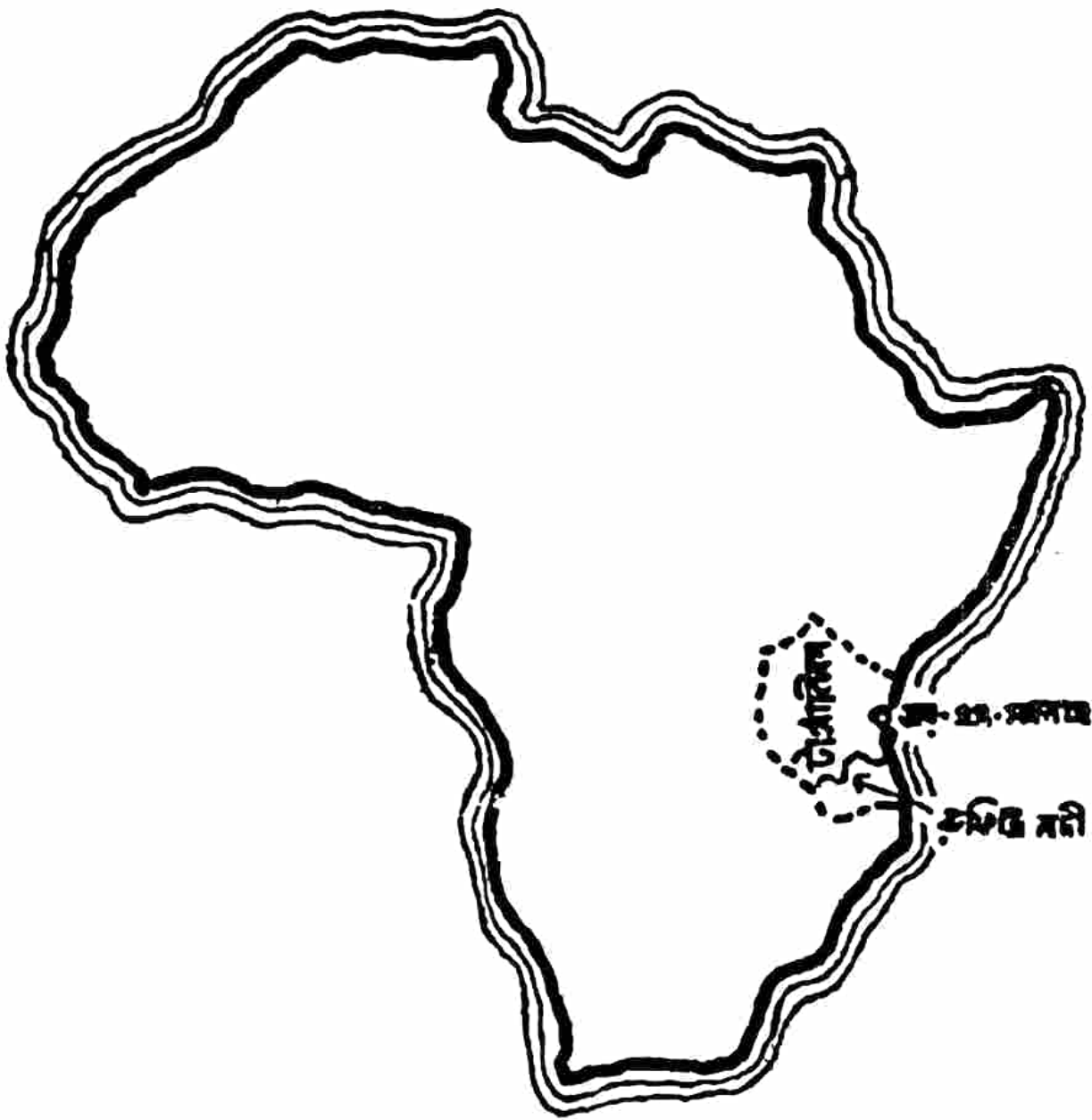
'কত বড় হতো এগুলো?'

'তা ধর একটা পূর্ণবয়স্ক ব্রাকিওসরাস সত্তর-আশি ফুটেরও বেশি লম্বা হত বলে অনুমান করা হয়।'

'আরে বাস্, ওজন কত?' মামাবাবুর সাড়া পেয়ে ওকেলো নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকেছিল। সে বিস্ফারিত চক্ষে প্রশ্ন করে।

'প্রায় পঞ্চাশ টন হত। একটা হাতির ওজন কত হবে, বলতে পার?'

ওকেলো ভেবেচিন্তে বলে, 'ম্যাক্সিমাম ছ-সাত টন।'

'তবেই বুঝে দেখ এদের বপুখানা কীরকম ছিল? অনায়াসে একটা বাচ্চা হাতিকে ইনি জলযোগ করতে পারতেন। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, ব্রাকিওসরাস হাতি-টাতি খেত না। কারণ তখনও হাতি সৃষ্টি হয়নি এবং এরা ছিল উদ্ভিদভোজী।'

'কেমন দেখতে ছিল?' এবার আমার পালা।

'আমার পড়ার টেবিলের ওপর একটা বই দেখবে লাল মলাট, বেশ মোটা, নিয়ে এসো।' মামাবাবু বলেন।

বইটা খুলে পাতা জোড়া কিম্ভূত আকৃতির এক প্রাণীর ছবি খুলে ধরে বললেন, 'এই দেখ, ব্রাকিওসরাস। বৈজ্ঞানিকরা কঙ্কালের ওপর অনুমান করে এই চেহারা এঁকেছেন।

দেখলাম অনেকটা জিরাফের আকৃতি। লম্বা গলা, দেহের তুলনায় ছোট মাথা, মোটা লম্বা লেজ মাটিতে লুটোচ্ছে। বিরাট বপু। থামের মতো চারটে পা। সামনের পা দুটো পিছনের পায়ের চেয়ে লম্বা।

মামাবাবু বললেন, 'আদিম পৃথিবীতে অনেক বিশাল বিশাল প্রাণীর বাস ছিল। ডাঙার জন্তুদের মধ্যে ব্রাকিওসরাস বোধহয় ছিল সবচেয়ে বৃহৎ। এই বিরাট দেহটা নিয়ে ডাঙায় ঘোরাফেরার অসুবিধা হত বলে এরা সাধারণত জলাভূমিতে বাস করত।'

কফিতে চুমুক মেরে মামাবাবু ডক্টর হাইনের লিস্টটা মেলে ধরলেন। আমার মাথায় তখনও ব্রাকিওসরাস পাক খাচ্ছে। দুম করে আর একখানা প্রশ্ন ছাড়ি, 'ওটা মাফিয়া দ্বীপে গেল কী করে? সাঁতরে?'

লিস্ট থেকে চোখ সরিয়ে মামাবাবু বললেন, 'এরা অবশ্য কিছুটা সাঁতার জানত কিন্তু সাঁতারের দরকার হয়েছিল কিনা সন্দেহ আছে।'

'মানে?'

'মানে হয়তো হেঁটেই গিয়েছিল। স্রেফ চার পায়ে হেঁটে।' মামাবাবু মুচকি হাসেন।

'জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে কি?' আমি হতভম্ব।

'তখন ওখানে সমুদ্র ছিল কে বলেছে? গণ্ডোয়ানা ল্যান্ড থিওরির কথা শোননি? অনেকে মনে করেন আদিম যুগে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া সব জুড়ে এক প্রকাণ্ড মহাদেশ ছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'গণ্ডোয়ানা ল্যান্ড'। জুরাসিক যুগের কিছু আগে এই মহাদেশে ফাটল ধরে। কয়েকটি বড় বড় খণ্ডে ভাগ হয়ে যায় এবং ক্রমে খণ্ডগুলি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। তাদের মাঝখানে সৃষ্টি হয় সমুদ্র। ব্যাপারটা ঘটতে বেশ সময় লেগেছিল। প্রায় দশ-বারো কোটি বছর ধরে একটু একটু করে সরে গিয়ে ভূ-খণ্ডগুলি এখনকার পজিশনে এসে দাঁড়ায়।'

'কোনো মানে হয় আলাদা হয়ে যাবার!' আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বলি। 'তাহলে আর সমুদ্র-টমুদ্রের ঝামেলা থাকত না, দিব্বি ডাঙাপথে ভারত থেকে আফ্রিকা আসা যেত।'

'হুঁ, জাহাজে চড়তে হত না, কত সুবিধে। হাওড়ায় ট্রেনে চড়ো, সোজা ডার-এস-সালামে এসে নামো।' সুনন্দ পাশের ঘর থেকে একটি মন্তব্য ছাড়ে।

তার লক্ষ্যস্থল আমি। জাহাজে আসতে একদিন আমি ঢেউয়ের দোলায় গা গুলিয়ে সামান্য অসুস্থ হয়েছিলাম। তাই এই বিদ্রূপ।

'কিন্তু প্রমাণ স্যার?' কী করে বুঝল লোকে এ-দেশগুলো জোড়া ছিল?' ওকেলোর বিশ্বাস হয় না।

'প্রমাণ অনেক আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদের চিহ্ন। এমন কিছু একই জাতের বিশেষ ধরনের প্রাণী এবং উদ্ভিদের অস্তিত্ব এইসব সুদূর দেশগুলিতে পাওয়া গেছে, যাদের পক্ষে আজকের দিনের বিশাল জলপথের বাধা পেরিয়ে কিছুতেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া সম্ভব নয়। এরা নিশ্চয়ই স্থলপথেই ছড়িয়ে পড়েছিল।'

'অস্ট্রেলিয়া আর আফ্রিকা এক মহাদেশের মধ্যে?'—ওকেলোর যেন তত্ত্বটা তবুও ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় না।

'কেন হবে না? আদিম পৃথিবীর সঙ্গে আজকের জগতের মিল কতটুকু? তাছাড়া এই ছাড়াছাড়ি হতে বড় কম দিন লাগেনি ভেবে দেখ। অবশ্য এমনও হতে পারে, তখন দেশগুলো খুব কাছাকাছি ছিল আর স্থলপথের সেতু দিয়ে তাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগ ছিল। মোট কথা, এদের মধ্যে যে ডাঙাপথে যোগ ছিল এ-কথাটা প্রায় সব বিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন।'

আমরা আরও প্রশ্ন তুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মামাবাবু থামিয়ে দেন, 'আজ আর নয়, আর একদিন হবে। অনেক কাজ বাকি।'

লিস্টটা পড়তে পড়তে মামাবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন, 'সুনন্দ, হাইনের কাণ্ডটা দেখ। কী একখানা অর্ডার। লিখেছেন—আসার সময় কয়েকটা ডাইনামাইটের স্টিক সঙ্গে নিয়ে আসবেন। এ জায়গায় মাটির নিচে পাথরের স্তর খুব প্রাচীন। অনেক প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে জায়গাটা জুড়ে অনেকগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই পড়ে থাকায় খুঁড়তে অসুবিধা হচ্ছে। ব্লাস্টিং করে চাঁইগুলো ভেঙে ফেলব। ওকেলোকে বললে ডাইনামাইট জোগাড় করে এনে দেবে। অতএব বৎস ওকেলো, তোমার গুরুদেবের আদেশ তো শুনলে? এখন আজ্ঞা পালনে তৎপর হও। আমি বেরোচ্ছি, কিছু কেনাকাটা দরকার।'

চার

আমরা রুফিজি নদীর মোহনায় এসে উপস্থিত হলাম। এখান থেকে একটা ধাওয়ে চেপে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মাফিয়া যাব। ধাও একরকম সমুদ্রগামী নৌকো। শত শত বছর ধরে এই নৌকোগুলি যাত্রী ও মালপত্র নিয়ে আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের উপকূলে যাতায়াত করছে। মোহনায় একটি নৌকো নিয়ে ছ'জন আরব মাঝি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। পালতোলা নৌকো। আজকাল অবশ্য মোটর-ইঞ্জিন বসানো ধাওয়ের চলন হয়েছে, কিন্তু তাড়াহুড়োয় ব্যবস্থা করার ফলে কোনো মোটরলঞ্চ বা মোটর-ইঞ্জিন চালিত ধাওয়ের বন্দোবস্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মামাবাবু বললেন, 'কিছুটা সময় বেশি নেবে। এখন সকাল ন'টা, সন্ধের আগে পৌঁছতে পারব আশা করছি। তবে অনুকূল বাতাস পাব, তাই আরও তাড়াতাড়ি যাওয়া যেতে পারে।' আমি আর সুনন্দ বেজায় খুশি। দিনটা একটু মেঘলা করেছে। কবিত্ব করতে করতে দিব্যি সমুদ্র-বিহার জমাব। মালপত্র তোলা হলে নৌকো ছেড়ে দিল।

প্রায় আধাআধি পথ পেরিয়েছি। মাঝিরা ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাতে লাগল। একজন বলল, হুজুর আকাশের গতিক বড় সুবিধের নয়। তুফান আসতে পারে। তারা তাড়াতাড়ি পালটা নামিয়ে ফেলল।

দেখলাম, আকাশের কোণে একখণ্ড জমাট কালো মেঘ। বাতাসের বেগও বেশ বেড়েছে।

দেখতে দেখতে ঘোর কালো মেঘে সারা আকাশ অন্ধকার করে ফেলল। তারপরই

হঠাৎ হু হু করে ছুটে এল দমকা ঝড়। আরম্ভ হল বৃষ্টি। বড় বড় জলের ফোঁটা তিরের মতো গায়ে বিঁধতে লাগল। নিমেষে কী আশ্চর্য পট পরিবর্তন। সেই শান্ত রোমান্টিক সমুদ্র হয়ে উঠল ভয়াল উত্তাল। নীল সাগরের রঙ পাল্টে হয়ে যায় আলকাতরার মতো মসিঘন। ঘন ঘন বিদ্যুতের কশাঘাতে আকাশ যাচ্ছে চিরে। ঢেউয়ের পর ঢেউ ধেয়ে আসছে। বিশাল পর্বতপ্রমাণ। জলের ফসফরাসের অস্পষ্ট সবজে আভায় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ক্ষ্যাপা সমুদ্রের রূপ। প্রাণের আশঙ্কা না থাকলে এ-সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে দেখতাম।

বিক্ষুব্ধ জলরাশির মধ্যে আমাদের নৌকো মোচার খোলার মতো একবার ঢেউয়ের চূড়ায় লাফিয়ে ওঠে, তারপরই তলিয়ে যায়। আবার ওঠে ভেসে। দিকদিশাহীনভাবে নৌকো অন্ধবেগে ছুটে চলেছে।

আমরা তিনজন পাটাতন আঁকড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছি। লোনা জল ঢুকছে চোখে-মুখে। মৃত্যুর আশঙ্কায় ভগবানের নাম জপছি আর প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছি, এই বুঝি শেষ।

কিন্তু অদ্ভুত সেই মাঝিদের সাহস ও ক্ষমতা। প্রকৃতির ঐ প্রচণ্ড তাণ্ডবের মধ্যে তারা মরণপণ লড়াই চালিয়ে চলেছে। আর্তস্বরে আল্লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে আর প্রাণপণ চেষ্টায় টাল সামলে নৌকো ভাসিয়ে রাখছে।

একটা তীব্র কাতর আর্তনাদ ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে কানে এল। বিদ্যুতের ক্ষণিক দীপ্তিতে দেখলাম দু'জন মাঝি নেই। ঢেউয়ের ঝাপটা তাদের সমুদ্রগর্ভে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। বাকি চারজন তখনও নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষায় মত্ত। বিলীন সঙ্গী দুটির জন্য শোক প্রকাশের সময় নেই তাদের।

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছিল খেয়াল নেই। অকস্মাৎ নৌকোর তলদেশের সঙ্গে কঠিন কোনো বস্তুর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। নৌকোটা লাফিয়ে উঠল। সেই নিদারুণ ঝাঁকুনিতে আমার মুঠো গেল আলগা হয়ে। সজোরে ছিটকে পড়লাম শূন্যে। তারপর আছড়ে পড়লাম—জলে নয়, শক্ত মাটিতে। আর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালাম।

ধীরে ধীরে চোখ মেললাম! চোখের পাতা দুটো ভীষণ ভারী, তাকাতে কষ্ট হয়। চাইতেই উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল, আবার চোখ বুজলাম।

ভাবতে চেষ্টা করি কোথায় আমি। চিন্তাটা জট পাকিয়ে যায়। মনে আবছা আবছা ভেসে ওঠে—নৌকোযাত্রা, সমুদ্র, ঝড়, সুনন্দ, মামাবাবু। ফের চোখ খুলি। টান টান করে চাই। আর দেখি কয়েকটা আবলুস-কালো মুখ আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই তাদের চকচকে সাদা দন্তপাটি বিকশিত হয়। হাসছে? সভয়ে আবার আমি চক্ষু মুদি।

বুঝেছি, আমি নির্ঘাত পটোল তুলেছি। সমুদ্রগর্ভে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। তারপর এসে উপস্থিত হয়েছি যমপুরীতে। আমার চারপাশে এরা সব যমদূত।

নাঃ, কী সব ভাবছি যা তা!

প্রাণপণ চেষ্টায় মাথাটা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করি। একটা জলের ঝাপটা খেলাম মুখে। কানে আসে কতকগুলো দুর্বোধ্য আওয়াজ, মানুষের কণ্ঠস্বর। কথা বলছে।

তাড়াতাড়ি চোখ খুলি। উঠে বসতে চেষ্টা করি। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। হাত-পা নাড়তে পারছি না। মাথাটা যেন বিশ-মনি পাথর। কোনোরকমে আধশোয়া অবস্থায় যতটা সম্ভব চারপাশে চাই।

দেখলাম কোনো এক সমুদ্রসৈকতে এসে পড়েছি। আশেপাশে লম্বা লম্বা নারিকেল গাছ। সামনে নীল সাগর। অসীম জলরাশি। ঢেউগুলি একটানা নাচতে নাচতে এসে বেলাভূমিতে ভেঙে পড়ছে। মাথার ওপর প্রভাতী সূর্য। বেলা বোধহয় বেশি নয়। তবে পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশে রোদের বেশ তেজ। আমাকে ঘিরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে। আরও প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন মেয়ে-পুরুষ তটভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে জটলা পাকাচ্ছে। তারা সবাই কৃষ্ণকায়। পোশাক স্বল্প। পুরুষদের দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ খালি। কেবল কোমরে জড়ানো উরু অবধি লম্বা একটুকরো জানোয়ারের বা গাছের ছাল। আবার কারও গায়ে দেখলাম রঙচঙে সুতির কাপড় রয়েছে। মেয়েদের পরনেও ঐসব জিনিস। গলার নিচ থেকে হাঁটু অবধি ঢাকা। মেয়ে-পুরুষ সবারই গায়ে নানারকমের বিচিত্র গয়নাগাঁটি। কড়ি, শঙ্খ ইত্যাদির মালা, বালা। লোহা, পিতল ইত্যাদির গয়নাও দেখলাম। অনুমান হল এরা আফ্রিকার কোনো আদিম উপজাতি।

তারা উত্তেজিত স্বরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। একটা কথা বার বার কানে এল—'মাহিন্ডি, মাহিন্ডি।' কথাটার মানে জানি। সোয়াহিলি ভাষায় মাহিন্ডির অর্থ ভারতীয়। পিছনে তাকিয়ে দেখি তীরভূমি ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে। স্বল্প বালুরাশির শেষে নানারকম গাছগাছালির শুরু। উদ্ভিদরাজ্য ক্রমে ঘন হয়েছে। জায়গাটা যে কোথায় কিছু বুঝতে পারলাম না। আফ্রিকার কোনো উপকূলে? কিন্তু চক্রাকার তটরেখা এবং সমুদ্রবেষ্টনী দেখে সন্দেহ হল কোনো দ্বীপ। হঠাৎ মনে পড়ল, সুনন্দ? মামাবাবু?—কই তারা! দুঃসহ আশঙ্কায় চারদিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখি।

ঐ তো!

কতগুলো লোকের ভিড়ের মাঝে মামাবাবু শুয়ে রয়েছেন। পাশে সুনন্দ বসে। নিচু হয়ে কী জানি করছে। ডাকলাম, 'সুনন্দ!' ক্ষীণ স্বর বেরোল।

সুনন্দ চকিতে ফেরে। 'কে অসিত? উঃ, বাঁচালি বাবা! এখন কেমন লাগছে? উঠিস নে, আমি যাচ্ছি।'

মামাবাবুর কী হয়েছে? শুয়ে কেন? নিজের হাত-পাগুলো আস্তে আস্তে নাড়াই।

নাঃ, ভাঙে-টাঙেনি। তবে অনেক জায়গায় চোট খেয়েছে। কোনোরকমে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। পাশের লোকগুলো আমায় ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়। হেঁটে সুনন্দের কাছে গিয়ে দেখি মামাবাবুর মাথায় জামা ছিঁড়ে কাপড়ের ফালির ব্যান্ডেজ বাঁধছে। মামাবাবুর চোখ বোজা, তবে নিশ্বাসের তালে বুক ওঠানামা করছে। কিছুটা স্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করি, 'কেমন আছেন মামাবাবু?'

সুনন্দ জবাব দেয়, 'ভালো। মাথায় লেগেছে। রক্ত পড়ছিল, তবে সিরিয়াস কিছু নয়।'

'আর তুই?'

'পারফেক্টলি ফিট। শুধু বাঁ হাতের কব্জিটায় একটু লেগেছে। ভগবানকে ধন্যবাদ দে, বালিতে আছড়ে পড়ায় আমরা প্রাণে বেঁচে গেছি।'

একটু পরে মামাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। খুব অবসন্ন দেখাচ্ছিল তাঁকে। চারিদিক তাকিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে এটা কোনো দ্বীপ। রুফিজি নদীর মোহনার কাছে কয়েকটা ছোট ছোট জঙ্গুলে দ্বীপ আছে। ম্যাপে তাদের পয়েন্ট আউট করা হয় না। বোধহয় তাদেরই একটায় এসে পড়েছি!'

সুনন্দ বলল, 'এখানে তো একমাত্র উপজাতি ছাড়া অন্য লোক দেখছি না! আর কোনো জাতি থাকে কিনা কে জানে!'

'না থাকাই সম্ভব। এই দ্বীপগুলো অস্বাস্থ্যকর বলে সাধারণত মানুষ বাস করে না।'

হঠাৎ একটি লোক এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। দশাসই পুরুষ। পরনে একখানা লাল রঙ মাখানো পশুচর্ম। হাতে বিরাট লম্বা বর্শা। অঙ্গে নানারকম গয়নাগাঁটির বিশেষত্ব চোখে পড়ার মতো। বেশ ভারিক্কি চালে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে হড়বড়িয়ে একগাদা কী সব বলে গেল। কী জানি প্রশ্ন করল। ভাষাটা চেনা, সোয়াহিলি। কিন্তু অর্থ ঠিক ধরতে পারলাম না।

মামাবাবু একটুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে উত্তর দিলেন সোয়াহিলিতে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার একপ্রস্থ প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়।

তার দ্রুত কথা বলার জন্য এবং বিচিত্র অপরিচিত উচ্চারণভঙ্গির ফলে আমার বা সুনন্দের সামান্য সোয়াহিলি জ্ঞানে কুলোচ্ছিল না।

ইতিমধ্যে সমুদ্রতীরের তাবৎ মেয়ে-পুরুষ এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আগ্রহভরে সমস্ত কথা গিলছে। তাদের গুঁতো খেয়ে আমি ও সুনন্দ অনেকটা তফাতে হটে গেলাম। সেখান থেকেই ঘাড় উঁচু করে আমরা মামাবাবু ও সেই লোকটির কথাবার্তার সারমর্ম বুঝতে চেষ্টা করলাম। খাপছাড়াভাবে কয়েকটা কথা বুঝলেও আসল বক্তব্য কিছুই ধরতে পারছিলাম না।

মামাবাবু হাত-টাত নেড়ে বোঝাচ্ছেন। মাঝে মাঝে আঙুল তুলে সমুদ্রের দিকে দেখাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'ঠিকই ধরেছি এটা দ্বীপ, উপকূলের কাছেই। এই উপজাতিরা দ্বীপের একমাত্র বাসিন্দা। ইনি হচ্ছেন সর্দার। জানতে চাইছেন আমরা কে? কেন এসেছি? কী করে এসেছি ইত্যাদি।'

সুনন্দ বলে, 'এদের রকম-সকম কেমন বুঝছেন?'

'ভালোই। আপাতত আমাদের কোনো ক্ষতি করার লক্ষণ নেই। তবে বিদেশি অতিথি বিশেষ পছন্দ করে বলে মালুম হচ্ছে না।'

আমি বললাম, 'জিজ্ঞেস করুন না এখান থেকে তীরে ফিরে যাবার কী উপায়?'

'হুঁ, করছি।' তারপর আবার প্রশ্নোত্তর।

একটি লোক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

লোকটা বেজায় ঢ্যাঙা। রোগা, পাকানো দড়ির মতো হাত-পা। মুখে অজস্র বলিরেখা। দেখলে বোঝা যায় প্রচুর বয়স। তার সারা গায়ে-মুখে বিচিত্র নক্‌শা কাটা। গলায় হাড়ের টুকরো গাঁথা মালা। কোমরে জড়ানো একখানা লাল-কালো রঙ করা চামড়া। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুকটা শিরশির করে উঠল। বাজপাখির মতো চাউনি, তীক্ষ্ণ ক্রূর। সর্দারের ঘাড়ের কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সে মন দিয়ে সব শুনছিল, মাঝে মাঝে দু-একটা প্রশ্ন করছিল।

খানিক পরে মামাবাবু বললেন, 'বলছে দ্বীপের কাছ দিয়ে নাকি কোনো নৌকো জাহাজ-টাহাজ যায় না। তবে ওরা নিজেরা মাঝেমধ্যে সমুদ্র পেরিয়ে উপকূলে যায়। তখন আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। ঠিক স্পষ্ট কথা দিচ্ছে না। তবে মনে হচ্ছে উপহার-টুপহার দিয়ে একটু সন্তুষ্ট করলে রাজি হবে। যাক, এখন চল আমাদের মাঝিদের কী অবস্থা দেখি। নৌকোটার খোঁজ করি।'

চারজন মাঝিকে দেখতে পেলাম কাছেই। সৌভাগ্যবশত তারা সবাই জীবিত। তবে দুজন বেশ আহত হয়েছে। একজনের লেগেছে কোমরে, সে শুয়ে ছটফট করছে। আর একজনের ডান হাতের কনুইয়ের হাড় ভেঙেছে বা মচকেছে। বেচারা হাত চেপে ধরে বসে যন্ত্রণায় অস্ফুট কাতরোক্তি করছে। অন্য দু'জন মোটামুটি অক্ষত। তারা বালির ওপর বসে। দিশাহারা ভাব। কয়েকজন দ্বীপবাসী তাদের ক্রমাগত নানারকম প্রশ্ন করে চলেছে। মাঝিরা কোনো উত্তর দিচ্ছে না। শুধু জড়োসড়ো হয়ে অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে। আমরা কাছে যেতেই তারা মহা খুশি হয়ে উঠে দাঁড়াল।

মামাবাবু আহত দু-জনকে পরীক্ষা করলেন। আঘাতের গুরুত্ব আপাতত কিছু বোঝা গেল না। তিনি অন্য দু-জনকে আহতদের পাশে বসে থাকতে আদেশ দিয়ে আমাদের বললেন, 'চল, নৌকোটা দেখি। ঐ যে পড়ে আছে। আমাদের সঙ্গে ওষুধপত্র ব্যান্ডেজ ছিল। আহত লোকগুলোর জন্য দরকার।

নৌকোটা জলের কিনারে বালির ওপর ওল্টানো অবস্থায় পড়ে ছিল। ভাঙা, দুমড়ানো। নৌকোর দিকে যেতে যেতে সুনন্দ বলল, 'মামাবাবু, ঐ লোকটা কে? সর্দারের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। বেজায় ঢ্যাঙা।'

'ওর নাম কামাউ। এই উপজাতির উইচ্ ডক্টর।'

'বুঝেছি। আমাদের দেশে যাদের বলে ওঝা।'

'না, আমাদের দেশের ওঝা বা গুণিনদের থেকে এদের তফাত আছে। এদের ক্ষমতা আরও বেশি। উপজাতিদের মধ্যে এরা অত্যন্ত প্রভাবশালী। এরা বহুবিদ্যাবিশারদ। একাধারে উপজাতি পল্লির হেকিম, পূজারি, সর্দারের পরামর্শদাতা, আরও অনেক কিছু।'

'লোকটাকে কিন্তু সুবিধের মনে হল না।' সুনন্দ বলে।

'হ্যাঁ। মামাবাবু চিন্তান্বিত স্বরে বললেন। 'যাহোক ভালোয় ভালোয় ফিরতে গেলে ওকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে।'

টেনেটুনে নৌকোটা সোজা করলাম। আমাদের মালপত্র পাটাতনের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা ছিল, তাই খুলে পড়ে যায়নি। এক এক করে প্যাকেটগুলো খুলে দেখতে থাকি।

হালকা ঠুনকো সমস্ত জিনিস ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। তবে টিনের খাবার, জামা-কাপড়, তাঁবু, বইপত্র, ওষুধের বাক্স, স্টিলের বাসন ইত্যাদি অনেক কিছু মোটামুটি অক্ষত রয়েছে। সুনন্দ বলল, 'ভাগ্যিস ক্যামেরাটা আমার কাঁধে ছিল। তাই বালিতে পড়ে বেঁচে গেছে।'

মামাবাবুর নজর বইয়ের দিকে। 'যাক বইগুলো রক্ষে পেয়েছে। অল্প ভিজেছে, কিন্তু ছেঁড়ে-টেঁড়েনি।'

জিনিসগুলো বের করে পরীক্ষা করছি, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। দ্বীপবাসীরা এতক্ষণ আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে চোখ গোল গোল করে বিদেশিদের সম্পত্তি দর্শন করছিল। হঠাৎ একজন একটা মোজা হাতে তুলে নিল। দেখাদেখি অন্যরাও টপাটপ যে যা পারে হাতাতে শুরু করল।

মহা মুশকিল। বারণ করতে ভরসা হচ্ছিল না, কিন্তু যে রেটে হাতছাড়া হচ্ছে তাতে আমাদের সম্পত্তির আর কিছু বাকি থাকলে হয়! একজন সুনন্দের সিগারেট লাইটারটা ছোঁ মারল। ব্যস, সুনন্দের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। লাইটারটা সুনন্দের এক জাপানি বন্ধু তাকে প্রেজেন্ট করেছিল।

'তবে রে!' সে খপ্ করে লোকটার হাত থেকে লাইটার কেড়ে নিয়ে খচ্ করে তার মুখের সামনে আগুন জ্বালল। বলা নেই কওয়া নেই, নাকের কাছে অগ্নিশিখা লাফিয়ে উঠতে দেখে সে তো বাপ্‌রে বলে মারল পিছনে এক লম্ফ। অন্যদেরও আক্কেলগুড়ুম। ঘাবড়ে গিয়ে হুড়মুড় করে কয়েক পা হটে গেল। কয়েকজন নারী ও শিশু দিল দৌড়। জাদু, বিদেশি জাদু—'মুজিমা ইয়া মাগেনি' বলতে বলতে লোকগুলো মহা সোরগোল করে যে যা নিয়েছিল সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। সুযোগ পেয়ে মামাবাবু বোঝালেন, 'সাবধান, হাত দিও না, সব মন্ত্র দেওয়া আছে। ভীষণ বিপদে পড়বে।'

এই ঘটনাটায় আমাদের মহা উপকার হয়েছিল। দ্বীপবাসীদের ধারণা হয়ে গেল বিদেশিদের জিনিস মন্ত্রপূত বিপজ্জনক। কখন কোনটা থেকে অগ্নিদেব ফোঁস করে উঠবেন কে জানে! ভবিষ্যতে নিজে থেকে না দিলে আমাদের জিনিসে এরা কক্ষনো হাত দেয়নি। সেধে দিতে গেলেও কি আর সহজে নেয়! অনেক করে বোঝাতে হয়েছিল, 'মন্ত্র-টন্ত্র সরিয়ে নিয়েছি। নির্ভয়ে গ্রহণ কর বৎস।'

একখানা প্লাস্টিকের থালায় দুটো রুমাল, কয়েকটা চকচকে বোতাম, একটা লাল টাই, ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে আমরা সর্দারের সামনে নিবেদন করলাম—উপঢৌকন।

সর্দার হাত বাড়িয়েই টেনে নিল। আমাদের মুখপানে একটু সন্ত্রস্তভাবে তাকাল। মামাবাবু অভয় দিলেন, 'ভয় নেই।'

সর্দার আড়ম্বর সহকারে প্রণামী গ্রহণ করলেন। মুখ দেখে মনে হল খুশি হয়েছে।

এরপর কিছু উপহার দেওয়া হল কামাউকে। উপহার সে বিনা বাক্যব্যয়ে ট্যাঁকস্থ করল, কিন্তু মুখে কোনো সন্তোষ প্রকাশ করল না।

যতটা সম্ভব জিনিস বেঁধে-ছেঁদে কাঁধে তুলে আমরা দ্বীপের মধ্যে উপজাতিদের গ্রামে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। রীতিমতো শোভাযাত্রা করে আমরা বনপথ দিয়ে এগোলাম।

আহত দু-জনকে আমরা ডাল দিয়ে তৈরি স্ট্রেচারে বয়ে নিয়ে চললাম। মামাবাবু তাদের যন্ত্রণা কমানোর ওষুধ দিয়েছিলেন। যাতে নড়াচড়ায় বেশি কষ্ট না হয়।

প্রায় আধ মাইল চলে আমরা একটা খোলা জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম। মস্ত গোল প্রাঙ্গণ। গাছ কেটে আগাছা সাফ করে পরিষ্কার সমতল করা হয়েছে। চারধারে বাঁশঝাড়ের বেড়া। চত্বরের সীমানা ঘেঁষে ছোট-বড় দশ-বারোটি কুটির। কুটিরের দেয়াল বাঁশের ওপর কাদা লেপে তৈরি। চালে ঘাস-পাতা চাটাইয়ের ছাউনি। এই হচ্ছে আদিবাসীদের গ্রাম।

আমরা ঘাড় থেকে জিনিস নামিয়ে একটু বিশ্রাম নিলাম। তিনটে নারকেল দু-আধখানা করে ভেঙে আমাদের দেওয়া হল খেতে। চমৎকার টাটকা শাঁস। খিদের মুখে স্বাদ লাগল যেন অমৃত।

আমাদের পৌঁছে দিয়ে পুরুষরা আবার বেরিয়ে গেল তাদের দৈনন্দিন খাদ্য সংগ্রহের ধান্দায়।

একটা ডেরা বাঁধতে হয়। আপাতত যে-কটা দিন এখানে থাকতে হবে, মাথা গোঁজার আশ্রয় চাই। ওদের কুটিরে ওদের সঙ্গে তো আর থাকা চলে না! সুতরাং তাঁবু খাটালাম।

তাঁবু পাতলাম চত্বরের ভিতরে নয়, গ্রাম থেকে একটু দূরে। সমুদ্রতীরের কাছে। এধারে গাছপালা তেমন ঘন নয়, কিন্তু পরে দেখেছি দ্বীপের অন্য পাশে বেশ ঘন।

আমাদের তাঁবুটা বেশ বড়। মাঝখানে একখানা ক্যানভাস ঝুলিয়ে দিতেই দুটো কামরা হয়ে গেল। একটায় থাকবেন মামাবাবু, অন্যটায় আমি ও সুনন্দ। বাকি সমস্ত দিনটা কেটে গেল ক্যাম্প খাটাতে।

মাঝিদের তাঁবুটি পড়ল আমাদের থেকে কিছু দূরে। মামাবাবু আহতদের যথাসম্ভব সেবাশুশ্রূষা করলেন। ওষুধ দিলেন। শক্ত করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। বললেন, আশা করছি কয়েকদিন রেস্ট নিলেই ভালো হয়ে উঠবে।

দ্বীপের বালখিল্যের দল এবং অল্পবয়সী কিছু ছেলে-মেয়ে কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও আমাদের সঙ্গ ছাড়ে নি। আমাদের রকম-সকম, তাঁবু খাটানো, জিনিস গোছানো, সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহে দেখছে এবং অনর্গল বকর বকর করে নিজেদের মধ্যে আমাদের সমালোচনা করছে। তবে সর্বদাই তারা বেশ খানিকটা নিরাপদ ব্যবধান বজায় রেখেছিল—বিদেশি জাদুর ভয়ে।

সূর্য ডোবার আগে দ্বীপের সবাই ঘরে ফিরল। তাদের আহ্বানে আমরা গ্রামে গেলাম। মাঝিরা যেতে চাইল না। প্রথমত দ্বীপবাসীদের সঙ্গে মেশার কোনো আগ্রহ তাদের নেই। দ্বিতীয়ত আহত সঙ্গী দু'জন রয়েছে।

দেখলাম চত্বরের মাঝখানে এক অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে। সবাই জড়ো হয়েছে চারপাশে। সর্দার এবং কামাউ বসেছে দুটো উঁচু পাথরের আসনে। আগুনের আঁচে ঝলসানো হচ্ছে মাংস, মাছ। একটু পরেই বড় বড় ঢাকে পড়ল কাঠির ঘা। ধ্বনিত হয়ে উঠল আকাশ-বাতাস। তৎক্ষণাৎ একদল উঠে শুরু করল নাচ। একদল ধরল গান। ক্রমে বাজনার লয় বাড়ে, নাচের তাল দ্রুততর হয়। আগুনের লালচে আভায় সঞ্চরমান সুগঠিত কৃষ্ণবর্ণ মূর্তিগুলি কেমন অপার্থিব বোধ হচ্ছিল। সে-ধ্বনি সুন্দর, সে-দৃশ্য কেমন ঘোর লাগায়। আমরাও মাথা নেড়ে তাল ঠুকি।

ছেলে ও মেয়ের দল পালা করে নাচল। কখনো যৌথ নৃত্য। নানারকম নাচ। জন্তু-জানোয়ারের অঙ্গভঙ্গি নকল করে নাচ। উদ্দাম সমর-নৃত্য, কত কী!

দিব্যি আছে এরা। ভবিষ্যতের ভাবনা নেই। অতীতের জন্য আক্ষেপ নেই। শুধু বর্তমান। প্রত্যক্ষ জীবনধারণের তাগিদে কঠোর সংগ্রাম আর অনাবিল আনন্দ।

ঘণ্টা দুয়েক পর নাচ-গান থামল। আরম্ভ হল যথেচ্ছ পানভোজন। আমরাও এক-এক টুকরো মাংস এবং এক পাত্র মাংসের ক্বাথ মেশানো ভুট্টার সুরুয়া পেলাম। স্যুপটা মন্দ নয়, কিন্তু আধপোড়া মাংস মুখে রুচল না। খাবার ভান করে লুকিয়ে ফেললাম।

পেটপুরে ভোজন করে সবাই টইটুম্বুর। কেউ কেউ আগুনের ধারেই সটান শুয়ে পড়ে নাসিকা গর্জন শুরু করল। কেউ কেউ উঠে গেল কুটিরে। আমরাও সুযোগ বুঝে নিঃশব্দে উঠে পড়ি।

পাঁচ

দ্বীপটাতে গুছিয়ে বসলাম।

মেয়াদ অবশ্য বেশিদিন নয়, মাত্র দশদিন। সর্দার বলেছে আমরা যেদিন দ্বীপে এসেছি তারপর ঠিক এগারো দিনের দিন 'ময়োজিমাকুবা' অর্থাৎ পূর্ণিমা। আকাশে সেদিন মস্ত গোল চাঁদ উঠবে। পূর্ণিমার আগের দিন তাদের নৌকো যাবে ওপারে। আমাদেরও তখন সঙ্গে নিয়ে যাবে।

সূচনায় বেঘোরে প্রাণ যাবার উপক্রম হলেও পরের ব্যাপারটা মন্দ দাঁড়াচ্ছে না। বরাতে শিকে ছিঁড়ে খাসা একটা অ্যাডভেঞ্চার জুটে গেছে। দশটা দিন তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। অতএব প্রাণভরে এই হঠাৎ-পাওয়া রোমাঞ্চের স্বাদ উপভোগ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমাদের থাকার ব্যবস্থাটি ভালোই হয়েছে। আর খাওয়ার ভাবনা মামাবাবু সুনন্দের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন, কারণ রান্নার ব্যাপারে সুনন্দর দারুণ উৎসাহ।

ঠিক করা হল প্রথমে দ্বীপটা সার্ভে করা যাক।

সকালে একবার সপারিষদ সর্দার এসেছিল খোঁজ নিতে। আসা মাত্র সুনন্দ তাকে একটা পেন-নাইফ প্রেজেন্ট করল। ছুরিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সর্দার মহাখুশি। এখন তাদের ব্যবহার বেশ সহজ, বন্ধুত্বপূর্ণও বলা যায়। শুধু ঐ কামাউ হল ব্যতিক্রম। সেও এসেছিল, কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। মামাবাবু এগিয়ে তাকে নমস্কার জানালেন—'জাম্বো বানা'। কিন্তু তার সন্দিগ্ধ আচরণ কিছু সরল হল বলে মনে হল না। যাক বাবা মিশতে না চায় ক্ষতি নেই, কোনো বাগড়া না করলেই বাঁচোয়া।

সর্দার সুনন্দকে অনুরোধ করল, 'মাহিন্ডি, তোমার জাদুটা একবার দেখাও তো! সেই যে হঠাৎ অগ্নির আবির্ভাব, ছোট্ট একখানা নীল বাক্স থেকে।'

সুনন্দ গেরামভারি চালে পকেট থেকে লাইটার বের করল। দেখেই জনতা সাত হাত তফাতে সরে গেল।

সুনন্দ বার কয়েক হিংটিং-ছট মন্ত্র আউড়াল, শূন্যে বাহু আন্দোলিত করল, তারপর খচ্‌ করে লাইটার টিপল।

মোটো, মোটো—আগুন, আগুন,—ভীত বিস্মিত দর্শকদের মধ্যে থেকে কোলাহল ওঠে। বিদেশি ভারতীয়দের জাদুর মাহাত্ম্য নিয়ে জোর একচোট আলোচনা হয়।

এই ফাঁকে সুনন্দ আমাদের দেশে ফেরার কথাটা তোলে।

সর্দার বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ যাবে বইকি! তবে ক-দিন অপেক্ষা কর। আমরা যখন-তখন সমুদ্রযাত্রা করি না। ওপারের দেশ ভালো নয়। ওখানে আমাদের অনেক শত্রু। 'শিকো কুমি' অর্থাৎ দশ দিন অপেক্ষা কর।

তাদের ভালোমতো লোভ দেখালে বা জেদাজেদি করলে হয়তো আগেই আমাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হতে পারত, কিন্তু এ নিয়ে আমরা বেশি চাপাচাপি করলাম না। ক-টা দিন এই অজানা দ্বীপে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার আকর্ষণ কম নয়।

সর্দার দলবল নিয়ে চলে গেলে আমরাও বেরলাম। স্থির হল সমুদ্রের ধারে ধারে গোটা দ্বীপটা চক্কর দিয়ে আসব। একজন দ্বীপবাসীকে সঙ্গে নিলাম পথ দেখাতে।

যেতে যেতে লোকটির মুখে শুনলাম এ-দ্বীপে বড় হিংস্র জন্তু নেই। বন্য বড় জন্তু বলতে আছে কেবল শুয়োর। তবে সংখ্যায় বেশি নয়। প্রায়ই তাদের শিকার করা হয় কিনা! আমাদের সঙ্গে বন্দুক-টন্দুক ছিল না, কাজেই সংবাদটা শুনে আশ্বস্ত হলাম।

লোকটি বলল, অবশ্য ছোট জানোয়ার বা সাপখোপের অভাব নেই। খটাসগুলো আকারে ছোট, কিন্তু শয়তানিতে বড় জন্তুকে হার মানায়। প্রায়ই তাদের পোষা ছাগলছানা মারে।

খটাস বা ছোট জন্তু নিয়ে আমরা মাথা ঘামালাম না। তবে কিছুদূর গিয়েই এক দৃশ্য দেখে আমাদের টনক নড়ল। বুঝলাম দুশ্চিন্তার কিছু কারণ আছে বটে।

দেখি একটি লোক বল্লমের ডগায় একটা প্রকাণ্ড মরা সাপ বিঁধিয়ে ঝুলিয়ে আনছে। লম্বায় সাপটা অন্তত সাত ফুট হবে। মামাবাবু দেখে বললেন, 'গ্রিন মাম্বা। অতি বিষাক্ত। গোখরো-কেউটের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।'

দ্বীপের যেদিকে আমাদের তাঁবু পড়েছে, তার উল্টো দিকে গাছপালা ঘন। একটা অগভীর জলাশয় রয়েছে। চারপাশ ঘিরে নিবিড় জঙ্গল। জলাশয়ের ধারে ম্যানগ্রোভ গাছের দুর্ভেদ্য বেষ্টনী। একটু শুকনো জায়গায় বাঁশ-ঝাড় ও খাটো আকারের প্রচুর ডালপালাওলা কাঁটাঝোপ। ম্যানগ্রোভ বনে অসংখ্য কাঁকড়া। সন্ন্যাসী কাঁকড়া ও বীণাবাদক কাঁকড়াই বেশি। পুরুষ বীণাবাদক কাঁকড়াগুলো ভারি মজার দেখতে। একটা দাঁড়া ছোট্ট, অন্যটা বিরাট। বড় দাঁড়াটা মুখের সামনে বাগিয়ে ধরে রাখে, যেন বীণা, আর ছোট হাতটা দিয়ে যেন বাজাচ্ছে।

মামাবাবু সন্ধানী দৃষ্টিতে চারদিকে চাইছিলেন। বললেন, 'এখানকার কীট-পতঙ্গ লক্ষ করো। কতকগুলো দেখছি একেবারে নতুন, অচেনা। ভালো করে সাজসরঞ্জাম নিয়ে পরে আসতে হবে। বনে ঢুকব। স্পেসিমেন নিয়ে যাব।'

কয়েকটা কীট-পতঙ্গ তিনি আমাদের দেখালেনও। খটমট ল্যাটিন নাম বললেন তাদের। একবার মামাবাবু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'একী!' আঙুল দিয়ে দেখালেন, গাছের গুঁড়িতে বসা একটা গোবদা গঙ্গাফড়িং।

'ভালো করে দেখ। মাথায় দুটো শিং রয়েছে। এ-জাতের ফড়িং তো কেবল মাদাগাস্কারে পাওয়া যায় জানতাম! এখানে এল কী করে!'

ধরার চেষ্টা করতেই ফড়িংটা ফড়ফড় করে উড়ে পালাল।

সমুদ্রের কিনার ঘেঁষে চলেছি। দেখলাম, আমাদের নৌকো দ্বীপের যে-পাশে আছড়ে পড়েছিল সে-ধারের সৈকতভূমিই সবচেয়ে চওড়া। অন্য সব ধারে সমুদ্রতীর অপরিসর, খানাখন্দে ভরা পাথুরে। আমাদের নৌকো তীরের এসব অংশে আঘাত করলে আর প্রাণে বাঁচতে হত না।

লক্ষ করলাম দ্বীপের চারপাশে তীরের কাছাকাছি অনেক শিলাখণ্ড ও প্রবাল প্রাচীর জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলে রয়েছে। ঢেউ এসে সবেগে আছড়ে পড়ছে তাদের ওপর।

চোখে দেখা যায় না এমনি ডুবো পাহাড় না জানি আরও কত লুকিয়ে আছে সমুদ্রগর্ভে। বোধহয় এইসব বিপজ্জনক শিলাস্তূপ ও প্রবাল প্রাচীরের ভয়েই দ্বীপের কাছ দিয়ে জাহাজ বা নৌকো চলে না। আমরা সর্বক্ষণ সমুদ্রের পানে নজর রেখেছিলাম। কিন্তু বৃথা আশা, কোনো নৌকো-টৌকো চোখে পড়ল না।

একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম।

এক প্রাচীন ভগ্নস্তূপ। কেল্লা জাতীয় বাড়ি ছিল মনে হল। বড় নয়, ছোট আকারের বাড়ি তৈরি হয়েছিল আগাগোড়া পাথরে। ইঁটের চিহ্নমাত্র নেই। অজস্র পাথরের টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ছাদ ভেঙে পড়েছে, তবে দেয়ালগুলো এখনও খাড়া। বৃক্ষ, লতাগুল্মে ঢেকে ফেলেছে ভগ্নাবশেষ।

এখানে বাড়ি কে তৈরি করল? দ্বীপে সভ্য মানুষের বসতি ছিল বলে তো মনে হয়নি! তাহলে আরও বাড়িঘরের চিহ্ন চোখে পড়ত। মাত্র একটি কেন?

মামাবাবু বললেন, 'জলদস্যুদের আড্ডা হতে পারে। নির্জন দ্বীপে আরব বা পর্তুগিজ জলদস্যুদের গোপন ঘাঁটি ছিল।'

সুনন্দ আমার কানে কানে বলল, 'পরে খুঁজে দেখব, যদি গুপ্তধন পাওয়া যায়।'

'কাজ নেই আমার গুপ্তধনে। ঐ সাপের আড্ডায় আমি ঢুকছি না।'

যেতে যেতে মামাবাবু আদিবাসীটির সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করছিলেন। এই দ্বীপ ও এখানকার অধিবাসীদের খবরাখবর নিচ্ছিলেন। দ্বীপের গাছপালা পশুপাখি সম্বন্ধে তথ্য জোগাতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে বেশি কথা বলতে সে নারাজ।

আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম, কত পাখি। জলের ধারে উড়ছে নানান সামুদ্রিক পাখি। গাছে গাছে রঙ-বেরঙা পাখির কাকলি। বাঃ—চেনা শিস্, তাকিয়ে দেখি গাছের ডালে ঝুঁটি মাথায় বুলবুলি। ভারি আপনজন মনে হল পাখিটাকে।

একজাতের ক্ষুদে বাঁদর আমাদের দেখে মহা হল্লা জুড়ে দিল। বোধকরি শার্ট-প্যান্ট পরা মানুষ এই প্রথম দেখছে।

পুরো দ্বীপটা একপাক ঘুরে আসতে আমাদের ঘণ্টা চারেকের বেশি লাগল না।

ছোট্ট ভূখণ্ড। কোনো রকমে জলের ওপর মাথা জাগিয়ে রেখেছে। মনে হয়, যে কোনো সময় সমুদ্র তাকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। এইটুকু সামান্য জমি এবং এখানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যই বোধ হয় এখন পর্যন্ত সভ্য মানুষ এ-দ্বীপে বসতি স্থাপনে উদ্যোগী হয়নি।

মামাবাবু বললেন, 'একটা উঁচু গাছের মাথায় চড়ে দেখ তো চারদিক।'

আমি ছোটবেলায় গাছে চড়তে ওস্তাদ ছিলাম, কাজেই আমিই উঠলাম।

পরিষ্কার ঝকঝকে দিন। যেদিকে তাকাই চারপাশে চঞ্চল সমুদ্র। নীলচে-সবুজ ঢেউগুলি ফেনার মুকুট পরে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে। পশ্চিমদিকে দেখলাম বহু দূরে একটা কালো রেখা। অস্পষ্ট। নিশ্চয় আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূল। কত দূর হবে? সাত-আট মাইল। যাক, খুব বেশি দূরে এসে পড়িনি। নেমে এসে রিপোর্ট করলাম।

আমাদের ডেরার কাছাকাছি আসতে দেখি তাঁবুর সামনে ভিড়। দ্বীপবাসীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। সর্দারও রয়েছে। মাঝখানে আমাদের নৌকোর দুজন মাঝি, যে দুজন দুর্ঘটনায় অক্ষত আছে। কী ব্যাপার? তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। দ্বীপের লোকেরা উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে। মনে হচ্ছে কোনো কারণে খুব চটেছে।

এর মধ্যে আবার কী ফ্যাসাদ বাধল রে বাবা।

মামাবাবু আমাদের অপেক্ষা করতে বলে ভিড়ের মাঝে ঢুকে গেলেন।

অনেকক্ষণ তিনি সর্দার ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বললেন। মাঝিদের কী সব জিজ্ঞাসা করছেন দেখলাম। মনে হল ধমকাচ্ছেন। তারপর ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্দার ও তার লোকজনরা মাঝি দুটিকে নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা দিল।

মামাবাবু বললেন, 'আর বল কেন, লোক দুটো এক নম্বর বুদ্ধু। এক কাণ্ড বাধিয়েছে। ওদের বিশ্বাস হয়নি যে সত্যি এরা কদিন পরে আমাদের দেশে ফেরত পাঠাবে। তাই সকালবেলা নিজেরাই একটা নৌকো চুরি করে পালাবার তাল করছিল। কিন্তু তীর থেকে জলে নৌকো নামাবার আগেই দ্বীপের লোকেরা দেখে ফেলে। ব্যস, ছুটে গিয়ে ধরে-বেঁধে আনে। আমাদের কাছে এসেছিল এই চক্রান্তে আমাদেরও কোনো হাত আছে কিনা জানতে। ওদের কাছে নৌকো অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তি, তাই নৌকো চুরির চেষ্টা করায় দারুণ চটেছে। তারপর আবার মাঝিরা আরব। আরবদের এরা মোটেই সুনজরে দেখে না। উপজাতিদের ওপর তো কম অত্যাচার করেনি আরবরা! যাহোক, ভাগ্যিস ঠিক সময় এসে পড়েছি, নইলে একটা খুন-খারাপি হয়ে যেত। অনেক বলে-কয়ে ওদের শারীরিক অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু ছাড়বে না, বন্দী করে রাখবে! বিশ্বাসভঙ্গ এদের কাছে মারাত্মক অপরাধ।

'কিন্তু আমাদের সঙ্গে শেষে ফিরে যেতে দেবে তো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'দেবে। মানে যাতে দেয়, সে-চেষ্টা নিশ্চয় করতে হবে। রাগ কমুক। তারপর বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করাব।'

অন্য দুজন মাঝি কাণ্ড দেখে ভীষণ ঘাবড়েছিল। তারা আমাদের কিছুতেই ছাড়বে না। সঙ্গী দুজনের দুরভিসন্ধির কথা তারা বিন্দুবিসর্গ জানত না। অসহায় বন্ধুদের ফেলে কেটে পড়ছিল শুনে গালিগালাজ করে বেইমানদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল।

আমরা অনেক বুঝিয়ে তাদের অভয় দিলাম।

'খবরদার! লুকিয়ে পালাবার চেষ্টা কোরো না। দেখলে তো কী সাংঘাতিক ফল হতে পারে! আমরা যদি ফিরি তোমাদের ফেলে রেখে যাব না।'

যার কোমরে ব্যথা, সে-বেচারা হাঁটাচলা করতে পারে না। শুয়ে থাকে। অন্যজনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। তার ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান হাতটা গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো। তার ওপরেই কোমর ভাঙা লোকটির দেখাশোনার ভার দিলাম।

মধ্যাহ্নভোজন সারলাম। মেনু—টিনের মাংস ও নারকেল। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে মামাবাবু বুট, টুপি, চামড়ার জারকিন ইত্যাদি ধড়াচূড়া এঁটে ব্যাগে স্পেসিমেন সংগ্রহের নানারকম সরঞ্জাম নিয়ে জঙ্গল ঢুঁড়তে বেরোলেন। আমি ও সুনন্দ গেলাম সমুদ্রতীরে মাছধরা দেখতে।

তিনটি ছোট ছোট ডিঙিনৌকো চেপে সাত-আটজন লোক সমুদ্রে মাছ ধরছিল। তাদের কারও হাতে ছোট দড়ির জাল, কারও হাতে বল্লম, মাছ ভাসলেই গেঁথে ফেলবে। বল্লমের পিছনে দড়ি বাঁধা। শিকারকে বিদ্ধ করবার পর টেনে আনা যাবে। অদ্ভুত ব্যালান্স এদের। সরু নৌকোর ওপর বসছে, দাঁড়াচ্ছে। ঢেউয়ের মাথায় টলমল নৌকোগুলো অপূর্ব দক্ষতায় চালনা করছে। জলের জায়গায় জায়গায় শিলাস্তূপ। নৌকো তাদের গায়ে ধাক্কা খেলে চুরমার হয়ে যাবে। এরা অনায়াসে সেসব বাধা এড়িয়ে নৌকো নিয়ে ঘুরছিল।

সুনন্দের শখ হল নৌকো চাপবে। পারে কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভাঙা ভাঙা সোয়াহিলিতে অনুরোধ করল। কিন্তু তারা তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল, 'আপানা' অর্থাৎ না না।

আমি ক্ষেপালাম, যদি অতিথি দেবতা জলে ডুবে অক্কা পায়। গেরস্তের অকল্যাণ হবে। তাই রাজি হচ্ছে না।

সুনন্দ রেগে বলে, 'যা যাঃ। আমি পূর্ব বাংলার ছেলে। পদ্মায় অমন ঢের ঢের নৌকো বাইসি। জলে ডোবা অত সস্তা নয়।'

'কিন্তু এটা নদী নয়, সমুদ্দুর।'

'জানি। তবে পদ্মার ঢেউও খুব সোজা নয়। তাছাড়া আমি তো আর একা চাপতে চাইছি না। ওদের সঙ্গে থেকে একটু প্র্যাকটিস করতাম।'

অজস্র ছোট-বড় নানা রঙের কাঁকড়া। বালির ভিতর গর্ত থেকে উঠে দৌড়াদৌড়ি বা পদচারণা করতে করতে আবার টুক করে গর্তে সেঁধুচ্ছিল। সুনন্দ বলল, 'আয়, ধরি।'

প্রাণপণ চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে আট-দশটা কাঁকড়া ধরলাম।

দ্বীপের লোকেরা আমাদের লক্ষ করছিল। একজন এগিয়ে এসে আমাদের একটা কাঁকড়া উপহার দিল।

প্রকাণ্ড সামুদ্রিক কাঁকড়া। খোলাটা যেন একখানা ছোট কড়াই। দাঁড়াগুলো তেমনি লম্বা ও মোটা, সাঁড়াশির মতো। নিশ্চয় শাঁসে ভরা।

সুনন্দ আহ্লাদে আটখানা হয়ে উপহারদাতাকে বারবার হ্যান্ডসেক করে পিঠ চাপড়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

প্রতিদানে কী দেওয়া যায়?

সে পকেট হাতড়ে বের করল একটা রঙচড়ে রাংতা। চকোলেটের। দুঃখের বিষয় চকোলেটটি সে খেয়ে ফেলেছে। আর কিছু নেই। রাংতাই দেব? তাই সই।

লাইটারের ম্যাজিক দেখাবার পর থেকে এরা সুনন্দকে রীতিমতো সমীহ করে। তাই মাহিন্ডি জাদুকরের কাছে এমন খাতির পেয়ে এবং এমন চমৎকার চকচকে একখানা উপহার লাভ করে লোকটি তো বেজায় খুশি হয়ে গেল।

ফেরার সময় সুনন্দ বলল, 'ইস্, কী যে আপশোস লাগছে! সঙ্গে মশলাপাতি নেই, এমন পেল্লাই কাঁকড়াটা জুত করে রান্না করা যাবে না। চল সিদ্ধ করি, নুন-গোলমরিচ দিয়ে শাঁসটা খাই। নেহাৎ মন্দ লাগবে না।

ছয়

রাত্রে দ্বীপের নিয়মিত ক্যাম্প-ফায়ারে যোগ দিলাম।

আমাদের প্রথম দিনের আড়ষ্টতা কেটে গেছে। এখন অনেক সহজ।

দুদিন সান্ধ্য বৈঠকেই একটা বিচিত্র ব্যাপার আমাদের নজরে পড়েছিল।

প্রথম দিন তিনটি এবং দ্বিতীয় দিন একটি লোক আগুনের পাশে গুটিসুটি মেরে কুঁকড়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে কোঁকাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম পেটব্যথা। কিন্তু পরে তাদের গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি গা খুব গরম। বেশ জ্বর।

অসুস্থ লোকগুলির চিকিৎসার ব্যবস্থাও দেখলাম।

মাহঙ্গা অর্থাৎ ওঝা কামাউ দ্বীপের বদ্যি। তার নির্দেশে অন্যরা লোকগুলিকে ধরে ধরে নিয়ে একটি ছোট কুটিরের মধ্যে ঢোকাল।

কৌতূহলী হলেও প্রথমে কী ডাক্তারি হচ্ছে দেখার সুযোগ পাইনি। দ্বিতীয় দিনে উঁকি মেরে লক্ষ করলাম।

দেখি কুটিরের মধ্যে এক চুল্লি জ্বলছে! রুগীরা আগুনের পাশে শুয়ে পড়ল। তাদের গায়ের ওপর কয়েকটা জানোয়ারের ছাল চাপিয়ে দেওয়া হল। তারপর কামাউ এসে দু-চারটে মন্ত্র আউড়ে খানিকটা তরল পদার্থ প্রত্যেক রুগীকে খাইয়ে দিল। অতঃপর তাদের সেখানে রেখে অন্যরা ফিরে এল।

এই দেশি টোটকায় খুব উপকার হয় বলে বিশ্বাস হয়নি। কারণ, দেখছি লোকগুলি সে-রাতে আর উঠতে-বসতে পারেনি। জ্বরে অচেতন হয়ে রয়েছে।

তবে রোগ মারাত্মক নয়। কারণ পরে দেখেছি তাদের, আবার চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। দুর্বল দেহ, চোখে-মুখে শ্রান্ত অবসন্ন ভাব। বোধহয় জ্বর নেই বা কমে গেছে। কে জানে কী ব্যারাম!

আগেই বলেছি এখানে আমাদের কিছু অনুরাগী জুটেছিল। একদল বালক-বালিকা। তারা সর্বত্র ছায়ার মতো আমাদের অনুসরণ করেছে। লক্ষ্য করেছে আমাদের হাবভাব। পুরো দেড়দিন আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি।

ক্রমে তাদের বিদেশিদের প্রতি উৎসাহ কমে গেল—শুধু একজন ছাড়া।

ছেলেটিকে আমরাও নজর করেছিলাম, বয়স সতেরো-আঠারো। যেন কষ্টিপাথরে কোঁদা শরীর। চোখাচোখি হলেই দু সারি মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসত। আমাদের সম্বন্ধে তার কৌতূহল অদম্য।

তৃতীয় দিন ভোরে দেখি—ইতিমধ্যে ছেলেটি এসে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুনন্দ বলল, 'ছোঁড়া পেটুক। দেখেছিস যখনই আমরা খেতে বসি, এসে আমাদের খাওয়া দেখে। জিভ চাটে।'

দুগ্ধহীন কফি ও বিস্কুট সহযোগে প্রাতরাশ সারছি, ছেলেটি যথারীতি কাছে এগিয়ে এল।

সুনন্দ একটা বিস্কুট বাড়িয়ে সোয়াহিলিতে ডাকল, 'ভিতরে এস, ভয় নেই। খাবে?—টাকা কুলা?'

সে তৎক্ষণাৎ খানিক দূরে সরে গিয়ে মাথা নাড়াতে লাগল। জাদুমন্তর জানা বিদেশিদের বড় ভয়।

আমি ও সুনন্দ খুব ডাকাডাকি করতে থাকি, অভয় দিই। বারবার দেখিয়ে দেখিয়ে বিস্কুট খাই এবং হাত বাড়িয়ে 'অফার' করি, 'খাও খাও, লজ্জা কী?'

এই টোপেই কাজ হল। গুটিগুটি এগিয়ে এসে ছেলেটা টপ করে সুনন্দর হাত থেকে বিস্কুট নিয়ে ফের দূরে সরে গেল।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিনিসটা পরীক্ষা করল। শুঁকল। তারপর ভয়ে ভয়ে এক টুকরো কামড়াল।

খানিকক্ষণ সে চোখ বন্ধ করে মুখ কুঁচকে বস্তুটির আস্বাদ নিল। তারপরই ফিক করে হাসি! 'বাঃ, খাসা, গ্র্যান্ড! মুজুরি সানা।'

সঙ্গে সঙ্গে বাকিটুকু মুখে পুরে কামড়িয়ে চিবিয়ে আবার হাত পাতল, 'ইঙ্গিনে মোজা।' অর্থাৎ আর একটা।

তার নামটি জেনে নিই। বলল, 'জেনা ইয়াঙ্গু টোটো।' অর্থাৎ আমার নাম টোটো।

টোটো ফের হাজির। ঘড়ি ধরে ঠিক বারোটায় বোধহয় সারা সকালটা সে তার ছায়ার ওপর দৃষ্টি রেখে এই মাহেন্দ্রক্ষণটির প্রতীক্ষা করছিল। এখন তার লজ্জা-ভয় কমে গেছে। একবার ডাকতেই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে এককোণে উবু হয়ে বসল।

আমাদের সঙ্গে চাল ছিল। ফেন-ভাত রেঁধেছিলাম, সঙ্গে মাখন ও টিনের মাংস।

প্লেটে অল্প মাংস দিয়ে টোটোর সামনে রাখলাম। কচ্ছপের মাংস, সামান্য মশলা দেওয়া। একবার গরম করে নিলেই খাসা খেতে। সুনন্দ বলল, 'দেখ হে টেস্ট করে। তোমাদের তো যত ঝলসানো আর আধপোড়ার কারবার, এ-বস্তুর মর্ম বুঝলে হয়!'

টোটো দেখল, শুঁকল, চাটল, তারপর সন্তর্পণে একটু মুখে পুরল। আধ মিনিট তার চক্ষুমোদা, সমস্ত ইন্দ্রিয় স্বাদগ্রহণে তন্ময়। চোয়াল অল্প অল্প নড়ছে। হঠাৎ চোখ খুলল! মুহূর্তে বাকি মাংস নিঃশেষ এবং প্লেটসহ হস্ত প্রসারিত, 'মুফা'—আরও দাও।

আধ টিন ম্যাংস শেষ করার পর আমরা বাধ্য হয়ে তাকে আর পরিবেশন করতে নারাজ হলাম।

ব্যস, এরপর থেকে সে আমাদের নিয়মিত অতিথি বনে গেল। যেখানেই থাকুক খাবার সময় তার হাসিমুখটি ঠিক তাঁবুর দরজায় উঁকি মারবে।

টোটোর সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেল। দ্বীপের সোয়াহিলি বুঝতে আর এখন আমাদের তেমন কষ্ট হয় না। মামাবাবু একদিন ঠাট্টা করে বললেন, 'কেন মাথা খাচ্ছ ছেলেটার? তোমরা তো দুদিন পরে চলে যাবে, তখন? দেশি রান্না কি আর ওর মুখে রুচবে?'

সুনন্দ বলল, 'সে আমি ভেবে রেখেছি। অনেকগুলো মাছ-মাংসের সোজা সোজা রান্না আমি টোটোকে শিখিয়ে দেব। তারপর যেদিন উপকূলে ফিরব, ওকে সঙ্গে নেব। ওখান থেকে প্রচুর টিনফুড আর দরকারি মশলাপাতি কিনে দেব। মাটির হাঁড়ি-কুড়ি ওরা বানাতে পারে! মাছ-মাংসের অভাব নেই। যখন ইচ্ছে খুশিমতো মুখ বদলাবে।'

টোটোকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, 'এ-দ্বীপে তোমরা কতদিন এসেছ?'

'অ-নে-ক-দি-ন। আমার জন্ম তো এখানে।'

'আগে কোথায় থাকতে?'

'আগে ছিলাম এ-মহাসাগর, 'বাহারিকু', এই সমুদ্র পেরিয়ে ওপারের দেশে। 'বালিসানা'— অনেকদূরে—পাহাড়-জঙ্গলের রাজ্যে।'

সুনন্দ বলল, 'আচ্ছা এখন সবার সঙ্গেই আমাদের বেশ ভাব-সাব হয়েছে, কিন্তু কামাউ-এর ব্যাপারটা কী? আমাদের সঙ্গে কথা বলে না, কাছে আসে না, কেন?'

'কামাউ কোনো বিদেশিকেই পছন্দ করে না। আর সাদা মানুষদের ওপর তো ভীষণ চটা।'

'কেন?'

'শুনেছি, কামাউ যখন ছোট ছিল, একদল শয়তান সাদামানুষ তাকে দূর দেশে ধরে নিয়ে যায়। খুব অত্যাচার করে। অনেক কষ্টে কামাউ পালায়। সেই থেকে তার রাগ। মাহিন্ডি বলে বেঁচে গেছ, সাদাদের বাগে পেলে ও খুন করতে পারে।'

টোটো একদিন সকালে এল না, দুপুরেও এল না, এল রাত্রে। তাঁবুর কাছে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সতর্কভাবে দেখল, তারপর গুটিগুটি তাঁবুর গা ঘেঁষে ছায়ায় বসল। 'কী ব্যাপার?'

শুনলাম, কামাউ তাকে ধমকেছে, 'এই ছোঁড়া, মাহিন্ডিগুলোর কাছে অত ঘুরঘুর কীসের? শুনছি ওখানে অখাদ্য-কুখাদ্য গিলিস। খবরদার ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। বিদেশিদের সঙ্গে অত ভাব চলবে না।'

কী হিংসুটে লোক! কিন্তু পেটুক টোটোকে ভয় দেখিয়ে আটকানো যায়নি। তবে বলে গেল দিনের বেলায় আর আসবে না। রাত্তিরে আসবে। সবাই যখন নাচ-গানের জন্য তৈরি হচ্ছে, তখন লুকিয়ে।

এই দ্বীপের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু জেনেছি।

দ্বীপের জনসংখ্যা একশোর বেশি নয়। এরা চাষবাস ভালোবাসে না। সামান্য ভুট্টা, রাঙাআলু ও দু-এক রকম শস্য ফলায়। জীবনধারণের প্রধান উপায় শিকার ও মাছধরা। গরু ও ছাগল পোষে। মাংসের অভাব মেটে। আধুনিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের খুবই কম। পারতপক্ষে মহাদেশের মাটিতে পা দেয় না। নৌকো এদের মহামূল্যবান সম্পদ। নৌকো চুরি করতে গিয়ে আমাদের মাঝিদের কী হাল হয়েছিল তা তো আগেই বলেছি। সামান্য কয়েকটি লোহার হাতিয়ার সম্বল করে অনেক কষ্টে গাছের গুঁড়ি কেটে নৌকো বানায়।

ছোট আর মাঝারি ডিঙিগুলো কাছাকাছি মাছ ধরার জন্য। কয়েকটা বড় ছিপ নৌকো আছে দূরে পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে।

মামাবাবু প্রত্যহ দ্বীপের সান্ধ্য আসরে যোগদান করে এদের আচার-ব্যবহারের খুঁটিনাটি লক্ষ করতেন। নোট করে রাখতেন। এমন চমৎকার গবেষণার ক্ষেত্র পেয়ে মাফিয়া না যেতে পারার শোক তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন।

সাত

দ্বীপবাসের পঞ্চম দিন। সন্ধেবেলা। আমি ও সুনন্দ তাঁবুর ভিতর বসে রাতের খাবারের আয়োজন করছি। মামাবাবু তাঁর নিজের কামরায়। সারাদিনের সংগ্রহ নমুনাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত। টোটো যথারীতি হাজির। তাঁবুর পাশটিতে উবু হয়ে বসে। কেমন, চুপচাপ। কথাবার্তা বলছে না। হঠাৎ সে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল।

'কী হল, কী হল?'

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখি খুব জ্বর। গা পুড়ে যাচ্ছে।

আমাদের ডাক শুনে মামাবাবু বেরিয়ে এলেন। টোটোর জিভ, চোখ ইত্যাদি পরীক্ষা করে বললেন, 'হুঁ, যা ভেবেছি, ম্যালেরিয়া। আগুনের ধারে অসুস্থ লোকগুলোকে দেখেও আমার এই সন্দেহ হয়েছিল।'

'এ্যাঁ, এখানে ম্যালেরিয়া? আমরা দুজন অবাক। এটা তো জানতাম আমাদের দেশের পেটেন্ট অসুখ। অন্য দেশেও ম্যালেরিয়া আছে?'

'নিশ্চয়।' মামাবাবু বললেন, 'আফ্রিকা হচ্ছে ম্যালেরিয়ার ডিপো। এখান থেকে পৃথিবীর বহু জায়গায় ম্যালেরিয়া ছড়িয়েছে। ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে এই মহাদেশে বহু উপজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। মাফিয়ায় যেখানে যাচ্ছিলাম, সেখানেও খুব ম্যালেরিয়া হচ্ছিল। হাইনে তাই আমাকে বেশ কিছু ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধক ট্যাবলেট নিয়ে যেতে লিখেছিলেন। যাক, ওষুধগুলো কাজে লেগে যাবে। সুনন্দ আমাদের বড় প্যাকিং-বাক্সটার মধ্যে দেখবে একটা হলুদ রঙের প্যাকেট রয়েছে। নিয়ে এসো তো!'

ওষুধ মুখে নিয়ে টোটো থু থু করে ফেলে দিল। আমরা বোঝাই, 'খেয়ে নাও ভাই, দেখবে অসুখ সেরে যাবে। লক্ষ্মী ছেলের মতো খেলে তবে অনেকগুলো বিস্কুট পাবে।' বিস্কুটের লোভেই বোধহয় সে মুখ বিকৃত করে, বড়ি ক'টা গিলে ফেলল। তাকে তাঁবুর মধ্যে শুইয়ে দিয়ে দুটো কম্বল ঢাকা দিয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ পর গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বর কমেছে।

ঘণ্টাতিনেক পর টোটো উঠে বসল। গরম চা-বিস্কুট খেল। সে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। সত্যি মাহিন্ডিদের ওষুধের আশ্চর্য গুণ। এই 'হোমা' অর্থাৎ কাঁপুনি-জ্বর তার আগেও হয়েছে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কখনো ভালো হয়নি। আর জ্বরের পর এত চাঙ্গাও কখনো বোধ করেনি। প্রতিবারই ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে।

বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে সে বিদায় নিল।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সেদিন আর দ্বীপের সান্ধ্য আসরে গেলাম না! মামাবাবু বললেন, 'সঙ্গে তো মশারি আছে, এবার বের করো। জেনেশুনে ম্যালেরিয়া বাধিয়ে কাজ নেই।'

পরদিন ভোরবেলা। সবে ঘুম ভেঙেছে। একজন লোক এসে তাঁবুর সামনে বেজায় হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিল।

'সর্দার ডাকছে, জলদি।'

'হঠাৎ সর্দারের তলব কেন?'

'তা জানি না। বলে দিয়েছে সেই দাওয়াই নেবে।'

'দাওয়াই? ওষুধ? কীসের?'

'ঐ যে টোটোকে খাইয়েছিলে। সেই ওষুধ।'

ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ আঁচ করি। সর্দার কি চটেছে? তার অগোচরে বিদেশি ওষুধ খাওয়ানো কি অপরাধ হয়ে গেল? পরোপকার করতে গিয়ে নতুন ফ্যাসাদ বাধালাম না তো? টোটোও আচ্ছা পেট আলগা, কী দরকার ছিল জানানোর? অবশ্য আমরাও তাকে বারণ করিনি বলতে।

অগত্যা তিনজনে দূতের সঙ্গে চললাম। দুরু দুরু বক্ষে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে যাই। হুকুম মাফিক কিছু ম্যালেরিয়ার ট্যাবলেটও নিলাম।

গ্রামের ডাক্তারখানা। সেই ছোট্ট কুটির।

সর্দার তার দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। যেতেই কুটিরের ভিতরে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এদের ওষুধ দাও, জ্বর হয়েছে। কাল যেমন টোটোকে দিয়েছ, তেমনি—'

টোটো সামনে ছিল। দাঁত বের করে হাসল। বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। যত নষ্টের মূল।

কুটিরের ভিতর দুজন লোক শুয়ে জ্বরে কাঁপছিল। মামাবাবু ভিতরে ঢুকলেন। পরীক্ষা করে বললেন, 'হুঁ—ম্যালেরিয়া।' ট্যাবলেট দিলেন। সর্দারকে বললেন, 'পরে আমায় খবর দিও গা গরম কমেছে কী না।'

সর্দার বলল, 'এ-অভিশাপ দ্বীপে আগে ছিল না। মাত্র বছরখানেকের আমদানি। কয়েকজন উপকূল থেকে ঘুরে এসে এই 'হোমা' অর্থাৎ কাঁপুনি-জ্বরে পড়ে। ক্রমে আজ দ্বীপের অধিকাংশ লোককে এই রোগ ধরেছে। সহজে মরে না কেউ, কিন্তু দিন দিন দুর্বল করে দিচ্ছে আমাদের। আমার নিজেরও একবার জ্বর হয়েছিল। জ্বর ছেড়ে গেল দুদিনে। কিন্তু ওঃ, পরে সাত দিন ধরে পা টলত, মাথা ভনভন করত। টোটো বলছে, তোমাদের ওষুধ খেয়ে নাকি অল্পক্ষণেই জ্বর সেরে গেছে, আর এক রাতেই তাজা হয়ে উঠেছে। তাই তো ডাকলাম। কী যে করি এই নিয়ে! কামাউ বলে, দুষ্টু অপদেবতা ভর করেছে। অনেক পুজো-টুজো তো দিচ্ছি, কিন্তু তাড়াতে পারছি না।'

প্রায় দুঘণ্টা পর।

দেখি একটা বড় দল ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে। সর্দার সামনে। সেই রুগী দুজনও রয়েছে। হেঁটে আসতে পারছে, অর্থাৎ জ্বর কমেছে। আমরা গম্ভীর মুখে অপেক্ষা করি।

রুগী দুজন সামনে এসেই সটান শুয়ে পড়ল, 'জয় বাবা মাহিন্ডি! কী দাওয়াই দিয়েছ! জাদু!'

সর্দার বলল, 'আশ্চর্য ওষুধ তোমাদের। এতদিন কামাউ-এর ওষুধ খেয়েছি। কিন্তু এ অদ্ভুত ব্যাপার কোথায় শিখলে?'

সুনন্দ চাল মেরে বলে, 'হুঁ হুঁ বাবা, এ কি যে-সে জিনিস! মন্ত্রপূত করা। কামাউ এ-বস্তু পাবে কোথা? গুরুর কাছে শিখতে হয়।'

মাহিন্ডিদের অসামান্য শক্তি দেখে সবাই ভক্তিতে গদগদ।

মামাবাবু বললেন, 'আবার কারো জ্বর হলে খবর দিও, বা এখানে পাঠিও। না-না, পাঠানোর দরকার নেই, আমরাই যাব। প্রত্যেকদিন সকালে ঐ কুটিরে।'

রুগীরা দুটো বড় বড় ডাব নিয়ে এল। ডাক্তারের ফি!

সবাই খুশি, শুধু একজন ছাড়া। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে, কপালে ভ্রূকুটি, হিংস্র চাউনি। সে কামাউ।

আট

ঘটনাটায় আমাদের দ্বীপের জীবনযাত্রা এক নতুন পথে মোড় নিল।

প্রত্যেকদিন সকালে একবার গ্রামের হাসপাতালে হাজির হই, দু-একটি রুগী মজুত থাকে প্রত্যেকদিন।

দ্বীপের প্রত্যেকটি লোকের মধ্যেই বোধহয় ম্যালেরিয়ার জীবাণু সংক্রামিত হয়েছে। শিশু ও বালক-বালিকারাই ভোগে বেশি। এদের জীবনীশক্তি খুব জোরালো। তাই দু-এক ডোজ ওষুধ খেয়েই গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু এভাবে কতদিন যাবে? সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করে কী লাভ! বারবার জ্বর হয়ে প্রাণশক্তি যে ক্ষয় হয়ে যাবে। মামাবাবু বললেন,

'ফিরে গিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ওষুধপত্র নিয়ে দল পাঠাতে হবে। ডিডিটি ছড়িয়ে ম্যালেরিয়ার বিষবাহী মশা ধ্বংস করতে হবে, নইলে এরা মরবে।'

আমাদের খাতির এখন দেখে কে?

নাচ-গানের আসরে সর্দারের পাশেই আমাদের আসন নির্দিষ্ট হয়েছে। তাদের সঙ্গে নাচে যোগ দিতে আমাদের সাধাসাধি করে। তাল বুঝে সুনন্দ একদিন লাফিয়ে উঠে নাচ শুরু করে দিল। আধঘণ্টা নেচে-কুঁদে বেদম হয়ে সে বসে পড়ে। সকলে খুব তারিফ করল, 'তোমার হবে। ক'দিন অভ্যেস করলেই হবে। ফার্স্ট ক্লাস নাচিয়ে হয়ে যাবে। শুনে সুনন্দের কী গর্ব!'

আমার বাবা নাচার শখ নেই! তবে ওদের নাচের তালে পা আপনি নেচে ওঠে। তখন চুপ করে বসে থাকা যায় না। আমি তাল ঠুকি। টিনের কৌটো বাজাই। মামাবাবুকেও দেখেছি ঘাড় নেড়ে তাল দিচ্ছেন।

নাচ এদের রক্তে। ছেলে-বুড়ো মা-মেয়ে সবাই নাচের নামে পাগল। থুত্থুরে বুড়ো, বয়সের ভারে বেঁকে গেছে, সেও পা ঠোকে। হাততালি দেয় নাচের সাথে। এদের সমস্ত সুখ-দুঃখের প্রকাশ নাচের মাধ্যমে।

সমুদ্রে একটা বড় মাছ উঠল। অমনি তীরে যারা ছিল একপাক নেচে নিল। শুয়োর মারা হয়েছে, ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আজ, ব্যস, নাচ চলবে দু-গুণ। আবার একজন বুড়ো মরল, তার শ্রাদ্ধেও দেখি সবাই নেচে নেচে শোক প্রকাশ করছে।

সর্দার নাচে। কামাউও নাচে।

চত্বরের একটু বাইরে এদের এক মন্দির আছে। উঁচু টিলার ওপর ছোট্ট ঘর। দেয়াল ও মাথার ছাউনি অন্য ঘরের মতো। কোমর সমান উঁচু এক প্রবেশপথ। তার ওপর তক্তা দিয়ে বন্ধ থাকে। কামাউ প্রত্যেক দিন সন্ধেবেলা সেই দরজা খুলে ভিতরে দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে। সেই দেবতার চেহারা আমরা দেখিনি। কামাউ একা যায়, অন্য কেউ যায় না। বিশেষ উৎসবে নাকি দেবতাকে বের করা হয়। আমাদের দেবভক্তি তেমন প্রবল না হওয়ায় ও-বিষয়ে মাথা ঘামাইনি।

তবে যে-কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম তা হল, কামাউয়ের পুজোর পদ্ধতি।

দু-চার লাইন মন্ত্রপাঠ। তারপর সে মন্দিরের চারপাশে বারকয়েক নেচে নেচে ঘুরবে। পুজো শেষ। এইবার সে আসবে চত্বরে। মজলিসে যোগ দেবে। সেখানেও সে নাচে। তবে রোজ নয়, বিশেষ উপলক্ষে। তার নাচের বিশেষত্ব আছে।

সে নাচবে একা। অন্যরা তখন ওঠে না। ঢাক আর ড্রামের আওয়াজ চতুর্গুণ হয়ে ওঠে। কী সমস্ত সাংঘাতিক অঙ্গভঙ্গি ও মুদ্রা, তেমনি বিকট মেকআপ! মুখে বুকে হাতে পায়ে লাল কালো সাদা হলদে রঙের ছড়াছড়ি। হঠাৎ দেখলে বুক ধড়াস করে ওঠে। কী বাবা ওটা? মানুষ না রাক্কস?

ভাঁটার মতো চক্ষুতারকা ঘুরছে। গায়ে হাড়ের গয়নায় খটাখট আওয়াজ। মাথায় লম্বা লম্বা পালকের মুকুটে ঝোড়ো কাঁপন। থেকে থেকে হুহুঙ্কার।

ভূতপ্রেত অপদেবতা বশ করা হচ্ছে কিনা, তাই এইসব ভয়ঙ্কর কলাকৌশল।

সুনন্দ আপসোস করে, 'ইস্ একটা মুভি ক্যামেরা থাকলে যা হত! কোথায় লাগত হলিউডের ছবি!'

আমাদের তাঁবু উপহারে ভরে যেতে লাগল। আমরা সর্দারের প্রিয়পাত্র, তাদের মহা উপকারী বন্ধু, সবাই চায় আমাদের সন্তুষ্ট করতে। উপহার যা আসে বেশির ভাগই খাদ্যবস্তু। মাছ, মাংস, পাখি, কচ্ছপের ডিম, কাঁকড়া। ফলটলও আসে। একরকম শিম আসত, দেশি শিমের মতো স্বাদ। আর আসত কাঁড়িকাঁড়ি নারকেল ও জল-ভরা কচি মিষ্টি ডাব।

একটা চিংড়িমাছ দিয়েছিল, খোলাটা বাঁশের মতো মোটা। দুহাত লম্বা। একটির কালিয়াতে বাড়িসুদ্ধুর পেট ভরে যাবে। সুনন্দর তো চোখে জল আসার উপক্রম। আহা এমন জিনিসটি যদি—মাসিমার (আমার মার) হাতে পড়ত! যাহোক নারকেল দিয়ে চিংড়িমাছের মালাইকারি গোছের কী একটা যে বানাল!

খেতে খেতে মামাবাবু বললেন, 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে মাছটা!'

সত্যি সুনন্দর কৃতিত্ব আছে। আমাদের সঙ্গে আনা যৎসামান্য মশলা দিয়ে কত কত কী নতুন রান্না খাইয়ে মুখের একঘেয়েমি কাটিয়ে দেয়।

টোটো এখন বুক ফুলিয়ে আসে। কামাউকে থোড়াই কেয়ার করে। বরং আমাদের সঙ্গে দোস্তি আছে বলে বন্ধুমহলে তার খাতির বেড়েছে।

আমাদের দিন কাটছে প্রায় একই ধাঁচে। মামাবাবু সকালে বেরিয়ে ফেরেন দুপুরে। পোকা-মাকড়, ফল-ফুল-পাতা কত কী যে জোগাড় করে আনেন! দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়েই বসেন স্পেসিমেনগুলির পরিচয় উদ্ধার করতে। বই ঘাঁটেন, নোট করেন। যত্ন করে স্পেসিমেন বাক্স-বন্দী করেন।

একদিন ফিরলেন, হাতে কয়েকটা ধুঁধুল।

'এখানে ধুঁধুল পেলেন কোত্থেকে?'

'বনের মধ্যে লতা আছে।'

'কিন্তু এখানে ধুঁধুল এল কী করে?' আমি আশ্চর্য হয়ে বলি।

'বাঃ, ধুঁধুল তো এখানকারই ফল! এখান থেকে ভারতে গিয়েছে। শুধু ধুঁধুল কেন, আরও অনেক ফল-ফুল বাইরে থেকে ভারতবর্ষে গিয়েছে। আজ আমরা তাদের ভাবি খাঁটি দেশি।'

'গেল কী করে?'

'বণিকরা এনেছে। পর্যটকরা এনেছে। অবশ্য ভারত থেকেও অনেক ফল-ফুল বিদেশে গেছে।'

ধুঁধুল ভাজা (তেল নয়, মাখন দিয়ে) খেয়ে একটু চেনা খাবারের স্বাদ পেলাম। বাড়ির কথা, মার হাতের রান্নার কথা মনে পড়ছিল। আহা কতদিন খাইনি!

সুনন্দের বেশ সুবিধে হয়েছে। সমুদ্রে নৌকো চালানোর শখ এতদিনে মিটেছে। এখন তাকে সাধাসাধি করতে হয় না, বরং কার নৌকোয় সে উঠবে সেই নিয়ে টানাটানি।

সুনন্দ আগে নদীতে ডিঙিনৌকো চালিয়েছে, কাজেই সমুদ্রে ডিঙি বাওয়া রপ্ত করতে তার সময় লাগল না। আমিও চাপি। তবে ওর মতো দাঁড়িয়ে বল্লম দিয়ে মাছ শিকারে সাহস হয় না। পারতপক্ষে আমি সুনন্দর সঙ্গে এক নৌকোয় উঠি না। যা দাপাদাপি করে। প্রায়ই তার জন্যে নৌকো উল্টোয়। সাঁতরাতে সাঁতরাতে নৌকো সোজা করতে হয়। জলে হাঙর আছে, কোনোদিন ঘ্যাক করে ঠ্যাংখানা কেটে নিলে বুঝবে ঠ্যালা।

সুনন্দ একজনের কাছে বেজায় জব্দ। লুম্বাকে দেখলেই তার মুখ শুকিয়ে যায়। আমাকে বলেনি ব্যাপারটা, কিন্তু একদিন ঘটনাচক্রে জেনে ফেললাম।

বনপথে আসছি দুজনে। সারা সকাল ধরে মাছ ধরেছি। সাঁতার কেটেছি। পেটে চনচনে ক্ষিদে। হঠাৎ সুনন্দ বলল, 'এই খেয়েছে!' বলেই সে চট করে একটা গাছের পাশে লুকোয়। 'তুই এগিয়ে যা, আমার দিকে তাকাসনি।'

'বেশ। আমি এগোলাম। সামনে দেখি একটি যুবক। ওকে চিনি, লুম্বা।'

লুম্বাকে দেখেই লুকোল নাকি?

লুম্বাও আমাদের দেখেছে। দুজনকেই। কারণ সে আমার দিকে একবার তাকিয়েই সোজা সুনন্দকে লক্ষ্য করে দৌড়ল।

আমি হাঁ করে দেখছি ব্যাপারখানা।

লুম্বা ছুটে গিয়ে খপ্ করে সুনন্দর হাত চেপে ধরল। 'এ্যাঁ। মারবে-টারবে না কি?' আমি বাধা দিতে এগোই।

'আরে দূর দূর! এই জন্যে এত কাণ্ড!' আমি হেসে ফেলি।

লুম্বা সুনন্দের ঘড়িসুদ্ধ কব্জিটা টেনে নিয়ে ঘড়িটা তার ডান কানের ওপর চেপে ধরেছে। তার চোখ বোজা, নাক-মুখ কুঁচকে প্রাণ ঢেলে শুনছে—

সুনন্দ অসহায়ভাবে বলে, 'দেখছিস, এই এক যন্ত্রণা! যখনই দেখবে টিক্ টিক্ শোনা চাই।'

'কিন্তু রহস্যটি টের পেল কী করে! তুই শুনিয়েছিলি বুঝি?'

'হুঁ।' সুনন্দ বিরসবদনে বলে। 'একদিন মজা দেখতে ওর কানে ঘড়ি চেপে ধরেছিলাম। ব্যাটা তো আঁতকে উঠে মারল ডিগবাজি। তারপর বুঝিয়ে শুনিয়ে ভয় ভাঙিয়ে টিক্ টিক্ শোনালাম। ব্যস, সেদিন থেকে আরম্ভ হয়েছে এই গেরো।'

'এই ছাড় ছাড়! হাত ব্যথা হয়ে গেল যে।—আর একটু, আর একটু।' লুম্বা এবার বাঁ কানের ওপর ঘড়ি চেপে ধরে।

সুনন্দ রেগেমেগে ঘড়ি খুলে দেয়! 'নাও শোনো।'

পনেরো মিনিট পর অনেক ঝুলোঝুলি করে তবে ঘড়ি ফেরত পাওয়া যায়।

সবাই খুশি, শুধু কামাউ আর তার গুটিকয়েক ভক্তের মুখ দিন দিন থমথমে হচ্ছে। কামাউয়ের কয়েকজন ভক্ত ছিল। সর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। তাদের মধ্যে দুটিকে আমরা খুব চিনেছি। দুটি যেন মানিকজোড়। সর্বদা একসঙ্গে থাকবে। তাদের নাম দিয়েছিলাম—ত্যাড়া-ব্যাঁকা। আসলে বলা উচিত ছিল ট্যারা-ব্যাঁকা। কারণ একজনের চোখ কিঞ্চিৎ ট্যারা এবং অন্যটির পা দুটো ধনুকের মতো বাঁকা।

লোক দুটো বেজায় লোভী এবং ধড়িবাজ। আমাদের কাছে প্রায়ই এটা-সেটা চাইত। আবার কখনো চাইত কামাউয়ের নাম করে। পরে খবর পেয়েছি সেসব উপহার বেশির ভাগ সময় কামাউয়ের হাতে পৌঁছয়নি। দুই শিষ্যই গাপ মেরে দিয়েছে।

যেদিন আমাদের চিকিৎসাপাট আরম্ভ হয়, তার দুদিন পরে।

বিকেলে ক্যাম্পের বাইরে বসে আছি, হঠাৎ দেখি একজন আসছে এদিকে। ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম—কামাউ। কামাউয়ের হাঁটা ভুল হবার নয়। ব্যাপার কী?

কামাউয়ের দীর্ঘ শরীর সামনের দিকে নোয়ানো। যখন চলে দেহ সামনে আরও ঝুঁকে পড়ে ধনুকের মতো বেঁকে যায়। লম্বা লম্বা পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে এগোয় যেন রণ-পা চড়ে হাঁটছে। আর হাত দুটো তার পেণ্ডুলামের মতো ক্রমাগত সামনে পিছনে দোল খায়।

'জাম্বো, বানা' অর্থাৎ নমস্কার।

কামাউ হাসি হাসি মুখে সম্ভাষণ জানায়। কিছু একটা মতলব আছে নিশ্চয়। মনের ভাব চেপে রেখে বলি, 'কুজা কুজা', অর্থাৎ আসুন আসুন। কী সৌভাগ্য! 'খেতি হিকো' (এখানে বসুন)।—একটা প্যাকিং বাক্স এগিয়ে দিই।

কামাউ বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'বিদেশি মাহিন্ডি তোমরা দেখছি অনেক দৈবশক্তি-টক্তি রাখো। ওষুধ-টষুধ জানো। তা আমাকে ঐ হোমার দাওয়াই তৈরি শিখিয়ে দাও। তোমরা চলে গেলে আমাকেই তো চিকিৎসা করতে হবে।'

'ওঃ, এই মতলব!'

সুনন্দ বাংলায় মামাবাবুকে বলে, 'দেখছেন কী ধড়িবাজ! এসে পর্যন্ত পিছনে লাগবার চেষ্টায় আছে, ভদ্রভাবে দুটো কথা অবধি বলেনি, এখন ওষুধ শিখে নাম কেনার ধান্দা। কী মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা হচ্ছে!'

মামাবাবুকে কিছু বলতে না দিয়ে সুনন্দ মেজাজের মাথায় বলল, 'ওষুধ তৈরি কী করে শেখাব? সেসব অনেক জিনিসপত্র লাগে। এখানে পাব কোথায়?'

'তাই বুঝি? কামাউ একটু দমে যায়। সেসব এখানে পাওয়া যাবে না?'

'না।'

কামাউ খানিক ভাবে। তারপর বলে, 'বেশ তোমাদের কাছে কত ওষুধ আছে? কতদিন চলবে?'

'খুব বেশি দিন নয়। আমরা ডাক্তারি করতে হবে জেনে আসিনি। এই ধরো আর এক চাঁদ (অর্থাৎ একমাস)।

সুনন্দ বাড়িয়ে চলল। এই রেটে খরচ হলে ট্যাবলেট আর পনেরো দিন চলবে বড়জোর।

'বেশ, যা ওষুধ আছে আমায় দিয়ে দাও। এবার থেকে আমিই চিকিৎসা করব।' কামাউ বলে।

'বটে, আবদার তো মন্দ নয়! কেন টোটোকে এখানে আসতে, আমাদের সঙ্গে মিশতে বারণ করার সময় মনে ছিল না?' সুনন্দ বাংলায় জানায়।

তারপর কামাউকে বলে, 'তা তো সম্ভব নয়।'

'কেন?' কামাউয়ের মুখ গম্ভীর।

'ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। গুরুর কাছে অনেক দিনের চেষ্টায় ওষুধ তৈরি শিখেছি। গুরু বলেছে এ-ওষুধ অন্য কারও হাতে পড়লে আর কাজ হবে না!'

কামাউয়ের ভ্রূকুঞ্চিত। বলল, 'মনে রেখো আমিও মন্ত্রটন্ত্র জানি। আমার হাতে ওষুধের গুণ নষ্ট হবে কেন?'

'হবে হবে।' সুনন্দ বলে। 'তুমি তো আর আমাদের গুরুর কাছে মন্ত্র নাওনি!'

কামাউয়ের মুখে অবিশ্বাস। বলল, 'বেশ দেখি পরীক্ষা করে। দাও তোমাদের ওষুধ।'

'উত্তম।' সুনন্দ তাঁবুর ভিতর ওষুধ আনতে যায়।

আমি ও মামাবাবু চুপচাপ শুনছিলাম। 'সুনন্দটা তো আচ্ছা প্যাঁচালো বুদ্ধি রাখে!' মামাবাবুর মুখে চাপা হাসি।

সুনন্দ ফিরে এসে দুটো বড়ি কামাউয়ের হাতে দিল, 'কি, কোনো রুগী আছে নাকি হাতে? তাহলে এখুনি খাইয়ে দেখতে পারো।'

কামাউ বলল, 'আছে।'

দীর্ঘ শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে, পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কামাউ হাঁটতে লাগল। আমরা তিনজনও সঙ্গে চললাম।

একটি কুটিরে একজন জ্বরে কাতর হয়ে শুয়েছিল। কামাউ তাকে বড়ি দুটো খাইয়ে দিল। দু-চারবার নিজস্ব মন্ত্রও আউড়াল।

সুনন্দ বলল, 'কাল জানতে পারবে ফলাফল। আজ চলি।'

খেতে খেতে মামাবাবু বললেন, 'কী দিলে?'

'মাথাধরার ট্যাবলেট। সাদা, একরকম দেখতে, ধরতে পারেনি।'

'কাজটা ভালো করলে না। ও কিন্তু তোমার কথায় বিশ্বাস করেনি। বুঝেছে ঠকাচ্ছে। ওষুধ শেখাবার ইচ্ছে নেই। কাল যখন দেখবে জ্বর নামল না, চটে যাবে। আমাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।'

'ফুঃ, ঘোড়ার ডিম করবে। ওকে কিছু দিচ্ছি না। ব্যাটা মহা হিংসুটে। যদি যাবার সময় কিছু বাঁচে তো সর্দারকে বরং দিয়ে যাব।'

পরদিন দ্বীপের হাসপাতালে গিয়ে দেখি রাত্তিরের সেই লোকটি আমাদের চিকিৎসার অপেক্ষা করছে। তার জ্বর কমেনি, বরং বেড়েছে। তাকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ দিলাম।

কামাউ পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের কার্যকলাপ দেখছিল। সুনন্দ তাকে হেসে বলল, 'কী হে, বলেছিলাম না? বিশ্বাস হল তো?'

কামাউ উত্তর দিল না। পাঁচন খাওয়া মুখ করে অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

কামাউ যদিও গোপনে এসেছিল আমাদের গুপ্তবিদ্যা জানতে, কিন্তু কথাটা পাঁচকান হতে দেরি হল না। ঐ রুগীই সব্বাইকে বলে দিল তার ব্যর্থতার কাহিনি। ফলে সমাজে কামাউয়ের প্রেস্টিজ বেশ ক্ষুণ্ণ হল।

টোটো খবর দিল কামাউ নাকি আমাদের বিরুদ্ধে লোকজনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে। 'মাহিন্ডিদের ওষুধ খেও না। ভবিষ্যতে ফল ভালো হবে না।'

কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউ কান দেয়নি তার কথায়। উল্টে তারা বলেছে, বিদেশিদের মন্ত্রের জোর বেশি। অপদেবতা তাদের ওষুধে তাড়াতাড়ি পালায়। ফলে কামাউয়ের পসার ভীষণ নষ্ট হচ্ছে।

সর্দার নাকি ধমকেছে। 'বিদেশিদের পিছনে লাগছ কেন? তোমার দৌড় তো দেখলাম এতদিন। খবরদার! ওদের কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করলে তোমাকে আমি আস্ত রাখব না।'

কামাউ আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে না, ধারে কাছে আসে না। জ্বলন্ত চোখে দূর থেকে তাকায়। ক্ষমতা থাকলে নির্ঘাত ভস্ম করে দিত।

নয়

দেখতে দেখতে ন-টা দিন কেটে গেল। আজ দশ দিনের দিন। কাল আমরা উপকূলে ফিরে যাব।

সকালে সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখলাম দুটো বড় বড় ছিপনৌকো সাজানো হচ্ছে। সেগুলোকে জলের ধারে টেনে আনা হয়েছে। নানারকম জিনিস বোঝাই হচ্ছে নৌকোতে। নারকেল, ছোবড়া, শাঁখ, ঝিনুক, কড়ি, হাঙরের দাঁত, পশুচর্ম, প্রবাল প্রভৃতি হরেক রকম তাদের রপ্তানির জিনিস। টোটো বলল, 'এই সবের বদলে আনা হবে শস্য, কাপড়, লোহার ফলা, সৌখিন গয়নাগাঁটি, নুন।'

আমাদের মন খুব উৎফুল্ল হবার কথা, কিন্তু জানি না মন কেমন করছে চলে যেতে।

মামাবাবু একবার বললেন, 'ইস্, এত তাড়াতাড়ি যাব! আমার কাজ তো কিছুই এগোয়নি। দ্বীপের কতটুকু বা সার্ভে হল? এক কাজ কর না, তোমরা চলে যাও, আমি ক-দিন পরে যাব। নৌকো পাঠিয়ে দিও।'

আমাদেরও ইচ্ছে করছে না যেতে। দিব্যি রাজার হালে ছিলাম। সুনন্দর আপশোস, নৌকো চালানোটা ভালো করে শেখা হয়নি। বড্ড তাড়াতাড়ি যেন কেটে গেল দিনগুলো।

টোটো শুকনো মুখে ঘুরছে, বেচারার মন খারাপ। বলেছি, বাকি টিনফুড ও বিস্কুটগুলো ওকে দিয়ে যাব। উপকূল অবধি সে অবশ্য আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। সেখান থেকে সুনন্দ তাকে রান্নার প্রয়োজনীয় মশলাপাতির জোগাড়যন্ত্র দিয়ে দেবে।

তড়িঘড়ি তাকে কতগুলো রান্না শিখিয়েছে সুনন্দ। রান্নার ফরমুলা মুখস্থ করিয়েছে। হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছে।

আমি বলেছিলাম, 'কী দরকার এত ঝঞ্ঝাটে! দু-দণ্ডে তো ভুলে মেরে দেবে। তার চেয়ে অনেকগুলো টিনের খাবার কিনে দে।'

'না না, ওর রান্নার ন্যাক আছে। ঠিক রাঁধবে।' সুনন্দ বলে।

বন্দী মাঝি দুজনেরও ব্যবস্থা করেছি। একফাঁকে সর্দারকে বলে রাজি করিয়ে রেখেছি। সর্দার বলেছে, 'বেশ, যখন তোমরা বলছ ছেড়ে দেব। কিন্তু লোক দুটো চোর। আপাতত বন্দী থাক, যখন যাব, সঙ্গে যাবে।'

সুনন্দ বিকেলে বলল, 'যাই জেনে আসি কখন নৌকো ছাড়বে। সেই বুঝে মালপত্র গোছাব।'

সুনন্দ ফিরে এল প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। দেখি সে হনহন করে আসছে। চোখ-মুখ লাল। কী ব্যাপার!'

আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে সে গটগট করে তাঁবুর ভিতরে ঢুকে প্রায় চিৎকার করে ডাকল, 'মামাবাবু! মামাবাবু!'

মামাবাবু বই পড়ছিলেন শুয়ে শুয়ে। চমকে উঠে বললেন, 'কী হয়েছে?'

'সর্দার কী বলছে জানেন? এখন নাকি আমাদের যাওয়া হবে না।'

'কেন?'

'কেন সেটা তো স্পষ্ট করে কিছু বলছে না। নানান আবোল-তাবোল বকছে। নৌকোয় জায়গা কম। তোমরা সাতজন। হেনতেন।'

'আবার বলছে এত তাড়াহুড়ো কীসের? থাক না আরও কিছুদিন। পরের বারে যাবে। মোট কথা যেতে দেবার ইচ্ছে নেই এবং মতলব বোঝা যাচ্ছে না।'

সুনন্দ ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে সর্দারের নামে যা-তা বলতে লাগল, 'ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড, মিথ্যেবাদী, ওরাং-ওটাং। নিশ্চয় ওই কামাউটা দুর্বুদ্ধি দিয়েছে। ওটাই নাটের গুরু। ওকে আমি দেখে নেব...'

মামাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, 'দাঁড়াও দেখে আসি। ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমরা বসো, মাথা গরম করে কোনো কাজ হবে না।'

মামাবাবু ফিরে এসে বললেন, 'বুঝলে হে, ম্যালেরিয়া আমাদের ডুবিয়েছে। পরোপকার করতে গিয়ে ফেঁসে গেছি।'

'মানে?'

'ম্যালেরিয়ার ভয়ে ওরা আমাদের ছাড়তে চাইছে না। ওদের ধারণা আমরা চলে গেলে হোমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?'

'কিন্তু আমাদের ওষুধ তো দুদিন পরে শেষ হয়ে যাবে, তখন?'

'বলেছি সে কথা। বলছে, শেষ হলে যেও। ততদিন বাঁচাও।'

'তার চেয়ে সর্দারের হাতে বাকি ট্যাবলেটগুলো দিয়ে যাই। ওপারে পৌঁছে আরও কিনে দেব। নিজেরাই চিকিৎসা করুক, আমাদের থাকার দরকার কী?'

'তাও বলেছি। কোনো লাভ হয়নি। তুমিই ভেলকি দেখিয়ে, মন্ত্র, গুরু, এইসব বলে-টলে গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছ। ওষুধ ওরা ভয়ে ছুঁতেই চায় না। পাছে তার গুণ নষ্ট হয়ে যায়। আর এতে কামাউয়ের কোনো হাত নেই। সে বরং চাইছিল আমরা চলে যাই। আইডিয়াটা সর্দারের মাথায় হঠাৎ খেলেছে। কামাউয়ের কথা শোনেনি।'

'একটু বুদ্ধি করে বললেন না কেন, নতুন কায়দায় ওষুধ বানিয়ে দেব যাতে ওদের হাত লাগলে গুণ নষ্ট না হয়ে যায়।'

'তাও বলেছি। কিন্তু ওদের দৃঢ় ধারণা উপকূলে একবার পা দিলে আমরা ঠিক পালাব। কাজেই যতক্ষণ ওষুধ আছে আমাদের আটকাও।'

'যাকগে মন খারাপ কোরো না। বলেছিলে তো আরও কটা দিন থাকলে হয়। পাকেচক্রে ঘটে গেল।'

মামাবাবু দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে চলে গেলেও আমরা দুজনে বেশ ভড়কে গেলাম। কটা দিন বেশি থাকতে আপত্তি নেই কিন্তু এভাবে জোর করে আটকে রাখা ভালো চোখে দেখলাম না। ওষুধ ফুরোলে সত্যি সত্যি যেতে দেবে তো, না আবার ফ্যাকড়া বের করবে?'

সুনন্দের রাগ। 'ভণ্ডামি করল কেন? ভালোভাবে অনুরোধ জানালেও তো পারত। সর্দারটা মোটেই তেমন সরল লোক নয়, হাড়ে হাড়ে প্যাঁচালো।'

পরদিন ভোরবেলা আমাদের নাকের ডগা দিয়ে দুখানা ছিপনৌকো সমুদ্রের জল কেটে তীব্র গতিতে বেরিয়ে গেল। নৌকোয় গেল দশ-বারোজন, বাকিরা তীরে দাঁড়িয়ে বিদায় জানাল। বারবার দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাল, 'হে ভগবান, ভালোয় ভালোয় যেন ফিরে আসে।'

নৌকো দুটি ফিরল পরদিন দুপুর নাগাদ।

সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। নৌকো ফিরতেই জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। যাক, সকলে ফিরেছে ভালোভাবে।

দ্বীপের লোক ঝুঁকে পড়ল, 'দেখি দেখি, কী সওদা এনেছে?'

দশ

দুপুর থেকেই ঢাক বাজছিল। দুম্ দুম্ দুম্—

বেলা যত পড়তে থাকে ঢাকের আওয়াজ বেড়ে চলে। দ্বীপের আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হতে থাকে, দুম্ দুম্ দুম্....

বোধহয় কোনো বড় উৎসব আজ।

সন্ধে নামতেই আকাশের গায়ে মস্ত রুপোর থালার মতো পূর্ণিমার গোল চাঁদ উঠল। আমি আর সুনন্দ সমুদ্রের তীরে বেড়াতে গেলাম।

জোয়ারের বেগে সাগর উথাল-পাথাল। বড় বড় ঢেউ নাচছে, তাদের মাথায় ফসফরাসের ঝিকিমিকি। ওপর থেকে গড়িয়ে নামছে তরল রুপোলি জ্যোৎস্নাধারা। নীল-সবুজ জলের সঙ্গে মিশে সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

মনে হয় ঐ বুঝি পাতাল রাজ্য। অগাধ জলরাশির নিচে লুকিয়ে আছে অপরূপ পাতালপুরী। এই নির্জন সাগরবেলা থেকে আমরা সরে গেলেই বুঝি জল থেকে উঠে আসবে জলকন্যারা।

পিছনে আমাদের সাদামাটা গাছপালা ভরা দ্বীপটাকে লাগছে রীতিমতো রহস্যময়। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছোপ ছোপ চাঁদের আলো মাটিতে লুটোচ্ছে। মাটি পাথরের রঙ বদলিয়ে দেখাচ্ছে কেমন চকচকে তকতকে। নারকেল গাছগুলির পাতায় পাতায় ঝমাঝম বাজনা। তারা ছায়া দুলিয়ে প্রাণপণে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কাকে? ঐ জ্যোৎস্নাভরা পূর্ণিমার চাঁদ, না উত্তাল সমুদ্রকে?

খানিকক্ষণ বসে থেকে মনটা ভারি স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। কথা কইতে ইচ্ছে করে না। কান পেতে শুনি প্রকৃতিরাজ্যে নানান আনন্দধ্বনি। কতরকম কীটপতঙ্গ ডাকছে মনের খুশিতে। আর অবিশ্রান্ত জলরাশির আনন্দ উচ্ছ্বসিত কলধ্বনি।

চুপচাপ দুজনে বসে থাকি।

ফিরে আসতে মামাবাবু বললেন, 'আজ জমজমাট ব্যাপার। কী ঢাক বাজছে! শুনলাম, ওদের মুঙ্গু অর্থাৎ দেবতাকে আজ বের করবে। জানো তো, সোয়াহিলি ভাষায় মুঙ্গু মানে দেবতা। চলো দেখে আসি।'

সুনন্দ বলল, 'আমি যাব না।' তার বিরক্তি কাটেনি।

আমার মনটা কিন্তু উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। দ্বীপের আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সুনন্দকে ফেলে যাই কী করে? অতএব আমিও বললাম, 'থাক, আজ যাব না।' তখন মামাবাবু একলাই গেলেন।

রাত্রে আবার কিছুক্ষণ সমুদ্রতীরে এসে বসি। তরঙ্গের কলরোল ছাপিয়ে সমানে কানে আসছে ঢাকের দুম্ দুম্ দুম্...। মাঝে মাঝে অট্টরোল। কুটিরবাসী মুঙ্গুকে এরা সহজে বের করে না। চোখেই দেখিনি তাকে! ইস্, সুনন্দ না বেঁকে বসলে যাওয়া যেত।

বিকেলে দেখেছি নাচিয়েরা নানারকম সাজপোশাক করে প্রস্তুত হচ্ছে। কত রকম মুখোশ, বিদ্‌ঘুটে সাজ।

তাঁবুতে ফিরে এসে শুয়েছি। ঢাকের বাদ্যিতে ঘুম আসা দায়। সুনন্দ তো দিব্যি নাক ডাকাতে লাগল। এপাশ ওপাশ করছি, হঠাৎ দেখি মামাবাবু ফিরে এলেন।

তিনি শুলেন না। তাঁবুর মধ্যে একটু খুটখাট করেই আবার বেরিয়ে গেলেন। কী দরকার কে জানে! তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

পরদিন মামাবাবুকে কিঞ্চিৎ গম্ভীর দেখলাম। অন্যমনস্কভাবে কী জানি ভাবছেন।

অবশ্য দৈনন্দিন প্রোগ্রামে কোনো বদল হয়নি। যথারীতি সকালে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করেছেন। তারপর বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দুপুরে বই পড়েছেন। স্পেসিমেন সাজিয়েছেন। তবে কথাবার্তা বলছেন কম।

তাঁর এই ভাবটা সুনন্দরও চোখে পড়েছিল। বলল, 'কী ব্যাপার রে?'

বললাম, 'কিছু বুঝছি না।'

পরদিন মামাবাবুর মুড ঐ একই খাতে বইল।

একটা নতুন জিনিস লক্ষ করলাম, তাঁর বই পড়ার সময় বেড়েছে। ব্যস্তভাবে এ-বই সে-বই ঘাঁটছেন।

সাধারণত প্রাণিবিজ্ঞানের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামালে তিনি সুনন্দর সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু এ দুদিন সুনন্দকে তিনি মোটেই আমল দিলেন না।

আমার মন বলছিল কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে!

তৃতীয় দিন চা-পানের পর। এবার আমাদের দৈনিক ডিউটি দ্বীপের হাসপাতালে যাওয়া। যদি কোনো রুগী থাকে।

সেদিন মামাবাবুর গাত্রোত্থানের কোনো লক্ষণ দেখলাম না। বেশ নিশ্চিন্ত মনে গাছের তলায় পা ছড়িয়ে গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বসে বই পড়ছেন।

আমাদের কী? যাই, নৌকো চাপি। গুটিগুটি উঠছি, একজন লোক এসে দাঁড়াল।

লোকটাকে চিনি, সর্দারের এক পার্শ্বচর। বলল, 'শীগগির চলো। সর্দারের ছেলের হোমা হয়েছে। গা তেতে, পুড়ে যাচ্ছে। সবাই তোমাদের জন্য সেই কুটিরের সামনে অপেক্ষা করছে। যাচ্ছ না দেখে সর্দার আমায় ডাকতে পাঠাল। চলো চলো—'

আমি ও সুনন্দ দাঁড়িয়ে পড়ি। দূর ছাই অযাত্রা কোথাকার! মামাবাবু একা যাবেন, না আমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে ভাবছি, এমন সময় মামাবাবুর গম্ভীর গলা শুনতে পেলাম, 'যাইনি, কারণ গেলে কোনো লাভ হত না। আমাদের ওষুধে সর্দারের ছেলে বা অন্য কোনো কাঁপুনি রুগীই আর সেরে উঠবে না।'

'তার মানে?' লোকটির চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যায়।

'মানে ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। ওষুধ যখন বানানো হয় তখন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করা হয়। সেই সময় পেরিয়ে গেলে ওষুধ হয়ে পড়ে প্রাণহীন, অকেজো। আমাদের ওষুধে কাল অবধি শক্তি ছিল, আজ ঐ বড়িগুলোর শক্তি মৃত। বড়িতে আবার নতুন করে শক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। পুজো-আর্চা করতে হবে। অনেক সরঞ্জাম চাই। সেসব এখানে পাব কোথায়? তুমি সর্দারকে বলো, ছেলের জন্যে কামাউকে ডাকতে। আমার দ্বারা হবে না।'

লোকটা এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল।

আমরা দুজন হতভম্ব। এ কী কাণ্ড! মামাবাবু হাঁড়িপানা মুখ করে বসে আছেন। তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছে না। দেখা যাক কী ঘটে।

দূরে দেখা গেল সর্দার আসছে। সদলবলে হন্তদন্ত হয়ে।

সে এসেই উত্তেজিত স্বরে বলল, 'কী ব্যাপার? শুনলাম নাকি ওষুধ দেবে না? ওষুধের শক্তি শেষ হয়ে গেছে! পুজোটুজো করতে হবে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ।'

'তবে বসে আছ কেন, পুজো লাগাও। কী কী লাগবে বলো, কটা বলি? এক্ষুনি আনিয়ে দিচ্ছি। মন্ত্র-টন্ত্র তোমাদের জানা আছে তো?'

'হ্যাঁ, তা আছে কিন্তু যে বস্তুটি নইলে হাজার মন্ত্র পড়েও কাজ হবে না, ওষুধে একফোঁটা শক্তিও ফিরিয়ে আনা যাবে না, সে জিনিসটি এখানে কই?'

'কী সে জিনিস?'

'একটি দৈবশক্তিসম্পন্ন পাথর। সেটা আছে আমাদের দেশে। সেরকম পাথর না পেলে শুধু মন্ত্র পড়ে কী হবে? বরং কামাউয়ের ওষুধ খাওয়াও তোমার ছেলেকে।'

'ধুত্তেরি! এ কামাউয়ের কম্ম নয়। ভীষণ জ্বর, ওর সাধ্য নেই এমন রুগীকে সারায়। এত জ্বরে কামাউয়ের ওষুধ খাওয়ানো হলে দেখেছি রুগী প্রায়ই সারেনি। মরে গেছে। তোমরা যাহোক কিছু ব্যবস্থা করো।'

'কী আর করব?' মামাবাবু হতাশ কণ্ঠে জানান।

অমন জাঁদরেল সর্দার হাউমাউ করে প্রায় কেঁদে ফেলল, 'ওঃ, কী হবে! আমার অমন জোয়ান ছেলেটা বেঘোরে মরবে নাকি? ও যে আমার সেরা ছেলে। কী কব্জির জোর! কী বর্শার তাক! উৎসবের দিন থেকে জ্বর হয়েছে। আমাকে বলেনি। ওষুধ খায়নি। বন্ধুদের বলেছিল, ও আপনি সেরে যাবে। এখন উঠতে পারছে না। চোখ দুটো রক্তের মতো লাল, শুধু গোঙাচ্ছে, ছটফট করছে। থরথর করে কাঁপছে। ধরে রাখা যাচ্ছে না। গায়ে হাত দেওয়া যায় না, এত তাত! ওঃ! ওঃ!'

সর্দারকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু মামাবাবু নির্বিকার। শুধু মাথা দুলিয়ে বললেন, 'তাই তো! আহা, তোমার অমন ছেলেটা!'

সর্দার বলল, 'খুঁজে দেখেছ এ-দ্বীপে তেমন কোনো পাথর আছে কিনা।'

'না, তা দেখিনি অবশ্য।' মামাবাবু বলেন।

'বেশ, বলো কীরকম দেখতে। দ্বীপের সমস্ত লোক যত রাজ্যের পাথর আছে তোমার সামনে হাজির করবে। দেখ পাও কিনা।'

'না না, আমার কাছে পাথর আনতে হবে না। আর সে পাথর কি বাইরে থেকে দেখে চেনা যায়? আচ্ছা আমি গণনা করে দেখছি, যদি তেমন কোনো পাথর থাকে, ঠিক জানতে পারব। কোথায় আছে তাও জানব। কিন্তু যদি না থাকে তো আমি নিরুপায়।'

'দেখ, দেখ শীগগির।' সর্দারের ধৈর্য আর বাঁধ মানে না।

'বেশ।' মামাবাবু উঠে দাঁড়ান। হাঁক পাড়েন, 'সুনন্দ, তাঁবু থেকে দাবার বোর্ড আর গুটি নিয়ে এস তো।'

সুনন্দ বোর্ড আর গুটির বাক্স নিয়ে এল।

মামাবাবু বললেন, 'সাজাও। এক দান খেলা যাক।

'সত্যি খেলবেন?' সুনন্দ ভয়ে ভয়ে বলে।

'নিশ্চয়।' মামাবাবু বসে পড়ে গুটি সাজাতে থাকেন।

সুনন্দ আমার দিকে আড়চোখে তাকায়। তার চোখে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

খেলা আরম্ভ হয়।

সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুজনকে ঘিরে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখতে থাকে খোপ খোপ ঘর কাটা বোর্ড। অদ্ভুত দেখতে গুটিগুলো।

আমিও হাঁ করে দেখছি। হঠাৎ এমন সাড়ম্বরে দাবা খেলার শখ কেন মামাবাবুর? গভীর উদ্দেশ্য একটা আছে নিশ্চয়, কিন্তু রহস্যটা কী? মাথামুণ্ডু কিছুই ধরতে পারছি না। গম্ভীর মুখে মামাবাবু চাল দিচ্ছেন।

মামাবাবু দুর্ধর্ষ দাবাড়ু। সুনন্দ কতক্ষণ টিকবে তাঁর সামনে? তারপর ব্যাপার-স্যাপার দেখে সে নার্ভাস। দেখতে দেখতে বোড়ে, ঘোড়া, গজ ইত্যাদি ঝপাঝপ কাটা পড়তে লাগল। পাঁচ মিনিটে মাৎ। সুনন্দর রাজাকে নিয়ে মামাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন সোয়াহিলিতে, 'পেয়েছি, পেয়েছি। ইউরেকা! হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে। এই দ্বীপেই আছে। সেরকম এক দৈবশক্তি সম্পন্ন পাথর। তার সাহায্যে আমার ওষুধের গুণ ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

'কোথায়? কোথায়?' সমস্ত জনতা চিৎকার করে ওঠে।

''দাঁড়াও সেটা গুণে দেখি।'

মামাবাবু এবার পকেট থেকে বের করলেন একখণ্ড সাদা কাগজ। মাটিতে বিছিয়ে পাতলেন। তারপর পেন ঘুলে খসখস করে এঁকে চললেন বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ— যত রাজ্যের জ্যামিতিক নক্শা।

মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছেন। কখনো কী গুণছেন। সবাই গোল গোল চোখ করে দেখছে। দারুণ টেনশন।'

হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন, 'হুঁ পেয়েছি। কাগজের ওপর চোখ রেখে তিনি জোরে জোরে হিসেব করেন—চত্বরের পুব-দক্ষিণ কোণ বরাবর পঞ্চাশ হাত। একটা ছোট কুটির। কেউ থাকে না তাতে। না না ভুল হল, থাকে। তবে মানুষ নয়। মূর্তি। এ হচ্ছে তোমাদের মুঙ্গুর কুটির। ভিতরে আছে পাথরটা।

'মুঙ্গুর কুটিরের ভিতর?' সর্দার আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, কালো রঙের বেশ বড় পাথর।

'কই সেরকম কোনো পাথর তো নেই কুটিরে।' একজন বলে।

'নেই?' মামাবাবু অবাক হন। আবার কয়েকবার আঁচড় কাটেন কাগজে। তারপর বলেন, 'আচ্ছা, তোমাদের মুঙ্গু কী দিয়ে তৈরি? পাথরের? কালো রঙ, চৌকো গড়ন?

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

মামাবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'ব্যস, তবে ঐ মুঙ্গুকে আমার চাই। মুঙ্গুই একমাত্র পারে আমার ওষুধের গুণ ফিরিয়ে দিতে। আর কোনো তেমন পাথর নেই এখানে। মুঙ্গুর সামনে আমি পুজো করব। মন্ত্র পড়ব। তারপর ওষুধ ছোঁয়াব তার গায়ে। অমনি ওষুধে আবার নতুন প্রাণ পাবে। সেই ওষুধ খেলেই সর্দারের ছেলে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

সমস্ত জনতা কেমন আড়ষ্ট অসাড় হয়ে যায়। কারো মুখে কোনো কথা নেই। এ ওর দিকে তাকাচ্ছে।

বুঝলাম কোথাও একটা গরমিল হয়ে গেছে।

ভেবেছিলাম মুঙ্গুর নাম শুনেই সর্দার হুকুম দেবে—'লে আও মুঙ্গুকে। আভি।' কিন্তু এই দ্বিধা কেন? প্রস্তাবটি কাজে পরিণত করতে কোথায় যেন বাধা আছে।

সর্দার এগিয়ে এল। আমতা আমতা করে বলল, 'কিন্তু মুঙ্গুর সামনে পুজো হবে কী করে? বিদেশিদের পক্ষে এই দেবতাকে দর্শন যে বারণ। নিষিদ্ধ।

মামাবাবু আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'তাই নাকি! বিশেষ কারণেও দেখা চলবে না?'

'না।'

'তাহলে আমি নিরুপায়।' মামাবাবু উদাসভাবে মুখ ফেরান। 'তোমার ছেলের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। বেচারার দেখছি নেহাতই প্রাণটা যাবে। কী কড়া তোমাদের নিয়ম! দেখো ভেবে, কোনো রকমেই কি সম্ভব নয় মুঙ্গুর সামনে আমার পুজো করা? তাহলে ছেলেটা বাঁচত।'

'না না না। এ অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব। একটা তীক্ষ্ণ, তীব্র গলা মামাবাবুর কথা শেষ করতে দেয় না।'

সচকিতে তাকিয়ে দেখি কামাউ।

তার দীর্ঘ বাঁকানো শরীরটা উত্তেজনায় সোজা হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে রাগে।

'অপবিত্র বিদেশির দৃষ্টি মুঙ্গুর গায়ে লাগলে সর্বনাশ হবে। ধ্বংস হয়ে যাবে সবাই।'

কামাউ সর্দারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে, 'মাহিন্ডির শয়তানি। ওরা আমার দেবতাকে অপমান করতে চায়।'

মামাবাবু সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে হাতজোড় করেন, 'আরে ছি ছি! তোমার পবিত্র মুঙ্গুকে অপমান করতে কি পারি? মুঙ্গুকে দেখা নেহাত যদি নিষিদ্ধ হয় তবে থাক। কিন্তু এও শোনো সর্দার—আমরা সাধারণ বিদেশি নই। অনেক শক্তি আমাদের। অনেক মন্ত্র জানি। তার প্রমাণ তো তোমরা পেয়েছ, বিদেশির দৃষ্টি গায়ে লাগলে মুঙ্গু যাতে অসন্তুষ্ট না হন তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করব। পুজো দেব। তোমরাও ভালো করে পুজো লাগিও তাঁর রাগ কমাতে। আমি নিশ্চিত জানি সর্দারের প্রিয় ছেলের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করতে এই সামান্য নিয়মভঙ্গ হলে মুঙ্গু অপরাধ নেবেন না। দ্বীপের কারো কোনো ক্ষতি হবে না। এখন তোমরা ভেবেচিন্তে কী করতে চাও—'

মামাবাবু কলমটা পকেটে গুঁজলেন। সযত্নে বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ অঙ্কিত জ্যোতিষচর্চার নিদর্শন কাগজটি ভাঁজ করে পকেটে রাখলেন, তারপর গালে হাত দিয়ে উদাস হয়ে বসে রইলেন।

দাবার গুটি বোর্ড সুনন্দ ইতিমধ্যে গুছিয়ে ফেলেছিল।

দেখি, কামাউয়ের মুখ আক্রোশে বিকৃত হয়ে উঠেছে। মুঙ্গুর সম্মান রক্ষা করতে সে বদ্ধপরিকর।

সর্দার দ্বিধাগ্রস্ত। ধর্মবিশ্বাস ও প্রিয় ছেলের প্রাণ, এই দোটানায় দুলছে তার হৃদয়।

সর্দার কামাউয়ের দিকে এগিয়ে গেল। সমস্ত ভিড়টা তাদের ঘিরে ধরল।

সর্দার ও কামাউয়ের মধ্যে কথা আরম্ভ হল। বুঝলাম, কামাউ সম্মতি দিলেই সর্দার আমাদের মুঙ্গুর সাক্ষাতে হাজির করবে।

প্রথমে নিচু স্বরে কথাবার্তা হচ্ছিল, কিন্তু ক্রমে দুজনের গলাই চড়তে থাকে। কামাউয়ের এক কথা বার বার কানে আসছিল, 'আপানা আপানা', অর্থাৎ না না।

সর্দারের মেজাজও গরম হচ্ছিল।

অন্যদের হাবভাব দেখে মনে হল তারাও সর্দারের পক্ষে। অসুস্থ ছেলেটি তাদের পরম প্রিয়। তার প্রাণ বাঁচাতে তাদের আগ্রহ বেশ বোঝা যাচ্ছিল। তাছাড়া মুঙ্গুর মেজাজ শান্ত করতে যে দাওয়াই মামাবাবু বাতলেছেন সেটাও তাদের মনে ধরেছে। কামাউয়ের চেয়ে আমাদের শক্তির ওপরই তাদের বেশি আস্থা।

মিনিট দশেক পর সর্দার গটগট করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমি আদেশ দিচ্ছি, যাও তোমরা মুঙ্গুর সামনে পুজো আরম্ভ করো। কেউ বাধা দিতে এলে তার মাথাটা আর ধড়ের ওপর আস্ত থাকবে না, মনে রেখো।'

মুখ ঘুরিয়ে সর্দার কামাউ এবং তার গুটিকতক ভক্তকে ক্রুদ্ধ চোখে দেখে নেয়।

কামাউ তখন রাগে ফুলছে। চিৎকার করে অভিশাপ দিচ্ছে, সবংশে নিপাত যাবি। মুঙ্গু কাউকে রক্ষা রাখবে না। শয়তান বিদেশিগুলোকে এখুনি খতম কর। কী, তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? বাধা দে।

কিন্তু কেউ বাধা দিল না। প্রতিবাদ করল না। কামাউয়ের দুই চেলা ত্যাড়া-ব্যাঁকা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। কিন্তু তারাও এগোলো না।

'উঃ অসহ্য! নিষ্ফল ক্রোধে ফুলতে ফুলতে কামাউ দ্রুত পায়ে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।'

সর্দার বলল, 'কী কী দরকার বলো, আনিয়ে দিচ্ছি।'

মামাবাবু বললেন, 'থাক, আমরা নিজেরাই জোগাড় করে নেব!' তারপর গলা নামিয়ে আশ্বাসের সুরে বললেন, 'কিছু ঘাবড়িও না। মুঙ্গুকে আমি ঠিক ম্যানেজ করে দেব। চটবে না।'

'সুনন্দ শীগগির বেশ কিছু নারকেল ছোবড়া জোগাড় করো। আর একটা পাত্র। ধোঁয়া দিতে হবে।'

'কার বুদ্ধির গোড়ায় কে জানে!' আমার কানে ফিসফিসিয়ে কথা কটা বলে সুনন্দ, 'এই যাচ্ছি মামাবাবু!' বলে একলাফে এগোলো।

মুঙ্গুর মন্দিরের দরজায় চাপা কাঠের তক্তাটা আগে থাকতেই খোলা ছিল। মন্দিরের কাছে পৌঁছে মামাবাবু অর্ডার দিলেন, 'এবার ছোবড়ায় আগুন লাগাও। খুব ধোঁয়া হয় যেন।'

একটা হাতলওলা স্টিলের ডেকচি ঠেসে নারকেল ছোবড়া ভরা হয়েছিল। সুনন্দ লাইটার জ্বেলে আগুন দিল। তারপর দুজনে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ধোঁয়ার মেঘ তৈরি করে ফেললাম।

মামাবাবু হঠাৎ 'হাঁ রে রে রে' বলে বিকট এক হুঙ্কার ছাড়লেন। তারপর দরজার মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমাদের বললেন, 'আমি ভিতরে ঢুকছি। তোমরা দরজার মুখে বসে পড়ো। খুব ধোঁয়া ওঠাও আর যা ইচ্ছে মন্ত্র আওড়াও। জোরে জোরে।

'মন্ত্র! কীসের মন্ত্র?

'আহা, ঐ কবিতা-টবিতা যা হয় কিছু। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত যা মনে আসে। থামবে না। এই বলে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে মুঙ্গুর মুখোমুখি হলেন।

একনজরে একবার দেখে নিলাম মুঙ্গুকে।

ঘরটার সামনে তখন সমস্ত দ্বীপের বাসিন্দা এসে জড়ো হয়েছে। থমথমে আবহাওয়া। মুঙ্গুকে বিদেশি চর্মচক্ষে দেখল—না জানি কী অঘটন ঘটবে। বজ্রপাত না ভূমিকম্প! এক অজানিত আশঙ্কায় তাদের হৃদয় আচ্ছন্ন। মুখগুলো বিবর্ণ। চোখে ভয় বিস্ময়।

বুঝছি যে সমস্ত ব্যাপারটায় এক বিরাট প্যাঁচ খেলছেন মামাবাবু। কিন্তু কেন? উদ্দেশ্য কিছু ধরতে পারছি না। জিজ্ঞেস করারও উপযুক্ত সময় নয় এটা। অতএব প্রতীক্ষা করা যাক। ধীরে ধীরে সব রহস্যই উদ্ঘাটিত হবে।

সুনন্দকে বললাম, 'আমি বাংলা চালাচ্ছি, তুই দেবভাষা ঝাড়।'

'অলরাইট! সংস্কৃতে আমার লেটার ছিল ম্যাট্রিকে, শুনবি?'

দুজনে আচমকা এমন বিটকেল হেঁড়ে গলায় আওয়াজ ছাড়লাম যে সামনের লোকগুলো চমকে সাত হাত পিছিয়ে গেল। দুটো তালপাতার পাখা দিয়ে প্রাণপণে ধোঁয়া ওড়াই আর মুঠি পাকিয়ে কী ভীমবিক্রমে কাব্যপাঠ। বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিল কারণ ভিতর থেকে মামাবাবুর চাপা স্বর শুনলাম, 'একটু আস্তে।'

ঝাড়া পনেরো কুড়ি মিনিট চিৎকার করে গলাটা আমার ধরে এল। দম নিতে থামলাম।

মামাবাবু কী করছেন? কৌতূহলী হয়ে পিছনে তাকালাম।

ভীষণ অবাক হয়ে দেখলাম তিনি সেই অদ্ভুতদর্শন বিগ্রহের পরে ঝুঁকে পড়েছেন। হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। গ্লাসে চোখ লাগিয়ে কী দেখছেন। একেবারে তন্ময়। পাশে মাটির ওপর খোলা একখানা সাদা কাগজ, কী সব ছবি আঁকা। একটা পেন্সিল মাটিতে পড়ে।

একটা নিচু মাটির বেদির ওপর শিলের মতো একখণ্ড কালচে পাথর চিৎ করে

শোয়ানো। পাথরের ওপর খোদাই করা এক মূর্তি। প্রায় হাতখানেক লম্বা। মানুষের মূর্তি নয় এটুকু বুঝলাম। কোনো জন্তু বা কোনো কাল্পনিক বস্তু। অদ্ভুত আকৃতি।

আমার দেখাদেখি সুনন্দও পিছনে তাকিয়েছে। দুজনেরই চিৎকার বন্ধ হয়ে গেছে।

মামাবাবু মুখ তুললেন, 'কী ব্যাপার?' দেখলেন, আমরা হাঁ করে তাকিয়ে আছি। আঙুল নেড়ে ডাকলেন, 'দেখে যাও।'

ধুনুচিটা দরজার গোড়ায় রেখে আমরা পায়ে পায়ে যাই।

এবার স্পষ্ট করে খুঁটিয়ে দেখলাম।

উপাস্য বিগ্রহ যে এমন ভয়াবহ বিকট হতে পারে ধারণাই ছিল না। উপজাতিদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা! এটাকে কী বলব? কোনো জন্তু? না। মনে হল কোনো টিকটিকি বা গিরগিটি জাতীয় জীবের কঙ্কাল যেন পাথরের ওপর সেঁটে দেওয়া হয়েছে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতি-কোঠায় একটি বর্ণনা বিদ্যুতের মতো চমক দিয়ে যায়।

জঙ্গলের মধ্যে আগুন ঘিরে অসভ্য আদিবাসীদের উৎসব হচ্ছে। আগুনের পাশে রাখা হয়েছে এক মূর্তি—বিচিত্র। বীভৎসাকৃতি। আর দূর থেকে লুকিয়ে দূরবীন চোখে দেখছে—বিল। ডেয়ারিং বিল।

মামাবাবু বললেন, 'মনে পড়েছে কারো কথা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' দুজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠি।

'আমার মনে হয় এটা সেই মূর্তি। সেই দেবতা। কিন্তু কী বস্তু এটা বুঝতে পেরেছ?' প্রশ্নটা তিনি করেন সুনন্দকে।

'এ তো খোদাই করা মূর্তি নয়। ফসিল।' সুনন্দ বলে।

'কারেক্ট। কিন্তু কীসের?'

'কোনো সরীসৃপের বোধহয়। গিরগিটি বা কুমীরের ছানা।'

'তোমার মুণ্ডু।' মামাবাবু চাপা গলায় ধমকে ওঠেন। সুনন্দ থতমত খেয়ে যায়।

'ব্যস ব্যস, দেখা হয়েছে। এবার তোমাদের ডিউটি করো। দরজায় লোক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বেশিক্ষণ নয়, আর পাঁচ মিনিট। আমি স্কেচটা শেষ করে নিই।'

এক অজানিত রহস্যের গন্ধে আমার মন আনচান করে ওঠে। খোদাই করা মূর্তি, না ফসিল! সুনন্দের প্রাণিবিজ্ঞান চর্চা করা চোখ সেটুকু আবিষ্কার করতে ভুল করেনি। কিন্তু কীসের? সুনন্দও ভুল করেছে। যাক আপাতত মামাবাবুর কথামতো আবার মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করি। ধোঁয়া ওড়াই।

উত্তেজনার বশে এবার আমি ধরেছি ইংরেজি আর সুনন্দ বাংলা।

পাতার পর পাতা হ্যামলেট বলে যাচ্ছি। দু-এক টুকরো অভিনয়ও দেখাচ্ছি সামনের স্তম্ভিত মুগ্ধ দর্শকবৃন্দকে। কলেজ লাইফে অসিত রায় হ্যামলেট করে মেডেল পেয়েছিল। সুনন্দ আউড়াচ্ছে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। এক কবিতাতেই পাঁচ মিনিট কাবার করে দেবার মতলব।

সহসা যবনিকা পতন।

পিছন থেকে মামাবাবুর গলা পেলাম, 'ব্যস, থামো এবার। চলো, সর্দারের ছেলেকে দেখতে যাই।'

তাঁবুতে ফেরার পথে মামাবাবুকে দেখলাম চুপচাপ, অন্যমনস্কভাবে পথ চলছেন। ক্যাম্পে পৌঁছে তিনি আমাদের সঙ্গে একটি কথা না বলে বই হাঁটকাতে আরম্ভ করলেন। দেখলাম, মুঙ্গুর ছবিটা পিচবোর্ডের ওপর ক্লিপ দিয়ে আটকে পাশে রেখেছেন।

এরকম গুরুগম্ভীর ভাবগতিক দেখে আমার প্রশ্ন-টশ্ন করার সাহস উবে গেল। যদিও প্রচণ্ড কৌতূহল। নিজেদের মধ্যে নিচুস্বরে কথা কই। বাইরে রান্নার জোগাড়যন্ত্র করি আর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি মামাবাবুর হালচাল।

একদফা চা হল।

মামাবাবুকে দিলাম এক কাপ। মুখ না তুলেই তিনি কাপ নিলেন।

চারদিক নিস্তব্ধ! শুধু টুপটাপ পাতা ঝরার শব্দ। টুংটাং বাসনের আওয়াজ। সুনন্দকে জিজ্ঞেস করি, 'হ্যাঁরে, ওটা বুঝি খোদাই করা মূর্তি, না ফসিল?'

'হ্যাঁ।'

'দেখতে কিন্তু অবিকল খোদাই করা মূর্তির মতন। যেন পাথর কুঁদে একটা কঙ্কাল তৈরি করেছে কেউ।'

'হুঁ, পুরো দেহটা কাদায় পড়ে ডুবে যায়। তারপর প্রাণিদেহের নরম অংশগুলো গলে গিয়ে পুরো হাড়ের অংশটুকু জমে শক্ত পাথর হয়ে গেছে। আর যে কাদায় ডুবেছিল সেই কাদায় হয়েছে কাদা পাথর। দেখলি না পাথরটার রঙ কালো কিন্তু মূর্তিটার রঙ সাদাটে। দুটো তো এক পাথর নয়।'

'কিন্তু কীসের ফসিল?'

'সেইটেই তো ধরতে পারছি না!' সুনন্দ চিন্তিত স্বরে বলে।

দু-ঘণ্টা কেটে গেছে।

রান্না তৈরি। আজ সুনন্দ বানিয়েছে ভুট্টার ছাতুর সঙ্গে মাংস মিশিয়ে সুরুয়া, নুন মাখানো সিদ্ধ ধুঁধুল। কাছিমের সিদ্ধ ডিম এবং সামুদ্রিক শ্যাওলা।

এই শ্যাওলা মামাবাবুর আবিষ্কার। সমুদ্রের ধারে পাথরের খাঁজে দেখেই বলেছিলেন, 'এ শ্যাওলা আমি খেয়েছি, জাপানে। খুব উপকারী। অতএব আমরাও খাচ্ছি, কাঁচাই। ভালো করে ধুয়ে নিয়ে সামান্য টমাটো সস মাখিয়ে। আমার তত উপাদেয় ঠেকে না, কিন্তু সুনন্দ খুব ভক্ত হয়ে পড়েছে।

মামাবাবুর সাড়াশব্দ নেই। খেতে ডাকা উচিত হবে কি না ভাবছি। এমন সময় ডাক শুনলাম, 'সুনন্দ শুনে যাও। অসিত তুমিও এসো।'

দুজনে এক ছুটে তাঁবুর ভিতরে ঢুকলাম।

দেখি, মামাবাবু মাটিতে কম্বল পেতে বসে, সামনে একখানা খোলা বই। পাশে বিছানো রয়েছে সেই স্কেচটা বইয়ের যে পাতা খোলা সেটার পাতা জোড়া কোনো ফোটোগ্রাফের ছবি। কোনো অদ্ভুত আকৃতির প্রাণী বা প্রাণীর কঙ্কাল।

মামাবাবু বইয়ের ছবিটা দেখিয়ে সুনন্দকে বললেন, 'চিনতে পারো? এখন মিলিয়ে দেখ এর সঙ্গে এদের দেবতাকে।'

সুনন্দ তাকিয়ে রইল। এক-দুই...প্রায় দশ সেকেন্ড। চোখের পলক পড়ছে না। তারপরই সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আর্কিঅপটেরিক্স! এ তবে আর্কিঅপটেরিক্স-এর ফসিল?

'না।' মামাবাবু মাথা নাড়েন। আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। ভালো করে পরীক্ষা করো। তফাত ধরতে পারছ?

আমি তখন বইয়ের ছবি খুঁটিয়ে দেখছি—

কোনো জীবন্ত প্রাণী নয় বুঝলাম, ফসিলের ছবি। পাথরের গায়ে কোনো প্রস্তরীভূত কঙ্কাল। দেহের রক্তমাংস মাটির তলায় চাপা পড়ে গেছে। শুধু হাড়ের কঙ্কাল জমে পাথর হয়ে গেছে।

লম্বা গলা। ছোট মাথার খুলি। চোয়াল ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে গেছে, অনেকটা কুমীরের চোয়ালের মতো গড়ন। চোয়ালের মধ্যে দু-সারি দাঁত দেখা যাচ্ছে। চার পা। সামনের পা দুটো অপেক্ষাকৃত ছোট। বাঁকানো আঙুলের মাথায় তীক্ষ্ণ নখ। প্রাণীটার লম্বা লেজও ছিল। এখন মাংস তো নেই। ছোট ছোট অস্থিখণ্ড জোড়া পাথরের লেজটা দেখতে বীভৎস।

একটা জিনিস দেখে চমকে উঠি। ছবির নিচে লেখা Archaeopteryx (ancient bird)। এই সেই প্রাচীন পাখি—

দেখলে গিরগিটির মতো কোনো সরীসৃপের ফসিল বলেই মনে হয়।

মামাবাবুর হাতে আঁকা মুঙ্গুর ছবির সঙ্গে আরকিঅপটেরিক্স-এর ফসিলের ছবিটা মিলিয়ে দেখলাম, দুই-ই একরকম। অমনি গলা, মাথা, মুখের ভিতর দাঁতের সারি। লম্বা লেজ, চারটে পা, দুটো এক ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুটো যে এক জাতের নয় সে তো কানেই শুনলাম। কিন্তু বইয়ের ঐ ছবি পাখির ফসিল হয় কী করে?

সুনন্দ একদৃষ্টে চেয়ে ভাবছে। একবার বইয়ের ছবি, একবার মুঙ্গুর স্কেচটাকে লক্ষ্য করছে।

মামাবাবু নীরব।

মামাবাবু বললেন, 'এই পাখি জুরাসিক যুগ, অর্থাৎ প্রায় আঠারো কোটি বছর আগেকার জীব। এর চেয়ে প্রাচীন পাখির ফসিল এখনও আবিষ্কার হয়নি।

'তখনও এরা পুরোপুরি আধুনিক পাখি হয়ে উঠতে পারেনি। সরীসৃপের অনেক চিহ্ন তখনও তাদের দেহে বর্তমান।

'জীবন্ত আরকিঅপটেরিক্স দেখার সৌভাগ্য অবশ্য কোনো মানুষের হয়নি। বৈজ্ঞানিকরা আন্দাজে স্থির করেছেন কেমন দেখতে ছিল সরীসৃপের অতি নিকট-আত্মীয় পক্ষি-জগতের এই আদিপুরুষ।'

মামাবাবু বই খুলে একখানা ছবি দেখান—

'আরেব্বাস! বলে না দিলে কে একে পাখি ভাববে? ভাবতাম নির্ঘাত সেই রূপকথার ড্রাগন। কঙ্কালের গায়ে মাংস লাগানো হয়েছে। অক্ষিকোটরে বসেছে একজোড়া হিংস্র চক্ষুতারকা। ফাঁক করা ঠোঁটের মধ্যে দু-সারি করাতের মতো দাঁত দেখা যাচ্ছে। পাখির চিহ্ন বলতে দেখলাম, একজোড়া ডানা। সামনের দু-পায়ের সঙ্গে আটকানো। আর তার পাখায়, লম্বা লেজে বড় বড় মোটা মোটা পালক। পালকগুলো নরম নরম নয়। কেমন শক্ত শক্ত, সোজা সোজা। গায়ে ওগুলো কী? আঁশ, না পালক?'

মামাবাবু বললেন, 'দুই-ই ছিল।'

ছবিতে গাছের ডাল আঁকড়ে ঝুলছে পাখিটা।

'কত বড় হত এই পাখি?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'বেশি বড় নয়। ধরো এই কাক বা পায়রার সাইজ। কই হে সুনন্দ, কিছু বলছ না যে? মামাবাবু অধীর হয়ে ওঠেন।

'না, মানে কয়েকটা তফাত ধরতে পারছি, তবে ঠিক'—সুনন্দ আমতা আমতা করতে থাকে।

'কি, আমার স্কেচটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে? বেশ এই দেখ।'

একটা পেন্সিল নিয়ে উল্টো পিঠ দিয়ে তিনি পয়েন্ট আউট করতে থাকেন।

'এই হচ্ছে বার্লিন মিউজিয়ামে যে ফসিলটা রয়েছে তার ফোটো। আরকিঅপটেরিক্স-এর বেস্ট স্পেসিমেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি। এখন লক্ষ্য করো, প্রথমে গলা—মুঙ্গুর গলা দেহের তুলনায় অনেক লম্বা এবং সরু। তারপর মাথা।'

'এই গিরগিটি-অবতারের মাথার খুলি বেশি বড়। চোয়াল চওড়া, দাঁতগুলোও বড় বড়। অর্থাৎ এই প্রাণীর পাখির সঙ্গে আদল আরও কম এবং পূর্বপুরুষ সরীসৃপের অনেক কাছাকাছি।'

'হ্যাঁ, লেজ দেখ।

'এই ফসিলের লেজ বার্লিন ফসিলের তুলনায় কিছুটা লম্বা। আঙুলও এর মোটা মোটা। সোজা সোজা, আরকিঅপটেরিক্স-এর মতো বাঁকানো বাঁকানো নয়। নখ ভোঁতা। ওড়ার চেয়ে হাঁটত বেশি, তাই এইরকম আঙুলের গঠন। যেমন উটপাখির হয়।

'ছবি দেখে ঠিক বুঝতে পারবে না। আরকিঅপটেরিক্স-এর ফসিল চোখে দেখলে বুঝতে দ্বীপের ফসিলের সামনের পায়ের হাড় মোটা ও লম্বা। অর্থাৎ তখনও সামনের পা দুটো একেবারে অকেজো হয়ে যায়নি। পরে দিনে দিনে সামনের পা ডানার সঙ্গে জুড়ে ডানার অংশ হয়ে যায়।

'আর এই প্রাণী যে আরকিঅপটেরিক্স থেকে পুরনো তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এর ডানা এবং পালক। মুঙ্গুর ডানাটি এঁকেছি আরকিঅপটেরিক্স-এর থেকে ঢের ছোট। কাদা পাথরের গায়ে ডানার ছাপ স্পষ্ট পড়েছে, হয়তো এই প্রাণী একেবারেই ডানা নেড়ে উড়তে পারত না। মাঝে মাঝে ছুটে এসে দু-ডানা মেলে খানিকক্ষণ বাতাসে ভাসত। অবশ্য আরকিঅপটেরিক্স কিছু ওড়ায় ওস্তাদ ছিল না, আধা-ওড়া আধা-হাঁটার ওপর থাকত বলে অনুমান করা হয়েছে।'

মামাবাবু বলেন, 'এবার লক্ষ করো পালক। সবচেয়ে ইমপর্ট্যান্ট পয়েন্ট। স্কেচটা অবশ্য তেমন নিখুঁত হয়নি, তাড়াহুড়োয় এঁকেছি। আগুনের আভায় মুঙ্গুকে দূর থেকে দূরবিনে দেখে আমিও ভেবেছিলাম আরকিঅপটেরিক্স। অবশ্য একদম প্রথমে আমারও সরীসৃপ বলে ভুল হয়েছিল। তারপরই ডানার ছাপটা লক্ষ করলাম। কিন্তু কুটিরে ঢুকে কাছ থেকে দেখে চমকে গেলাম। একি! আরকিঅপটেরিক্স তো মনে হচ্ছে না—কিছু কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন যেন অন্যরকম। পাথরের দেহের কোমল অংশের ছাপ পরীক্ষা করে বুঝলাম এ আরকিঅপটেরিক্স নয়, তার পূর্বপুরুষ। কাদা পাথরে আঁশ এবং পালকের ছাপ পরিষ্কার পড়েছে। দেখলাম এটায় আরকিঅপটেরিক্স-এর তুলনায় পালক অনেক কম, আঁশ বেশি।'

'আপনি বুঝি লুকিয়ে দেখেছিলেন মুঙ্গুকে?' এতক্ষণে সুযোগ বুঝে আমি প্রশ্ন করি। 'ঐ জন্যে তাঁবুতে এসেছিলেন রাত্তিরে? দূরবিন নিতে?'

'হ্যাঁ, বাধ্য হয়ে। শুনলে তো মুঙ্গুকে বিদেশিদের দেখা বারণ। ডেয়ারিং বিলকেও দেখতে দেয়নি। নাচের আসরে যাওয়া মাত্র কামাউ আমাকে ভাগিয়ে দেয়। আমিও ছাড়ব না। তাঁবু থেকে দূরবিন নিয়ে গিয়ে বিলের মতোই আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখি। চত্বরের এককোণে পাথরটা খাড়া করা ছিল।'

'ও তারপরে আরও ভালো করে দেখবার জন্য এই ফন্দি আঁটলেন?' সুনন্দ বলে।

'হ্যাঁ।' মামাবাবু হাসেন। 'এত সহজে খেটে যাবে প্ল্যানটা ভাবিনি। যাক এ-প্রাণী যে আরকিঅপটেরিক্স থেকে কয়েক কোটি বছরের পুরনো আশা করি তা প্রমাণ হচ্ছে।'

মামাবাবু বলেন, 'আমি এই প্রাণীকে পুরোপুরি পাখি বলব না। আবার পুরোপুরি সরীসৃপও নয়। বলব সরীসৃপ এবং পাখির মধ্যে এটাই হচ্ছে মিসিং লিঙ্ক—হারানো সূত্র। আই ওয়াজ রাইট!'

মামাবাবু শেষ করতেই সুনন্দ লাফিয়ে ওঠে, 'ওঃ এটা যে দারুণ একটা আবিষ্কার হবে মামাবাবু। চারদিকে একেবারে হইচই পড়ে যাবে!'

'তা একটু পড়বে। তবে আমি সবচেয়ে খুশি হয়েছি কেন জানো?'

'কেন?' সুনন্দ বলে।

'এইবার ডক্টর মিলার ধরাশায়ী হবেন। তাঁর ধারণা, পাখি নাকি ইউরোপেই প্রথম

হয়েছিল। কারো কথা মানে না। বেজায় দাম্ভিক। ফসিল দেখে বাছাধন কী করবেন তাই ভাবছি।'

'কিন্তু ফসিল দেখাবেন কী করে? এখান থেকে নিয়ে যাবেন কী উপায়ে?' সুনন্দ বলল।

'সে নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। আপাতত খেতে দাও। বকবক করে বেজায় খিদে পেয়ে গেছে।'

মামাবাবু আশ্চর্য লোক।

অমন উত্তেজনার দিনেও তাঁর দৈনন্দিন প্রোগ্রামে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হল না। খেয়ে উঠে যথারীতি নিশ্চিন্তভাবে বই খুলে শুয়ে পড়তে লাগলেন।

আমরা এদিকে ছটফট করছি। কথা বলতে চাইছি, কিন্তু মামাবাবুর যেন ও-বিষয়ে কোনো আগ্রহই নেই। আমি ও সুনন্দ অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করি। কথা বলতে পারছি না পাছে মামাবাবুর ডিসটার্বেন্স হয়। তবু ফিসফিস করে বললাম, 'ওঃ মামাবাবু সাংঘাতিক ফেমাস হয়ে যাবে, বুঝলি। মিসিং লিঙ্ক আবিষ্কার! সোজা ব্যাপার?'—তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুম থেকে উঠে দেখলাম মামাবাবু নেই। সুনন্দ, ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। তাকে ধাক্কা দিলাম, 'এই ওঠ ওঠ। তিনটে বাজে।'

'কী হয়েছে!' সুনন্দ তড়াক করে উঠে বসল।

'আর কতক্ষণ ঘুমোবি! শোন না—তোকে কতগুলো জিনিস জিজ্ঞেস করব।'

'কী?' সুনন্দ চোখ কচলাতে কচলাতে বলে।

'আচ্ছা, ফসিলের বয়স জানা যায় কী করে?'

'আধুনিক পদ্ধতি হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করা। রেডিও-অ্যাক্টিভিটি টেস্ট। প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অথবা যে পাথরের ভিতর ফসিলটা আটকে আছে তার মধ্যে ইউরেনিয়াম, পটাশিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে রাসায়নিক পরীক্ষা করে সহজেই ফসিলের বয়স ঠিক করা যায়।'

'আর যদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ না থাকে?'

'তখন দেখতে হবে কোন ভূ-স্তরে ফসিলটা পাওয়া গেছে। সেই স্তরের বয়স কত? অথবা সেই স্তরে অন্য যেসব উদ্ভিদ বা জীবের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে তারা কত পুরনো। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা অনেক পাথর এবং ফসিলের বয়স বের করে ফেলেছেন। সেরকম কোনো জানা ফসিল বা পাথরের সঙ্গে মিলিয়ে যে ফসিলটা আবিষ্কার হল তারও বয়স অনেকটা জানা যাবে।'

'কিন্তু ঐ মুঙ্গু মানে দ্বীপের ফসিলের বয়স বুঝবি কী করে? রাসায়নিক পরীক্ষা হল না, কোথায় পাওয়া গেছে জানা নেই। তবে?'

'এ-ফসিলটা জলের মতো সহজ। এর জন্যে পরীক্ষার দরকার হয় না। স্রেফ দেখেই বলা যায়। কারণ আরকিঅপটেরিক্স-এর বয়স বের করা আছে। এটা যে তারই পূর্বপুরুষ তোর মতো গাধাও চোখে দেখে বলে দিতে পারে!'

'ও! তা তুই বলতে পারলি না কেন? বললি গিরগিটি।'

মামাবাবুর মতো আমার অত অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া আরকিঅপটেরিক্স-এর ফসিল আমি চোখে দেখিনি, শুধু ছবি দেখেছি। তারপর অন্ধকার ঘর, ধোঁয়া, কিন্তু পরে ঠিক বলেছিলাম, মামাবাবুর স্কেচ দেখেই। তবে তফাতটা ধরতে দেরি হচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম দুটো এক নয়, কিন্তু নার্ভাস লাগছিল। আর একটু সময় পেলেই—'

এগার

কটা দিন রীতিমতো উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে।

আমার ও সুনন্দর আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে এই আবিষ্কার।

আমরা আরও দুদিন মুঙ্গুর সামনে যাগযজ্ঞ করেছি। ফসিল সম্বন্ধে মামাবাবুর ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। সুনন্দও উৎসাহের মাথায় আমাকে আরও একদফা লেকচার দিয়েছে পাখির উৎপত্তি, বিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে, মামাবাবুর ইচ্ছে ফসিলের ফোটো তোলেন। কিন্তু অন্ধকার ঘরে ফ্ল্যাস ছাড়া ছবি উঠবে না। আর আমাদের একটি বাল্বও আস্ত নেই।

দ্বীপের লোকের চোখে আমরা প্রায় অবতার বনে গেছি। মুঙ্গুকে স্বচক্ষে দেখেও যে তারা এবং আমরা উভয় পক্ষই বহাল তবিয়তে টিকে আছি এমন অভাবনীয় কাণ্ড তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

আর কামাউ? অনুভব করছি সর্বদা সে আমাদের মস্তকে যাবতীয় অভিশাপ বর্ষণ করে চলেছে। বয়ে গেছে, আমরা থোড়াই কেয়ার করি। তবে শুধু যে শাপমন্যি করে কামাউ হাত গুটিয়ে বসে ছিল না, অচিরেই টের পেলাম হাড়ে হাড়ে।

ইতিমধ্যে আমরা এক নতুন তথ্য জেনেছি।

মুঙ্গু দর্শনের পরের দিন। মামাবাবু আমাদের বলেছিলেন, 'টোটো এলে আমায় ডেকো। ওর সঙ্গে কথা আছে।' সন্ধ্যায় টোটো আসতেই মামাবাবুকে ডাকলাম।

মামাবাবুকে কাছে আসতে দেখেই টোটো কাঁচুমাচু হয়ে গেল। রাশভারি মামাবাবুকে সে এড়িয়ে চলত। হাসিমুখে বললেন, 'টোটো, খবর কী? সর্দারের ছেলে কেমন আছে?'

'একদম ভালো হয়ে গেছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'বেশ বেশ। সুসংবাদ। আচ্ছা এই মুঙ্গুকে তোমরা কদ্দিন পুজো করছ? অনেকদিন?'

'আমরা পুজো করব কেন? ও তো কামাউয়ের দেবতা! আমরা, কোনো মূর্তিপুজো করি না।'

'সেকি!' আমরা তিনজনেই অবাক।

'কামাউয়ের দেবতা, কিন্তু তোমাদের নয়? আশ্চর্য। কামাউ কি তোমাদের জাতের লোক নয়?' মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'নয়ই তো, ও ভিন্ন জাতের লোক। সাদা মানুষেরা ওকে ধরে নিয়ে যায়। দাস করে রেখে, খুব খাটিয়েছিল। অত্যাচার করেছিল। তারপর একদিন সে পালায়। আমাদের গাঁয়ে এসে আশ্রয় চায়। তখন থেকে আমাদের সঙ্গে আছে।'

'তা বাইরের জাতের লোক কামাউ তোমাদের মাহুঙ্গা হল কী করে?'—মামাবাবু গভীর আগ্রহে প্রশ্ন করেন।

'ও কিনা অনেক ওষুধ-টষুধ জানে। আর ম্যাজিক দেখাত। তাই আমাদের জাতে ওর খুব খাতির হল। তারপর আমাদের পুরনো মাহুঙ্গা মরে গেলে ও হল নতুন মাহুঙ্গা।'

'মাহুঙ্গা কী?' আমি বলি।

'উইচ-ডক্টর! ওঝা।' মামাবাবু উত্তর দিলেন।

'অ্যাঁ! ওঝা হয়ে গেল, কেউ আপত্তি করল না?' আমি বললাম।

'ও বাব্বা, কার অত সাহস! কামাউ ভীষণ লোক। সবাই ওকে ভয় করে। তাছাড়া অসুখ-বিসুখ হলে, সাপে কাটলে, জানোয়ারে কামড়ালে বা দুষ্ট অপদেবতা ভর করলে ও ছাড়া আমাদের গতি নেই।'

'তুমি এত কথা জানলে কী করে?' মামাবাবু বলেন।

'ঠাকুমার মুখে শুনেছি। ইস্, কী ভালো যে গল্প বলত ঠাকুমা, যদি শুনতে, কত রকম কথাই জানত। কিন্তু কী করে শুনবে, ঠাকুমা আমার মরে গেছে চার বছর হল।'

টোটো তার ঠাকুমার আরও কিছু প্রশস্তি গাইতে যাচ্ছিল, মামাবাবু থামিয়ে দিলেন—

'আচ্ছা এই মূর্তি কামাউ কোত্থেকে পেয়েছে? সঙ্গে নিয়ে এসেছিল?'

'মোটেই না। আমাদের গ্রামে আসার কিছুদিন পরে কামাউ হঠাৎ মুঙ্গুকে পায়। গ্রামের কাছে ছিল একটা পাথুরে খাদ। কামাউ খাদের পাশে একদিন বসে আছে, এমন সময় চড়চড় করে পাথর ফেটে গেল, ভিতর থেকে আবির্ভূত হলেন মুঙ্গু। কামাউ তখুনি পাথর কেটে তাঁকে নিয়ে এল।'

'বাঃ চমৎকার, মিলে যাচ্ছে।' মামাবাবু আমাদের উদ্দেশ করে বললেন। 'ডেয়ারিং বিলও দেখেছিল গ্রামের কাছে এক উপত্যকা, সেখানে কালো রঙের পাথরের স্তর।'

'এ কদ্দিন আগের ঘটনা?' মামাবাবু টোটোকে জিজ্ঞেস করলেন।

'কদ্দিন হবে?' টোটো গালে হাত দিয়ে ভাবল। 'ঠাকুমা বলেছিল এখানে আসার বেশ কিছু বছর আগে।'

'কিন্তু কামাউয়ের দেবতার সামনে তোমরা নাচগান করো কেন?' সুনন্দ কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হয়ে বলল।

'আজ করছি, প্রথমে করতাম না। ঠাকুমা বলেছে, প্রথম প্রথম কামাউ নাকি একা একা কুটিরের ভিতর মুঙ্গুর পুজো করত। করে সে নাকি দৈবশক্তি পায়। আমাদের জাতের কেউ কাছে যেত না, আমল দিত না। পরে যখন ওর দাপট বাড়ল, গ্রামে কোনো বড় উৎসব হলে ও মুঙ্গুকে নিয়ে আসত নাচ-গানের আসরে। প্রথম দিকে কেউ কেউ বলেছিল, ওর দেবতার সামনে আমরা নাচব কেন? কিন্তু বেশির ভাগ ওর দলে। কামাউকে তাদের দারুণ বিশ্বাস। তাছাড়া লোকটা ভয়ঙ্কর। ঠাকুমা বলত, ও নাকি বাণ মারতে জানে। তোমার ওপর কোনো কারণে চটে গেছে, রাত্তিরে তুমি ঘুমোতে গেলে, কোনো অসুখ-বিসুখ নেই। ওমা, সকালে সবাই দেখবে মরা কাঠ হয়ে আছ।'

'হুম্। তোমার ঠাকুমা দেখছি অনেক গল্প বলেছে।'

মামাবাবুর মন্তব্যে উৎসাহিত হয়ে টোটো বলল, 'ঠাকুমা যে কত গল্প জানত! সব মনে ছিল।'

'বেশ শুনব আর একদিন।' মামাবাবু চিন্তান্বিতভাবে তাঁবুতে ঢুকে যান।

রাত্রে মামাবাবু বললেন, 'এতক্ষণে বুঝলাম কামাউয়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কেন সর্দার আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল। ফন্দিটা এঁটেছিলাম বটে, কিন্তু রীতিমতো সন্দেহ ছিল কতটা খাটবে। নিজেদের দেবতা হলে খুব সম্ভব ছেলের প্রাণ গেলেও সর্দার ধর্মের আইনকানুন ভাঙত না। আমাদের মূর্তি দেখতে দিত না। কিন্তু ও তো কামাউয়ের দেবতা। কাজেই ছেলের প্রাণ বাঁচাতে নিয়ম বদলানো যেতে পারে।'

'ঐ জন্যে কামাউয়ের সঙ্গে সর্দারের অত তর্ক হচ্ছিল।' সুনন্দ বলল, 'উঃ! কী ক্ষেপেছিল ওঝাটা, কিছুতেই দেখতে দেবে না। শেষে সর্দার জোর করে অর্ডার দিল তবে—'

প্রথমবার মুঙ্গুদর্শনের পর চতুর্থ দিন।

আমি ও সুনন্দ বনপথে আসছি হঠাৎ সর্দারের সঙ্গে মুখোমুখি। দুজন সঙ্গী নিয়ে সে আসছিল। সর্দারকে দেখে সুনন্দ হেঁকে বলল, 'এই যে সর্দার, কোত্থেকে? তারপর তোমাদের নৌকো আবার ওপারে যাচ্ছে কবে?'

'দিন পনের-ষোল পরে।'

'বেশ বেশ। যাবার দিন দুই আগে আমাদের খবর দিও কিন্তু। একেবারে শেষ সময়ে বললে হুট্ করে বেরনো মুশকিল। গোছগাছ করতে হবে, সংসার পেতে বসেছি।'

সুনন্দের উচ্ছ্বাসে সর্দারের কিন্তু বিন্দুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না। বলল, 'তোমরা এখন যাবে না।'

'অ্যাঁ! সে কি! কথাটা যেন বিশ্বাস হয় না। বোধহয় শুনতে ভুল করেছি।'

'তোমাদের এখন যাওয়া হবে না।' সর্দার পুনরুক্তি করে।

'তবে কবে যাব? আমাদের ওষুধ তো শেষ হয়ে যাবে দিন পনেরোর মধ্যে। তারপর এখানে থাকব কী করতে?'

'নতুন ওষুধ বানাও। এদেশ থেকে যখন এই ভীষণ রোগ একদম চলে যাবে, আর একটা লোকও হোমার অপদেবতার কবলে পড়বে না, তখন তোমাদের ছুটি। আমাদের অভিশাপ মুক্ত করে দাও, তোমাদের সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে দিয়ে আসব।'

'কিন্তু সর্দার ওষুধ বানাব কী করে? সেসব মালমশলা এদেশে পাব কোথায়? দেশে যাই, অনেক ওষুধ তোমাদের বানিয়ে দেব। আমরা নিজেরা ওষুধ নিয়ে এসে রোগ একেবারে তাড়িয়ে দেব দ্বীপ থেকে।'

'না, এখন যাওয়া চলবে না। আগে কাঁপুনিরোগ সারুক।' সর্দার দৃঢ় স্বরে বলে।

'কী মুশকিল, ওষুধ পাব কোথায়?'

'বানাও।'

'বারবার ঐ এক কথা।' সুনন্দ অধীর হয়ে ওঠে। 'এখানে বসে ওষুধ বানানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়—'

'হ্যাঁ সম্ভব, আমি জানি।' সর্দারের গলায় উষ্মা ফুটে ওঠে।

'কী করে জানলে?' সুনন্দ আশ্চর্য হয়ে বলে, 'কে বলল?'

'কামাউ বলেছে। ও তোমাদের কাছে ওষুধ শিখতে গিয়েছিল। তোমরা বলেছ—ওষুধ বানাতে পারি, কিন্তু আমরা ছাড়া অন্য লোকের হাতে সে-ওষুধ কাজ করবে না।'

'মিথ্যে কথা। ডাহা মিথ্যুক। আমাদের কাছে ও ওষুধ শিখতে গিয়েছিল ঠিক। আমরা এও বলেছি ওষুধ যার-তার হাতে কাজ করে না। কিন্তু এখানে ওষুধ বানাতে পারব, একথা কক্ষনো বলিনি। আসলে ও আমাদের বিপদে ফেলতে চায়। আমাদের হিংসেয় একথা বলেছে।'

'হিংসে কেন?'

'ও অ্যাদ্দিন ওঝাগিরি করছে, কিন্তু ওর দাওয়াইয়ের চেয়ে আমাদের ওষুধের জোর বেশি। রোগ সারছে। লোকে আমাদের খাতির-যত্ন করছে। এটা ও সহ্য করতে পারছে না।'

সর্দার ঘাড় নাড়তে থাকে। আমাদের যুক্তি তার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। 'উঁহু, তোমরা এত ম্যাজিক মন্ত্র-তন্ত্র জানো, আর ওষুধ বানাতে জানো না। তা কি হয়?'

'বিশ্বাস করো সর্দার, সত্যি পারি না।' সুনন্দের কণ্ঠে অনুনয়, 'আমাদের মিছিমিছি আটকে রেখে কোনো লাভ নেই।'

সর্দারের ভ্রমরকৃষ্ণ মুখমণ্ডল রাগে বেগুনি হয়ে গেল। কণ্ঠস্বর গম্ভীর, কর্কশ।

'পারবে। পারতেই হবে। তোমরা আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ। এ তোমাদের পালাবার মতলব। সব বুঝি। আমি অত বোকা নই। একবার দেশে ফিরলে আর তোমাদের পাত্তা পাব ভেবেছ? দেখ, আমাদের মরণের মুখে ফেলে রেখে তোমরা দিব্যি সটকান দেবে, তা হচ্ছে না। মতলব করে ওষুধ যদি না বানাও, আমরা যদি মরি, জেনে রেখো তোমরাও প্রাণে বাঁচবে না। চল—'

সর্দার তার সঙ্গীদের প্রতি আদেশ দিয়ে সোজা হাঁটা দিল।

আমরা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকি।

সুনন্দ হঠাৎ তার লম্বা পা ফেলে গ্রামের দিকে এগোতে থাকে।

'কোথায় চললি?'

'কামাউয়ের খোঁজে।'

'কেন?'

'কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেব শয়তানটাকে।'

'দাঁড়া। আমি দৌড়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরি।'

বলি, 'কোনো লাভ নেই। কামাউকে ঠ্যাঙালেই সর্দার আমাদের কথা বিশ্বাস করবে ভেবেছিস? বরং কেস আরও খারাপ হবে। এখন টেন্টে চল।'

মামাবাবু সব শুনে বললেন, 'হুম্? প্রতিশোধ! খুব স্বাভাবিক। আমরা ওর ভাত মারার জোগাড় করেছি, ও কি ছেড়ে কথা কইবে? আমি আঁচ করেছিলাম ও কিছু মতলব ভাঁজছে। যাকগে ভালোই হল।'

'সে কী!' আমরা হতবাক।

'মামাবাবু!' সুনন্দ কাতরে ওঠে, 'ভবিষ্যৎটা ভেবে দেখেছেন? দুদিন পরে ম্যালেরিয়ার ট্যাবলেট শেষ। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও খতম, এদের হাতে বেগুনপোড়া হতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।'

'আমারও নেই। অসিত, তোমার?'

'মোটেও না। মরি মরব, বীরের মতো মরব। খুঁটির আগায় রোস্ট হচ্ছি না।'

'ঠিক ঠিক!'

'তবে যে বলছেন ভালোই হল?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'কারণ আমি একটা দোটানায় পড়েছিলাম। তার সমাধান হয়ে গেল।'

'কীরকম?'

'সমস্যাটা হল, যদি এদের নৌকো চেপে ফিরে যাই একজনের কিন্তু যাওয়া হচ্ছে না।'

'কার?'

'মুঙ্গুর। এই মহামূল্যবান বৈজ্ঞানিক সম্পদটি ছেড়ে রেখে যাই কী করে?'

'কেন ফিরে এসে নিয়ে যাব।' সুনন্দ বলল।

মামাবাবু হাসেন। 'কী ভেবেছ? এরা তোমায় তাদের দেবতাকে দান করবে?'

'তবে জোর করে নেব।'

'তাহলে এদের তুমি চেন না। একটি প্রাণ বেঁচে থাকতে ওরা দেবতা ছাড়বে না।'

সুনন্দ বলল, 'কিন্তু দেবতা তো কামাউয়ের, অন্যদের অত মাথাব্যথা কীসের?'

'তাহলেও দেবে না। কারণ আমরা বিদেশি। মাঝ থেকে জোরজার করতে গিয়ে হয়তো চিরকালের মতো ফসিলটা হারাব এবং অনর্থক কিছু প্রাণ নষ্ট হবে।'

'তাহলে উপায়?'

'উপায় পালানো। নৌকো চুরি করে আমরা লুকিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেব। মুঙ্গুকেও সঙ্গে নেব চুরি করে। নিরাপদে ফিরে যাব, নাকি জেনে শুনে এত বড় রিস্কটা নেব? তাই ভাবছিলাম। আমি একা থাকলে দ্বিতীয় পন্থাটাই ধরতাম, কিন্তু তোমরা রয়েছ, মাঝিরা আছে। ভালোয় ভালোয় উপকূলে পৌঁছুতে পারব কি না কে জানে! যাক, আপাতত একটি পথই এখন খোলা।'

'কামাউয়ের মুঙ্গুকে চুরি করবেন?' সুনন্দের মুখ হাসি-হাসি।

'কামাউয়ের দেবতা বলেই তো চুরি করব। নইলে যদি জানতাম, এই উপজাতির কাছে এ-মূর্তি অতি পবিত্র, মূর্তি হারালে তারা বিষম ব্যথা পাবে মনে, বিজ্ঞানের খাতিরেও আমি এ-কাজ করতে পারতাম না। কিন্তু সেদিন টোটোর কথায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে দ্বীপের লোকেরা কামাউয়ের মুঙ্গুকে ভক্তি করে না, ভয় করে।'

আমি বললাম, 'কামাউ নিজেই কত মুঙ্গুকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে সন্দেহ আছে। ধূর্ত লোক, নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে একটা অদ্ভুত দেখতে মূর্তি খাড়া করেছে। এটা তার পুরুষানুক্রমের দেবতাও নয়।'

'মুঙ্গু উধাও হলে কামাউ দারুণ প্রেস্টিজ খোয়াবে। লোকে ভাববে দেবতা নেই, অতএব তার দৈবশক্তিও বুঝি গেল এবার।' সুনন্দ খুশিমুখে মন্তব্য করে।

'আশা করছি তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে।' মামাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমরা ওর ওপর খুব চটে আছ দেখছি। যাক। বলো নৌকো চালানো কতটা রপ্ত করলে? মনে রেখো ছিপনৌকো নাও পাওয়া যেতে পারে। ওগুলো থাকে ডাঙায়, অনেক দূরে। যেতে হবে ডিঙি বা মাঝারি নৌকো চড়ে।'

সুনন্দ চিন্তিত স্বরে বলল, 'সেটা এক হিসেবে ভালোই। কারণ ডিঙি আমরা বেশি চড়ি। ছিপ বাইতে শিখিনি। কিছুটা আমি রপ্ত করেছি। অসিতও মোটামুটি পারবে। তবে ঢেউ বেশি উঠলে সামলাতে পারব কি?'

'আকাশ পরিষ্কার দেখে বেরোতে হবে। সমুদ্র যেদিন শান্ত, দিন নয়, বলা উচিত রাতে। কারণ রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পালাতে হবে। তবে যতটা শক্ত ভাবছ তত কঠিন নাও হতে পারে। দ্বীপের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মোজাম্বিক স্রোত। এই স্রোত গিয়ে ঠেকেছে তটভূমির গায়ে। নৌকো কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিমে চালিয়ে নিয়ে মোজাম্বিক স্রোতের টানে পড়তে পারলেই আর ভাবনা নেই। ঠিক হাজির হয়ে যাব মহাদেশের কূলে। শুধু নৌকো ভাসিয়ে রাখতে পারলেই হল। বন্দী মাঝি দুজনকেও সঙ্গে নেব। তারাও সাহায্য করতে পারবে।'

আমি বললাম, 'মাঝিদের মুক্ত করতে গিয়ে আবার নতুন হাঙ্গামা বাধবে না তো? যদি ধরা পড়ে যাই!'

'কিন্তু ওদের ফেলে রেখেও তো যাওয়া যায় না। আমরা পালালে ওদের পরিণতি কী দাঁড়াবে ভেবে দেখেছ? স্রেফ থোড় কুচো করে ফেলবে রাগে। অবশ্য সবচেয়ে কঠিন কর্ম কী করে মুঙ্গুকে চুরি করা যায়। যাহোক, এসব প্ল্যান আমি ভেবে-চিন্তে ঠিক করছি। তোমাদের কর্তব্য, যতটা পারো নৌকো চালানো প্র্যাকটিস করা। তবে সাবধান, ওরা যেন ঘুণাক্ষরেও আমাদের মতলব টের না পায়। তাহলে সর্বনাশ ঘটবে।

বার

এরপর ক-দিন ধরে আমরা প্রবল উৎসাহে নৌকো চালানো প্র্যাকটিস করলাম। কামাউকে দেখতাম দূরে থেকে বাঁকা দৃষ্টি দিয়ে আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করছে। সুনন্দ মাঝে মাঝে কটমটিয়ে তাকে দেখে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'ব্যাটা শকুনি, ব্যাটা শয়তান। একবার বাগে পাই তো দেখাই মজা।'

দিন চারেক পর মামাবাবু তাঁর প্ল্যান উপস্থিত করলেন।

সকালবেলা চা খেতে খেতে বললেন, 'আমরা পরশু পালাব।'

'পরশু কেন?'

'কারণ ঐ দিন দ্বীপে এক উৎসব আছে। হই-হল্লাটা একটু গুরুতর হবে। উৎসবের শেষে সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোবে, সেই ফাঁকে—'

'মুঙ্গু? বন্দী মাঝি দু'জন?'

'হুঁ, বলছি সব। মাঝিদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করেছি। দেখেছ রাত্রিতে তারা একটা কুটিরে বন্দী থাকে। হাত শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে খুঁটোর সঙ্গে। দুজনে ঘরের দু'প্রান্তে। এক হাতে সে গিঁট খোলা অসম্ভব। কিন্তু একখানা ধারালো ছুরি পেলে তারা অনায়াসে বাঁধন কেটে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে শিসের সংকেত শুনলেই বেরোবে।'

'বেরোবে কী করে?' আমি বলি, 'বাঁশ মাটির দেওয়াল বেশ মজবুত। দরজা ঝাঁপ দিয়ে আটকানো থাকে—'

'বেরোবে চাল ফুটো করে। ঘাস-পাতার চাল ফাঁক করা শক্ত নয়। হ্যাঁ, ওদের একটা ছুরি দিয়ে আসতে হবে। অসিত, তুমি এই ভার নাও। সুযোগমতো কুটিরের পিছনে দক্ষিণ কোণে গিয়ে আস্তে দু-বার শিস দেবে। ভিতর থেকে উত্তর আসবে—একবার শিস। দেখবে মাটি থেকে দু-ফুট ওপরে দেওয়ালের গায়ে ছোট ফুটো। আমি করে রেখেছি। পাশে ক্রশ চিহ্ন। তুমি খোলা ছুরিটা ফোকরের মধ্য দিয়ে গলিয়ে ফেলে দেবে। ব্যস, ছুরি পড়বে আবদুলের পাশে। পালাবার চরম সংকেত পাওয়ামাত্র ওরা বেরিয়ে এসে সোজা সমুদ্রতীরে হাজির হবে।'

'এইবার আসছে মুঙ্গু অপহরণপর্ব। এইটাই সবচেয়ে জটিল কাজ। তোমরা দেখেছ মুঙ্গুর কুটিরের দরজা খোলা হয় দিনে একবার। সান্ধ্য আসর বসবার মুখে। কামাউ তার পুজো করে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্চিন্ত। কেউ মুঙ্গুর খোঁজ করে না। অতএব এই সময়ের মধ্যে কাজ হাসিল করতে হবে। গিরগিটি অবতারকে সরাতে হবে উৎসবের শেষে। যখন সকলে নেচে-কুঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। দিনের বেলা বা উৎসব চলার সময় চুরি করা অসম্ভব, কারণ যে কারো চোখে পড়ে যেতে পারি। চত্বর থেকে পরিষ্কার দেখা যায় কুটিরটা। সুনন্দ, এটা তোমার ডিউটি। পাতলা দেয়াল কেটে ভিতরে ঢুকবে। তারপর ফসিলটা নিয়ে সোজা সমুদ্রতীরে চলে যাবে, নৌকোর কাছে। আমি আর অসিত যাব ক্যাম্প থেকে। দু-চারটে প্রয়োজনীয় জিনিস শুধু সঙ্গে নেব। আর আহত মাঝিদের ডেকে নেব। অতঃপর নৌকো জলে নামানো ও দুর্গা বলে সাগরের বুকে পাড়ি।

'ভোররাত্রে বেরোলে একটা মাত্র বিপদ থেকে যাচ্ছে যে আমরা দ্বীপ থেকে বেশি দূরে সরে যেতে পারছি না। ভোরে উঠে দ্বীপবাসীরা যখন টের পাবে পাখি পালিয়েছে, তারা তৎক্ষণাৎ ছিপ নিয়ে তাড়া করবে। হয়তো মাঝপথে ধরেও ফেলতে পারে। যাহোক, এ ঝুঁকিটুকু আমাদের নিতেই হচ্ছে, উপায় নেই। আরও আগে বেরোতে পারলে ভালো হত। এদের মুঠো থেকে অনেক দূরে সরে যেতে পারতাম।'

সুনন্দ বলল, 'যদি উৎসব ছাড়া অন্য কোনোদিন পালাই। সেসব দিন অনেক আগে এদের আসর ভাঙে।'

'সেসব দিন সম্ভব নয় ঐ কামাউ বুড়োর জন্যে।'

'কেন?'

'কামাউয়ের ঘর মুঙ্গুর কুটিরের একদম লাগোয়া। আমি লক্ষ্য করেছি, বুড়োটা রাত্রে ভালো ঘুমোয় না। প্রায়ই জেগে থাকে। খক্ খক্ করে কাশে। লোকটার আবার কান ভারি সজাগ। তবে উৎসবের দিন প্রচুর নেচে-কুঁদে আর কড়া নেশার পানীয় গিলে ঘুমটা নিশ্চয় ওর গাঢ় হবে। তাছাড়া উৎসবের পর বেশিরভাগ সময়ই এরা কুটিরে ঘুমোতেই যায় না, চত্বরেই লম্বা হয়। সুতরাং পরশুই উপযুক্ত দিন।'

বুঝলাম সব দিকে হুঁশ রেখেই মামাবাবু পরিকল্পনা তৈরি করেছেন।

মামাবাবু বললেন, 'সাবধান! খুব সতর্ক হয়ে কাজ করবে। একটু সন্দেহ হলেই সঙ্গে সঙ্গে কাবার!'

সমস্ত দিন এক চাপা উত্তেজনার মধ্যে আছি। নানা সম্ভব-অসম্ভব আশঙ্কা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। কাউকে বলছি না। ভাববে ভীতু। সুনন্দও ঘাবড়েছে। তবে ভান করছে যেন এ তো ছেলেখেলা। শুধু একবার মনের ক্ষোভ প্রকাশ পেল।

ব্যাজার মুখে বলল, 'যত শক্ত কাজ দেখছি আমার ঘাড়ে। ঐ ভারী পাথরখানা বয়ে নিয়ে অতটা পথ হাঁটা! বাপরে! দেশি-বিদেশি যত জানা দেবদেবী আছেন সবাইকে স্মরণ করছি। হে মা, হে বাবা, ভালোয় ভালোয় পার করে দিও।'

সত্যি বলতে কি একটু উৎসাহও লাগছে। অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়েছি কত। এবার একেবারে হাতেনাতে এক্সপেরিমেন্ট। যেমন বিচিত্রভাবে আমাদের এই দ্বীপে আগমন, তেমনি রোমাঞ্চকর প্রস্থান (পলায়নও বলতে পারেন)। দেশে ফিরলে নির্ঘাত 'হিরো' বনে যাব। খবরের কাগজে ছবিটবি বেরিয়ে যাবে। অবশ্য যদি ফিরি।'

সেদিন রাতে টোটোর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল তাঁবুর সামনে বসে। ছেলেটার ওপর মায়া পড়ে গেছে। বেচারা হঠাৎ জানবে তার বন্ধু মাহিগুিরা পালিয়েছে। পেটুক মানুষ, ভালো-মন্দ বিদেশি খানা আর জুটবে না।

টোটো বলছিল তাদের জাতির অতীত গৌরবের কাহিনি।

'বাবা-জ্যাঠারা বলে, দূর দূর এ কী জীবন? শিকার নেই। যুদ্ধ নেই। তোরা ছাগল বনে গেছিস। কী সব দিন ছিল আমাদের সেই জঙ্গলের দেশে। বর্শা দিয়ে সিংহ শিকার দেখেছিস? তির ছুঁড়ে প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতিকে পেড়ে ফেলতাম। হায়, সেসব দিন গেল কোথায়! এইটুকু দ্বীপে বন্দী হয়ে আছি। কাজের মধ্যে কেবল নৌকো চড়া। ছোঃ ছোঃ! যতসব মেয়েলিপনা! তার চেয়ে তির ছুঁড়ে নারকেল পাড়া ঢের শক্ত।'

'এ-দ্বীপে তোমরা এলে কেন?' আমি প্রশ্ন করি।

'বাধ্য হয়ে, যুদ্ধে হেরে। আমার তো এখানেই জন্ম। শুনেছি পাশের গ্রামের ওঙ্গামিদের সঙ্গে ছিল আমাদের দারুণ শত্রুতা। বার বার যুদ্ধ হত। ওঙ্গামিরা পারত না। শেষে একবার তারা অতর্কিতে আক্রমণ করল। আমরা প্রস্তুত হবার সুযোগটুকু পেলাম না। আমাদের বেশির ভাগ পুরুষ মরল। বাকিরা মেয়ে আর বাচ্চাদের নিয়ে পালালো। ওঙ্গামিরা সহজে ছাড়েনি। সমুদ্রতীর অবধি পিছন পিছন তেড়ে এসেছিল। একেবারে ঝাড়ে-বংশে শেষ করে দেবার মতলব আর কী! ওদের ভয়েই আমরা এই দ্বীপে পালিয়ে আসি। দেখ না, আজও ওপারে গিয়ে আমরা বেশিদিন থাকি না। ঐ ওঙ্গামিদের ভয়ে। তবে আবার ফিরব।

'কবে?'

'সর্দার বলেছে। আমরা আরও সংখ্যায় বাড়ি। যুদ্ধ জানা যুবকে যখন আমাদের দল বেশ ভারী হবে তখন ফিরব সেই জঙ্গলের দেশে। ওঙ্গামিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে। কিন্তু ইদানীং সবাই খুব মুষড়ে পড়েছে। এই মারাত্মক কাঁপুনি জ্বরে আমাদের গায়ের জোর কমে যাচ্ছে। লোকও মরছে। ওঙ্গামিদের সঙ্গে লড়ব কী করে?'

'ওঙ্গামিদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতার কারণ কী?'

'কেন জানো? ওঙ্গামিরা ছিল ঐ অঞ্চলের প্রভু। আমরা গিয়ে জমিতে ভাগ বসাতে ভয়ানক চটে যায়। ফলে প্রাণপণে আমাদের তাড়াতে চেষ্টা করে।

'ও তোমরা বুঝি অন্য দেশ থেকে এসেছিলে? কোথায় ছিলে আগে?'

'আমরা আগে ছিলাম আরও গভীর বনের রাজ্যে। আকাশছোঁয়া এক পাহাড়ের গায়ের কাছে আমাদের গ্রাম। সেই তো আমাদের আসল দেশ।'

'সেখান থেকে এলে কেন?'

'ভয়ে।'

'কীসের ভয়?'

'মোটো। মালিমা ইয়া মোটো।'

'মামাবাবু!' সুনন্দ ডাকে।

কি? মামাবাবু বই থেকে মুখ তোলেন।

'মোটো। মালিমা ইয়া মোটো মানে কী?'

'মোটো মানে আগুন। মালিমা ইয়া মোটো মানে হচ্ছে আগ্নেয়গিরি বা অগ্ন্যুৎপাত। কোথায় শুনলে কথাটা?'

'টোটো বলছে, ওদের আদি বাসস্থান নাকি ছিল গভীর জঙ্গলে। পাহাড়ের কোলে। সেখান থেকে পালিয়ে আসে আগুনের ভয়ে।'

'তাই নাকি?' মামাবাবু কৌতূহলী হলেন, 'ব্যাপারটা কী হয়েছিল টোটো?'

টোটো বলল, 'আমি ঠাকুমার মুখে শুনেছি। উঃ, সে এক ভীষণ ব্যাপার। আমার বাবা তখন ছোট, এই আমার মতো। ঠাকুমার মুখে সে-গল্প শুনলে বুঝতে কী সাংঘাতিক কাণ্ড! আমি তেমন জমিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু ঠাকুমাকে আর পাবে কোথা? ঠাকুমা তো মরে গেছে।'

'বেশ তুমিই বলো শুনি।'

টোটো বলল, 'ঐ পাথরের মধ্যে ছিল অগ্নিদেবতার বাস। মাঝে মাঝে গুড়গুড় আওয়াজ উঠত। চোঙার মতো মাথা দিয়ে বেরতো কালো ধোঁয়া। গরম হাওয়া। শব্দটা বাড়তে লাগল। সবাই বলল, দেবতা রেগেছে। ভালো ক'রে পুজো দিতে হবে। কিন্তু পুজো দেবার আর সময় পাওয়া গেল না। সেদিন রাত্তিরে পাহাড়ের মাথা থেকে ঝলকে ঝলকে অগ্নিদেবের গরম নিশ্বাস বের হতে লাগল। মাটি তেতে উঠল। আকাশে ধোঁয়া, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সবাই বলল, পালাও। এক্ষুনি। দেবতার রোষে নইলে কেউ রক্ষা পাবে না। গ্রামসুদ্ধ পালিয়ে চলল। পালাতে পালাতে আরম্ভ হল আগুনবৃষ্টি। জ্বলন্ত পাথর ছুটতে লাগল। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এল শত শত আগুনের ধারা। মানুষ পশুপাখি সবাই ছুটল দিশেহারা হয়ে, প্রাণের ভয়ে। অনেকে মরল পাথরের ঘায়ে। আমার ঠাকুর্দা এক হাতে ঠাকুমাকে অন্য হাতে বাবাকে ধরে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে টেনে নিয়ে চলল। উঃ! কী ভীষণ রাত্রি! যারা বাঁচল, কোনোরকমে গিয়ে উঠল দূরে এক পাহাড়ে।

পরদিন দুপুর নাগাদ এক বিকট শব্দ। সে কী কান-ফাটানো আওয়াজ! মনে হল সৃষ্টি বুঝি ভেঙে গুঁড়িয়ে উড়ে গেল। প্রচণ্ড আলোর ঝলক ও ভয়ঙ্কর শব্দে অনেকক্ষণ সবাই হতবুদ্ধি হয়ে রইল। সম্বিত ফিরতে দেখল আগুন দেবতার বাসা সেই উঁচু পাহাড়ের ডগাটা ফেটে চুরচুর হয়ে উড়ে গেছে। আর সেই মাথাভাঙা পাহাড়ের ভিতর থেকে নেমে আসছে অজস্র জ্বলন্ত স্রোত। মস্ত মস্ত পাথর ছিটকাচ্ছে। আবার ছোট্ ছোট্। অনেক দূরে এক সমতলে এসে সবাই থামল। সেখানে তৈরি করল নতুন গ্রাম। জায়গাটা চমৎকার ছিল।

প্রচুর শিকার। কিন্তু জুটল এক নতুন হাঙ্গামা,—ওঙ্গামি। তাদের সঙ্গে ঝগড়া আর কিছুতেই মিটল না।

'এই দ্বীপেও অগ্নিদেব আছে নাকি?' মামাবাবু মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করেন।

'কে জানে, থাকতে পারে! তবে শুনিনি তো কখনও। থাকলে তো মরেছি। ঠাকুমা বলত, অগ্নিদেব ঘুমিয়ে থাকে মাটির নিচে, একদিন হঠাৎ জাগে। তখন তার মেজাজ হয় অগ্নিশর্মা। ধারে কাছে কারো তখন রক্ষা নেই।

'টোটো, তুমি দেখছি বড্ড ভয় পাও অগ্নিদেবকে।' মামাবাবু ঠাট্টা করতে লাগলেন।

'ডরাব না? কী রাগী দেবতা! আমি আর কী ডরাই! আমার বাপ-জ্যাঠা, ঐ দারুণ সাহসী বীর সর্দার সব্বাই অগ্নিদেবের নামে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। একটা দড়াম্ করে শব্দ হোক, খানিকটা আগুন দেখা যাক, দু-চারটে পাথর ছুটুক—আর চেঁচিয়ে বলুন—অগ্নিদেব সাবধান! ঊর্ধ্বশ্বাসে সব পালাবে, অন্ধের মতো। একবার পিছন ফিরে দেখতে ভরসা পাবে না, গাছ পড়ল না মশাল ছুঁড়ল কেউ। আমরা ছয় চাঁদ অন্তর একবার ঘটা করে অগ্নিদেবের পুজো দিই।

টোটো ফিরে যেতেই মামাবাবু বলে উঠলেন, 'আমাদের প্ল্যান কিছু বদলাতে হবে।'

'কীরকম?' আমরা উদ্বিগ্ন হই।

'পরশু আমরা সমুদ্রযাত্রা করছি না। সেদিন হবে শুধু এক অংশ—মুঙ্গু অপহরণ পর্ব।'

'তারপর?'

'তারপর সমুদ্রে ভাসছি, মানে ফাইনালি চম্পট দিচ্ছি যে কোনোদিন সুবিধা মতো।'

সুনন্দ বলল, 'পরদিন কুটিরের দরজা খুলে যখন দেখবে মুঙ্গু নেই, তখন যদি আমাদের সন্দেহ করে?'

দরজাই থাকবে না, তো খুলবে কী? মুঙ্গুর কুটির বা দরজার কোনো চিহ্নই থাকবে না।

'সেকি!' আমরা তো অবাক।

'কী করে?'

'মাফিয়া-যাত্রার সময় ডক্টর হাইনের অর্ডারমাফিক কয়েকটা ডিনামাইট স্টিক সঙ্গে নিয়েছিলাম মনে আছে? মনে হয় স্টিকগুলো নষ্ট হয়নি, ফাটবে। পরশু উৎসবের শেষে যখন এরা অচেতন হয়ে ঘুমোবে, তোমরা দুজনে মুঙ্গুর কুটিরের দেয়াল ফুটো করে ফসিলটা সরাবে। নিয়ে আসবে ক্যাম্পে। না, ক্যাম্পে রাখা ঠিক হবে না। কাছাকাছি কোনো গর্তটর্ত আছে, ফসিলটা লুকিয়ে রাখা যেতে পারে?'

'আছে। সামনের ঐ প্রকাণ্ড গাছটার গুঁড়ির ওপর দিকে একটা মস্ত গর্ত আছে। ফসিলটা পুরো ঢুকে যাবে।'

'বেশ। ভালো করে শুকনো পাতা চাপা দিয়ে রাখবে। তারপর আবার ফিরে যাবে মুঙ্গুর কুটিরে। কুটিরের নিচে একটা গর্ত খুঁড়ে তোমরা পয়লা নম্বর ডিনামাইটটা ফিক্স করবে। তারপর আরও দুটো লাগাবে কুটিরের পিছনে যে ঢিবি আছে তার নিচে। ঢিবির ওপর মস্ত একটা গাছ আছে। আমার আশা ডিনামাইট ফাটলে হয়তো উল্টে পড়বে। ব্যস, রাত্তিরে এই অবধি। কারণ বিস্ফোরণ ঘটবে সকালে। স্টিকের পলতেগুলো বেশ লম্বা নেবে আর ঘাস-পাতা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখবে, যাতে কারও চোখে না পড়ে।

'পরদিন আমরা যাব রুগী দেখতে, আমি আর অসিত। সুনন্দ গোপনে গিয়ে ডিনামাইটের পলতেতে আগুন লাগাবে। তারপর চট করে আমাদের কাছে চলে আসবে। পলতের আগুন স্টিকে পৌঁছতে লাগবে বড়জোর চার-পাঁচ মিনিট। তুমি প্রথমে মুঙ্গুর কুটিরের নিচে লাগানো ফিউজে আগুন দেবে, আর তার দশ-পনেরো সেকেন্ড পরে আগুন দিও বাকি দুটো পলতেয়। এরপর কী ঘটবে স্বচক্ষেই দেখতে পাবে।'

সুনন্দ বলল, 'কিন্তু এত কষ্ট করার কারণ তো বুঝছি না? পরশুদিন সবাই মিলে কেটে পড়লেই তো হাঙ্গামা চুকে যায়।

'কারণ শেষ রাতে সমুদ্রযাত্রাটা এড়াতে চাই। যদি মাঝপথে ধরা পড়ি? মুঙ্গুকে আগে থাকতে সরিয়ে রাখলে প্রথম রাতেই পালাতে পারব। অবশ্য ফেরা দু-একদিন পিছিয়ে যাবে। তাতে কিছু এসে যায় না, অনেক নিরাপদে ফিরব।'

ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকছিল না। ডিনামাইট ফাটিয়ে আমাদের কী উপকার হচ্ছে? বললাম, 'যদি ওরা বিস্ফোরণের জন্য আমাদের দায়ী করে?'

'না করবে না।' মামাবাবু বলেন, 'কী শুনলে এতক্ষণ টোটোর গল্প? ভাববে অগ্নিদেবের কাণ্ড। কোনো মানুষ যে এমন ব্যাপার ঘটাতে পারে মাথায়ই আসবে না। বরং লেগে যাবে অগ্নিদেবের ক্রোধ নিবারণের জন্য ঘটা করে পুজো দিত। এই তালেগোলে আমরা পালাব।

উৎসবের রাতে আমি ও সুনন্দ কীভাবে মহামান্য মুঙ্গুকে অপহরণ করলাম, কীভাবে ডিনামাইটগুলি বসালাম, তার বিশদ বিবরণ দেবার দরকার নেই। শুধু বলে রাখি, সে-রাতে ঘুম আমাদের ভাগ্যে জোটেনি এবং কাজ শেষে তাঁবুতে যখন ফিরেছি হাত-পিঠ টনটন করছিল, সারা গায়ে ঘাম।'

পরদিন সকালে চত্বরে গিয়ে দেখি অনেকেই তখনও নাক ডাকাচ্ছে বা ঝিমুচ্ছে। গত রাত্রের ফুর্তির ধকল সামলে উঠতে পারেনি। রুগী দেখা হল। মামাবাবু সর্দারের সঙ্গে খোশগল্প জুড়ে দিলেন। কামাউকে দেখলাম এক কোণে বসে ঢুলছে।

সুনন্দ একটু পরেই এল।

মামাবাবু বাংলায় বললেন, 'কি, সব রেডি?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ এখন কথা বলতে বলতে গাছের আড়ালে সরে যাও। পাথর ছিটকাতে পারে।'

'গুড়ম্-ম্-ম্।'

ঘড়ির ওপর চোখ রেখে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, তবু এত কাছে ডিনামাইট ফাটায় চমকে কান চেপে বসে পড়লাম। মাটি, পাথর, বাঁশের টুকরো ছিটকে পড়ল চারপাশে। দেখলাম মুঙ্গুর কুটির বেমালুম নিশ্চিহ্ন।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব অবস্থা। তারপরই শুরু হল চিৎকার দৌড়াদৌড়ি। সদ্য ঘুমভাঙা লোকগুলো দিশাহারার মতো এদিক সেদিক ছুটল। তাদের বিপর্যস্ত স্নায়ু ধাতস্থ হবার আগেই আবার বিস্ফোরণ দু-দুটো।

ছোট-বড় পাথরের খণ্ড দুমদাম্ করে পড়ল চারপাশে। একটা গাছ মড়মড় শব্দে মুখ থুবড়ে পড়ল। কয়েকজন দেখলাম আহত হয়েছে।

আতঙ্কে সবাই প্রায় উন্মাদ হয়ে গেল। 'মালিমা ইয়া মোটো'—'মালিমা ইয়া মোটো' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল। আমরাও ছুটলাম সঙ্গে—বাবাগো মাগো, বলে চিল্লাতে চিল্লাতে। তারপর টুক করে একসময় কেটে পড়ে ক্যাম্পে ঢুকে পড়লাম। দ্বীপের লোকেরা ছুটে চলল সমুদ্রের তীরে। প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট ধরে শুনলাম সমুদ্রতীর থেকে ভেসে আসছে তুমুল হট্টগোল হইচই। আস্তে আস্তে কোলাহল শান্ত হল।

ঘণ্টাখানেক পরে মামাবাবু বললেন, 'কী ব্যাপার? একটা লোকেরও গলার আওয়াজ পাচ্ছি না যে! চল তো দেখে আসি।'

সমুদ্রতীরে এসে আমরা থ।

বেলাভূমি খাঁ-খাঁ করছে। জনমনিষ্যি নেই। গাঁ একেবারে ফাঁকা নয় অবশ্য। কয়েকজন বুড়োবুড়িকে দেখলাম পাথরের খাঁজে, গাছের তলায় লুকিয়ে বসে। কিন্তু বাকিরা কই!

এবার নজর পড়ল। একটাও নৌকো নেই। ডিঙি ছিপ সব উধাও, দেখি অনেক দূরে সমুদ্রের জলে কালো কালো বিন্দুর মতো সার সার নৌকো, ভেসে চলেছে উপকূলের দিকে।

'যাব্বাবা!' সুনন্দ বলে, 'এ যে গুষ্টিসুদ্ধ হাওয়া! যাক ভালোই হল, এখন থেকে আমরাই দ্বীপের রাজা।'

'হুঁ রাজা বটে! তবে নির্বাসিত।' মামাবাবু মন্তব্য করলেন।

'কেন?'

'বাঃ, সবক'টা নৌকো যে নিয়ে গেছে। দ্বীপ থেকে বেরোবার রাস্তা বন্ধ।'

'তাইতো!' আমরা একটু মুষড়ে পড়ি।

'এরা আর ফিরবে না?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ফিরতে পারে। অগ্নিদেবের ধ্বংসলীলা কতদূর গড়ায় দেখেশুনে হয়তো ফিরবে। তবে কবে ফিরবে কে জানে! যাহোক, সুনন্দ অসিত তোমরা পালা করে সমুদ্রতীরে পাহারা দাও। আমার ধারণা শব্দ উপকূল অবধি পৌঁছেছে। কিংবা দ্বীপের রিফিউজিদের কাছ থেকে খবর পেয়েও উপকূল থেকে খোঁজ নিতে আসতে পারে—ব্যাপারখানা কী!

পরদিন সকালে আরও দুটি ডিনামাইট ফাটানো হল। সেই বিকট বজ্রনিনাদ দ্বীপের চারপাশের জলবেষ্টনীর তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁপুনি জাগিয়ে ছুটে গেল দূর দিগন্তে। মহাভয়ে পশুপাখিরা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পালাতে লাগল। মানুষ তো আগেই পালিয়েছে।

বন্দী মাঝি দুজন আবদুল ও রশিদ মহানন্দে দ্বীপময় চষছে। কতদিন পরে তারা স্বাধীনভাবে ঘুরছে। একটা নতুন খবর দিল তারা—শুধু কিছু বুড়োবুড়ি নয়, কয়েকজন জোয়ান পুরুষও নাকি রয়েছে দ্বীপে। কী কারণে তারা পালাতে পারেনি জানি না। হয়তো ভয় পেয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, অন্যরা তখন ভেগেছে।

মাঝিরা বলল, বনের মধ্যে হঠাৎ দুটো লোক তাদের সামনে পড়ে। অমনি তারা লোক দুটোকে লাঠি বাগিয়ে তাড়া করে। দ্বীপের লোকের ওপর তাদের ভীষণ রাগ। লোক দুটোও তৎক্ষণাৎ ভোঁ দৌড়।—'আবদুলরা খুব বাহাদুরি নিল, ব্যাটারা ভিতুর একশেষ। সঙ্গে তির-ধনুক ছিল, কিন্তু দেখেই পালাল। একবার ধরতে পারলে—'

আমাদের ধারণা ওরা মোটেই ভীতু নয়। আকস্মিক দুর্যোগে বেচারারা ঘাবড়ে গেছে। হয়তো ভেবেছে—বিস্ফোরণের পিছনে ভারতীয় জাদুকরদের কোনো কারসাজি আছে। কারণ কাল থেকে দ্বীপের কোনো লোক আমাদের ধারে কাছে ঘেঁষেনি। দেখলেই লুকিয়ে পড়েছে।

দুপুর বারোটা নাগাদ।

আমি ও সুনন্দ সমুদ্রতীরে রাউন্ড দিচ্ছি। সুনন্দের চোখে দূরবিন। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'লঞ্চ! একটা লঞ্চ আসছে এদিকে!'

'কই দেখি, দেখি।' আমি তার হাত থেকে দূরবিন কেড়ে নিই। 'সত্যি তো লঞ্চ! কয়েকজন মানুষ রয়েছে। ঠিক চেনা যাচ্ছে না তাদের।'

'দে দে।' সুনন্দ কাড়াকাড়ি করে। কিন্তু আমি শক্ত হাতে দূরবিন ধরে থাকি।

একটু একটু করে স্পষ্ট হতে থাকে লঞ্চ। দূরবিনের মধ্য দিয়ে মানুষগুলোকে দেখি।

'সুনন্দ! ডক্টর হাইনে! ঐ তো ওকেলো! আরও তিন-চারজন লোক দেখছি, বোধহয় খালাসি।'

সুনন্দ দূরবিন কেড়ে নিল। তারপর বলে চলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। হাইনে, ওকেলো।'

সুনন্দ তার শার্টটা খুলে প্রাণপণে নাড়তে লাগল। আর গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, 'ও-কে-লো! হাইনে!'

দুম্‌দুম্‌। লঞ্চ থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। অর্থাৎ তারা আমাদের দেখেছে।

'দাঁড়া মামাবাবুকে ডেকে আনি। সুনন্দ পাঁই-পাঁই করে দৌড়ল।

তের

লঞ্চ থামল দ্বীপ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে। তীরের কাছে কাছে জলের মধ্যে অজস্র শিলাস্তূপ, প্রবাল প্রাচীর। লঞ্চের ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা। একটা ছোট বোট জলে নামানো হল। তাতে চাপলেন ডক্টর হাইনে এবং ওকেলো। দুজন খালাসি দাঁড় বাইতে লাগল।

হাইনে লাফ দিয়ে ডাঙায় নেমে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন মামাবাবুকে।

'ওঃ প্রোফেসর ঘোষ। আপনারা জীবিত!'

'কেন সন্দেহ আছে নাকি? কী দেখছেন সামনে? ভূত?' মামাবাবু হাসেন। 'হাত দিয়ে অনুভব করুন খাঁটি রক্তমাংসের শরীর। আরও সাচ্চা প্রমাণ ঐ দেখুন ছায়া পড়েছে মাটিতে।'

'উঃ কী মনোকষ্টে যে দিন কাটাচ্ছিলাম! অনুতাপে পুড়ে যাচ্ছিল বুক। আমারই জন্যে এই দুর্ঘটনা! কেন আপনাদের মাফিয়া আসতে লিখলাম! কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার, কী করে বোঝাই। পাষাণ-ভার নেমে গেল মন থেকে।'

আমি ও সুনন্দ তখন আনন্দে উন্মত্ত ওকেলোর অক্টোপাস-সম ভীমবাহুপাশের আলিঙ্গনে দমবন্ধ হয়ে ছটফট করছি। 'প্লিজ ওকেলো, ভাই এবার ছেড়ে দাও। এবার কিন্তু সত্যি সত্যি অক্কা পাব।'

হাইনে বললেন, 'মাফিয়ায় আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। চারদিন কেটে গেল, দেখাই নেই। আবার খবর পাঠাই, 'কই, চটপট চলে এসো।

'ওকেলো টেলিগ্রাম করল, আপনারা রওনা দিয়েছেন চারদিন আগে! কী ব্যাপার? সঙ্গে সঙ্গে ডার-এস-সালাম ফিরলাম। তারপর জানি, রুফিজি নদীর মোহনা থেকে আপনারা রওনা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে প্রবল ঝড় ওঠে। বুঝলাম ঝড়ে পড়েছেন। মোহনার দুইপাশ, কাছাকাছি সমুদ্রতীর সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। নাঃ, কোনো পাত্তা নেই। জীবিত ফিরে পাবার আশা তো ছেড়েই দিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, মৃত দেহগুলোও যদি পাই। কিন্তু কোনো চিহ্নই পাচ্ছিলাম না। এমনকি ভাঙা নৌকো বা জিনিসপত্রগুলোরও কোনো সন্ধান নেই। ভাগ্যিস এখনও আপনাদের দেশে খবর পাঠাইনি। ঠিক করেছিলাম, আপনাদের কোনো চিহ্ন না পেয়ে, স্থির নিশ্চিত না হয়ে আপনাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে এই মর্মান্তিক সংবাদ পাঠাব না।'

'এত খুঁজেছেন কিন্তু এই দ্বীপটা বাদ দিলেন কেন?' মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

'রাইট, এ-দ্বীপে আমি খুঁজতে আসিনি। এত দূরে এসে পড়বেন ভাবিনি। তবে একেবারে খোঁজ নিইনি বলতে পারেন না। কিছুদিন আগে এই দ্বীপের অধিবাসীরা যখন উপকূলে এসেছিল তাদের জিজ্ঞেস করা হয়—ঝড়ে কোনো নৌকো কি তাদের দ্বীপে গিয়ে পড়েছে?— কোনো ভারতীয় ছিল নৌকোয়? তারা বলল—না।

'তাহলে আমাদের খোঁজ পেলেন কী করে! ডিনামাইটের শব্দে?'

'শব্দ তীরে পৌঁছেছিল, তবে খুব ক্ষীণ। কীসের শব্দ বোঝা মুশকিল। তারপরই হুড়মুড় করে দ্বীপবাসীরা কূলে হাজির হল। তাদের মুখে বিস্ফোরণের কাহিনি শুনে লোকেদের সন্দেহ হল অগ্ন্যুৎপাত নয়, কারণ সবাই জানে ওটা প্রবাল-দ্বীপ। অতএব মানুষের হাত

আছে। বারুদের কাণ্ড। আদিবাসীরা তো বারুদের ব্যবহার জানে না।—কোনো বিদেশি গেছে দ্বীপে? তারা উত্তর দেয়—না।'

'তবে খবর পেলেন কী করে?'

'শুধু একটা ছেলে, এই ষোল-সতের বছর বয়স হবে, খবর দিল তিনজন ভারতীয় নাকি বেশ কিছুদিন ধরে তাদের দ্বীপে রয়েছে। ঝড়ে তাদের নৌকো গিয়ে দ্বীপে পড়েছিল। ছেলেটা লুকিয়ে এসেছিল। বলে গেল—কাউকে বলবেন না আমি বলছি, তাহলে সর্দার কেটে ফেলবে তাকে।'

'টোটো, নিশ্চয় টোটো।' আমি বলে উঠলাম।

'টোটো কে?' হাইনে বললেন।

'একটি ছেলে, আমাদের ভারি ভালোবাসে।'

ডক্টর হাইনে বলেন, 'সব্বাইকে বলা ছিল আপনাদের সন্ধান পেলেই যেন আমাকে খবর দেওয়া হয়। গতরাত্রে ট্রাঙ্ককল পেলাম। সকালে পৌঁছেই লঞ্চ জোগাড় করে বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু আশ্চর্য, ওরা বার বার আপনাদের কথা চেপে গেল কেন?'

'কারণ ওরা চাইছিল না আমরা এখান থেকে চলে যাই।'

'কেন?'

'তাহলে হোমার খপ্পর থেকে ওদের বাঁচাবে কে?'

'মানে?' হাইনে বিভ্রান্ত। 'সে আবার কে?'

মামাবাবু তখন সংক্ষেপে বললেন, 'আমরা কেমন করে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি সেই কাহিনি।'

সমস্ত শুনে হাইনে প্রথমে একচোট হাসলেন হো হো করে, 'বেশ হয়েছে, যেমন হাতুড়ে বদ্যি তেমনি নাছোড়বান্দা পেসেন্ট। আচ্ছা জব্দ। যাক খুব সময়ে এসে পড়েছি, এখন লঞ্চে আরাম করে ফিরে চলুন।'

ওকেলো ফোড়ন কাটল, 'কিন্তু সুনন্দ আসিটের কি এমন নিরামিষ প্রস্থান পছন্দ হবে? অ্যাডভেঞ্চার কই? ওরা বরং আমাদের জালিবোটটা নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিক। আমরা প্রোফেসরকে নিয়ে লঞ্চে চলে যাই।'

আমরা দুজন সরবে আপত্তি জানাই, 'নেভার।'

খেয়াল করলাম মামাবাবু তাঁর গল্পের মধ্যে মুঙ্গু অর্থাৎ ফসিলের বিবরণ বেমালুম চেপে গেলেন।

ডক্টর হাইনে ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তবে আজই ফেরা যাক। আপনাদের জিনিসপত্র নিয়ে আসি? বেড়াতে এসে কী দুর্ভোগ! এতগুলো দিন আপনাদের নষ্ট হল।'

মামাবাবু বললেন, 'দুর্ভোগ কিছুটা হয়েছে বটে, কিন্তু দিনগুলো নষ্ট হয়েছে বলতে পারি না। একেবারে শূন্য হাতে ফিরছি না। অনেক অভিজ্ঞতা পাওয়া গেছে এবং মুঙ্গু। এই আমাদের পুরস্কার!'

'মুঙ্গু কী?'

'দ্বীপের দেবতা। কিন্তু আমাদের কাছে তার পরিচয় মিসিং লিঙ্ক। সরীসৃপ ও পাখির মাঝামাঝি এক জীবের ফসিল। আরকিঅপটেরিক্স-এর পূর্বপুরুষ।'

‘কী বললেন, মিসিং লিঙ্ক? ফসিল এখানে পেয়েছেন? হেঃ হেঃ প্রোফেসর ঘোষ, আমি কাটখোট্টা সায়ান্টিস্ট হতে পারি, কিন্তু অল্পস্বল্প রসিকতা বুঝি।’

‘রসিকতা নয়, সিরিয়াসলি।’

‘অ্যাঁ সত্যি? কোথায়?’

‘ক্যাম্পে রয়েছে।’

‘তবে চলুন, দাঁড়িয়ে কেন? ইস্, এতক্ষণ আজবাজে বকে সময় নষ্ট করছেন।’ উত্তেজিত হাইনে মামাবাবুর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন।

‘আহা অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?’ মামাবাবু কাতর কণ্ঠে জানান, ‘পালাচ্ছে না তো?’

পাতলা কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় একটা বক্সের মধ্যে ফসিলটা শোয়ানো ছিল। কাপড় সরাতেই হাইনে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

কখনো খালি চোখে, কখনো ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়ে দেখছেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য, তন্ময়ভাবে। আমরা দুরুদুরু বক্ষে ভাবছি—মামাবাবুর ধারণা সত্যি হবে তো?

প্রায় আধ ঘণ্টা পর হাইনে লাফিয়ে উঠলেন, ‘প্রোফেসর ঘোষ, কনগ্রাচুলেসন্স! আপনি ঠিক ধরেছেন—মিসিং লিঙ্ক। জীবটা না-পাখি, না-সরীসৃপ। আরকিঅপটেরিক্স-এর চেয়ে পুরনো। এর গায়ে পালক খুব সামান্য, সবে বেরিয়েছে ছোট ছোট। এখন দয়া করে বলুন এই মহামূল্যবান আবিষ্কারটি করলেন কী করে! এ যে সাত রাজার ধন মানিক! প্রাণিবিজ্ঞানীদের স্বপ্ন। এরকম আবিষ্কারের জন্যে আমি একবার কেন, সাত-সাতবার টাইফুনে পড়তে প্রস্তুত আছি।’

মামাবাবু বললেন, ‘সুনন্দ কফি বানাও, জমিয়ে বসা যাক। জানলে ডক্টর হাইনে, এরকম বিচিত্র কাহিনি অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে পড়া যায়। কিন্তু সত্যি সত্যি নিজেদের জীবনে তেমনি এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হব কে জানত?’

‘প্রথমেই বলে রাখি এই ফসিল আবিষ্কারের অনেকখানি কৃতিত্ব ডেয়ারিং বিলের। বিল অবশ্য বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমার তখনই সন্দেহ হয় যে ও যে-বিগ্রহটা দেখেছিল সেটা আসলে একটা ফসিল। তারপর এখানে সেই মূর্তি দেখে ভালো করে নজর করি। তখন না শুনলে হয়তো এই মূর্তি নিয়ে এত মাথাই ঘামাতাম না।’

‘তাছাড়া ফসিলটা কোথায় পাওয়া গেছে ভেবেও কূলকিনারা পেতাম না। পরে টোটোর কথায় আমি নিঃসন্দেহ হই। কারণ এ-দ্বীপে এত পুরনো ফসিল পাওয়া অসম্ভব।’

মামাবাবু মুঙ্গু আবিষ্কার কাহিনি আরম্ভ করেন।

ডক্টর হাইনে ও ওকেলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনেন।

মামাবাবু শেষ করামাত্র হাইনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

‘ওয়ান্ডারফুল! এক নম্বর—অদ্ভুত তীক্ষ্ণ আপনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। বায়নোকুলারের ভিতর দিয়ে অতটুকু সময়ে চিনতে পারলেন কী করে?’

‘না, ঠিক চিনতে তো পারিনি।’

‘ঐ হল। আরকিঅপটেরিক্স ভেবেছিলেন। সেটাই বা ক-জনের মাথায় আসবে। দ্বিতীয় নম্বর—হাইনে মিটমিট করে আমাদের দিকে তাকাতে থাকেন—দুষ্টু বুদ্ধিতেও আপনি বড়

কম যান না। আচ্ছা প্যাঁচ কষে বেচারা কামাউয়ের দেবতাটিকে হাতালেন। সব্বাইকে দেশছাড়া করে ছাড়লেন মশাই।'

সমবেত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সবাই।

হাইনে মহাখুশি হয়ে বলেন, 'প্রোফেসর ঘোষ, 'চালিয়াত মিলার' এবার চিৎপটাং।'

চোদ্দ

স্থির হল কাল আমরা ফিরে যাব। হাইনে দ্বীপটা দেখতে উৎসাহ প্রকাশ করলেন। মামাবাবু তাকে ঘুরিয়ে দেখাবেন।

সকাল থেকে যাবার তোড়জোড় শুরু হল।

দফায় দফায় মালপত্র লঞ্চে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল। মামাবাবু বললেন, 'আমি একদম শেষে যাব স্পেসিমেনের বাক্সগুলি এবং ফসিল নিয়ে। আমরাও একে একে লঞ্চে উঠি। মাঝি চারজন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বাব্বাঃ, জংলিগুলোর খপ্পর থেকে বেঁচে বেরোলাম তাহলে?'

'হাইনের ইচ্ছে ছিল মামাবাবুর সঙ্গে যাবেন। কিন্তু মামাবাবু আপত্তি করলেন, না না আপনি আগে চলে যান। জিনিসগুলো গুছিয়ে রেখে স্পেসিমেন আর ফসিলের জন্য একটু ভালো জায়গা করে রাখবেন। ঢেউয়ের দোলায় কোনো ভারী জিনিস যেন ওদের ঘাড়ে গড়িয়ে না পড়ে।'

লাস্ট ট্রিপ।

লঞ্চ চালক পেড্রো ইঞ্জিন চালু করেছে। ঘোর গর্জনে থরথর করে কাঁপছে লঞ্চ। মামাবাবু এলেই সে লঞ্চ ছেড়ে দেবে।

বালির ওপর শোয়ানো মুঙ্গুকে মামাবাবু আস্তে আস্তে তুলে ধরলেন। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় ফসিলের গায়ে জড়ানো কাপড়ের টুকরোটা হুস্ করে উড়ে গেল। মুহূর্তে ডানা মেলে উধাও হয়ে গেল কাপড়টা। মামাবাবু বোকার মতো চেয়ে রইলেন। লঞ্চে আমরা খুব একচোট হেসে উঠি এই দৃশ্য দেখে।

আমাদের হাসি থামতে না থামতে শুনি এক চিৎকার। মামাবাবু বা খালাসিদের গলা নয়। অপরিচিত কণ্ঠস্বর। এক নয়, একাধিক।

সমুদ্রতীরে মামাবাবুর কাছ থেকে প্রায় শতখানেক গজ দূরে কিছু ঝোপঝাড়ের অন্তরাল থেকে যেন জাদুবলে আবির্ভূত হল দুটি কৃষ্ণকায় মূর্তি। তারা চেঁচিয়ে ওঠে, 'মুঙ্গু মুঙ্গু!' তারস্বরে কী সব জানি বলতে লাগল।

হাইনে আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'কে লোক দুটো? দ্বীপের আদিবাসী? এরা বুঝি পালায়নি? কী বলছে?'

আমরা দেখেই চিনেছি—সেই মানিকজোড়। ত্যাড়া-ব্যাঁকা। ত্যাড়াকে চিনতে না পারলেও ব্যাঁকার ধনুকের মতো পা ভুল হবার নয়। মুঙ্গুকে চুরি করতে দেখলে অন্য কেউ বোধ হয় খুশিই হত। কিন্তু এ দুটো কামাউয়ের চেলা। হয়তো বাধা দেবে।

আমরা বললাম, 'ওরা মুঙ্গুকে চিনতে পেরেছে। এতক্ষণ লুকিয়ে দেখছিল। মুঙ্গুকে ফিরিয়ে দিতে বলছে। শাসাচ্ছে।'

ত্যাড়া-ব্যাঁকা দ্রুতবেগে বালির ওপর দিয়ে দৌড়ে আসতে লাগল।

মামাবাবু মুহূর্তে হৃদয়ঙ্গম করলেন ব্যাপারটা। চটপট ফসিল বগলদাবা করে জলে নামলেন। ঝপঝপ করে ঢেউ ভেঙে এগোতে থাকেন। নৌকো রয়েছে প্রায় এক কোমর জলে।

নৌকোয় পৌঁছে ফসিলটি সাবধানে ভিতরে শুইয়ে তিনি লাফিয়ে উঠলেন। খালাসি দু'জন তৈরি ছিল। ঝপাং করে দাঁড় পড়ল। ঢেউ কেটে তীব্রবেগে বোট গভীর জলে এগিয়ে গেল।

লোক দুটো যখন জলের ধারে হাজির হল নৌকো অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সাঁতার কেটে ধরা যাবে না তাকে।

ওকি! হতবাক আমরা লক্ষ করি লোক দুটো ধনুকে তির বসিয়ে জ্যা টানছে।

উল্কাগতিতে তির ছুটল। অব্যর্থ নিশানা।

আ আ আ! একজন খালাসি কাতর আর্তনাদ করে উঠল। তার বাহুমূলে তির লেগেছে। ফলাটা গেঁথে গেছে মাংসে। তার সঙ্গী একটানে তিরটা তুলে নেয়। জামাটা লাল হয়ে ওঠে তাজা রক্তে। মুঠো আলগা হয়ে তার দাঁড়টা জলে ভেসে গেল।

আবার তির ছুটল।

মামাবাবুরা সাবধান হয়ে গেছেন। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছেন পাটাতনে। চালকহীন নৌকো পাক খেতে খেতে অন্ধের মতো ভেসে চলল।

আমরা প্রাণপণে চিৎকার করছি। ঘুঁসি দেখাচ্ছি—যদি লোকগুলো ভয় পায়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তারা মরিয়া। গুরুদেব কামাউয়ের দেবতাকে কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবে না।

দেখলাম, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, মাছের মতো সাঁতরে চলল নৌকোর দিকে।

'মামাবাবু সাবধান! ওরা আসছে!'

আমাদের চিৎকার তাঁর কানে পৌঁছয়নি কিংবা তিরের ভয়ে খানিকক্ষণ মাথা তুলতে সাহস পায়নি। আমরা প্রাণপণে ডাকতে থাকি।

ত্যাড়া-ব্যাঁকা নৌকোর কাছে এসে পড়েছে—

'বলি ব্যাপারখানা কী?' পেড্রোর বাজখাঁই গলা শোনা গেল। সে এতক্ষণ ইঞ্জিনঘরে ব্যস্ত ছিল। ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দে কিছুই তার কানে ঢোকেনি। চিৎকার চরমে উঠলে শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এসেছে।'

'ওই জংলি দুটো বোট আক্রমণ করেছে। সাঁতরে আসছে। তির ছুঁড়েছে। একজন আহত।'

'তবে রে!' দৈত্যাকার পেড্রো ব্যাঘ্রলম্ফ দিয়ে তার কেবিনে ঢুকল। পরমুহূর্তে ফিরে এল, হাতে বন্দুক।

বন্দুকে টোটা ভরে সে তাক করল।

হাইনে তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরলেন, 'আরে করছ কী? দেখছ না লোকগুলো আর নৌকো এক লাইনে। যদি নৌকোয় গুলি লাগে?'

'ওঃ!' অসহায় রাগে পেড্রো সজোরে পা ঠুকতে লাগল।

মামাবাবু ও খালাসিরা মাথা তুলেছে কিন্তু নৌকো এগোয় না। একটা মাত্র দাঁড়। ক্রমাগত পাশে সরে যেতে লাগল। ত্যাড়া-ব্যাঁকা ধরে ফেলেছে নৌকো। তারা নৌকোর চারপাশে সাঁতরায় আর সুযোগ খোঁজে ওঠবার।

একজন খালাসী দাঁড় তুলে জলের মধ্যের মাথাগুলো লক্ষ্য করে ঘা কষায়। তারা টুপটাপ ডুব দিয়ে সরে যায়। একজন হঠাৎ নৌকোর তলায় মারল ধাক্কা। খালাসিটি হুমড়ি খেয়ে পড়ল নৌকোর কানায়। অমনি তার ঘাড় ধরে মেরেছে টান। ব্যস, দাঁড় সুদ্ধ সে জলের মধ্যে গোঁত্তা খেয়ে পড়ল। অমনি লেগে গেল জাপটা-জাপটি।

মামাবাবু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন জলযুদ্ধ দেখতে। অন্য লোকটা সেই সুযোগে নৌকোয় উঠে পড়ল। মারল তাঁকে এক প্রচণ্ড ধাক্কা। লোকটাকে নৌকোয় ওঠামাত্র চিনেছি—ব্যাঁকা।

মামাবাবু ঠিকরে পড়লেন জলে।

আহত খালাসিটিও বাধা দেবার চেষ্টা করল। তার জামা-প্যান্ট রক্তে লাল। এক হাতে ঘুঁষি চালাল। কিন্তু এক প্রচণ্ড লাথি খেয়ে সে উল্টে পড়ল জলে।

ব্যাঁকা এবার নিচু হয়ে মুঙ্গুকে দুহাতে তুলে ধরল, বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'পেয়েছি।'

গুড়ুম্! হঠাৎ কানের কাছে প্রচণ্ড শব্দ। চমকে দেখি পেড্রোর বন্দুকের নল দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মুখে তার তৃপ্তির হাসি। খতম।

'বাঃ, চমৎকার লক্ষ্যভেদ। টুঁ শব্দটি করার ক্ষমতা হয়নি। ব্যাঁকা উল্টে পড়েছে নৌকোর বাইরে জলে। হাতের ফসিল নৌকোর পাটাতনে সজোরে আছড়ে পড়ল—ঠকাস্।

আমাদের দৃষ্টি মামাবাবুকে অনুসরণ করল। দেখি তিনি আহত খালাসিটিকে নিয়ে কোনো রকমে পাড়ে যাবার চেষ্টা করছেন।

দ্বিতীয় খালাসিটি ফিরে আসছে দেখলাম। নিশ্চয় যুদ্ধে তার জয়লাভ হয়েছে। সে দ্রুত সাঁতার কেটে এসে আহত সঙ্গীকে ধরল লঞ্চ থেকে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। তাদের সাহায্য করতে ছুটল।

'নৌকো আটকাও। মামাবাবুর গলা ভেসে এল।

সত্যি তো, নৌকো কোথায়? এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম নৌকোর কথা, লক্ষ্য করতে গিয়ে শিউরে উঠি।

দূরে নৌকোটা ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে হেলেদুলে ছুটে চলেছে এক সর্বনাশা নিয়তির উদ্দেশে। তার লক্ষ্য 'কুফানি'।

কুফানি? একটা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি। নামটা দ্বীপের লোকের দেওয়া। কুফানি মানে মৃত্যুদ্বার। যমের দক্ষিণ দুয়ারই বটে। কতগুলো ডুবো পাহাড়ের মাঝখানে সমুদ্রের জল লাট্টুর মতো বন বন করে পাক খাচ্ছে। একবার তার ভিতরে গিয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই। স্রোতের টানে পাতালে তলিয়ে যাবার আগেই স্রেফ পাথরে ধাক্কা খেতে খেতেই টুকরো হয়ে যাবে। এ-দ্বীপের ওস্তাদ মাঝিদেরও দেখেছি সভয়ে এড়িয়ে চলত এই ঘূর্ণিকে। সুতরাং আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠি।

'বোট বাঁচাও!' মামাবাবু চিৎকার করে ওঠেন।

অসম্ভব। নৌকো এখন আমাদের নাগালের বাইরে।

দেখতে দেখতে নৌকোর গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হল। তারপর সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল 'কুফানি'র গর্ভে।

দেখলাম চরকির মতো পাক খাচ্ছে নৌকো। তারপরই কোনো শিলাস্তূপের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল।

নৌকোটা অন্ধের মতো ঘুরছে আর বার বার ঢুঁ মারছে কঠিন পাথরে। যেন সেই নিষ্ঠুর ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ক্রমশ সেটা জলের ভিতর ডুবে যেতে লাগল, তারপর হঠাৎ দেখি আর নেই। অদৃশ্য। শুধু কয়েকটা ছোট তক্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।

সবাই হায় হায় করে উঠলাম।

একটা নৌকো গেলে কী এসে যায়? কিন্তু ওর সঙ্গে যে তলিয়ে গেল মামাবাবুর আবিষ্কার। বিজ্ঞানজগতের এক অমূল্যনিধি। কেমব্রিজের মিলারকে শায়েস্তা করার হাতিয়ার। কামাউয়ের মুঙ্গু!

পেড্রো দুম্ করে পা ঠুকে খালাসিদের উদ্দেশে গর্জন ছাড়ে, 'তোরা উজবুক, অকম্মার ধাড়ি! একটু সময় থাকতে ডাকতে পারলি না? পেড্রোর বন্দুকের কথা মনেই পড়ল না হতভাগাদের? দেখতাম ঐ জংলি দুটো কী করে নৌকোর কাছে ঘেঁষে! ওফ্!'

মামাবাবু লঞ্চে উঠে টলতে টলতে এক কোণে বসে পড়লেন। তাঁর সারা গা থেকে জল ঝরছে, চোখে বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টি। যেন সর্বহারা। আমরা স্তব্ধ হয়ে দেখছিলাম। কাছে যেতে বা কথা কইতে সাহস হচ্ছিল না।

আহত খালাসিটিকে লঞ্চে তোলা হল। মামাবাবু একবার বলে ওঠেন, 'অ্যানটিসেপটিক দিয়ে ভালো করে ব্যান্ডেজ করো। ব্যান্ডেজ ওষুধ কোথায় আছে?'

সুনন্দ বলল, 'জানি।' ব্যস, মামাবাবু আবার চুপ মেরে গেলেন।

আহত লোকটিকে ড্রেস করে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি মামাবাবু তখনও একভাবে বসে।

ডক্টর হাইনে গিয়ে মামাবাবুর সামনে দাঁড়ালেন।

'প্রোফেসর ঘোষ এবার উঠুন। পোশাক চেঞ্জ করে নিন। সবই বুঝছি, কিন্তু কী করবেন?' মামাবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

'হুঁ, যা বলেছেন। দুর্ভাগ্য। অতি দুর্ভাগ্য। আমার, আপনার, সারা বিজ্ঞানজগতের। কিন্তু হারানো সূত্রের আর একটি স্পেসিমেন আমি নিশ্চয় জোগাড় করব। তবে খাটতে হবে, সময় লাগবে।'

'কী করে?' ডক্টর হাইনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন।

'কেন? সেই উপত্যকার কথা ভুলে যাচ্ছেন? ডেয়ারিং বিল যার উল্লেখ করেছিল। বিল সেখানে দেখেছিল কালো পাথরের স্তর। সেখানেই ফাটলের মধ্যে কামাউ খুঁজে পেয়েছিল মুঙ্গুকে—এই ফসিল। ডার-এস-সালাম ফিরে গিয়ে আমাদের কাজ হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাইভাসা হ্রদের দিকে যাত্রা করা। বিলের কুটির হ্রদের কাছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব সেই উপত্যকায়। ভালো করে খুঁজে দেখলে এই প্রাণীর আরও দু-একটা ফসিল আবিষ্কার করা হয়তো অসম্ভব হবে না। কী বলেন হের হাইনে?'

হাইনে বললেন, 'রাইট!'

অজেয় রায়
আমাজনের গহনে
ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস

ভূমিকা

দুনিয়ায় কত জায়গাতেই তো যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সাধ থাকলেই সাধ্যে কুলোয় না। তাই মনে মনে বেড়াতে যেতে পারি এমন সুযোগ একমাত্র যাতে পাওয়া যায় তেমন বই পেলে আর কোনো দুঃখ থাকে না। কিন্তু তেমন বই কি সহজে মেলে? যাঁর কল্পনায় ভর করে যাব, তিনি হয়তো যেখানকার কথা বলছেন, সেখানে নিজে তো যান-ই নি, ভালো করে ঠিকমতো খবরাখবরও রাখবার চেষ্টা করেননি। তিনি হয়তো উত্তর মেরুতে পেঙ্গুইন পাখি দেখিয়ে ছাড়বেন আর দক্ষিণ মেরুতে শাদা ভাল্লুক।

তবে সে রকম বই যে বাংলায় মোটে নেই, তা কেউ যেন না বলে। এই তো আমার হাতে রয়েছে 'আমাজনের গহনে'। যেমন তেমন জায়গায় নয়, সেই দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরের অজানা পেরু আর বলিভিয়ার যে সব অঞ্চলে আমাজন নদীর সব ধারাপথ এখনো পুরোপুরি খুঁজে বার করা হয়নি, সেইখানে যদি যেতে হয় তো আমি অজেয় রায়ের সঙ্গেই যাব। উত্তেজনা রোমাঞ্চ গা-ছম্-ছম্ করা ভয় আর রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগের খোরাক তো পুরোপুরি পাবই, সেইসঙ্গে এইটুকু নিশ্চিত মানব যে প্রাকৃতিক ভৌগোলিক যা সব বিবরণ পাচ্ছি, তার মধ্যে এতটুকু ভুল কোথাও নেই। আমাদের ছোটদের মনগুলোকে সমস্ত পৃথিবীতে সার্থকভাবে ঘুরিয়ে আনবার জন্যে এই 'আমাজনের গহনে'র মতো বই আর অজেয় রায়ের মতো লেখকের বড় দরকার।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

টোনি মার্কোর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয় এক বিচিত্র পরিবেশে, আর সেই আলাপই হল এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের সূত্রপাত।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্য। বিশাল আন্ডিজ পর্বতমালার এক অংশ পড়েছে এই পেরুর মধ্যে। আন্ডিজের এক সুউচ্চ মালভূমিতে লুকনো প্রাচীন ইংকা জাতির এক নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিলাম আমরা তিনজন—আমি, সুনন্দ ও মামাবাবু। সঙ্গে ছিল আরও প্রায় জনা কুড়ি নানা দেশীয় ট্যুরিস্ট।

দুর্গম পথ, কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। সরু ফিতের মতো রাস্তা বেয়ে আমাদের ছোট ট্রেন ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে চড়েছে। মাঝখানে উরুবাম্বা নদীর গিরিখাত, তার ওপর লোহার ব্রিজ। ট্রেন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে ট্যুরিস্ট বাসে উঠতে হয়েছে। হাজার ফুট তলায় উদ্দাম পাহাড়ি নদীর আস্ফালন দেখলে মাথা ঘুরে যায়।

এ সমস্তই রীতিমতো রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। কিন্তু এর পর পাহাড়ে চড়ে যা দেখলাম তাতে অভিভূত হয়ে গেলাম সবাই।

দূরে, যত দূরে চোখ যায় শুধু ঢেউয়ের মতো পর্বতমালা। আর সামনে পাহাড়-ঘেরা মালভূমির ওপর এক আশ্চর্য নগরীর কঙ্কালদেহ। উঁচু চওড়া প্রাচীর, বিস্তৃত সোপান শ্রেণি, আর সারি সারি ছাদহীন কক্ষ সব পাথরে তৈরি। এই নির্জন মৃত প্রস্তরপুরী হচ্ছে ইংকাদের হারানো শহর ভিল্‌কাপাম্পা যার আধুনিক নাম মাচুপিচু। আশ্চর্য জাতি এই ইংকারা ; পাহাড়ের ওপর কী অদ্ভুত সব নগর গড়ে তুলেছিল। আমরা কুজকো শহরেও এমনি প্রকাণ্ড চৌকো পাথরের তৈরি প্রাচীন মন্দির প্রাসাদ ইত্যাদি দেখেছি, কিন্তু এমন খাড়া পাহাড়ের ওপর তাদের এই কীর্তি না দেখলে বিশ্বাসই হত না।

'এক্সকিউজ মি।'

মৃদু স্ত্রী-কণ্ঠ শুনে ফিরে দেখি এক প্রৌঢ়া মেমসাহেব। মাথায় পানামা হ্যাট, চোখে সানগ্লাস, হাতে একটি ক্যামেরা, পরনে সোয়েটার ও স্ল্যাকস। ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, 'আপনারা কি এই সাইটটা নিয়ে আলোচনা করছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' আমি জানাই।

'যদি দয়া করে ইংরেজিতে বলেন, আমিও শুনি। আমার পুরনো সভ্যতা সম্বন্ধে খুব আগ্রহ। আমার নাম মিসেস এমিলি জোন্স। বাড়ি ক্যালিফোর্নিয়া। আপনারা বোধহয় ভারতীয়?'

'ঠিক বলেছেন।' আমি উত্তর দিলাম।

'আমার সঙ্গে অনেক ভারতীয়ের চেনা আছে। একবার ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম যে।' মিসেস জোন্স উৎসাহিত হয়ে জানান।

বললাম, 'আমরা ইংরেজিতেই আলোচনা করব। তাহলে আপনিও বুঝতে পারবেন।' একটু গর্বের সঙ্গে সুনন্দর দিকে তাকালাম, যেন বোঝাবার দায়িত্বটা আমারই।'

মিসেস জোন্স প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, এখানে থাকত কারা?'

আমি উত্তর দিলাম, 'ইংকা রাজা ও রাজপরিবারের লোক, পুরোহিত এবং কিছু সৈন্য।'

'অ্যাঁ, তবে যে হোটেল ম্যানেজার আমায় বলল কুজকো ছিল ইংকাদের রাজধানী?' মিসেস জোন্স সানগ্লাস খুলে আমায় কটমট করে দেখলেন। ভাবখানা যেন আমি ভুল বোঝাচ্ছি।

থতমত খেয়ে গেলাম। সুনন্দ মুখ লুকিয়ে হাসে। মামাবাবু উদ্ধার করলেন।—ম্যানেজার ঠিকই বলেছে। স্প্যানিয়ার্ডরা ষোলশো শতাব্দীতে পেরুর ইংকা সাম্রাজ্য এবং রাজধানী কুজকো অধিকার করে নেবার কিছু দিন পরে ইংকা রাজা মংকো সদলবলে পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ওপর এই নগরে আশ্রয় নেয়। তারপর বলা যায় এটাই ছিল তাদের রাজধানী।'

'তারপর বুঝি স্প্যানিয়ার্ডরা মাচুপিচু দখল করে?'

'আজ্ঞে না। স্প্যানিয়ার্ডরা কোনোদিনই মাচুপিচুর সন্ধান পায়নি।'

মিসেস জোন্স বললেন, 'তাহলে ইংকারা এখানে অনেক দিন রাজত্ব করেছিল বুঝি?'

'বেশি দিন নয়। মাত্র চল্লিশ বছর। ইংকারা মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমে এসে স্প্যানিয়ার্ডদের ওপর উৎপাত করত। শেষে একদল স্প্যানিয়ার্ড সৈন্য ইংকাদের দমন করতে পাহাড়ে চড়তে শুরু করল। তখন তরুণ টুপাক-আমারু ইংকাদের রাজা। সে ভয় পেয়ে মাচুপিচু ছেড়ে পাহাড়ের অন্য পাশে পালাতে চেষ্টা করে। স্প্যানিয়ার্ডরা তাদের তাড়া করল। ইংকারা পাহাড় থেকে নেমে বনের মধ্যে হাজির হল। সামনে আমাজনের অববাহিকার গভীর অরণ্য। রাজা আর এগোতে ভরসা পেল না। সন্ধি করার মতলবে সে স্প্যানিয়ার্ডদের হাতে ধরা দিল। কিন্তু স্প্যানিয়ার্ডরা তাদের কুজকোয় নিয়ে গিয়ে স্রেফ গর্দান নিল। ব্যস, ইংকা রাজবংশ ধ্বংস হল। স্প্যানিয়ার্ডরা পাহাড়ের ওপর কী আছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি। ইংকাদের পবিত্র নগরী ভিলকাপাম্পা বহুকালের জন্য হারিয়ে গেল।'

'আই সি! ভেরি ইন্টারেস্টিং।' ভদ্রমহিলা মন্তব্য করলেন।

মিসেস জোন্স দেখেন, প্রশ্ন করেন, আর কেবল বলেন—'ভেরি ইন্টারেস্টিং!'

আমি ও সুনন্দ বিরক্ত হচ্ছিলাম। ভদ্রমহিলা খুটখুট করে চলেছেন আর গুচ্ছের প্রশ্ন করে আমাদের সময় নষ্ট করছেন। আমি একটা মতলব আঁটলাম। বললাম, 'মামাবাবু, চলুন ওই উঁচু পাঁচিলটার ওপর চড়ি। অনেক দূর দেখা যাবে।'

মামাবাবু বুঝলেন। আমাদের দিকে আড়চোখে হেসে বললেন, 'বেশ চলো।'

মিসেস জোন্স ঘাবড়ে গেলেন। এতটা বাড়াবাড়ি করার ইচ্ছে তাঁর নেই। বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ, এবার আমি বরং ফিরে গিয়ে রেস্ট নিই।' অগত্যা তিনি ফিরে চললেন।

আর পরমুহূর্তেই পুরুষকণ্ঠে ইংরেজিতে কথা এল—'যাক, মিসেস জোন্স-এর খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়েছেন।'

ফিরে দেখি এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক। লালচে লম্বা চুল এবং প্রচুর দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে মুখ প্রায় ঢাকা। শুধু একজোড়া হাসিভরা ধূসর চোখ এবং তীক্ষ্ণ নাসিকা দেখা যাচ্ছে। উচ্চতা মাঝারি, তবে খুব জোয়ান বপু। বয়স মনে হল আমার চেয়ে কিছু বেশি। তার কাঁধে ঝুলছে দুটো ক্যামেরা। লোকটি এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করে বলল—'আমার নাম টোনি মার্কো। পেশা ফোটোগ্রাফি। বাড়ি সুইজারল্যান্ড।'

মামাবাবু পরিচয় দিলেন।—'আমি নবগোপাল ঘোষ, এই হচ্ছে আমার ভাগনে সুনন্দ বোস, আর এ সুনন্দের বন্ধু অসিত রায়। আমরা ভারতীয়। আমি লেকচার ট্যুরে এসেছি সাউথ আমেরিকায়। এরা দুজনও সঙ্গে এসেছে। কাজ শেষ, হাতে সময় আছে, তাই দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো ঘুরে দেখছি। তা মিসেস জোন্স-এর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি?'

'আছে। অতি সামান্য। আসার পথে উনি আমাকে মাচুপিচু সম্বন্ধে এমন সাংঘাতিক জেরা শুরু করলেন যে বাধ্য হয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। বললাম—ওঁরা খুব ভালো জানেন এ-বিষয়ে। যাক, এখন মাপ চেয়ে নিচ্ছি। কেমন লাগছে মাচুপিচু? আমি এ-জায়গার বড় ভক্ত। যতবার এদিকে এসেছি জায়গাটি দেখে গেছি?'

আমি বললাম, 'আপনি সাউথ আমেরিকায় আরও এসেছেন নাকি?'

—'হ্যাঁ। দু'বার।'

—'ছবি তুলতে এসেছেন?' সুনন্দ জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। আমাজনের অরণ্যে ঢুকব আদিম উপজাতিদের ছবি তুলতে। গতবারও গিয়েছিলাম এই ধরনের ছবি তুলতে, কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাটে তাড়াতাড়ি ফিরতে হল! তাই আবার এসেছি।'

মার্কোর সঙ্গে মাচুপিচু ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সূর্যমন্দির, রাজপ্রাসাদ, পূজাবেদি। মার্কো ভারি আলাপী ও রসিক ব্যক্তি। জানলাম কুজকোয় আমরা যে হোটেলে উঠেছি মার্কোও সেই হোটেলে আছে। আমরা একসঙ্গে ফিরলাম।

পরদিন সকালবেলা। হোটেলের ঘরে বসে কফি খাচ্ছি, এমন সময় মার্কো এসে জুটলেন, সঙ্গে তাঁর তোলা ছবির অ্যালবাম।

অপূর্ব রঙিন ফোটোগুলি। জঙ্গল, পশু-পাখি এবং ইন্ডিয়ান উপজাতির ছবি। ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পর এদেশকে ভুল করে ইন্ডিয়া, মানে ভারতবর্ষ ভেবেছিলেন। তাই আজও এখানকার আদিবাসীদের লোকে সংক্ষেপে 'ইন্ডিয়ান' বলে ডাকে।

কতরকম উপজাতি। বিচিত্র তাদের সাজপোশাক। ছবি দেখলে বোঝা যায় কী গভীর জঙ্গলে ঢুকেছিল মার্কো। মার্কো বলল, 'সেবার আমার সঙ্গে ছিল ভিক্টর। ভিক্টর আমেরিকান ছাত্র। শখ করে আমার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছিল। এবার ভিক্টর আসতে পারেনি।'

তারপর হঠাৎ মার্কো বলল, 'আচ্ছা, প্রোফেসর ঘোষ আপনার সঙ্গে কি কেনিয়ার ডেয়ারিং বিল-এর পরিচয় আছে?'

মামাবাবু অবাক হয়ে বলেন, 'আছে। কেন?'

মার্কো খুশি হয়ে বলে, 'ঠিক। কাল থেকে ভাবছি কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে। বিলের কাছে আপনার ফোটো দেখেছি। গল্প শুনেছি। ওঃ, আপনি তো বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী।'

প্রশ্ন করলাম, 'আপনার সঙ্গে বিলের আলাপ হল কোথায়? আফ্রিকায়?'

'হুঁ। দুজনে যে অনেক শিকার করেছি।'

'আপনি শিকার করতেন?'

'করতাম বইকি! রীতিমতো প্রফেসনাল হান্টার ছিলাম। কিন্তু পরে হলাম ক্যামেরা

হান্টার। প্রাণী হত্যা আর ভালো লাগল না। তার চেয়ে ফোটো তোলা অনেক ইন্টারেস্টিং। যথেষ্ট সাহসের কাজও বটে। কারণ দূর থেকে গুলি ছোঁড়া নয়। খুব কাছে যেতে হয় ক্যামেরা বাগিয়ে।'

অ্যালবামের পাতা উলটিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ মামাবাবু একটা ছবির ওপর ঝুঁকে পড়ে মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনজন উপজাতীয় লোকের ছবি। একজনের পোশাক বড় মজার। সেই বোধহয় প্রধান। কারণ সে দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে। তার হাতে তিরধনুক, আর মুখে একগাল হাসি। কোমরে হাতে-বোনা সুতির খাটো কাপড়। খালি গায়ে নানারকম নক্‌শা। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার মাথায় একটি শোলার গোল টুপি এবং গলায় একখানা গিঁট দিয়ে বাঁধা নেকটাই। তার দুই সঙ্গীদের গায়ে অবশ্য কোনো আধুনিক সাজসজ্জা নেই।

মামাবাবু দেরাজ থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে কাঁচের মধ্যে দিয়ে ফোটোখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। মার্কো হেসে বলল, 'এখানকার গহন বনের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক সময় এমনি অদ্ভুত পোশাক দেখা যায়। যারা এদের কাছে রবার বা পশুচর্ম কিনতে যায়, তাদের কাছ থেকে আদায় করে। কিংবা কোনো পর্যটকের কাছ থেকে পায়। আমি দেখেছি স্রেফ নেংটির ওপর দামি একখানা টেরিলিনের শার্ট চড়িয়েছে কেউ কেউ।'

মামাবাবু মুখ তুলে বললেন, 'এ ছবি কোথায় তুলেছেন?'

'আমি তুলিনি। তুলেছে ভিক্টর।'

'কোথায়?'

'হিথ নদীর তীরে। আমি কয়েকদিন পায়ের ব্যথায় কাবু হয়ে তাঁবুতে শুয়েছিলাম। ভিক্টর সেই সময় একা নৌকো নিয়ে অনেক ঘুরে আসে।'

'মাদ্রে দ্য দিওস নদীর সঙ্গম থেকে ও জায়গাটা কত দূর?' মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

'প্রায় একশো মাইল। এরা হিথ নদীর পাশেই থাকে। ইচোকাস ইন্ডিয়ান। এই লোকটা ওদের সর্দার।'

'আপনি কি ওই অঞ্চলে যাবেন এবার?'

'তাই তো ইচ্ছে আছে।'

ছবি দেখা শেষ হল। মার্কো উঠল, ঘরে যাবে। মামাবাবু বললেন, 'মিঃ মার্কো, অরণ্য-যাত্রায় আমরা যদি আপনার সঙ্গী হই তাতে রাজি আছেন?'

সে কি! মামাবাবুর এ আবার কী উদ্ভট খেয়াল! কী ভয়ঙ্কর জঙ্গল ছবিতে দেখেই বুঝেছি। সুনন্দর দিকে চাইলাম। সেও স্তম্ভিত। মার্কো আশ্চর্য হয়ে মামাবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল।

মামাবাবু বললেন, 'আমার খুব ইচ্ছে একবার আমাজনের অরণ্যে ঢুকব। ঠিক একা যেতে ভরসা হচ্ছিল না। অবশ্য আপনার যদি অসুবিধা না হয়।'

মার্কো বলল, 'আমার আর কী অসুবিধা! একা যাচ্ছিলাম, আপনার মতো সঙ্গী পেলে সুবিধেই হবে। কিন্তু বড় কষ্টের জার্নি এবং খুব বিপজ্জনক বটে।'

মামাবাবু হাসলেন। 'আমাজন অববাহিকার অরণ্য যে কী বস্তু আমি তা জানি মিঃ মার্কো।'

মার্কো উৎফুল্লভাবে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বিলের কাছে আপনাদের অনেক অভিযানের গল্প শুনেছি। উত্তম। চলুন তবে। ভাবছিলাম একা একা একঘেয়ে লাগবে, ভগবান সঙ্গী জুটিয়ে দিলেন। আপনারা তৈরি হোন। তিন-চার দিনের মধ্যেই আমি যাত্রা করব।'

মার্কো বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ও সুনন্দ উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম—'মামাবাবু, কী ব্যাপার?'

মামাবাবু শান্ত কণ্ঠে বললেন—'ব্যাপার আছে। বলছি।'

বিছানার ওপর আরাম করে পা গুটিয়ে বসে মামাবাবু বললেন—'ডক্টর সত্যনাথ সর্বজ্ঞর নাম শুনেছ?'

বললাম, 'শুনেছি। বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী। বাঙালি। মাস আষ্টেক আগে পেরু না বলিভিয়ার জঙ্গলে অভিযানে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। কাগজে লিখেছিল, খুব সম্ভব জলে ডুবে মৃত্যু। কিন্তু মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।'

মামাবাবু বললেন, 'অনেক কিছুই পাওয়া যায়নি। রীতিমতো রহস্যময় এই অন্তর্ধান। নদীর তীরে তাঁর তাঁবু এবং কয়েকটা আজেবাজে জিনিস পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁর গবেষণা-সংক্রান্ত কাগজপত্র, বাক্স-ভরা স্পেসিমেন-সংগ্রহ এবং আরও অনেক নিজস্ব জিনিসের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ডক্টর সর্বজ্ঞ তখন একটি মাত্র উপজাতীয় লোক সঙ্গে করে পেরুর লা-মন্টানা অঞ্চলে আদিম উপজাতিদের গ্রামে গ্রামে ভেষজ উদ্ভিদের সন্ধান করছিলেন। লা-মন্টানা হচ্ছে আন্ডিজ পর্বতের পূর্বে আমাজন অববাহিকার অরণ্য

যেখানে শুরু হয়েছে তার নাম। এই অঞ্চলে অজস্র নদী, পাহাড় এবং গভীর বনভূমি। সভ্য জগতের খুব কম লোকই সেখানে গিয়েছে। মন্টানার বেশিরভাগ অংশ আজও অজানা। ঘুরতে ঘুরতে বৈজ্ঞানিক হঠাৎ নিখোঁজ হন। তাঁর সঙ্গের লোকটিরও পাত্তা পাওয়া যায়নি। সমস্ত ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে।'

'ওঁর খোঁজ করা হয়েছিল ভালো করে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'পেরু সরকারের উদ্যোগে এক অনুসন্ধানী দল দুর্ঘটনার জায়গায় গিয়ে কিছু খোঁজাখুঁজি করে। তারপর রিপোর্ট দেয়, সম্ভবত নদীতে ডুবে মৃত্যু ঘটেছে। জিনিসপত্র ভেঙে গেছে। দেহ কুমিরে খেয়ে ফেলেছে।'

'অর্থাৎ তুমি সর্বজ্ঞর সন্ধানে আমাজনের বনে যেতে চাও?' সুনন্দ গম্ভীর মুখে বলল।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সার্চ-পার্টি কোনো খোঁজ পায়নি, তুমি কি পাবে?'

'এতদিন সেই ভেবেই কিছু করিনি।' বললেন মামাবাবু। কিন্তু ওই ফোটোটা দেখে আমার আশা জেগেছে।'

'কোন ফোটো?'

'যে ফোটোটায় দেখলে একজন জংলি ইন্ডিয়ান হ্যাট আর টাই পরে রয়েছে, ওইটে।'

'তার মানে?'

মামাবাবু বলতে লাগলেন, 'অদ্ভুত লোক এই সত্যনাথ সর্বজ্ঞ। অতি প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক, কিন্তু একেবারে ভবঘুরে টাইপ। কোথাও স্থির হয়ে বেশিদিন বাস করা ওঁর ধাতে ছিল না। একা একা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন নতুন উদ্ভিদের খোঁজে। দুনিয়ায় তাঁর একমাত্র বন্ধন একটিমাত্র মেয়ে রূপা। রূপা কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে। বেচারা খামখেয়ালি বাবার জন্য সর্বদাই উদ্বিগ্ন। সর্বজ্ঞ এর আগেও এক্সপিডিশনে গিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েছেন। সাময়িকভাবে নিখোঁজ হয়েছেন কয়েকবার। তবে এবারে আট মাস হয়ে গেল। তবু রূপার ধারণা, ওর বাবা ঠিক বেঁচে আছেন। হয়তো কোথাও গিয়ে আটকে পড়েছেন, তাই ফিরে আসতে পারছেন না।

'রূপা দেবীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বুঝি?' সুনন্দ প্রশ্ন করল।

'হয়েছিল। রূপা নিজেই এসেছিল আমার কাছে। সর্বজ্ঞর সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ ছিল। সেই সূত্রে রূপাকেও চিনি। আমি এদেশে যাচ্ছি শুনে রূপা দেখা করতে আসে। আমাকে ভালো করে ওর বাবার খোঁজ করতে বলে। নিখোঁজ হবার কিছুদিন আগে ডক্টর সর্বজ্ঞ তাঁর মেয়েকে একটা চিঠি লেখেন। তাতে আভাস দেন যে, তিনি শিগগিরি এক দুরূহ অভিযানে যাবেন কোনো এক গোপন জায়গায়। চিঠির ভাষা আমার মনে আছে—'এক অজ্ঞাত জায়গায় আবিষ্কারের সন্ধানে যাচ্ছি। কিছুদিন আমার খবর না পেলে চিন্তা কোরো না।' তাই রূপা আজও আশা ছাড়েনি।

'কিন্তু ওই ফোটোতে আপনি কী ক্লু পেলেন?' আমি অধৈর্যভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

'ক্লু-টা হল, ওই হ্যাট এবং টাই। ওগুলো খুব সম্ভব ডক্টর সর্বজ্ঞর। খেয়ালি মানুষ ডক্টর সর্বজ্ঞর আর এক খেয়াল ছিল সর্বদা ওইরকম হ্যাট আর ওই রকম লালের ওপর নীল ডোরা-কাটা টাই ব্যবহার করা। আমি রূপার কাছ থেকে ডঃ সর্বজ্ঞর একটা ফোটো এনেছি। সেটা তিনি মেয়েকে চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। তাতেও ঠিক ওই রকম হ্যাট ও টাই পরা।

শুধু তাই না, আমি বলব, ঠিক ওই হ্যাটটাই তিনি পরে রয়েছেন। কারণ ফোটোতে ডক্টর সর্বজ্ঞর টুপির সামনের দিকে একটা খাঁজকাটা ভাঙা চিহ্ন রয়েছে। আমি মিলিয়ে দেখলাম সর্দারের টুপিতেও হুবহু ওই একই রকম খাঁজ রয়েছে। ওই টুপি আর টাই ইন্ডিয়ান সর্দার পেল কী করে, তাই আমি জানতে চাই।'

'খুব সোজা।' সুনন্দ বলল। 'ডক্টর সর্বজ্ঞ সর্দারকে ওগুলো দিয়েছিলেন।'

'কিন্তু দেবে কীভাবে? সেটাই তো রহস্য। ডক্টর সর্বজ্ঞ যেখানে নিখোঁজ হন সেখান থেকে ওই সর্দারের বাস অন্তত ষাট-সত্তর মাইল দূরে।'

সুনন্দ বলল; 'হতে পারে ডক্টর সর্বজ্ঞ নিরুদ্দেশ হবার আগে ওই জায়গায় গিয়েছিলেন। তখন সর্দার ওই হ্যাট আর টাই আদায় করে।

'কিন্তু সেখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে,' মামাবাবু বলেন, 'কারণ ডক্টর সর্বজ্ঞ মেয়েকে তাঁর শেষ চিঠিতে লেখেন—'অনেক দিন কোনো ফোটো পাঠাইনি বলে রাগ করেছিস। কী করব, ছিল না যে! এবারে তাই পাঠালাম। দেখ তোর বাবা কেমন দারুণ পোজ দিয়েছে। অর্থাৎ মনে হয় ফোটোটা তোলা হয়েছিল চিঠিটা লেখার অল্প দিন আগে। চিঠিতে পেরুতে এক ছোট্ট শহর পুয়ার্টো ম্যালডোনাডোর পোস্টমার্ক। ওই শহরে ডক্টর সর্বজ্ঞ তাঁর শেষযাত্রার আগে কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন...যাহোক, ওই হ্যাট-পরা সর্দারের দেখা পেলে এসব ধাঁধা পরিষ্কার হবে। জানা যাবে, কবে এবং কীভাবে ও হ্যাট-টাই পেয়েছে। আর তারপর হয়তো জানব ডক্টর সর্বজ্ঞর ভাগ্যে কী ঘটেছে।'

শেষ চেষ্টা করলাম, 'আচ্ছা মামাবাবু, এই ফোটোর ক্লু যদি অনুসন্ধান কমিটিকে জানিয়ে দেন?'

মাথা নাড়লেন মামাবাবু।—'কোনো লাভ নেই। একজন বিদেশির জন্যে ওরা খুব গা দিয়ে খুঁজেছে বলে মনে হয় না। তাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করে দেখেছি। বিরক্ত হয়। তাদের ধারণা, বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ আমাজনের বনে একা একা যখন ঘুরতে গেছেন তখন এমন দুর্ঘটনা তো হতেই পারে। ওই সরকারি কর্মচারীদের মতে, ডক্টর সর্বজ্ঞ একজন ছিটগ্রস্ত ব্যক্তি। নিখোঁজ হয়ে তাদের অযথা হয়রানি করেছেন। আমার বিশ্বাস, ক্লু-টা পেলে ওরা তো কিছু চেষ্টা করবেই না, উল্টে আমরা ওখানে যেতে চাইলে ভাববে ওদের ওপর টেক্কা দিচ্ছি। ফলে তারা বাধাও দিতে পারে। তার চেয়ে না জানানোই ভালো। লোকে জানুক বেড়াতে যাচ্ছি, ছবি তুলতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, মার্কোকেও আমাদের মতলব এখন না বলাই উচিত। কী জানি যদি বেঁকে বসে?

দুই

কুজকো থেকে আমরা উড়োজাহাজে চেপে মাদ্রে দে দিওস নদীর পারে ছোট্ট শহর পুয়ার্টো ম্যালডোনাডোয় উপস্থিত হলাম। এখান থেকে লঞ্চে রওনা হব হিথ নদী দিয়ে।

মামাবাবু ও মার্কো ডক্টর কেন্ট নামে এক ব্যক্তির খোঁজ করতে শুরু করলেন। প্রকৃতপক্ষে এই কেন্টের সন্ধানেই আমাদের ম্যালডোনাডোয় আসা।

মামাবাবু বললেন, 'সার্চ-পার্টির রিপোর্টে আছে, ডক্টর সর্বজ্ঞ তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রার আগে এই লোকটির বাড়িতে কয়েক দিন থাকেন। আমি জানতে চাই সর্বজ্ঞ ডাক্তারকে

কোনো গোপন জায়গায় যাত্রা সম্বন্ধে কিছু আভাস দিয়েছিলেন কিনা! মনে হয় দেননি। কারণ অনুসন্ধানী দল ডাক্তারের কাছে খোঁজখবর করেছিল। কিছু জানতে পারেনি। দেখা যাক চেষ্টা করে।'

মার্কোর ইচ্ছে ডাক্তারের কাছে একজন ভালো মাঝির খোঁজ করবেন। সেই হবে গাইড। অচেনা গাইড নেওয়া বিপজ্জনক। এখানকার স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানরা খুব ভালো মাঝি, কিন্তু খামখেয়ালি। হঠাৎ তাদের মেজাজ বিগড়ে গেলে যাত্রীদের ফেলে পালাবে। সভ্য জগৎ থেকে বহু দূরে অজানা গভীর বনের মধ্যে তখন এক অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়। গতবার মার্কো একবার এমনি বিপদে পড়েছিল। তাই ডাক্তারকে চাই।

মার্কো শুনেছে বিচিত্র লোক এই ডাক্তার। ডাক্তারি বিদ্যায় রীতিমতো সুনাম আছে, কিন্তু প্র্যাকটিসে মন নেই। অন্তত পয়সা রোজগারে উৎসাহ নেই। এই অখ্যাত জায়গায় পড়ে আছেন, প্রায়ই বনের ভিতর ঘুরে বেড়ান আর রেড ইন্ডিয়ানদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করেন। এ অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসীরা নাকি ডাক্তারকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে। কেন্ট-এর নেশা নাকি অর্কিড ফুল। তিনি একজন জগদ্বিখ্যাত অর্কিড-বিশেষজ্ঞ।

একেবারে শহরের সীমানায় ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তারের বাড়ির গেটের সামনে এসেছি, এমন সময় এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক সাইকেল চেপে বাইরে থেকে এসে আমাদের দেখে নেমে পড়লেন। বেঁটেখাটো গোলগাল লোকটি, মাথাজোড়া টাক। মার্কো বলল, 'এটা কি ডাক্তার কেন্টের বাড়ি? আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

লোকটি কৌতূহলী চোখে চেয়ে বলল, 'আমিই জর্জ কেন্ট। আপনারা?'

মার্কো আমাদের পরিচয় দিল। ডাক্তার বললেন, 'চলুন ভিতরে।'

প্রকাণ্ড কম্পাউন্ডওলা কাঠের তৈরি বাংলো ধরনের বাড়ি। চারপাশে বাগান, তাতে নানান ফল-ফুলের গাছ। সামনে বারান্দার ছাদে বুগেনভিলিয়ার লতা টকটকে লাল ফুলে ছেয়ে আছে। বারান্দায় উঠে বেতের চেয়ারে বসলাম। মার্কো তার আগমনের উদ্দেশ্য বলল। কেন্ট বললেন—'আচ্ছা সে হবে। আপাতত কফি হোক। মেরি! মেরি!'

ডাক্তারের স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। ভারি স্নিগ্ধ চেহারা মহিলার। আলাপের পর হেসে বললেন, 'আপনাদের ডাক্তার যে এমন খ্যাতিমান ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন জানতাম না। দেশবিদেশ থেকে সম্মানিত ভদ্রলোকরা সব আসছেন তাঁর কাছে। যাক, ভালো ভালো। আমি তো ভাবি ও বুনো হয়ে গেছে।'

একটু পরে এল কফি, স্যান্ডউইচ আর কাজুবাদাম ভাজা।

ডাক্তারের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে উঠেছেন কোথায়?'

বললাম, 'ইচ্ছে আছে কোনো হোটেলে থাকব।'

'আরে ছি! ছি! এখানকার হোটেল অতি জঘন্য। আমাদের বাড়িতে থাকুন। আমরা খুব খুশি হব। ডাক্তারের ভদ্রতা-জ্ঞান নেই। এখনও পর্যন্ত এ-বিষয়ে কোনো খোঁজই নেয়নি।'

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললেন, 'দেখ মেরি, ওঁরা যে এখানে থাকবেন সে ডিসিশন আমি অলরেডি নিয়ে ফেলেছি। শুধু সুযোগ বুঝে কথাটা পাড়বার অপেক্ষায় ছিলাম।' ডাক্তার ও মেরি কখনও ইংরেজি কখনও স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিলেন। মেরি জাতিতে ইংরেজ। ডাক্তার স্কচ। তাঁরা কয়েক পুরুষ এ দেশে আছেন।

এদেশের বেশিরভাগ লোক স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে, কারণ স্প্যানিয়ার্ডরাই প্রথম

পেরুতে বসতি স্থাপন করে। এখানে আসার আগে মামাবাবুর নির্দেশে আমরা কিছু স্প্যানিশ ভাষায় তালিম নিয়েছিলাম, আর অভিযানে বেরুবার আগে মার্কো শিখিয়েছেন, এখানকার অধিবাসীদের প্রচলিত ভাষা টৌপি, সামান্য কাজ চালাবার মতো। ফলে কথাবার্তা আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছিলাম।

কথার ফাঁকে ডাক্তার মামাবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা ইন্ডিয়ার কোন অংশের লোক?'

'ইন্ডিয়া' এবং 'ক্যালকাটা' শুনে একটু থমকে গিয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! আর একজন ক্যালকাটার লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। সায়ান্টিস্ট সর্বজ্ঞ। চেনেন তাঁকে?'

মামাবাবুর চোখ চকচক করে উঠল। বললেন, 'চিনি, তবে সামান্য। আচ্ছা, সর্বজ্ঞর নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারটা কেমন রহস্যজনক নয় কি? না পাওয়া গেল দেহ, না পাওয়া গেল তাঁর জিনিসপত্র। এমনও হতে পারে বৈজ্ঞানিক কোথাও আটকে পড়েছেন। বন্দী বা অসুস্থ হয়ে আছেন। ফিরে আসতে পারছেন না।'

'হুঁ। হতে পারে।' ডাক্তার মাথা নাড়েন। 'আমি একবার নিরুদ্দেশ হয়েছিলাম মেক্সিকোয়। মেরি তিন মাস আমার কোনো খবর পায়নি।'

'আচ্ছা, সর্বজ্ঞ ম্যালডোনাডো ছাড়বার আগে উনি কোথায় যাচ্ছেন সে-বিষয়ে আপনাকে কিছু বলেছিলেন?'

'না।'

সংক্ষিপ্ত উত্তর। মনে হল যে এ-বিষয়ে আলোচনা করতে ডাক্তার অনিচ্ছুক। হয়তো তাঁকে অনেক জেরা করা হয়েছে, তাই এ-ব্যাপারে তাঁর বিরক্তি জন্মেছে।

মার্কো ছবি তুলতে লেগে গেল। রক্তবর্ণ বুগেনভিলিয়ার ঝাড় ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে মেরির ফোটো তুলল। মামাবাবু বললেন, 'একটা কথা মনে পড়ল। আমি সাউথ আমেরিকায় আসার আগে বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। দুর্ঘটনার কিছুদিন আগে সর্বজ্ঞ মেয়েকে তাঁর একখানা ফোটো পাঠিয়েছিলেন। ওঁর মেয়ে বলেছে, ফোটোতে সর্বজ্ঞ মাথায় শোলার হ্যাট ও লাল নেকটাই পরেছিলেন। গায়ে নেভি-ব্লু শার্ট। ফোটোটা মেয়ে হারিয়ে ফেলেছে। ওই ফোটোর আরও কপি সে চায়। আমায় জোগাড় করে নিয়ে যেতে বলেছে। একমাত্র মেয়ে। বড্ড ভেঙে পড়েছে। আচ্ছা এখানে সর্বজ্ঞ কি কোনো ফোটো তুলেছিলেন? তুললে, কে তুলেছেন সেটা জানেন?'

ডাক্তার বলল, 'আমি স্বয়ং ওই ফোটো তুলি। দেব আপনাকে এক কপি। ফেরার সময় নিয়ে যাবেন।'

মেরি আক্ষেপের সুরে বললেন, 'বৈজ্ঞানিক তাঁর মেয়েকে খুব ভালোবাসতেন, জানি। কী চমৎকার লোক ছিলেন! অত বড় পণ্ডিত, অথচ কোনো অহঙ্কার নেই। ইস্, কী কাণ্ড যে হয়ে গেল!'

আমি সুনন্দর দিকে অর্থপূর্ণভাবে চাইলাম। অর্থাৎ মামাবাবুর অনুমান ঠিক। যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ তার চেয়ে অনেক দূরে গিয়েছিলেন। নইলে তাঁর টুপি আর টাই ওই সর্দার পেল কী করে?

মামাবাবু নির্বিকার। বললেন, 'মিসেস কেন্ট, ফেরার সময় দয়া করে ছবিটার কথা আমায় মনে করিয়ে দেবেন। নইলে লজ্জায় পড়ব রূপার কাছে।'

কথায় কথায় মামাবাবু ডাক্তারকে বললেন, 'শুনেছি আপনি রেড-ইন্ডিয়ান উপজাতিদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদের চিকিৎসা করেন?'

ডাক্তার বললেন, 'হ্যাঁ করি। কারণ সরল আদিবাসীদের আমি ভালোবাসি। আর আমি মনে করি, এটা আমার কর্তব্য। আমার শ্বেতাঙ্গ পূর্বপুরুষরা এখানকার আদিবাসীদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছে। তাদের ক্রীতদাস করে, পশুর মতো ব্যবহার করেছে। আমি সেই কলঙ্ক মুছে ফেলার চেষ্টা করছি। অনেকে আমায় পাগল বলে। বলুকগে। আমি নিজেকে কী ভাবি জানেন? ইংকা। আমার দেহে ইংকা-রক্ত আছে। আমার ঠাকুরমা ছিলেন ইংকা-রমণী। অমন সুসভ্য জাতির লোক হওয়া আমি গৌরবের বিষয় মনে করি। স্প্যানিয়ার্ডরা অস্ত্রের জোরে এক বিরাট সভ্যতাকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। ইংকাদের বহু জ্ঞানভাণ্ডার হারিয়ে গেল। শ্বেতাঙ্গরা যদি সেসব বিদ্যা শিখে নিত তবে মানুষের অনেক অনেক উপকারে লাগত।'

ডাক্তার বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ অতিথিদের সামনে বক্তৃতা দেবার লজ্জায় চুপ মেরে গেলেন। আমাদের কিন্তু এই আদর্শবাদী মানুষটির ওপর বড় শ্রদ্ধা জাগল।

সেদিন বিকেলে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল।

মার্কো আর মামাবাবু শহরে গেছেন। সুনন্দ একটা বইয়ে ডুব দিয়েছে। ডাক্তারকে দেখছি না। মিসেস কেন্ট রান্নাঘরে ব্যস্ত। আমি বেরিয়ে পড়লাম বাগানটা একটু ঘুরে দেখতে।

অনেকটা জায়গা জুড়ে ডাক্তার কেন্টের বাগান। ফুল-ফলের গাছগুলি কিছু চেনা, কিছু অচেনা। কয়েকজন দেশি মালি কাজ করছিল বাগানে। একধারে পরপর কয়েকটা তারের জালে তৈরি ঘর। জালে লতা উঠে ছেয়ে গেছে। কোনো ঘরে বাঁশের কঞ্চির বেড়ায় তৈরি দেওয়াল বা ছাদ। কাছে গিয়ে বুঝলাম গ্রিন-হাউস। যার মধ্যে আলো, বাতাস, উত্তাপকে নিয়ন্ত্রণ করে নানারকম ফুলগাছ রাখা হয়। প্রথম ঘরের দরজা একটু ফাঁক। ভিতরে উঁকি দিলাম। সবই অর্কিড গাছ। ছাদ থেকে তারে বাঁধা কাঠ বা শুকনো গাছের ডাল আঁকড়ে ঝুলছে নানা জাতের অর্কিড। কয়েকটা গাছসুদ্ধ টব ঝোলানো রয়েছে ছাদ থেকে। শুনেছি এই ধরনের বায়বীয় অর্কিড বৃষ্টির জল, রোদ, হাওয়া থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। মাটিতে টবে কিছু গাছ রয়েছে। ফুল ফুটেছে কোনোটায়। ভালো করে দেখতে ভিতরে ঢুকলাম।

পিছনে পায়ের শব্দ। ফিরে দেখি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তার কেন্ট। থমথমে মুখ। রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কী করছেন এখানে?'

উত্তর দিলাম, 'এই দেখছিলাম, কত রকম অর্কিড?'

রীতিমতো আদেশের সুরে ডাক্তার বললেন, 'এখন যান। পরে আমি দেখিয়ে দেব।'

অপ্রস্তুত হয়ে বাংলোয় ফিরলাম। এ-ঘটনা বললাম না কাউকে।

তিন

পরদিন সকালে দেখলাম ডাক্তারের আবার দিব্যি হাসিখুশি মেজাজ। আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, 'চলুন অর্কিড দেখবেন।'

গ্রিন-হাউসের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'অর্কিড আমার নেশা। মেরি রাগ করে। বলে, বৃথা সময় আর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আবার নতুন কোনো ফুল ফুটলে যখন ডেকে দেখাই, তখন রাগ ভুলে যায়। অর্কিড গাছে বড় যত্ন লাগে। ফুল ফুটতে অনেক সময় নেয়। সাত-আট বছরও লেগে যায়। তবে হ্যাঁ, একবার ফুটলে সে-ফুল থাকে অনেক দিন। দু-তিন সপ্তাহ থেকে তিন-চার মাসও কোনো কোনো ফুল গাছে তাজা থাকে। তখন মনে হয় পরিশ্রম সার্থক।'

সুনন্দ প্রশ্ন করল, 'অর্কিড ফুলের বিশেষত্ব কী?'

মামাবাবু বললেন, 'প্রধানত ফুলের গড়ন। ফুলের একটি পাপড়ির গড়ন অন্য ফুলের চেয়ে আলাদা হয়। একটু বড় হয় সাধারণত।'

ডাক্তার বললেন, 'আমি সাধারণত দক্ষিণ আমেরিকার ট্রপিকাল অঞ্চলে যত রকম অর্কিড পাওয়া যায় তাই জোগাড় করি। অবশ্য অন্য দেশের অর্কিডও আছে।'

একটা গ্রিন-হাউসের ভিতর ঢুকে ডাক্তার ঘোষণা করলেন, 'এর মধ্যে আছে প্রধানত ক্যাটলিয়া প্রজাতীয় অর্কিড। এদের আদি বাস মধ্য আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর অংশে।'

ডাক্তার গাছগুলির কখনও ল্যাটিন নাম কখনও বা চলতি নাম বলতে লাগলেন।—'ওই ছোট ছোট লাল ফুলগুলি মিলটোনিয়া। ওই যে সাদা ফুল, মধ্যিখানে গোলাপি হলুদ মেশানো একটি পাপড়ি, ওটি ব্রাজিলের ক্যাটলিয়া ট্রিয়ানাল।'

ওইসব নাম-গোত্র আমার মাথায় ঢুকছিল না।

ক্রমে গ্রিন-হাউস দেখা শেষ হল। আমার মনটা খচখচ করছে। কাল একটা অর্কিড দেখেছিলাম, সেটা আজ আর নেই। কোথায় গেল? দেখছি না তো! খোলা বাগানেও কিছু অর্কিড গাছ রয়েছে। গাছের ডালে ঝুলছে, মাটিতে জন্মেছে। একটা লতা দেখিয়ে ডাক্তার বললেন, 'এই হচ্ছে ভ্যানিলা লতা। এও একরকম অর্কিড।'

ঝাঁকড়া লতা একটা বড় গাছে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। তাতে শিমের মতো ফল। চ্যাটাল সবুজ পাতা, আর হালকা সবুজ ফুল।

'যে ভ্যানিলা আইসক্রিম বা চকোলেটে দেয়?' আমি আশ্চর্য হয়ে বলি।

ডাক্তার বললেন, 'হ্যাঁ। ওই ফলের বীচি থেকে ভ্যানিলার গন্ধ তৈরি হয়। ভ্যানিলা কিন্তু আধুনিক মানুষের আবিষ্কার নয়, পাঁচশো বছর আগে মেক্সিকোর আজটেক্‌রা চকোলেটে ভ্যানিলা মিশিয়ে খেত।'

একটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ডাক্তার বললেন, 'এই অর্কিড আমার সৃষ্টি। চার রকম অর্কিডের মিশ্রণে এটা তৈরি। এরকম আরও ক'টা নতুন ফুল আমি তৈরি করতে পেরেছি।'

একটু গর্বের সঙ্গে বললেন ডাক্তার, 'তাছাড়া পাঁচ রকম নতুন অর্কিড আমি আবিষ্কার করেছি, কুড়ি বছর দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়ে।'

'কুড়ি বছরে মাত্র পাঁচ!' সুনন্দ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

ডাক্তার বললেন, 'আমি তো সৌভাগ্যবান। অনেকে সারা জীবনে একটাও নতুন অর্কিড আবিষ্কার করতে পারে না।'

ঘণ্টা দুই পরে ফিরলাম।

সুযোগ পাওয়া মাত্র মামাবাবুকে জানালাম, 'কাল একটা ফুল দেখেছিলাম, সেটা আজ আর কোথাও দেখলাম না। একটু আশ্চর্য লাগছে।'

'কাল? মানে?'

মামাবাবুকে গতকালের ঘটনাটা খুলে বললাম। ডাক্তার কেন্টের অদ্ভুত ব্যবহারের কথাটাও বাদ দিলাম না। বললাম, 'চমৎকার ফুলটা। ঢুকেই আমার চোখে পড়েছিল। গাঢ় নীলরঙা পাপড়িগুলি। মাঝের একটা পাপড়ি শিঙার মতো মাথা উঁচু করে রয়েছে, তার গায়ে গোলাপি আভা। আজ সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কোনো গ্রিন-হাউসে নেই।'

মামাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'রঙ ঠিক মনে আছে?'

'হুঁ আছে। গন্ধও মনে আছে। চমৎকার মিষ্টি সুবাস।'

সুনন্দ বলল, 'কোণের গ্রিন-হাউসটা তালা মারা ছিল। আমরা ঢুকিনি। সেটায় রাখা হয়েছে হয়তো।'

মামাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'আজ সন্ধেবেলা সেটা জানার চেষ্টা করব। অসিত কাউকে বোলো না কিছু এ-বিষয়ে।'

'ব্যাপারটা মামাবাবু এত সিরিয়াসলি নেবেন ভাবিনি।'

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই মামাবাবু হুকুম দিলেন—'চলো।' ডাক্তার রুগী দেখতে বেরিয়েছেন, মার্কো ক্যামেরা নিয়ে খুটখাট করছে। এই সুযোগ।'

হালকা জ্যোৎস্না ফুটেছে। দূরে মালিদের কুটিরের সামনে আগুন জ্বেলে রান্না হচ্ছে। আমরা ধীরে ধীরে সেই বন্ধ গ্রিন-হাউসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মামাবাবু জালের ভিতর দিয়ে টর্চের আলো ফেললেন ভিতরে। 'ওই তো সেই গাছ! সেই নীল ফুল।' আমি উত্তেজিতভাবে দেখাই।

মামাবাবু প্রায় আধ মিনিট ফুলটা লক্ষ করলেন। তারপর চিন্তিতভাবে বাড়ির দিকে ফিরে চললেন।

আমরা দুজনও তাঁর পাশাপাশি চলেছি, হঠাৎ অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো কী এক প্রাণী লাফিয়ে পড়ল সামনে। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ ফেলে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। একটা জাগুয়ার। প্রকাণ্ড আকার। হলদের ওপর কালো ছোপ ছোপ, দেহটা টান টান। ওৎ পেতে বসে দন্ত বিকশিত করে গরগর করছে আমাদের দিকে চেয়ে। তার লেজ অল্প অল্প নড়ছে, সবুজ চোখ দুটো জ্বলছে হিংস্র রাগে।

এবার দেবে লাফ। আমার গলা শুকিয়ে এসেছে, বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটছে। কিন্তু বাঘটা দেরি করছে কেন? সহসা কানে এল ডাক্তারের গলা—'মাংকো!'

অমনি বাঘটা পিছন ফিরে দেখল একবার। পরমুহূর্তে দীর্ঘ লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

দৌড়ে এলেন ডাক্তার। 'একি, অন্ধকারে বেরিয়েছেন কেন? খুব ভয় পেয়েছেন তো?'

মামাবাবু প্রথম কথা বললেন, 'ওটা কি আপনার পোষা বাঘ?'

'হ্যাঁ, আক্রমণ করে না কাউকে। তবে অচেনা মানুষ দেখলে ভয় দেখায়। দিনেও ছাড়া থাকে। আপনারা আছেন বলে শুধু রাতে ছাড়ছি। আমার বলে রাখা উচিত ছিল।'

বুক ধড়ফড়ানি কমতে বেশ কিছুটা সময় নিল। আজকের ঘটনার পর ডক্টর কেন্টকে আরও রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।

পরদিন আমরা ম্যালডোনাডো ছাড়লাম। লঞ্চে মামাবাবু আমাদের দুজনকে আড়ালে বললেন, 'ওই নীল অর্কিড বড় ভাবিয়ে তুলল যে!'

'কেন?'

'বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ তাঁর মেয়েকে লিখেছিলেন—একটা নতুন অর্কিড পেয়েছি। অপূর্ব নীল রঙের ফুল। তারপর যা বর্ণনা দিয়েছেন তা হুবহু এই ফুলের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। প্রশ্ন হল— সর্বজ্ঞর আবিষ্কার ডাক্তার কেন্টের হাতে এল কী করে? কেনই-বা উনি এ-ফুল আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চান?'

বললাম, 'হয়তো সর্বজ্ঞ ডাক্তারকে গাছটা উপহার দিয়েছেন।'

মামাবাবু বললেন, 'তাহলে এত লুকোচুরির দরকার কী?'

সুনন্দ বলল,'ডাক্তারকে তো প্রথমে দেখে খুব ভালো লোক বলেই মনে হয়েছিল।'

মামাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'পৃথিবীতে এমন অনেক সৎ লোক আছেন যাঁরা তাঁদের শখের জিনিস সংগ্রহ করতে এমন সব কাণ্ড করে বসেন যা সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তাই করা যায় না! রূপা বলেছে, অর্কিড ফুলে নীল রঙ দুর্লভ! আর সর্বজ্ঞ লিখেছেন যে, এমন চমৎকার নীল অর্কিড আগে নাকি কখনও পাওয়া যায়নি।'

আমি বললাম, 'ডাক্তারকে ওই ফুল সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন না কেন?'

মামাবাবু বললেন, 'তাতে লাভ হত না। কারণ প্রমাণ কী? যদি বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর হদিস পাই তখন এ-রহস্যের কিনারা হতে পারে। আর তা না হলে বাধ্য হয়ে ডাক্তারের মুখ থেকে জোর করেই ওই অর্কিড এবং সর্বজ্ঞ সম্বন্ধে কথা আদায় করতে চেষ্টা করব।'

বেশ চওড়া নদী মাদ্রে দ্য দিওস। দুপাশে ঘন উদ্ভিদরাজি। লোকালয় প্রায় নেই বললেই চলে। আমাদের লঞ্চ বেশ বড়, তাতে যাত্রীও অনেক। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, তাম্রবর্ণ রেড-ইন্ডিয়ান ইত্যাদি নানা জাতের মানুষ রয়েছে। আর রয়েছে কিছু গরু, ছাগল, মুরগি।

নানা বাণিজ্যসম্ভার উঠেছে লঞ্চে। কাঁদি কাঁদি কলা, রবারের গোলা, আখ, পেঁপে, ভুট্টা ইত্যাদি। তাছাড়া আধুনিক জগতে তৈরি টিনের খাবার, জামা-কাপড়, ওষুধপত্র। বনভূমিতে নিঃসঙ্গ খামারগুলির এসব জিনিস বড় দরকার।

এখানে লোকগুলো কেমন বেপরোয়া। কেমন যেন একটা গা-ছাড়া ভাব। সময় নিয়ে কেউ যেন ব্যস্ত নয়। লঞ্চ থামলে ধীরেসুস্থে ওঠে নামে, কথায় কথায় তর্ক বাধে। প্রায় সবার কাছে পিস্তল বা ছুরি থাকে, যখন তখন টেনে বার করে। আবার দেখেছি পরস্পরে ভাবও

হয়ে যায় চট করে! আমরাও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েছি। তবে মার্কোর ভাষায় শুধু আত্মরক্ষা এবং খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে। অরণ্য-অভিযানে উপস্থিত বুদ্ধি এবং দৃঢ় নার্ভই প্রধান হাতিয়ার।

এই লঞ্চেই বুড়ো পেড্রো লোপেজ আমার ও সুনন্দর নজরে পড়ে। ছোটখাটো মানুষটি নোংরা পোশাক পরে রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে। মুখে অজস্র ভাঁজ। হুড দেওয়া জকি টুপি মাথায়। দাঁতে পাইপ কামড়ে চক্ষু মুদে ঝিমুচ্ছে।

একজন খালাসি চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'কী গো পেড্রো লোপেজ! যাচ্ছ কোথায়? নতুন কোনো খোঁজ-টোজ পেলে নাকি?'

বৃদ্ধ তির্যক দৃষ্টিতে চাইল খালাসির দিকে, উত্তর দিল না।

খালাসি আবার বলল, 'এই বয়সে বেশি ঘোরাঘুরি কিন্তু ভালো নয় বুড়ো।'

'চকিতে খাড়া হয়ে উঠল বৃদ্ধের দেহ। ভাঙা গলায় হুঙ্কার ছাড়ল, 'খবরদার, বুড়ো বলবি নে! জানিস আমার হাতের টিপ এখনও কেমন? দেখবি নাকি পরীক্ষা করে?'

ছোকরা খালাসি চট করে আড়ালে সরে গিয়ে মন্তব্য করল, 'উঃ, কী রাগী বুড়ো রে বাবা!'

একজন বয়স্ক লোক পেড্রোকে কী জানি কী বলতেই সে তেড়ে উঠল। 'থাক, আর উপদেশ দিতে হবে না। আমার ভালো-মন্দ আমি বুঝব। জেনে রাখ—লোপেজ বংশের কেউ বিছানায় শুয়ে মরে না। মূর্খের দল! আমায় ঠাট্টা করা! হুঁ—বরাত যদি ভালো হয় তো প্রমাণ করে দেব ফার্দিনান্দ লোপেজের কথা সত্যি কিনা।'

পেড্রো সবার মুখের পানে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে তাকাল। মামাবাবু ও মার্কো অবশ্য ও-দৃশ্য দেখেননি।

হিথ নদীর সঙ্গমস্থলে আমরা লঞ্চ থেকে নামলাম।

গ্রামের ঘাটে পেড্রো লোপেজকে আবার দেখলাম। শুধু দেখা নয়, কথাও হল। পেড্রো নিজেই এসে আমাদের বলল, 'তোমরা কোন দেশের লোক?'

সুনন্দ বলল, 'ইন্ডিয়া।'

উত্তরটা শুনে পেড্রো কিছুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে থেকে আবার প্রশ্ন করল—'তোমরা যাচ্ছ কোথায়?'

সুনন্দ জবাব দিল, 'হিথ নদীতে ঘুরব। ছবি তুলব।'

'হুঁ...'

পেড্রো ভুরু কুঁচকে বলল, 'তোমাদের দেশ থেকে আরেকজন এসেছিল এখানে, তোমরা তার কেউ হও কি?'

আমরা অবাক। কী উত্তর দেব ভেবে পাই না।

বুড়ো কিছুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে থেকে উল্টোদিকে ঘুরে চলে গেল।

এবার আমরা টমকে খুঁজে বের করলাম। টম অল্পবয়সী আধা-ইন্ডিয়ান। ভালো মাঝি! দুটো ক্যানু জোগাড় হল। ক্যানু হচ্ছে একরকম হালকা ছোট নৌকো। টম ছাড়া আরও তিনজন দেশি মাঝি নিলাম সঙ্গে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে নৌকো বোঝাই করে আমরা দুদিন পরে জলে পড়লাম। ক্রমে হিথ নদীতে প্রবেশ করলাম। শুরু হল আমাদের আসল অভিযান।

চার

নিবিড় অরণ্যময় আদিম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। গত তিন দিনে একটিমাত্র অন্য নৌকোর দেখা পেয়েছি। দুজন স্পেনীয় ব্যবসায়ী উপজাতিদের গ্রাম থেকে রবার সংগ্রহ করে ফিরছিল।

হিথ নদী চওড়া নয়, কিন্তু খরস্রোতা। দুধারে ঘন উদ্ভিদের রাজ্য। এ-বনের মজা হচ্ছে পাখি বা কীটপতঙ্গ ছাড়া বড় জীবজন্তুর দেখা সহজে পাওয়া যায় না। তবে কান পাতলে নানারকম ডাক শোনা যায়। আমাদের মাঝিদের তীক্ষ্ণ চোখ অবশ্য গাছের পাতার আড়ালে অনেক অদৃশ্য জীবের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। আর যেটা সকলেই দেখতে পায় সেটা হল বাঁদরের দাপাদাপি।

পাখি আর প্রজাপতি কত রকমের! সন্ধ্যার মুখে ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে হলদে-সবুজ টিয়াপাখিরা। কর্কশ কলরবে নদীতট মুখর করে তোলে। দক্ষিণ আমেরিকার বড় জাতের টিয়া, যাদের বলে 'ম্যাকাও', সেগুলির পালকের রঙ দেখবার মতো। সবুজ, হলদে, লাল ও নীল মেশানো বিচিত্র বর্ণ। ঝড়ের মতো উড়ে যায় জোড়ায় জোড়ায়।

জলের মধ্যে ছোঁ মারে মাছরাঙা। বেনেবউয়ের মিষ্টি ডাক শোনা যায়। জলের ধারে লম্বা পা ফেলে পায়চারি করে সারস। কখনও দেখি ধ্যানমগ্ন বক। টুকটুকে লাল আইবিস সবুজের ভিতর চমৎকার দেখায়।

ধীরে ধীরে এগোই! কখনও নৌকো থামিয়ে তীরে উঠে বনে ঢুকি। মার্কো ছবি তোলে পশু-পাখির। খোঁজে উপজাতি বসতি। মামাবাবু খোঁজেন নতুন প্রাণীর স্পেসিমেন। নদীতীরে যাও-বা কিছু পশুপাখি চোখে পড়ে, বনে ঢুকলে সব মিলিয়ে যায়, মিশে যায় গাছপাতার আবরণে।

এ-বনে পায়ে হেঁটে ঘোরা বড় কঠিন কাজ। বিশাল বিশাল মহীরুহের তলায় দিনের বেলাতেও সন্ধ্যার অন্ধকার। গাছের গুঁড়িকে পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠে গেছে মোটা মোটা লতা সূর্যালোকের সন্ধানে। মাথার অনেক ওপরে ডাল-পাতার ঘন আচ্ছাদন। কদাচিৎ একফালি রোদ এসে তিরের মতো মাটিতে পড়ে। বড় গাছের তলায় ঝোপঝাড়। কাঁটাগাছে গা ছড়ে যায়।

গাছপালা বেশিরভাগ অচেনা। মার্কো চিনিয়ে দেয়। কটন-উড, ব্রেজিল-নাট, নানা জাতীয় পাম। কোথাও দেখি জংলা পেঁপে আর কলা বন। একদিন মার্কো বলল, 'কাছেই নিশ্চয় রবার গাছ আছে। ওই শোন সেরিংগারো পাখির ডাক। ওই পাখি রবার গাছের গায়ে পোকা খায়।'

প্যাচপ্যাচে কাদা জমিতে পুরু পাতার আস্তরণ। আমাদের বুট বসে যায়। মার্কো সাবধান করে দিল, 'দেখে শুনে পা ফেল। গর্তের মধ্যে পাতা জমে দিব্যি মরণফাঁদ হয়ে থাকে। ভুস করে ডুবে যাবে।'

সবুজ, সবুজ আর সবুজ! রঙিন ফুল বনের ভিতর খুব কম। শুধু কখনও দেখি অর্কিড গাছ উঁচু কোনো গাছের ডালে দুলছে। লম্বা ডাঁটির মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ নানা রঙের ফুল। চোখ-কান সজাগ রেখে এগোই।

একদিন বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি, হঠাৎ আমার মাথায়, মুখে মাকড়সার জাল জড়িয়ে

গেল। ছাড়াতে পারি না। মনে হচ্ছে যেন একটা মাছধরার জাল। 'স্থির হয়ে দাঁড়াও অসিট।' মার্কোর কণ্ঠস্বর। তারপরই লাঠির আওয়াজ পাই—সপাং! চোখ পরিষ্কার করে দেখলাম মাটিতে মস্ত এক কোঁকড়ানো মাকড়সা। মার্কো বলল, 'আপাজাইকা স্পাইডার। ভীষণ বিষাক্ত এর কামড়।'

প্রত্যেকের হাতে লাঠি থাকে। বিষাক্ত সাপের ভয়।—জারারাকা, বুস মাস্টার, র‍্যাটল সাপ।

একটা জলাভূমিতে ফোটো তুলতে গিয়েছিলাম মার্কোর সঙ্গে। জলাতে প্রচুর এলিগেটর-কুমির ছিল। বেশ বড় কিন্তু অগভীর জলা। কুয়ারানা গাছ জন্মেছে জলার ভিতর। কুয়ারানা অনেকটা বাংলাদেশের সুঁদরী গাছের মতো। ছবি কিন্তু বেশিক্ষণ তোলা গেল না। কারণ প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দিতে হল। না, কুমিরের তাড়া নয়, জোঁক। অসংখ্য জোঁক লাফাতে লাফাতে এল তেড়ে। আঙুলের মতো মোটা আর বিঘৎ খানেক লম্বা জোঁকগুলো। বাপরে, ওদের খপ্পড়ে পড়লে আর রক্ষা ছিল না।

নদীপথে ছোট ছোট জলপ্রপাত পড়ে প্রায়ই। দুরন্ত গতিতে জল ছুটেছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁইয়ের পাশ দিয়ে। লাফ দিয়ে পড়ছে কয়েক হাত নিচের পাথরের ওপর। মাঝিরা কী নিপুণ কৌশলে পাথর কাটিয়ে নৌকো নিয়ে যায়! কখনও জলে নেমে হাতে নৌকো টেনে পার করে জলপ্রপাতের বাধা। আমি ও সুনন্দ সুযোগ পেলেই নৌকো চালানো অভ্যেস করি। মার্কো অবশ্য এ-বিদ্যেতে ওস্তাদ।

রাতে বেশির ভাগসময় শুই তীরে গাছের ডালে 'হ্যামক' বা দড়ির দোলনা-বিছানা টাঙিয়ে। কখনও শুই নৌকোয় বা তীরে তাঁবু খাটিয়ে। ভোরবেলা প্রায়ই বাঁদরের উৎপাতে মেজাজ বিগড়ে যায়। চকচকে লাল-রঙা মাইসিটি জাতের বাঁদরের গর্জনে কাঁচা ঘুম যায় ভেঙে। উঃ, কী বিকট চিৎকার! মনে হয় একদল উন্মাদ রণহুঙ্কার দিচ্ছে। আসলে কিন্তু মাত্র একটি বা দুটি পুরুষ-বাঁদরের গলা। কালো রঙের মেরিমোলে নামে বাঁদরগুলোও কম শয়তান নয়। হ্যামকের দড়ি ধরে এমন ঝাঁকায় যে ভয় হয় বুঝি ছিটকে পড়ব মাটিতে। ইচ্ছে হতো দিই বেটাদের গুলি মেরে খতম করে।

হ্যামকে শুয়ে মাথার ওপর দেখি গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝকঝকে নক্ষত্রখচিত টুকরো টুকরো আকাশপট। শুনি কানে তালা-ধরানো ঝিঁঝির ডাক। ব্যাঙের কর্কশ গম্ভীর গলার গান। ঝাঁক ঝাঁক জোনাকির আলোয় একটি একটি গাছ কেমন ভুতুড়ে লাগে। অবাক হয়ে ভাবি, এ কোথায় আমি? যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা অভিযানে বেরিয়েছি তা সফল হবে তো? ডক্টর সর্বজ্ঞকে খুঁজে পাব কি আমরা? তিনি কি বেঁচে আছেন, না সত্যিই তাঁর সলিলসমাধি হয়েছে?

চারদিনের দিন মার্কো জানাল যে এক উপজাতি গ্রাম আছে সামনে তীরের কাছে বনের মধ্যে। আমরা গিয়ে দেখি একটু ফাঁকা জায়গায় তিন-চারটে বড় বড় কুটির। চারজন অচেনা বিদেশির আবির্ভাব প্রথমে কিছু আদিবাসী স্ত্রীলোক এবং ছোট ছেলেমেয়েদের নজরে পড়ল। অমনি দুড়দাড় করে সবাই দিল ছুট। সঙ্গে ছুটল তাদের পোষা কুকুরগুলো। মানুষে পশুতে পায়ে পায়ে জড়িয়ে কেউ পড়ল গড়িয়ে। চেঁচামেচি করতে করতে লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন পুরুষ। তাদের হাতে তির, ধনুক, বর্শা।

মার্কো চিৎকার করে দেশি ভাষায় বলতে লাগল—'আমরা বন্ধু, আমরা বন্ধু।' তখন

গ্রামবাসীরা ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এল। ওরা আমাদের সর্বাঙ্গ চাপড়ালো। আমরাও তাই করলাম। দেখতে দেখতে তাদের সন্দেহ কেটে গেল, আমাদের তারা বন্ধু বলে মেনে নিল।

রেড-ইন্ডিয়ানদের চেহারা অনেকটা আমাদের দেশের নাগাদের মতো। খালি গায়ে নানা রঙের নক্‌শা। মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম, মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের সাজসজ্জার বহর কিঞ্চিৎ বেশি। ছেলে বা মেয়েদের পরনে গাছের ছাল বা সুতির পোশাক। আধুনিক প্যান্ট বা পেটিকোটও পরেছে কেউ কেউ।

এই উপজাতিরা চাষ করে, মাছ ধরে। আমাদের উপহার দিল—কলা, ভুট্টা, ম্যানডিওকা। ম্যানডিওকা রাঙালুর মতো উদ্ভিদমূল। তার আটা বানিয়ে রুটি করে খায় এখানকার আদিবাসীরা। আমরা পরিবর্তে দিলাম পুঁতির মালা, লোহার বঁড়শি, রঙিন কাপড়।

মার্কো ওদের পিয়ানো একর্ডিয়ান বাজিয়ে শোনাল। ওরা তো মুগ্ধ। কেবল বলে, 'আরও বাজাও।' শব্দ বের হলেই সবাই হেসে কুটিপাটি। এমন অদ্ভুত আওয়াজ তারা কস্মিনকালেও শোনেনি।

আরও দু-তিনটে উপজাতি গ্রামে গিয়ে ছবি তোলা হল। সবার মেজাজই যে নরম তা নয়। কেউ কেউ বেশ উগ্র, বিদেশিদের পছন্দ করে না।—মার্কো কিন্তু ঠিক তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল।

একদিন নদী তীরে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করছি। দুপুরবেলা। মার্কো হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'প্রোফেসর ঘোষ, এইভাবে খুঁজে বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর হদিশ পাবেন কি?'

চমকে গেলাম মার্কোর কথা শুনে। মামাবাবুও অবাক। বললেন—'আপনি জানলেন কী করে যে আমি বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর খোঁজ করছি?'

মার্কো হাসল। 'আমার চোখ ও কান আছে। ডক্টর কেন্টকে অত প্রশ্ন করলেন আপনি। ইন্ডিয়ানদের গ্রামে গিয়ে সর্বজ্ঞর ফোটো দেখিয়ে খোঁজখবর করছেন। সব আমি লক্ষ করেছি। জানি বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর কেস রহস্যজনক। কিন্তু সঠিক কোনো ক্লু পেয়েছেন কি?'

মামাবাবু খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'পেয়েছি।'

'কী?'

মামাবাবু সমস্ত বললেন। ভিক্টরের তোলা সেই ফোটো, দুর্ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে সত্যনাথ সর্বজ্ঞর হ্যাট ও টাই পরা উপজাতি সর্দারের ছবি। এ-বিষয়ে মামাবাবুর অনুমান।

শুনে মার্কো উত্তেজিত হয়ে উঠল—ইস্‌, আগে বলতে হয়! মিছিমিছি ক'টা দিন নষ্ট হল। চলুন সোজা সর্দারকে ধরিগে।'

সেইদিনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

আমি আর সুনন্দ বনে ঢুকেছি। ইচ্ছে সজারু বা এগুটি পেলে শিকার করব। প্রকাণ্ড একটা গাছের কাছে গিয়ে শুনি কেমন বিচিত্র আওয়াজ হচ্ছে। কড়মড় মড়মড় জাতীয়। কীসের শব্দ? আবিষ্কারের চেষ্টায় ওপরে চেয়ে আছি, দেখলাম এক দঙ্গল টিয়াপাখি গাছ থেকে বেরিয়ে উড়ে পালাল। হঠাৎ সামনে আমাদের দুজনকেই চমকে দিয়ে আবির্ভূত হল আমাদের এক চেনা লোক।—পেড্রো লোপেজ। সে হুঙ্কার ছাড়ল—'সরে এসো ওখান থেকে—এক্ষুনি।'

অবাক হয়ে দেখছি তাকে। পেড্রো খ্যাঁক করে আমাদের জামা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল। ওঃ, বুড়োর গায়ে তো আচ্ছা জোর!

বেশ খানিকটা যাবার পর নিজেদের ছাড়িয়ে নিয়ে রেগে বললাম, 'কী ব্যাপার?'

উত্তরের আগেই এক কর্ণভেদী শব্দে শিউরে উঠলাম। সেই বিশাল গাছটা সমস্ত অরণ্যটাকে কাঁপিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর আধ মিনিট ওখানে থাকলে আমরা ওই গাছের তলায় চাপা পড়ে পিষে যেতাম।

পেড্রো পাইপে টান দিয়ে বলল, 'বৃষ্টির জলে শিকড় আলগা হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে পড়ছিল গাছটা। জঙ্গলের জ্ঞান নেই মূর্খ। মরতে এক্ষুনি!'

কী বলে ওঁকে ধন্যবাদ দেব ভাবছি, এমন সময় পেড্রো বলল—'ম্যাপটা পেলে কোথায়?'

'বললাম, 'ম্যাপ! কীসের ম্যাপ?'

পেড্রো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। 'বটে, বলবে না? চেপে যাচ্ছ? দেখ, একজন ভারতীয় মরেছে। তোরাও মরবি। লোপেজ বংশের হক্কের ধন গাপ্ মারা অত সোজা নয় বুঝলি?'

পেড্রো হন্‌হন্ করে বনের ভিতর অদৃশ্য হল।

স্তম্ভিত হয়ে থেকে বললাম, 'লোকটা পাগল নাকি?'

সুনন্দ বলল, 'হতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর বিষয়ে কি ও কিছু জানে? ওর

কোনো হাত আছে নাকি? শুনলি ওর কথা? এমন খ্যাপাটে লোক অনেক সময় ডেনজারেস হয়।'

তাঁবুতে ফিরে মামাবাবু ও মার্কোকে পেড্রোর কথা জানালাম। দুজনেই একটু চিন্তিত হলেন। মার্কো বলল, 'খেয়াল রেখো, লোকটাকে আবার দেখলে ধরব। জানতে হবে সর্বজ্ঞ সম্বন্ধে ও কী জানে!'

দুঃখের বিষয় আমরা আর পেড্রোর দেখা পেলাম না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, পেড্রো ঠিক আমাদের অনুসরণ করছে লুকিয়ে লুকিয়ে।

পাঁচ

নৌকো চলেছে। দুপাশে সেই একঘেয়ে বনভূমি, সেই একই প্রাণিজগৎ। নতুনত্বের মধ্যে একটা বিশাল আনাকোন্ডা দেখলাম। জলের কিনারে গাছের ডাল পাকে পাকে জড়িয়ে মাথা ঝুলিয়ে ওৎ পেতে ছিল, দক্ষিণ আমেরিকার এই অজগর। ভাগ্যিস দেখতে পেয়েছিল মাঝিরা, কোনোরকমে একটা গাছের ঝুরি আঁকড়ে নৌকো থামিয়ে ফেলল। তারপর অনেকখানি সরে এড়িয়ে গেল সেই মহাসর্পের উদ্যত আলিঙ্গন।

আর সুনন্দ একদিন ইলেকট্রিক ইল্ মাছের শক খেল। ইল্ আমাদের দেশের বান মাছের মতো দেখতে। লম্বাটে গড়ন। মাঝিরা জাল পেতে মাছ ধরছিল নদীতে। একটা ছোট ইলেকট্রিক ইল্ আটকা পড়েছিল তার মধ্যে। সুনন্দ মাছ বের করতে জালের ভিতর হাত ঢোকাতেই শক খেয়ে কুপোকাৎ। বেচারার শরীর অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে ছিল। মার্কো প্রাণপণে ম্যাসাজ করে সুনন্দকে সুস্থ করে তুলল। তারপর শুরু হল তার ঠাট্টা।—'কী হে বীরপুরুষ, বুঝছো তো কী ডেনজারেস এই দেশ! এখনও ভেবে দেখ ফিরে যাবে কিনা?'

শুনলাম বড় ইলেকট্রিক ইল-এর শকে নাকি মানুষের জীবনহানিও ঘটতে পারে।

আমরা এক ব্যারাকায় উপস্থিত হলাম।

এদেশে চাষ বা পশুপালন খামারকে বলে 'ব্যারাকা'। নদী থেকে মাইলখানেক দূরে বনের ভিতর অনেকখানি জমি পরিষ্কার করে খামার তৈরি হয়েছে। মালিক এক জার্মান, নাম মুলার। কাঠের বাংলোবাড়িতে বৃদ্ধ একা থাকে, সঙ্গে থাকে কয়েকজন দেশি পরিচারক। চাষবাস করে, গরু, ছাগল পোষে, উপজাতীয় লোকে শ্রমিকের কাজ করে। এমন গহন বনে সভ্য মানুষের বাস কল্পনা করিনি। মার্কো বলল, 'আমাজন অববাহিকার অরণ্যে এমন অনেক ব্যারাকা আছে।

মুলার আমাদের পেয়ে ভীষণ খুশি। অনেক কষ্টে জোগাড় করা মহা মূল্যবান বিস্কুট এবং কফি খাওয়াল। রাঁধুনিকে অর্ডার দিল, 'অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য আজ কচ্ছপের স্যুপ আর টেপিরের মাংস বানাও।'

মুলার গল্প করল যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সে ছিল একজন মেজর। হিটলারের মতবাদ পছন্দ না হওয়াতে একবার পেরুতে জাহাজ আসতে সোজা নেমে পালিয়ে যায় আমাজনের বনে। যুদ্ধের শেষে দেশে গিয়ে দেখে আপনজন প্রায় সবাই মারা গেছে, তাই আবার ফিরে আসে দক্ষিণ আমেরিকায়।

মুলার খুব দাবার ভক্ত। বলল, দাবা খেলার লোভে মাঝে মধ্যে শহরে যাই। বেশিদিন টিকতে পারি না কিন্তু।'

মুলার অনুরোধ করেছিল, আরও কিছুদিন থেকে যাবার জন্য, কিন্তু আমাদের তাড়া ছিল তাই বিদায় নিলাম।

মুলারের ব্যারাকা ছাড়ার সময় দুজন লোক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হিথ নদীতে একখানা ডিঙিনৌকোয় বসে তারা চুরুট টানছিল এবং আমাদের লক্ষ্য করছিল।

মার্কো বলল, 'ডাক্তার বলেছে, এ-অঞ্চলে কয়েকজন পলাতক বিদ্রোহী সৈন্য আশ্রয় নিয়েছে। তারা লুটপাট ছিনতাই করছে। এ লোক দুটোর হাবভাব সন্দেহজনক। দেখ, কোমরে আর্মি বেল্ট।'

আরও দুদিন নদীপথে যাত্রার পর আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। তীরে কয়েকজন রেড-ইন্ডিয়ান ঘোরাঘুরি করছিল। মার্কো তাদের ডাকল। এরা বেশ সপ্রতিভ, ডাকতেই কাছে এল। আমরা চারজনে ওদের সঙ্গে ওদের গ্রামে চললাম।

সর্দারকে চিনতে অসুবিধা হল না। অবিকল সেই ফোটোর মুখ। তবে হ্যাট বা টাই নেই। কিছু নুন উপহার দিতে সে বেজায় খুশি, কারণ জঙ্গলে নুনের বড় অভাব। বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর ফোটো এবং ভিক্টরের তোলা সর্দারের ফোটো দেখিয়ে মার্কো সর্দারের সঙ্গে কিছু আকার- ইঙ্গিতে, কিছুটা ভাষার সাহায্যে আলাপ শুরু করল।

সর্দার মন দিয়ে নিজের ফোটোখানা দেখল। তারপর হঠাৎ উঠে এক কুটিরের মধ্যে ঢুকে গেল। কী ব্যাপার!

অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার আবির্ভূত হল সর্দার। এবার তার মাথায় সেই গোল শোলার টুপি, গলায় সেই টাই বাঁধা। দু-বগলে দুই সঙ্গীকে চেপে ধরে সে ইশারা করল, ছবি তোলো।

মার্কো তৎক্ষণাৎ ছবি তুলে সর্দারের সঙ্গে আরও কিছু কথা বলে মামাবাবুকে জানাল, 'সর্দার সর্বজ্ঞকে চিনেছে। এখানে এসেছিলেন। পাথরে লেগে তাঁর নৌকো ফুটে হয়ে যায়। ইন্ডিয়ানরা তার নৌকো মেরামত করে দেয় তাই পুরস্কারস্বরূপ সর্দার ওই টুপি এবং টাই চেয়ে নেয়। পরদিন সকালে দেখে বৈজ্ঞানিক চলে গেছেন। কোন দিকে গেছেন তা সে জানে না। 'হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে একজন ইন্ডিয়ান অনুচর ছিল। সে অন্য জাতের লোক।'

মামাবাবু খুব নিরাশ হলেন। তিনি আশা করেছিলেন এখানে সর্বজ্ঞ সম্বন্ধে সঠিক কোনো খবর পাবেন।

নির্জন নদীতীরে বিকেলবেলা।

নদীর ওপরে গাছের মাথায় ঘন সবুজ পল্লবগুচ্ছের গায়ে রাঙা রোদ পড়ে চকমক করছে। ছুটন্ত জলের বুকে থিরথির করে কাঁপছে বাঁশ আর তালগাছের ছায়া। মামাবাবু আর মার্কো গেছেন উপজাতিদের গ্রামে। মাঝিরা বনে ঢুকেছে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে। সুনন্দ তাঁবু খাটাবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ 'কী হে ছোকরারা?'

বিষম কর্কশ গলায় স্প্যানিশ ভাষা শুনে চমকে ফিরলাম।

সেই দুই মূর্তিমান মুলারের খামারের কাছে যাদের দেখেছি, তাদের একজনের হাতে উদ্যত পিস্তল। পিস্তলধারী গর্জন করে উঠল, 'খবরদার, নড়লেই গুলি করব। মাথার ওপর হাত তোলো।'

মাটিতে বসে ছিলাম। অগত্যা বসে বসেই হাত তুললাম।

পিস্তলধারী তার সঙ্গীকে বলল, 'র‍্যাপসো, দেখ তো হে মালকড়ি কী আছে?'

র‍্যাপসো হামলে পড়ল আমাদের ব্যাগগুলোর ওপর। টপাটপ খাবারের টিন ও প্যাকেটগুলো বের করতে করতে র‍্যাপসো খ্যাক খ্যাক করে হেসে মন্তব্য করল, 'বুঝলে রস্, আজ দারুণ কপাল। ঘুম ভেঙেই আর্মাডিলো দেখে তখনই বুঝেছি আজ দিন ভালো যাবে।'

খুশির চোটে পিস্তলধারী রস্ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তার চোখ মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছিল লুটের মালের ওপর। দুই অর্বাচীন ভারতীয় ছোকরা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকার প্রয়োজনবোধ করছিল না। নয়তো ভেবেছিল এক ধমকই যথেষ্ট। আমি লক্ষ করলাম লোকটা মাটিতে বিছানো তাঁবুর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। সুনন্দকে ইশারা করলাম। তারপর যেই লোকটা একবার আমাদের থেকে চোখ সরিয়েছে ঝট্ করে হাত নামিয়ে তাঁবুর কাপড় আঁকড়ে মারলাম এক হেঁচকা টান। একসঙ্গে দুজনেই কুপোকাৎ।

সঙ্গে সঙ্গে রসের পিস্তল সরব হয়ে উঠল। কিন্তু বেটাল হয়ে ফসকে গেল টিপ। পা হড়কে মাটিতে বসে পড়ল। পিস্তল ছিটকে গেল হাত থেকে। নিমেষে পকেট থেকে রিভলবার বের করে রসের মাথা তাক করে বললাম, 'এবার তোমাদের পালা। হাত তোলো। উঠে দাঁড়াও, নইলে—'

ইতিমধ্যে সুনন্দ র‍্যাপসোকে লক্ষ্য করে রিভলবার বাগিয়েছে। মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়ানো দুই বন্দীর অবস্থা হল দেখবার মতো। রাগে লজ্জায় মুখ তাদের ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

মামাবাবুরা ফিরলেন একটু পরে। এই দৃশ্য দেখে তাঁরা তো চমৎকৃত। মার্কো হেসে বলল, 'সাবাস ব্রাদার! নাঃ, তোমাদের যত নাবালক ঠাউরে ছিলাম তত নও। ঘুঘু দুটোকে আচ্ছা জব্দ করেছ।'

মার্কো ওদের প্রশ্ন করল, 'তোমরা নিশ্চয় জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর দলের পলাতক সৈন্য। বেড়ে ব্যবসা ধরেছ তো হে! টম, লোক দুটোকে বাঁধো।'

মামাবাবুর আচরণে আমরা আশ্চর্য হলাম। তিনি র‍্যাপসোর কাছে গিয়ে তার শার্ট পরীক্ষা করতে লাগলেন।

র‍্যাপসোর ছেঁড়া সস্তা খাকি প্যান্টের সঙ্গে অমন দামি নেভি-ব্লু শার্টখানা বেমানান বটে, কিন্তু তা নিয়ে অত মাথা ঘামাবার কী দরকার?

'এ শার্ট কোথায় পেয়েছ?' মামাবাবু কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'কেন?' র‍্যাপসো খেঁকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল।

'দরকার আছে। ঠিক ঠিক জবাব দাও।'

'আমি কিনেছি।'

'বটে! বনের ভিতর দোকান আছে নাকি?'

মামাবাবুর কণ্ঠে বিদ্রূপ—'আবার পয়সা দিয়ে এত ছোট মাপের শার্ট কিনেছ!' র‍্যাপসো নিরুত্তর।

মামাবাবু মার্কোকে বললেন, 'শার্টটা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। ভীষণ চেনা-চেনা লাগছিল। বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ ফোটোতে ঠিক এমনি শার্ট পরে রয়েছেন। বুকের কাছে সাদা ফুল তোলা। তুমিও মিলিয়ে দেখ ফোটোর সঙ্গে।'

মামাবাবু ব্যাগ থেকে ফোটো বের করলেন। আমরা দেখলাম—অবিকল সেই শার্ট।

মামাবাবু বললেন, 'আপাতত জানতে হবে এ শার্ট ও পেল কী করে এবং সর্বজ্ঞকে ওরা কী করেছে? মনে হচ্ছে এরা সর্বজ্ঞর ওপর ডাকাতি করেছিল। দেখ চেষ্টা করে কথা বের করতে পারো কিনা।'

মার্কো গম্ভীর বদনে ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর মোলায়েম গলায় বলল—'মিস্টার র‍্যাপসো, বড়ই দুঃখের বিষয় তুমি এমন অসময়ে বোবা হয়ে গেলে। যাক, এই রোগের দুটো দাওয়াই আমার মনে পড়েছে। দেখ কোনটি তোমাদের পছন্দ হয়।

'প্রথম নম্বর, তোমাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাব এবং তারপর গভর্নমেন্টের হাতে সমর্পণ করব। বিদ্রোহী সৈন্য হিসেবে আশা করি তোমাদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হবে। দ্বিতীয় নম্বর, তোমাদের দুটিকে নদীর ধারের ওই দুটো গাছে বেঁধে রাখব। গাছগুলো নিশ্চয় চেনা। বন্দী করে নিয়ে যাওয়া ঝামেলা। তাই দ্বিতীয় ওষুধটাই প্রথমে এক্সপেরিমেন্ট করা যাক।'

দুই বন্দী ঘাড় ফিরিয়ে গাছ দুটো দেখল। স্পষ্ট দেখলাম তাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কৌতূহল হল ওটা কী গাছ?

নদীতীরে কয়েকটি গাছ দাঁড়িয়ে। ছোট ছোট গাছ, সোজা সরু গুঁড়ি। গুঁড়ির নিচের অংশে ডালপালা নেই। একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলাম যে, প্রত্যেক গাছের গোড়ার চারপাশে মাটিতে এক কণাও ঘাসের চিহ্ন নেই।

মার্কো এবার আমাদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওই গাছের নাম পালো-সান্টো। দেখতে নিরীহ, কিন্তু আসলে অতি মারাত্মক। এই গাছের প্রত্যেকটি কাঠ হল কাঠপিঁপড়ের ডিপো। যে কোনো প্রাণী ওই গাছ স্পর্শ করলেই অগুনতি পিঁপড়ে তাকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করবে। কয়েক ঘণ্টা ওই গাছের গায়ে বেঁধে রাখলে বাছাধনদের মুখে আশাকরি বাক্য ফুটবে। ইন্ডিয়ানরা এইভাবে তাদের অপরাধীদের শাস্তি দেয়। শুনেছি প্রায় আসামী অসহ্য যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে যায়। কেউ কেউ মারাও যায়।'

র‍্যাপসো ও রস্ হাউমাউ করে উঠল। 'সেনর, দয়া করুন। সব বলছি।'

'বেশ, বলো।'

'আমরা ওই শার্ট লুট করে পেয়েছি।'

'কতদিন আগে?'

'সাত-আট মাস হবে।'

'একে চেনো?' মামাবাবু সর্বজ্ঞর ফোটো বের করলেন।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই লোকেরই জিনিস।'

'কী করেছ তাকে? খুন?'

'না না।' দুজনে সরবে আপত্তি জানায়। আমরা তার গায়ে হাত দিইনি। ও তখন ছিল না। ওর জিনিস নিয়ে একজন ইন্ডিয়ান মাঝি নৌকোয় বসেছিল। তাকে ভয় দেখিয়ে আমরা কিছু খাবার আর পোশাক কেড়ে নিই।'

'সত্যি কথা?' কড়া ধমক দেয় মার্কো।

'সত্যি, মা মেরির দিব্বি।'

'তারপর?' মামাবাবু প্রশ্ন করেন। 'তারা নৌকো নিয়ে কোন্ দিকে গেল?'

'তা জানি না। তবে মাঝিটা বলছিল, তারা নাকি পাহাড়ি ইন্ডিয়ানদের গ্রামের দিকে যাবে।'

'সে কোন্ দিকে?'

'এই নদীপথে কিছু এগিয়ে ডান পাশের এক শাখানদী ধরে গেলে পাহাড়ে পৌঁছনো যায়। তিন-চার দিনের পথ।'

'ওই দুজন আবার ফিরে এসেছিল এ-পথে?' মামাবাবু জানতে চান।

'না। পাহাড়ি ইন্ডিয়ানদের হাতে হয়তো মারা পড়েছে। ওই ইন্ডিয়ানরা দারুণ হিংস্র।'

'তোমরা ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ। এই নদীতে আমাদের চোখ এড়িয়ে কেউ যাওয়া-আসা করতে পারে না। ডাক্তার কেন্ট ফিরেছিল, কিন্তু ওরা ফেরেনি।'

মামাবাবু তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন—'তোমরা চেনো ডাক্তারকে?'

'চিনি, তবে আলাপ নেই। ডাক্তারকে এ-অঞ্চলে সবাই চেনে।' ওদের কণ্ঠে বেশ সমীহ ফুটে ওঠে।

'ডাক্তার এ-পথে গিয়েছিল?' মামাবাবু জানতে চান।

'হ্যাঁ।'

'কবে?'

'ওরা চলে যাবার দু'দিন পরে।'

'ডাক্তার ফিরল কবে?'

'তিন-চার দিন পরে।'

বন্দী দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হল।

মামাবাবু গম্ভীরভাবে একটা পাথরের ওপর বসলেন।

আবার সেই রহস্যজনক ডাক্তারের অস্তিত্ব। বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর সঙ্গে এই ডাক্তারটির যোগাযোগ বারবার আবিষ্কার করছি। কেন ডাক্তার এসেছিল সর্বজ্ঞর পিছনে পিছনে? কিন্তু এ-বিষয়ে সে কাউকে কিছু বলেনি তো! কেন এই লুকোচুরি? আমার মনে ডাক্তারের আচরণের একটাই ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। ডাক্তার লুকিয়ে লুকিয়ে বৈজ্ঞানিককে অনুসরণ করে যায় পাহাড়ের দিকে। তারপর তাকে সরিয়ে দিয়ে হাত করেছে সর্বজ্ঞর আবিষ্কার সেই নীল অর্কিড। অর্কিড হয়তো সর্বজ্ঞর সঙ্গে ছিল। কিংবা ওটা ডাক্তারের কাছে গচ্ছিত রেখে তিনি অভিযানে বেরিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ না থাকলে সেক্ষেত্রে ডাক্তার হবে ওই অর্কিডের মালিক। কারণ আর কেউ জানে না এই আবিষ্কারের কথা।

মামাবাবু মুখ তুললেন।—'মিঃ মার্কো, মনে হচ্ছে ওই পাহাড়িদের গ্রামেই এই রহস্যের শেষ সূত্রটি লুকিয়ে আছে। আমি নিশ্চিত জানতে চাই ডাক্তারের সঙ্গে সর্বজ্ঞর ওখানে দেখা হয়েছিল কিনা? না অন্য কোনো দুর্ঘটনায় পড়েন সর্বজ্ঞ। যদি বুঝি ডাক্তার কেন্টই বৈজ্ঞানিকের মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাহলে'—মামাবাবু দাঁতে দাঁত চাপলেন।

—'এখন আমি ওই পাহাড়ি ইন্ডিয়ানদের কাছে যাব। আপনি কি যাবেন সঙ্গে? আপনার যা খুশি।'

মার্কো উত্তর দিল, 'আলবৎ যাব। এমন মিস্ট্রির শেষ অধ্যায়ে আমি কি বাদ পড়ব? সে হতেই পারে না।'

ছয়

পাহাড়ি ইন্ডিয়ানদের সম্বন্ধে মার্কো যে রিপোর্ট আনল তা বেশ ভয়ের। ওরা দুর্দান্ত জাত। অন্য উপজাতির সঙ্গে মোটে মেলামেশা নেই। বিদেশি কেউ ওদের এলাকায় যাওয়া পছন্দ করে না। অনেকে ওই অঞ্চলে গিয়ে আর ফেরেনি। কদাচিৎ ওদের নদীপথে দেখা যায়। হিথ নদীর পশ্চিম পাশে কয়েকটা জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় আছে, তারই একটায় ওদের বাস।

টম ও অন্য মাঝিরা অনিচ্ছা প্রকাশ করল ওই এলাকায় যেতে। ঠিক হল ওরা এইখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। শুধু আমরা চারজন যাব একটা নৌকো নিয়ে।

পরদিন সকালে আমরা যাত্রা করলাম। বিকেল নাগাদ ডান দিকের এক শাখানদীতে প্রবেশ করলাম। এই স্রোতধারাই আমাদের পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে যাবে।

ক্ষীণ জলধারা এঁকেবেঁকে চলেছে। জল কম, কিন্তু স্রোত প্রখর। দুধারে ঝুঁকে পড়েছে গাছপালা। যেন উদ্ভিদে তৈরি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চলেছি। ধারে কাছে জনমানবের চিহ্ন নেই। মানুষের কোলাহল, গাড়ির আওয়াজ, ইলেকট্রিক আলোর ঝলমলানি—এসব যেন স্বপ্নের বস্তু।

নিজেরা দাঁড় বাইছি। বারবার জলপ্রপাতের বাধায় ভীষণ অসুবিধায় পড়তে লাগলাম। তখন আমরা জলে নেমে ধার দিয়ে ক্যানু ঠেলে নিয়ে চলতে লাগলাম।

প্রথম রাতে এক উপদ্রব ঘটল। ভোরবেলা হ্যামক থেকে নেমে ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখি ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। মার্কো পরীক্ষা করে বলল, ‘এ ভ্যাম্পায়ার ব্যাট-এর কীর্তি।’ তাড়াতাড়ি এলাকাটা পেরিয়ে গেলাম।

পরদিন দুপুরে সুনন্দ এক কাণ্ড করে বসল। নদীতীরে ঘাসের ওপর শুয়ে চোখ বুজে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি সবাই, হঠাৎ সুনন্দর চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। মার্কো মুহূর্তে রাইফেল তুলেছে। পরক্ষণেই সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। দেখি একটা ভাল্লুকের মতো জন্তু, কিন্তু মুখে ছোট্ট শুঁড়, বনের মধ্যে পালাল। সুনন্দ স্তম্ভিতভাবে প্রশ্ন করল—‘কী ওটা?’

‘অ্যান্টইটার।’ জানাল মার্কো।

‘ওঃ, আমার আঙুল সুড়সুড় করে উঠল। আমি ভাবলাম বুঝি—’

‘বুঝেছি, ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। কিন্তু জেনে রাখো, রক্তপায়ী বাদুড় দিনে বেরোয় না। নিশ্চয় পিঁপড়ে উঠেছিল তোমার পায়ে, এ-বেচারা লম্বা জিভ দিয়ে সেগুলো খাচ্ছিল। উপকার করতে গিয়ে তোমার লাথি খেয়েছে।’

তিন দিন, তিন রাত কাটল। উঃ, কী কষ্টকর যাত্রা! বারবার জলে নেমে নৌকো টানতে গিয়ে পাথরে পা কেটে ক্ষতবিক্ষত হল। মশা-মাছির আক্রমণে হাত-মুখ উঠল ফুলে। চতুর্থ দিনে দেখলাম নদী দুই ধারায় ভাগ হয়ে গেছে। সোজা পথটা নিলাম বেছে। মাইলখানেক এগোবার পর বিরাট এক জলাভূমির ভিতর গিয়ে পড়লাম। অগভীর জলা। ওপারে পাহাড়, ঘন বনে ঢাকা। এই জলা পেরিয়ে পাহাড়ে পৌঁছনো যায় কিনা আলোচনা করছি, মার্কো চেঁচিয়ে উঠল—‘সাবধান, সাপ!’

আশেপাশে লক্ষ করে শিউরে উঠলাম। জলে অগুনতি সাপ। ভয়ানক বিষধর ‘জারারাকা’ সাপের বিচরণক্ষেত্রে এসে পড়েছি। নৌকোর চারধারে হিস্ হিস্ গর্জন। প্রকাণ্ড লম্বা কয়েকটা সাপ নলখাগড়ার গা বেয়ে নৌকোয় লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। সপাং সপাং লাঠি চালালাম। সাপগুলো লাঠির ঘায়ে একটু দূরে সরে যেতে কোনোরকমে নদীতে পালিয়ে গেলাম। মাত্র আধঘণ্টা কেটেছিল ওই জলায়, কিন্তু সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি কখনও ভুলব না।

পরদিন নদীর দ্বিতীয় ধারাটা অনুসরণ করে আমরা এগোলাম।

আমাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা অপেক্ষা করছিল।

পরদিন সকালে সুনন্দকে নদীতীরে রেখে আমি, মার্কো ও মামাবাবু বনের ভিতরে গিয়েছিলাম। সুনন্দর ডান হাঁটু পাথরে ঘা লেগে ফুলে উঠেছিল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, তাই

যায়নি আমাদের সঙ্গে। মার্কো খাবার জন্য কয়েকটা পাখি শিকার করল। মামাবাবু একরকম ছোট্ট বাঁদর মারমোসেট-এর ধরন-ধারণ লক্ষ করলেন অনেকক্ষণ ধরে। এইভাবে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে নৌকোয় ফিরে আমরা চমকে উঠলাম। নদীতীরে আমাদের জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড অবস্থায় ছড়ানো। নৌকোটা উল্টিয়ে পড়ে আছে পাড়ে।

আর সুনন্দ নেই!

'সুনন্দ! সুনন্দ!' অনেক ডাকাডাকি করলাম। কোনো সাড়া মিলল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু সুনন্দকে পাওয়া গেল না।

মার্কো জমি পরীক্ষা করে বলল, 'ইন্ডিয়ানরা এসেছিল নৌকো করে। ওরা নিশ্চয় সুনন্দকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখছি। কিছু জিনিসও চুরি করেছে লোকগুলো। তবে রক্তের দাগ দেখছি না। সম্ভবত সুনন্দ তেমন আহত হয়নি। বন্দী করে নিয়ে গেছে ওকে।'

মামাবাবুর মুখ পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠল। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'চলো, এখুনি বেরোই। ইন্ডিয়ানদের ধরতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে ওদের আস্তানা। হয়তো তাড়াতাড়ি করলে সুনন্দর প্রাণ বাঁচাতে পারব।'

তখুনি নৌকো নামালাম জলে। প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগলাম। মার্কো একবার বাঁকা হেসে বলল, 'জানো অসিট, অনেকদিন শিকার প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। অকারণ প্রাণিহত্যা আর করি না। কিন্তু সুনন্দকে যদি ফিরে না পাই, ওই পাহাড়ি ইন্ডিয়ানগুলোকে আমি এমন শিক্ষা দেব!' মার্কোর চোখ দুটো যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল।

বুঝলাম, এই আমুদে রসিক লোকটির মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা দুর্দান্ত মানুষটা আবার জেগে উঠেছে।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ক্ষতি হল। হঠাৎ পাথরে ঠোক্কর লেগে নৌকোর তলা গেল ফেঁসে। এবার হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। মার্কো বলল, 'ফেরার সময় একটা ভেলা তৈরি করে নেব, অবশ্য যদি ফিরি।'

নৌকো তীরে তুলে রাখলাম। ভারী জিনিস সব বাক্সবন্দী করে সেখানে রেখে দেওয়া হল। বাকি জিনিস পিঠে নিয়ে হাঁটা দিলাম। আমার মনে কেবল একটা চিন্তাই ঘুরছে—সুনন্দ নেই। কী হল সুনন্দর? আবার তার সঙ্গে দেখা হবে তো? সমস্ত ব্যাপারটা যেন ভারি অবাস্তব মনে হচ্ছে। ও কি সত্যি হারিয়ে গেল চিরকালের মতো? তাহলে আমিই বা ফিরব কোন মুখে? সুনন্দর সঙ্গে বহু দিনের বন্ধুত্বের কত টুকরো টুকরো স্মৃতি ভেসে ওঠে মনে।

মামাবাবু একটা টিনের কৌটো কুড়িয়ে পেলেন। বায়ুশূন্য মাংস রাখার টিন। অর্থাৎ কোনো শহুরে মানুষের পদার্পণ ঘটেছিল কিছুকাল আগে। কে সে? হয়তো বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ। এই পথে গিয়ে তিনি হারিয়ে গেছেন, বুনো পাহাড়ি ইন্ডিয়ানদের খোঁজে। সুনন্দও পড়েছে তাদের খপ্পরে।

আমাদের অদৃষ্টেও জানি না কী অপেক্ষা করে আছে ওই অজ্ঞাত বনভূমির নিষিদ্ধ এলাকায়!

আরও দুর্ভোগ লেখা ছিল কপালে।

আকাশে কালচে মেঘ জমছিল সকাল থেকে। বিকেল নাগাদ ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে নামল প্রবল বৃষ্টি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নদী ফুলে-ফেঁপে কূল ছাপিয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে নদীতীর ছেড়ে বনের ভিতর সরে গেলাম।

বৃষ্টির ছাঁট আর সূর্যালোকে ভালো দৃষ্টি চলে না। প্রকৃতির এই তাণ্ডবে বনের সব পশু-পাখি নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছে। শুধু বুঝি আমরা তিনটি মানুষ বাইরে বেরিয়েছি। ওয়াটারপ্রুফ মুড়ি দিয়ে সতর্কভাবে পা ফেলছি—ছপ্ ছপ্ ছপ্। সামনে মার্কো, পিছনে মামাবাবু ও আমি। পায়ের নিচে কোনো চোরা গর্তে যে কোনো সময় তলিয়ে যেতে পারি। ফোঁস করে মাথা তুলতে পারে কোনো হিংস্র সরীসৃপ। লা-মন্টানার ট্রপিকাল অরণ্য যেন তার সমস্ত দুর্গমতা দিয়ে আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করছে। সুউচ্চ বৃক্ষকাণ্ডগুলিকে পাশ কাটিয়ে, ঝোপঝাড় সরিয়ে ধীরে ধীরে এগোই।

ক্রমে পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলাম।

সন্ধ্যা নেমেছে, দিনের সব আলোটুকু গেছে মুছে। টর্চের আলোর রেখার দুপাশ থেকে জমাট অন্ধকার যেন চেপে আসে। ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝিলিকে আকাশ যাচ্ছে চিরে, সঙ্গে কানে তালা-ধরানো মেঘ-গর্জন।

পাহাড়ের তলায় ঘন বাঁশঝাড়। বাঁশের তীক্ষ্ণ ডগাগুলিকে সাবধানে এড়িয়ে চলি। মার্কো বলল, একটা গুহা খুঁজি, নইলে সারা রাত ভিজতে হবে।'

পাহাড়ের গায়ে পিছল পাথরের ওপর দিয়ে খানিকটা উঠে সৌভাগ্যক্রমে একটা গুহা পেলাম। ভিতরে আলো ফেলতেই দুজোড়া সবুজ চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। অপোসাম। খটাশ জাতীয় প্রাণী। জন্তু দুটো আমাদের দেখে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। দুর্যোগের রাতে তারা আশ্রয় ছাড়তে চাইছে না। যা হোক টর্চের তীব্র আলোয় ভয় পেয়ে তারা বাইরে পালাল।

চট করে স্টোভ জ্বেলে কফি বানিয়ে ফেললাম। গুহার মধ্যে কয়েকটা পোড়া কাঠ পড়েছিল। কেউ আগুন জ্বেলেছিল। সেগুলো ধরিয়ে রাখলাম গুহার মুখে। যাতে বুনো জন্তু না ঢোকে। সবাই নীরব, অবসন্ন। প্রিয়জনকে হারানোর দুঃসহ আশঙ্কা ক্রমে চেপে বসছে বুকে। শুধু মার্কো মাঝে মাঝে উৎসাহ দিচ্ছিল আমায়। বলছিল, 'আরে ভয় পেও না, সুনন্দকে ঠিক ফিরিয়ে আনব, দেখ।' যদিও জানি, সত্যি সত্যি এমন ভরসা সেও করতে পারছিল না।

একটু পরে গুহার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে আকাশ দিব্যি পরিষ্কার। কিন্তু সারাদিন ঘুরেও পাহাড়ি উপজাতির দর্শন পেলাম না। সন্ধে নাগাদ একটা ছোট সমতল জায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছি, পায়ে ব্যথা, শরীর অবসন্ন। সহসা খেয়াল হল অনেকগুলি ছায়ামূর্তি আমাদের ঘিরে ধরেছে। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে কাঠ হয়ে গেলাম। বুনো রেড-ইন্ডিয়ান! প্রত্যেকে ধনুকে তির লাগিয়ে কান অবধি ছিলা টেনে আমাদের দিকে তাক করে আছে। আস্তে আস্তে মাথার ওপর হাত তুললাম।

মার্কো দেশি ভাষায় চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'আমরা শত্রু নই। বন্ধু।' কিন্তু তাদের ভাবগতিকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হল না। তাদের মুখ কঠোর, চোখে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি। একজন এসে আমাদের বন্দুক ও পিস্তলগুলি নিয়ে নিল। অর্থাৎ আগ্নেয়াস্ত্রের মহিমা এরা জানে। তারপর তারা আমাদের হাত-পা শক্ত করে বাঁধল দড়ি দিয়ে। নিরুপায় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লাম।

কয়েকজন রেড-ইন্ডিয়ান আমাদের পকেট পরীক্ষা করতে লাগল। কিছু কিছু পছন্দসই জিনিস তারা বাজেয়াপ্ত করে এক জায়গায় জড়ো করে রাখল। বাকি জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিল। একজন মামাবাবুর ব্যাগ খুলেই এক চিৎকার। তার হাতে দেখি বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর ফোটোখানি।

এরপর তারা উত্তেজিতভাবে আলোচনা শুরু করল। হাতে হাতে ঘুরছে ফোটোটা। মামাবাবু বললেন, 'সর্বজ্ঞকে ওরা চিনতে পেরেছে। ইস্, যদি কথা বলা যেত!'

কিন্তু কোনো কথাবার্তা বলতে ওরা রাজি নয়।

একটু পরে একজন ভারিক্কি চেহারার লোক এসে উপস্থিত হল। তার গায়ে রঙচঙে সুতির আলখাল্লা, মাথায় পালকের মুকুট। হয়তো দলের সর্দার। সে ফোটোখানা হাতে নিয়ে দেখল। তারপর আমাদের তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করে আবার ফিরে চলে গেল।

এইভাবে বন্দী হয়ে পড়ে রইলাম সারারাত। ইন্ডিয়ানরা আমাদের পাহারা দিতে লাগল। 'কী গো বীরপুরুষেরা! লাগছে কেমন?' মার্কোর চোখে হাসির ঝিলিক। তারপরই মার্কোর কণ্ঠে কেমন যেন আবেগ ফুটল,—'ভাই অসিট, তোমাদের অনেক ঠাট্টা করেছি। কিন্তু সত্যি বলছি মনে মনে তোমাদের আমি বীরপুরুষ বলে স্বীকার করেছি। তোমরা সত্যি অসাধারণ সাহস ও ধৈর্য দেখিয়েছ। ব্রেভ ইয়াংম্যান।'

তারপর একটু থেমে মুচকি হেসে বলল, 'হয়তো আর অভিনন্দন জানাবার সুযোগ পাব না তাই বলে রাখছি। হাত খোলা নেই, ফলে হ্যান্ডসেক করতে পারলাম না। সরি! আর বড় দুঃখ হচ্ছে, সুনন্দর সঙ্গে বুঝি আর দেখা হল না।'

মার্কোর কথায় বুঝলাম আসন্ন বিপদের গুরুত্ব জিজ্ঞেস করলাম—'এরা কী করতে চায় আমাদের নিয়ে?'

'ঠিক বুঝছি না। মনে হয় মতলব ভালো নয়। জীবনে অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। মরণের ফাঁদ কেটে বেরিয়েও গেছি। যদি বুঝি সত্যি এরা আমাদের হত্যা করতে চায়, তা হলে এবারও চেষ্টা করব।'

'কীভাবে?'

'হাতের বাঁধন আমি ঠিক খুলে ফেলব। তারপর পা। ওই দেখ ঢিপির ওপরে আমাদের বন্দুক আর পিস্তলগুলো। প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে যদি একবার ওই গুলিভরা বন্দুক বা পিস্তল হাতাতে পারি তাহলে একচোট লড়ব। অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচব কিনা বলা শক্ত। এদের তিরের ফলায় থাকে মারাত্মক কুরারি বিষ। একবার রক্তে মিশলে আর রক্ষে নেই।'

মামাবাবু যেন নির্বিকার। শুধু একবার মার্কোকে বললেন, 'এই ইন্ডিয়ানদের চেহারা আর পোশাক দেখেছ? অন্য উপজাতির থেকে আলাদা। বেশ সুশৃঙ্খল জাত।'

মার্কো বলল, 'হ্যাঁ। আপশোস হচ্ছে এদের ছবি তুলতে পারলাম না।'

ভোরের দিকে একটু ঝিমুনি এসেছিল। অপরিচিত কণ্ঠে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে চমকে তাকালাম।—'আরে প্রোফেসার ঘোষ আপনি!'

একি, ভূত দেখছি নাকি!

সেই শীর্ণ মুখ, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ। সেই টিয়াপাখির মতো বাঁকানো নাক, চিবুকে একগুচ্ছ দাড়ি। ফোটোতে এ-মুখ বারবার দেখে মনে গেঁথে গেছে। তাই লোকটিকে চিনতে ভুল হল না। ইনি স্বয়ং বৈজ্ঞানিক সত্যনাথ সর্বজ্ঞ।

সাত

বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞকে দেখে আমাদের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোনো কথা বেরোল না। তারপর মামাবাবু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনি বেঁচে আছেন!'

সর্বজ্ঞ বললেন, 'সশরীরে এবং সুস্থ দেহে। কিন্তু আপনাদের এ কী অবস্থা!' সর্বজ্ঞ ইশারা করা মাত্র রেড-ইন্ডিয়ানরা আমাদের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল। মামাবাবু বললেন, 'আপনি এখানে কী করছেন? আপনি কি স্বেচ্ছায়—?'

'হ্যাঁ, আমি স্বেচ্ছায় এসেছি এখানে। বিশেষ কাজ। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আমি চাই।'

'বেশ, বলুন।'

'আমার এই ফোটো আপনাদের হাতে এল কী করে?'

'রূপা আমায় দিয়েছে।'

'ও, রূপা বুঝি আপনাকে আমার খোঁজ করতে বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটাকে ইঙ্গিত দেওয়াই আমার ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা প্রোফেসর ঘোষ, আমি যে এখানে আছি এ-সন্ধান আপনি পেলেন কীভাবে?'

মামাবাবু, ভিক্টরের তোলা ফোটোয় সর্বজ্ঞর টুপি ও টাই-এর কথা, র‍্যাপসোদের মুখে এই পাহাড়ে সর্বজ্ঞর আগমনের খোঁজ পাওয়া ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ অল্প কথায় জানালেন।

বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এত আঁটঘাট বেঁধে কাজে নেমেও দেখছি কতগুলো খুঁত থেকে গেছে।'

মামাবাবু বলে উঠলেন, 'ডক্টর সর্বজ্ঞ, একটা কথা। আমার ভাগনে সুনন্দকে এই ইন্ডিয়ানরা ধরে এনেছে, দয়া করে ওদের জিজ্ঞেস করুন সে কোথায়, কেমন আছে?'

'সেকি!' সর্বজ্ঞ তৎক্ষণাৎ ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। একটু পরে ফিরে মামাবাবুকে বললেন, 'বেঁচে আছে আপনার ভাগনে। ভালোই আছে। যদিও বন্দী। আমি তাকে এক্ষুনি এখানে আনতে বলেছি।'

কয়েকজন ইন্ডিয়ান দেখলাম চলে গেল পাহাড়ের পথে। আঃ! আমাদের মনের ওপর থেকে কী ভীষণ যে ভার নেমে গেল!

মামাবাবু বললেন, 'ডক্টর সর্বজ্ঞ, আপনার এই অজ্ঞাতবাসের কারণ জানতে পারি কি?'

সর্বজ্ঞ বললেন, 'সবই আমি বলব, কিন্তু এখন এখানে নয়। আপনাদের আমার সঙ্গে যেতে হবে একটা জায়গায়। কিন্তু আপনাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমি যতদিন না নিজে থেকে আত্মপ্রকাশ করি, ততদিন আমার এই অজ্ঞাতবাসের বা এখানে যা দেখবেন এবং যা শুনবেন তার কণামাত্র খবর কাউকে জানাতে পারবেন না। মনে রাখবেন তাতে আমার গবেষণার ক্ষতি হবে। এ-ব্যাপারে আপনি সম্মত কিনা বলুন।'

'রাজি,' মামাবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, 'আপনি সুস্থ দেহে বর্তমান এইটুকু জেনেই আমি সন্তুষ্ট। আপনার সব খবর আমরা সম্পূর্ণ গোপন রাখব। মার্কো, আশা করি আমার কথায় আপনি সায় দেবেন?'

'আলবাৎ,' বলল মার্কো। আমিও মামাবাবুকে সমর্থন জানালাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলাম। সর্বজ্ঞ মামাবাবুর কাছে কিছু পরিচিত বিজ্ঞানীর খবরাখবর নিতে লাগলেন। সহসা বনের ভিতর কাদের পায়ের শব্দ? উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকি। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন ইন্ডিয়ান এবং তাদের মাঝে সুনন্দ।

আমি লাফ দিয়ে গিয়ে সুনন্দকে জড়িয়ে ধরলাম। মামাবাবু তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'অত্যাচার করেনি তো?'

'না।' সুনন্দ উত্তর দেয়, 'তবে বড্ড জোরে বেঁধে রেখেছিল, হাতে-পায়ে কালশিরা পড়ে গেছে।'

'তোকে নিয়ে কী করত ওরা?' আমি জানতে চাই।

সুনন্দ ক্ষীণ হেসে বলল, 'নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড দিত। তবে কী উপায়ে মারবে বোধহয় ঠিক করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, তাই নিয়ে বেজায় তর্কাতর্কি চলছে।'

মার্কো হ্যান্ডসেক করে বলল, 'ব্রাদার সুনন্দ, আমাদের ফাঁকি দিয়ে একা বেড়াতে যাওয়া তোমার কিন্তু উচিত হয়নি। যাক, আপাতত এককাপ কফি খাবে নাকি?'

'না না, শুধু কফি নয়, সুনন্দ কাতর স্বরে বলে ওঠে, 'কিছু খাবার দাও। কিচ্চু খাইনি। কী একটা খেতে দিয়েছিল, খেতে পারিনি। বাপ্‌রে কী ঝাল!'

সুনন্দর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। সুনন্দ অনেক ধন্যবাদ জানাল তাঁকে।

গরম কফি খেয়ে আমরা বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর সঙ্গে রওনা দিলাম।

পাহাড়ের অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে প্রায় ঘণ্টা তিন চলার পর দুই পাহাড়ের মাঝে এক সমতলভূমিতে পা দিয়ে আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

আশ্চর্য দৃশ্য। ছোট মালভূমিতে এক প্রস্তরনগরীর ধ্বংসাবশেষ। প্রাসাদ, প্রাচীর, বেদি, সোপানশ্রেণি মিলিয়ে প্রাচীন নগরীর কঙ্কালকে ঢেকে ফেলেছে আগাছা, লতা, আর বড় বড় গাছ। মামাবাবু বললেন, 'এ যে আর এক মাচুপিচু। অদ্ভুত ব্যাপার!'

বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ বললেন, 'ঠিক ধরেছেন। মাচুপিছু থেকে যারা পালিয়ে এসেছিল খুব সম্ভব তারাই এ নগর তৈরি করে। মাচুপিচুর শেষদিনের ইতিহাস মনে করুন। ইংকা রাজা টুপাক আমারু স্প্যানিয়ার্ডদের তাড়া খেয়ে মাচুপিচু ত্যাগ করে পালাল। কিন্তু কিছু দূর এসে সে ধরা পড়ল। ধরা পড়েছিল বলা উচিত নয়, সে আত্মসমর্পণ করেছিল। স্প্যানিয়ার্ডরা তাকে কুজকোয় নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। কিন্তু রাজার সঙ্গীরা সবাই নিশ্চয় বিদেশিদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়নি। তারা কেউ কেউ দুর্ভেদ্য আমাজনের বনে পালিয়ে যায়। আমার বিশ্বাস তারাই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। গড়ে তুলেছিল এই নগর। জানি না কতকাল তারা এখানে বাস করেছিল? কীভাবে তারা লুপ্ত হয়ে গেল?'

হঠাৎ সর্বজ্ঞ সুর পাল্টালেন।—'দেখুন প্রোফেসর ঘোষ, একটা ইংকা ধ্বংসাবশেষ নিয়ে রিসার্চ করতে আমি এখানে পড়ে নেই। আমার উদ্দেশ্য অন্য। চলুন পাহাড়ের ওপাশে।' সর্বজ্ঞ আমাদের সঙ্গে নিয়ে চললেন।

—'ওই দেখুন, ওগুলো ছিল প্রাচীন ইংকা চাষের ক্ষেত।'

কিছু দূরে পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো চাতাল কাটা রয়েছে। সর্বজ্ঞ সেই দিকে হাত বাড়িয়ে দেখালেন। চাতালে নানারকম গাছ ও ঝোপ জন্মেছে। সর্বজ্ঞ বললেন, 'এই ক্ষেত ছাড়াও পাহাড়ের পাদদেশে জঙ্গল সাফ করে ইংকারা কিছু ক্ষেত বানিয়েছিল। বাগান করেছিল। এখন অবশ্য সব জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে। আমি এদের সেইসব ক্ষেত এবং বাগান খোঁজ করে আট-দশ রকম সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ফল-মূল-তরকারি পেয়েছি।

'প্রথমবার এসেই আমি ইন্ডিয়ানদের নানারকম নতুন ফল-মূল খেতে দেখি। তাদের প্রশ্ন করে আবিষ্কার করি এই ইংকা ক্ষেত এবং বাগানের সন্ধান। জানেন তো ইংকা জাতি ছিল আশ্চর্য প্রতিভাধর কৃষিবিজ্ঞানী। আধুনিককালে আমাদের প্রিয় অনেক ফল-মূল-শস্যই তাদের আবিষ্কারের দান। পেরুর পাহাড়-জঙ্গল থেকে খুঁজে এনে কত যে ফল-মূল-শস্য আর গাছপালাকে তারা মানুষের খাদ্য বা অন্য ব্যবহারে লাগিয়েছিল!'

—'কী কী?' আমি কৌতূহল চাপতে পারি না। ব্যাপারটা খানিক জানলেও ভালো করে জানতাম না আমি।

সুনন্দ ভুরু কুঁচকিয়ে কড়া চোখে তাকায় আমার দিকে। ভাবখানা যেন, এই অতি সামান্য জ্ঞানটুকু নেই তোর! অযথা সময় নষ্ট করছিস।

বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ কিন্তু বিরক্ত হন না। হেসে বলেন, 'শুধু আপনি নন, অনেকেই ব্যাপারটা তেমন বিশদে জানে না। সব কটার নাম মনে পড়ছে না এখন। কয়েকটা বলছি।

এই যেমন— আলু, টমেটো, ভুট্টা, আনারস, পেয়ারা, তামাক, সিঙ্কোনা, রবার, কাকাও মানে যার থেকে কোকো অর্থাৎ চকোলেট হয়'...

মামাবাবু থামিয়ে দেন সর্বজ্ঞকে। বলেন, 'মনে হচ্ছে এখানেও ইংকারা তেমন নতুন কিছু আবিষ্কার করেছিল?'

'হ্যাঁ তাই,' জানান সর্বজ্ঞ, 'পলাতক ইংকারা এই সুদূরে একরকম বন্দী জীবনযাপন করত। গবেষণার নেশায় তখন তারা আমাজনের বন থেকে নানারকম নতুন ফল-মূল উদ্ভিদ সংগ্রহ করে সেগুলি মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করেছিল।'

'এখানকার ইন্ডিয়ানরা বুঝি ইংকাদের আবিষ্কার করা ফল-মূল খায়?' আমি প্রশ্ন করি।

'হ্যাঁ খায়, তবে সব নয়। কয়েকটা মাত্র। সেগুলো তারা চাষও করে। বাকি আবিষ্কারগুলি প্রায় জংলি হয়ে গেছে। তবে ইন্ডিয়ানরা জানে কোন্ কোন্টা খাওয়া যায়। আমি এদের সাহায্যে সেইসব গাছপালা উদ্ধার করেছি। তাদের চারা তৈরি করেছি। আশা করছি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর লোক অনেক নতুন ফল-মূলের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। তবে আমার সবচেয়ে মূল্যবান আবিষ্কার হবে কতকগুলি ভেষজ উদ্ভিদ। পাহাড়ি ইন্ডিয়ানরা ইংকাদের কাছে চিকিৎসার জন্য অনেক গাছ-গাছড়ার ব্যবহার শিখেছে, আর তাদের কাছ থেকে জেনেছি আমি। সেইসব উদ্ভিদ থেকে অনেক দুরারোগ্য রোগের ওষুধ তৈরি হবে ভবিষ্যতে।...এই হল আমার গবেষণা এবং এই জন্যই আমার অজ্ঞাতবাস।'

'এর জন্য অজ্ঞাতবাসের কী প্রয়োজন?' মার্কো একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'কারণ জানিয়ে শুনিয়ে এখানে বেশিদিন থাকলে লোকে সন্দেহ করত। খবরটা রটে যেত। তখন দলে দলে বৈজ্ঞানিক এসে হাজির হত। এবং আমার আবিষ্কারে তারা ভাগ বসাত। এটা আমার পছন্দ নয়। এ-জায়গা আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজব, তারপর আমার আবিষ্কার সমেত আত্মপ্রকাশ করব। বৈজ্ঞানিক গর্বিত ভঙ্গিতে তাকালেন।

'দুর্ঘটনার ব্যাপারটা তাহলে সাজানো?' সুনন্দ জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়। প্রথমবার এখানে এসে দেখে শুনে ম্যালডোনাডোয় ফিরে গেলাম। তারপর প্ল্যান করে আবার অভিযানে বের হলাম। পথে উধাও হলাম লোককে ধোঁকা দিয়ে। কিন্তু তাতেই বা সফল হলাম কই? এই তো ধরা পড়ে গেছি। বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ নিজের ওপর রাগ করে ভুরু কোঁচকালেন।

ফেরার পথে সর্বজ্ঞ দেখালেন, 'এই গাছ চেনেন? কোকা। যার পাতা থেকে কোকেন হয়। ইংকারা এনার্জি বাড়াতে এর পাতা চিবুত। এখানে ইন্ডিয়ানদেরও দেখছি সেই অভ্যেস।'

আর একরকম গাছ দেখালেন সর্বজ্ঞ।—'এই নগরের নির্মাতারা যে মাচুপিচু থেকে এসেছিল তার প্রমাণ এই হুলিকা গাছ। জানেন নিশ্চয় মাচুপিচুর আসল নাম ভিলকাপাম্পা। ভিলকাপাম্পা শব্দের অর্থ যেখানে হুলিকা গাছ জন্মায়। হুলিকা ফলের বীচি গুঁড়ো করে ইংকারা নস্যি নিত এবং তার ফলে নেশা হত। আফিং খেলে যেমন হয়। মাচুপিচু পাহাড়ে এই গাছ আছে। নিশ্চয় ইংকারা এই গাছ সঙ্গে এনেছিল। কারণ আমাজনের জঙ্গলে আর কোথাও হুলিকা গাছ নেই।'

পাহাড়ের গায়ে বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞর ছোট কাঠের বাংলো। সামনে টুকরো টুকরো বাগান করা হয়েছে। একজন দেশি অনুচর থাকে তাঁর সঙ্গে। এই লোকটিই সর্বজ্ঞর সঙ্গে এসেছিল।

সর্বজ্ঞ জানালেন, 'একরকম শাক পেয়েছি। মোটা ডাঁটা। খেতে খুব মিষ্টি। প্রচুর কার্বোহাইড্রেড আছে। নিংড়ে অনেক চিনি পাওয়া যায়। এই শাক আখের চেয়ে সহজে জন্মায়, তাড়াতাড়ি বাড়ে।'

এমনি আরও ইংকাদের আবিষ্কৃত কিছু উদ্ভিদের বর্ণনা দিলেন তিনি। তাঁর ল্যাবরেটরি দেখালেন। দেখলাম ভদ্রলোক অনেক যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

দুপুরবেলা মার্কো ইংকা ধ্বংসাবশেষের ছবি তুলতে চলল। আমি, সুনন্দ আর মামাবাবুও সঙ্গে গেলাম। সর্বজ্ঞ কী একটা কাজ করছিলেন। বললেন, 'আপনারা যান, আমি পরে আসছি। সাবধানে চলাফেরা করবেন, খুব সাপ আছে ওখানে।'

ঘুরে ঘুরে দেখছি সেই মৃত নগরী, হঠাৎ পাহাড়ের গা বেয়ে একজনকে নেমে আসতে দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

—আগন্তুক, ডাক্তার জর্জ কেন্ট।

কেন্ট হাঁক দিলেন, 'হ্যালো প্রোফেসর?' তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করতে করতে বললেন।—'উঃ কী যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল! পথে যদি বিপদে পড়েন!'

মার্কো বলল, 'ডাক্তার, আপনি বুঝি আমাদের ফলো করেছেন?'

'বাধ্য হয়ে। কারণ আপনারা চলে যাবার পর ভেবে ঠিক করলাম, আপনারা নিশ্চয় স্যায়ান্টিস্ট সর্বজ্ঞর খোঁজে বেরিয়েছেন। তাই আপনাদের পিছনে পিছনে রওনা দিলাম। কিন্তু একটা উপজাতি গ্রামে কদিন আটকে পড়ে গেলাম। সেখানে ইয়োলো ফিভার লেগেছে। লোক মরছে। বেচারাদের ছেড়ে আসি কী করে? নইলে আগেই আপনাদের ধরে ফেলতাম। যাক এখন নিশ্চিন্ত।'

বুঝলাম কেন্ট যখন এখানে এসে পড়েছেন, তখন তাঁর দৃষ্টি থেকে সর্বজ্ঞকে আর লুকানো যাবে না। হয়তো ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে সর্বজ্ঞর হদিসও জেনে ফেলেছেন।

আমি দু-পা এগিয়ে গেলাম। ম্যালডোনাডোয় কেন্ট আমাকে যে অপমান করেছিলেন তার জ্বালা আমি ভুলিনি। ভারি মোলায়েম কণ্ঠে বিদ্রূপ মিশিয়ে বললাম, 'জানেন ডক্টর কেন্ট, আমরা বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞকে আবিষ্কার করে ফেলেছি, একবারে সশরীরে এবং সুস্থ দেহে।'

কেন্ট কেমন থমকে গেলেন। বললেন, 'ওঃ, তাই নাকি! ভেরি গুড, ভেরি গুড।'

সুনন্দ ফট্ করে বলল, 'বড্ড হতাশ হলেন তাই না ডাক্তার?'

ডাক্তার কেন্ট ভারি অবাক মুখ করে বললেন, 'হতাশ? আমি? কেন?'

'কারণ আপনি খুব আশায় ছিলেন সর্বজ্ঞ আর ফিরবেন না। ভেবেছিলেন দুর্ঘটনায় নদীতে ডুবে নির্ঘাত অক্কা পেয়েছেন। আহা, ব্যাপারটা সত্যি হলে আপনার কত সুবিধে হত।

হাঃ হাঃ হাঃ...। একটা প্রচণ্ড হাসির গমকে আমরা চমকে পিছনে ফিরলাম। হাসছেন বৈজ্ঞানিক সর্বজ্ঞ। কখন তিনি আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাইনি। আমরা থতমত খেয়ে চেয়ে থাকি। এই অট্টহাসির কারণ ধরতে পারি না। কোনো রকমে হাসি থামিয়ে সর্বজ্ঞ বললেন, 'আরে, আপনারা মস্ত ভুল করেছেন। ডাক্তার আমার সব খবর জানে। ওর সঙ্গে প্ল্যান করেই তো এখানে এসেছি। আর ওই তো আমাকে এই পাহাড়ে নিয়ে আসে।'

'অ্যাঁ!' আমরা অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকাই।

সর্বজ্ঞ বলে চলেন, 'কেন্টের সঙ্গে এই পাহাড়ি ইন্ডিয়ানদের ভাব হয়। হিথ নদীর তীরে সাপের কামড়ে মৃতপ্রায় এই উপজাতির একজনকে চিকিৎসা করে কেন্ট বাঁচিয়ে তোলে। তারপর এদের গ্রামে আসত মাঝে মাঝে। ডাক্তারকে এরা খুব শ্রদ্ধা করে। আমার সঙ্গে ওর হঠাৎ দেখা হয় হিথ নদীতে। আমাদের আগে থেকেই বন্ধুত্ব ছিল। তখন ডাক্তার ফিরছিল এই পাহাড় থেকে। সেইবারেই সে আবিষ্কার করেছে এই ইংকা নগর। খুব উত্তেজিত। আমায় বলল সব। আমি তক্ষুনি ডাক্তারকে নিয়ে পাহাড়ে এলাম ধ্বংসাবশেষ দেখতে। ডাক্তার না থাকলে অবশ্য আমি এই পাহাড়ে ঢুকতেই পারতাম না।'

'কেন?' আমি জানতে চাই।

'কারণ এই ইন্ডিয়ানরা বিদেশিদের এখানে আসতে দিতে চায় না। কিছু স্প্যানিয়ার্ড নাকি একবার অযথা গুলি চালিয়ে ওদের অনেক লোককে মেরে ফেলে। বিদেশিদের ওপর তাই এদের ভীষণ রাগ। অবশ্য যাদের বন্ধু বলে মনে করে তাদের কথা আলাদা।'

'এই ইন্ডিয়ানরা কারা? এদের সঙ্গে কি ইংকাদের কোনো সম্পর্ক ছিল?' এতক্ষণে মামাবাবু কথা বললেন।

'বোধহয় ছিল।' বললেন সর্বজ্ঞ। 'মনে হয় এই উপজাতি ছিল সুসভ্য ইংকাদের অনুগত রক্ষী। ইংকাদের সঙ্গে এদের মেলামেশাও হয়েছিল কারণ এদের মধ্যে অনেক প্রাচীন ইংকা আচার-ব্যবহার আমি লক্ষ করেছি। জানেন, এরা প্রতিদিন ভোরে প্রাচীন ইংকাদের মতো সূর্য দেবতার বন্দনা করে—ও ভিরাকোচা (সূর্যদেব), ও পাচাকামাক (আলোর দেবতা)।'

মামাবাবু ডাক্তার কেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে, তাঁর হাত ধরে বিনীত স্বরে বললেন, 'ডক্টর আপনার কাছে আমি মাফ চাইছি। আপনাকে আমরা অন্যায়ভাবে সন্দেহ করেছিলাম।'

'কেন? কীজন্যে সন্দেহ?' ডাক্তার রীতিমতো অবাক হয়ে বলেন।

মামাবাবু এবার সর্বজ্ঞকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম আপনার নিখোঁজ হওয়ার জন্য ডাক্তারই দায়ী। আপনাকে উনি কোনো কায়দায় পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। পরে এখানে এসে ভাবলাম ডাক্তার হত্যাকারী নয়, কিন্তু আর পাঁচজনের মতো বিশ্বাস করেছেন আপনি দুর্ঘটনায় মারা পড়েছেন।'

'কিন্তু সায়ান্টিস্ট মারা গেলে আমার লাভ? কারণটা দয়া করে বলবেন কি?' কেন্ট অধৈর্যভাবে বলে ওঠেন।

'লাভ সেই মহামূল্যবান ব্লু-অর্কিড। আমরা সন্দেহ করেছিলাম সর্বজ্ঞর অবর্তমানে তাঁর আবিষ্কার ব্লু-অর্কিড আপনি অধিকার করতে চান।'

কেন্ট আঁতকে উঠলেন, 'মাই গড, ব্লু-অর্কিডটা আপনার চোখে পড়েছে? ঠিক এই ভয়েই আমি ওটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। পাছে লোকে আমায় সন্দেহ করে?'

'ব্লু-অর্কিড সম্বন্ধে আপনি জানলেন কী করে?' সর্বজ্ঞ মামাবাবুকে প্রশ্ন করলেন।

'রূপার চিঠি পড়ে।' মামাবাবু জবাব দিলেন।

'ওঃ, মনে পড়েছে। বড্ড কাঁচা কাজ করেছি আমি। মেয়েটা অর্কিড ভালোবাসে, তাই ভাবলাম খুশি হবে। তা ডক্টর, আপনার অত লুকোচুরির দরকার কী ছিল?'

কেন্ট বললেন, 'কারণ আমি চাইছিলাম, আপনি আত্মপ্রকাশ করার পর লোকে এই অর্কিড আবিষ্কারের খবর জানুক। নইলে আপনার এত বড় আবিষ্কার আমার হেফাজতে রেখে আপনি নিখোঁজ হয়েছেন জানলে লোকে স্বাভাবিকভাবে আমায় সন্দেহ করত, আমাকে জেরা করত। ফলে আমি বাধ্য হতাম আপনার অজ্ঞাতবাসের কাহিনি বলে দিতে।'

'তা বেশ, ওটা আপনার আবিষ্কার বলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। আমি তো বারবার বলেছি ও ফুলের প্রকৃত আবিষ্কারক হওয়া উচিত আপনি, আমি নয়।'

ডাক্তার বললেন, 'তা হয় না।'

'কেন হয় না?' ওই অর্কিড পাওয়া গেছে এই পাহাড়ে। এ-পাহাড়ে আপনি আমায় নিয়ে এলেন। দৈবাৎ আমার চোখে পড়ে গেল ফুলটা। নইলে ও-ফুল আপনি পরে ঠিক আবিষ্কার করতেন। আপনি নিয়ে না এলে এখানে আমার আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং এ-ফুলের প্রকৃত আবিষ্কারক ডক্টর জর্জ কেন্ট।'

ডাক্তার দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন।—'না-না।'

সর্বজ্ঞ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'জানেন ঘোষ,' এই ডাক্তারের সব ভালো। শুধু বড্ড এঁড়ে তর্কের বাতিক। সোজা যুক্তি মাথায় ঢোকে না। ঠিক আছে, প্রোফেসর ঘোষ আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি। তৃতীয় পক্ষ। আপনি স্থির করে দিন এই ব্লু-অর্কিডের আবিষ্কারকর্তা কে হবে? আমরা তা মেনে নেব।'

মামাবাবু সর্বজ্ঞকে বললেন, 'আপনি এই ফুল প্রথম পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। দৈবাৎ।'

'তারপর কী করলেন?'

'কয়েকবার গন্ধ শুঁকে ফুলটা আমার জামার পকেটে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম ডাক্তারকে উপহার দেব। ও অর্কিড ভালোবাসে।'

'তারপর?'

'ডাক্তার তো ফুলটা দেখেই উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল। এ-ফুল যে এত মূল্যবান এবং নতুন ধরনের তা আমি ধারণাও করিনি। ডাক্তারের সঙ্গে অনেক খুঁজে ফের বের করলাম ওই অর্কিডের গাছ।

মামাবাবু বললেন, 'যদি ডাক্তার না থাকত তাহলে ওই ফুল নিয়ে কী করতেন?'

'নির্ঘাত ফেলে দিতাম। শৌখিন ফুল বা অর্কিড নিয়ে আমি কোনোকালে মাথা ঘামাই না। তাছাড়া আমার মাথায় তখন ঘুরছে অন্য এক বিরাট আবিষ্কারের চিন্তা।'

মামাবাবু বললেন, 'আমার মতে এই নীল অর্কিডের আবিষ্কারক হবেন আপনারা দুজনে একসঙ্গে। জয়েন্ট ডিসকভারার।'

সর্বজ্ঞ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'বেশ, ডাক্তারের সঙ্গে যদি আমার নামটা জুড়ে দিতে চান, তাই হোক। হ্যাঁ, ডাক্তার রাজি তো? এ-শর্তে ও রাজি না হলে আমি কিন্তু সত্যি চটে যাব।'

ডাক্তারের মুখ লাল। আবেগরুদ্ধ স্বরে বললেন, 'উত্তম। আপনাদের বিচার আমি মেনে নিলাম। এত বড় আবিষ্কারের ভাগ দিলেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ।'

সর্বজ্ঞ তেড়ে উঠলেন, 'বিনয় দেখানো হচ্ছে? বটে! আমার আবিষ্কারে যখন সবাই থ মেরে যাবে, তখন সারা জগৎকে জানিয়ে আমিও ধন্যবাদ দেব ডাক্তার কেন্টকে। মনে থাকে যেন।'

মার্কো বলে উঠল, 'ঝগড়া নয়। ওং শান্তি! শান্তি! দুজনে এবার হাত মেলান।'

ডাক্তার ও সর্বজ্ঞ পরস্পরের হাত চেপে ধরলেন। অমনি ক্যামেরার ক্লিক।

সর্বজ্ঞ রেগে বললেন, 'ছবি তুললেন যে?'

মার্কো বলল, 'ভয় নেই। এ-ফোটো ছাপা হবে আপনার আত্মপ্রকাশের পর।'

সর্বজ্ঞ মামাবাবুকে বললেন, 'রূপাকে বলবেন, তার বাবা তোফা আছে। বছরখানেক পরে ফিরবে। তবে এ-খবর যেন সে গোপন রাখে। ব্যস। কোথায় আছি, কী করছি বলার দরকার নেই।'

গল্পের ফাঁকে ডাক্তার সুনন্দকে বললেন, 'শুনলাম তোমরা দুই ইয়াংম্যান নাকি ভারি ওস্তাদ। র‍্যাপসো বলছিল। ওদের আচ্ছা জব্দ করেছ।'

সুনন্দ বলল, 'সেই দুই বিদ্রোহী সৈনিক? আপনার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, ওদের আস্তানায় গিয়ে আমিই দেখা করেছি। একটা জরুরি খবর জানাতে।'

'কী খবর?'

'বললাম যে জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো এবং তাঁর বিদ্রোহী সৈন্যদের বলিভিয়া সরকার ক্ষমা করেছে। শুনে ওরা খুশি হয়ে দেশে রওনা দিল।'

দুদিন বিশ্রাম নিলাম। সঙ্গে ডাক্তার রয়েছেন, সুতরাং ফেরার ব্যাপারে আমরা নির্ভাবনা। ডাক্তারের দুই অনুচর নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছে নদীতে। তারা আমাদের নৌকো মেরামত করে দেবে।

হিথ নদীর সঙ্গমের কাছে পৌঁছেছি। দেখি একটা ক্যানুর ওপর দাঁড়িয়ে একজন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই রহস্যময় পেড্রো লোপেজ।

আমি বললাম, ডাক্তার কেন্ট, এই লোকটি আমাদের অনুসরণ করছিল।'

'বুঝেছি।' ডাক্তার মাথা নাড়েন। তারপর চেঁচিয়ে ডাকেন, 'ওহে পেড্রো, কেমন আছ? নাঃ, তুমি আবার ভুল করেছ। এরা গুপ্তধনের খোঁজে যায়নি। পাহাড়ি ইন্ডিয়ান গ্রামে ফোটো তুলতে গিয়েছিল। খুব বিপদে পড়েছিল। তুমি যেও না ওদিকে।'

পেড্রো আমতা আমতা করে বলল, 'তবে যে ওরা বলল?'

'কী বলল? কারা?'

'লঞ্চের খালাসিরা। এরা নাকি একটা প্রাচীন নগর আবিষ্কার করতে যাচ্ছে। একটা ম্যাপ পেয়েছে।'

'ঠাট্টা করেছে। বুঝতে পারোনি।' বললেন ডাক্তার।

'অ্যাঁ? ঠাট্টা! আমার সঙ্গে? দাঁড়াও, হতচ্ছাড়া শয়তানগুলোকে দেখাচ্ছি মজা।' পেড্রো ঘুঁষি পাকাল। তারপর ধপ্ করে নৌকোর মধ্যে বসে পড়ল।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার ডক্টর?'

ডাক্তার হেসে বললেন, 'সে এক বিচিত্র কাহিনি। প্রায় দেড়শো বছর আগে পেড্রোর এক পূর্বপুরুষ এই অঞ্চলের জঙ্গলে পাহাড়ের ওপর নাকি এক নগর আবিষ্কার করে। সেখানে ইংকাদের বাস। তাদের অঢেল সোনাদানা। পেড্রোর পূর্বপুরুষ লুকিয়ে দেখেছিল তাদের। কিন্তু সোনা আনতে পারেনি। জংলি ইন্ডিয়ানদের তাড়া খেয়ে কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচে। কাউকে বলেনি সে-খবর। শুধু তার ডাইরিতে লিখে রেখেছিল সব কথা। তার কিছু পরে সেই পূর্বপুরুষ এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এতকাল পরে তার ডাইরি পেয়েছে পেড্রো। ডাইরির পাতা ছেঁড়া, লেখা ধেবড়ে গেছে। তাতে ইংকা নগরীর কোনো ঠিকানা পাওয়া যায়নি। তবু পেড্রো ক্ষেপে উঠেছে। সে আবিষ্কার করবে সেই নগর এবং ইংকাদের ধনরত্ন। পেরুর মন্টানা প্রদেশের কত পাহাড়-জঙ্গল যে সে চষে বেড়িয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। লোকে ওকে খ্যাপায়, তাতে ওর আরও জেদ বাড়ে।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন, 'এবার কিন্তু পেড্রো ঠিক লোককেই ফলো করেছিল। অবশ্য জানি না, ওই পাহাড়ে খুঁজলে ইংকাদের ট্রেজার সত্যি পাওয়া যাবে কিনা?'

ম্যালডোনাডোয় ডাক্তারের বাড়িতে তিনদিন থাকলাম। তারপর গেলাম কুজকো।

কুজকোয় বিদায় নিল মার্কো। এয়ারপোর্টে সে হাত নেড়ে চিৎকার করে বলল—'আদিওস্ (বিদায়) প্রোফেসর। আদিওস অসিট। আদিওস সুনন্দ। সামনের বছর ইন্ডিয়ায় যাচ্ছি, তখন দেখা হবে।'

ঠিক তের মাস পরে একদিন সংবাদপত্রের পাতায় চোখ আটকে গেল। দেখলাম বড় বড় হরফে ছাপা—নিখোঁজ বৈজ্ঞানিক সত্যনাথ সর্বজ্ঞর বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তন।
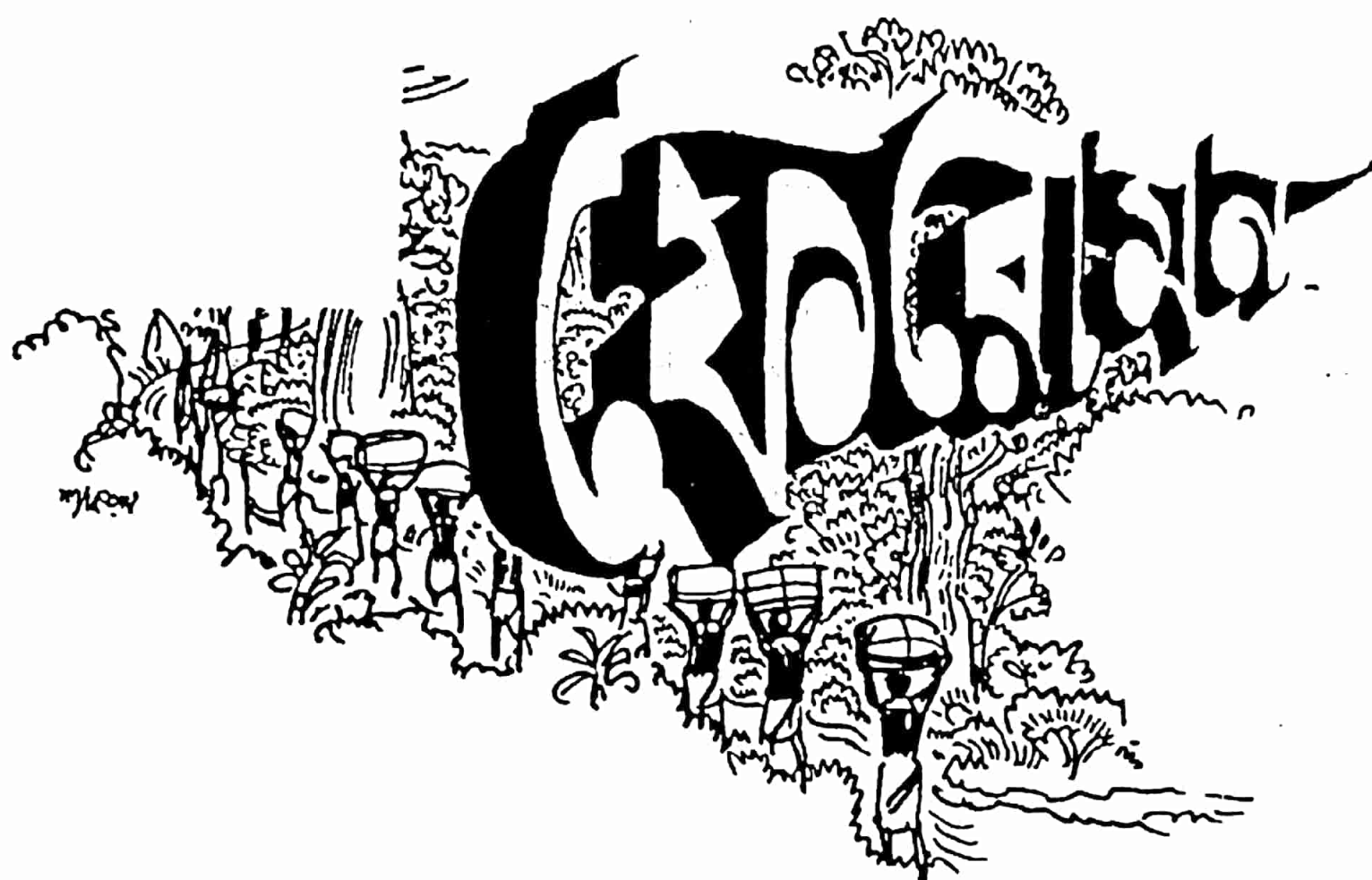
পূর্ব আফ্রিকার ডার-এস-সালাম শহর থেকে সমুদ্রপথে লঞ্চে চেপে আমরা রুফিজি নদীর মোহনার দিকে চলেছি। আমরা মানে প্রাণিতত্ত্ববিদ্ নবগোপাল ঘোষ অর্থাৎ আমাদের মামাবাবু, আমার বন্ধু সুনন্দ, আমি শ্রীমান অসিত ও বিল হার্ডি। আমরা তিনজন ভারতীয় বেশ কিছুদিন ধরে ডার-এস-সালামের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের কিউরেটর ডক্টর হাইনের আতিথেয়তা ভোগ করছি। ইতিমধ্যে আমাদের একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেছে! রুফিজি নদীর মোহনার কাছে একটা দ্বীপে মামাবাবু সরীসৃপ ও পাখির মাঝামাঝি কোনো জীবের এক দুর্লভ প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কার করেন এবং ঘটনাচক্রে সেই ফসিলটা আবার সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যায়। দ্বীপের অধিবাসীরা টাঙ্গানিকার এক গ্রাম থেকে ফসিলটা দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের এই দ্বিতীয় অভিযানের উদ্দেশ্য হল, যে গ্রামে ফসিলটা পাওয়া গিয়েছিল, তারই আশেপাশে ওই রকম আরও অন্য ফসিলের অনুসন্ধান করা। মামাবাবুর বিশ্বাস ছিল, বিল হার্ডি ওই গ্রামে যাবার একটা সহজ রাস্তা বাতলে দিতে পারবেন, কারণ সে ওই গ্রামে গিয়েছিল। সেই রকমই অনুরোধ করে একটা চিঠি পাওয়ামাত্র বিল ডার-এস-সালামে চলে আসেন এবং তার পরদিনই আমরা রওনা হয়ে যাই। এখানে বলা দরকার—হার্ডি নামক এই শ্বেতাঙ্গ শিকারী পর্যটকটি সারা পূর্ব আফ্রিকায় ডেয়ারিং বিল নামে খ্যাত। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়টাই তিনি আফ্রিকা মহাদেশ চষে বেড়িয়েছেন। দীর্ঘ ঋজু বলিষ্ঠ চেহারা, বয়স পঞ্চাশের উপর, কিন্তু কানের পাশে সামান্য কয়েকটা পাকা চুল ছাড়া কোথাও প্রৌঢ়ত্বের ছাপ নেই।

মামাবাবু এতক্ষণ ডেকে বসে ভারি মনোযোগ দিয়ে 'জুওলজি' পত্রিকা পড়ছিলেন, এখন সেটা বন্ধ করে প্রায় আপন মনেই বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য আবিষ্কার...ফেরোমন!'

বিল হার্ডি কিছুদূরে ঠোঁটে পাইপ কামড়ে চোখ বুজে লঞ্চের রেলিং-এর উপর পা তুলে বসে আছেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। মামাবাবুর সঙ্গে নানান জায়গায় নানান অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে আমাদের দুজনের মধ্যেই সেটা বেশ বেশি পরিমাণেই সঞ্চারিত হয়েছে, তাই জিজ্ঞেস না করে পারলাম না—

'ফেরোমন কী জিনিস, মামাবাবু?'

মামাবাবু তাঁর চশমার কাঁচটা রুমালে মুছতে মুছতে বললেন, 'ফেরোমন হচ্ছে প্রাণিদেহ-নিঃসৃত একরকম রাসায়নিক বস্তু। অনেক প্রাণী এর সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে নানারকম যোগাযোগ করে।'

আমি আর সুনন্দ পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করলাম।

'পরিষ্কার হল না?' মামাবাবু মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেশ, আরো সহজ করে বলছি। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর দেহকোষ থেকে এক বা একাধিক রকম লালা বা রস বেরোয়। যে জিনিসটা বেরোয়, সেটা হল কয়েকটা রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ। এগুলোর

প্রত্যেকটির গন্ধ বা স্বাদ একটা বিশেষ সংকেত বহন করে। সেই সংকেতের ভাষা কেবল ওই প্রজাতির প্রাণীরাই বুঝতে পারে। যে রাসায়নিক বস্তুর সাহায্যে এই সাংকেতিক যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে, তাকেই বলে ফেরোমন। কোনো কোনো উন্নত প্রাণী, যাদের মুখের ভাষা আছে, তাদের মধ্যেও বিশেষ প্রয়োজনে ফেরোমনের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, হরিণের মৃগনাভি বা কস্তুরী একরকম ফেরোমন। পুরুষ কস্তুরীমৃগ এর তীব্র সুবাস বাতাসে ছড়িয়ে তার হরিণীকে ডাকে। তবে কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি নিম্নশ্রেণির জীবের ব্যাপারে বলা চলে যে তাদের সামাজিক জীবনটা একেবারে পুরোপুরি ফেরোমন নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন পিঁপড়ে, পিঁপড়ে নিয়েই গবেষণা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। পিঁপড়েরা চোখে দেখে না সেটা জানো বোধ হয়। বিভিন্ন প্রজাতির পিঁপড়ের মধ্যে অন্তত দশ রকম ফেরোমন আবিষ্কার করা গেছে। কোনোটার গন্ধে তারা বিষাদের সংকেত দেয়, কোনোটার সাহায্যে তারা মৃত সঙ্গীকে আবিষ্কার করে। কোনোটা তাদের সার বেঁধে পথ চলতে সাহায্য করে, আবার কোনো ফেরোমনের সাহায্যে তারা সাথীকে কাছে ডাকে।'

ফেরোমনের বৃত্তান্ত শুনে সত্যিই আমাদের অবাক লাগছিল। মামাবাবু কয়েক সেকেন্ড দম নিয়ে আবার বলে চললেন, 'অনেক জাতের পোকা ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে। কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করেও তাদের ধ্বংস করা যায় না। মনে করো, কোনো পোকা ধান নষ্ট করে। আবিষ্কার করা গেল যে ওই জাতের স্ত্রী পোকা ফেরোমনের সাহায্যে পুরুষ পোকাকে কাছে ডাকে। তারপর ল্যাবরেটরিতে ওই ফেরোমনের রাসায়নিক মিশ্রণ আবিষ্কার হল। তৈরি হল কৃত্রিম ফেরোমন। ব্যস, এইবার কৃত্রিম ফেরোমন ধানক্ষেতের একপাশে ছড়িয়ে রেখে দাও। তখন কী হবে? পুরুষ পোকারা ছুটে আসবে কৃত্রিম ফেরোমনের গন্ধ পেয়ে আর সেই সুযোগে তাদের ধ্বংস করে ফেলা যাবে। আমেরিকায় এই উপায়ে প্রতি বছর হাজার হাজার 'জিপসি মথ' ধ্বংস করে শস্য বাঁচানো হয়।'

ফেরোমনের বর্ণনা হয়তো আরো কিছুক্ষণ চলত, কিন্তু বাধ্য হয়ে থামাতে হল। সামনেই শহর দেখা যাচ্ছে। নদীর মোহনায় ছোট্ট শহর, নাম মোহোরো। এই মোহোরো থেকেই আমাদের হাঁটা-পথে এগোতে হবে ফসিলের সন্ধানে। আমরা উঠে পড়লাম।

সাফারির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ডার-এস-সালাম থেকে নিয়ে এসেছিলাম। বিল একটা রাইফেল ও পিস্তল এনেছিলেন। তাছাড়া ডক্টর হাইনের বন্দুকটা আমরা চেয়ে এনেছিলাম। বিল বলেছিলেন, 'শিকার আমি ছেড়ে দিয়েছি। অযথা প্রাণিহত্যা করতে আর ভালো লাগে না। তবে আমাদের মাংসের দরকার হবে, টাটকা মাংস। তাই মাঝে মাঝে টোটা খরচ করব।'

মোহোরো থেকে বিল চারজন চাম্বা পোর্টার ভাড়া করলেন। এরা মালপত্র বইবে। দরকার মতো মাটি পাথর খুঁড়বে। একজন কিছুটা রান্নাও জানে। শহর ছেড়ে পরদিন আমরা উন্মুক্ত প্রকৃতির রাজ্যে পদব্রজে যাত্রা করলাম।

বেশি তাড়াতাড়ি এগোতে পারছিলাম না। একে খারাপ পথ, তার উপর মামাবাবুর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। পথে যেতে যেতে তিনি মাঝে মাঝে আমাদের অপেক্ষা করতে বলছিলেন। নতুন ধরনের পোকা-মাকড়, সরীসৃপ ইত্যাদি দেখে তিনি দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন। চোখে দূরবিন লাগিয়ে গভীর মনোযোগে লক্ষ করছিলেন। কখনও স্পেসিমেনটি জীবিত

বা মৃত অবস্থায় সংগ্রহ না করে ছাড়ছিলেন না। নিজেই দেরি করছিলেন, আবার তারপরই আমাদের 'চলো চলো, এগোও', বলে তাড়া লাগাচ্ছিলেন।

বিল পথ চলতে চলতে আমাদের নানারকম গাছপালা চেনাচ্ছিলেন। আফ্রিকার বনভূমিতে পথ চলার কায়দা-কানুন রপ্ত করাচ্ছিলেন। ছোট-বড় জীবজন্তু দেখিয়ে বোঝাচ্ছিলেন তাদের বয়স, মেজাজ ইত্যাদি।

প্রায় পনেরো মাইল পথ চললাম। একবার মাত্র দুপুরে খেতে থেমেছিলাম। তারপর টানা হণ্টন। সন্ধে নাগাদ তাঁবু ফেললাম। সবাই বেশ ক্লান্ত, রান্নার জোগাড় হতে থাকে। বিল বললেন, 'কাল আমরা নদীর কাছ ছেড়ে বাঁ দিকে বেঁকে যাব। প্রথমে একটা বড় 'স্টেপ' অর্থাৎ তৃণভূমি পড়বে। সেটা পেরিয়ে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। ওইখানেই সেই গ্রাম ছিল। এতদূর অবধি আসতে অসুবিধা হয়নি, তবে স্টেপের মধ্যে দিয়ে দিক নির্ণয় করা একটু কঠিন। যা হোক, মনে হয় ঠিকঠাক পৌঁছে যাব। কতগুলো চিহ্ন আমার মনে আছে।'

মামাবাবু একটা প্যাকিং বাক্সকে টেবিল বানিয়ে কিছু পোকামাকড়ের স্পেসিমেন পরীক্ষা করতে লাগলেন। আমি ও সুনন্দ বিলের কাছে বসে রইলাম গল্প শোনার আশায়।

বিল একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে আরাম করে পা ছড়িয়ে একমনে কিছুক্ষণ পাইপ টানতে টানতে দূরে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আফ্রিকার প্রকৃতিতে মায়া আছে বুঝলে, আজ রাতে চাঁদ উঠবে। তখন দেখবে কি অদ্ভুত রহস্যময় দেশ। এই বিশাল মহাদেশের কতটুকুই বা আজ পর্যন্ত আমরা জেনেছি—এখানকার অসংখ্য জীবজন্তু, গাছপালা, এ দেশের উপজাতিদের রীতিনীতি।'

প্রশ্ন করলাম, 'আপনি প্রথম কবে আফ্রিকায় আসেন?'

'আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে।'

'কী করতে এসেছিলেন? শিকার?'

'দূর দূর! তখন আমি ভালো করে বন্দুক চালাতেই জানতাম না। এলাম স্রেফ খেয়ালে পড়ে।'

'যাঃ! স্কটল্যান্ড থেকে এত দূরে অকারণে?' সুনন্দ প্রতিবাদ জানাল।

'সত্যি বলছি, কিছু ভেবে আসিনি। এসেছিলাম নিছক অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। আফ্রিকা সম্বন্ধে আমার তখন ধারণা ছিল অতি সামান্য, শুধু জানতাম এ এক বিশাল অজানা রহস্যময় দেশ। ঠিক করলাম, যেমন এ দেশের অধিবাসীরা প্রায় খালি হাতে মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, আমিও তেমনি বেড়াব। তারপর একটু একটু করে আফ্রিকাকে চিনলাম। উবুসকু নামে আমার প্রথম উপজাতি যুবক গাইডটি হল আমার গুরু। বন্ধুও বলতে পারো। জানো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার দু-বছর পরও আমি জানতে পারিনি যে, এমন এক সর্বনাশা যুদ্ধ চলছে! মোম্বাসা থেকে কিছু দরকারি জিনিস আনতে একজন পোর্টার পাঠিয়েছিলাম। জিনিস এল খবরের কাগজের মোড়কে। সেই কাগজ পড়ে জানলাম ওয়ালর্ড-ওয়র লেগেছে।'

'বলেন কি! কোনো শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে আপনার দেখাই হয়নি এই দু-বছর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না। কোনো শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে দেখা হয়নি! রেডিও শুনিনি, খবরের কাগজ পড়িনি। এই বিরাট দেশের কয়েকটি শহর এবং বাঁধা পথঘাটের বাইরে বিদেশি লোক বড় একটা পা

বাড়ায় না। আর আমি ঘুরতাম অজানা প্রকৃতি-রাজ্যে। পশু শিকার করে, ছাল বা দাঁত উপজাতির কারো হাতে শহরে পাঠাতাম চিঠি দিয়ে। সে দাম নিয়ে আসত কিংবা বদলে জিনিস কিনে আনত। কখনও শিকারের মাংস বা ছালের বিনিময়ে উপজাতিদের গ্রাম থেকে প্রয়োজনীয় খাবার জোগাড় করতাম। আর আমার জীবনধারণের প্রয়োজন ছিল অতি সামান্য। শুধু ঘুরতাম, প্রাণভরে দেখতাম। শিকার করতাম।'

দুই

পরদিন খুব ভোরে উঠে রওনা দিলাম। সারাদিন হাঁটলাম। কয়েকটা বড় বড় তৃণভূমি পেরোলাম। দেখলাম অজস্র জন্তুর ভিড়—নানারকম অ্যান্টিলোপ হরিণ, জিরাফ, জেব্রা, উটপাখি। একটা গাছের ছায়ায় দেখি কর্তা-গিন্নি দুই বাচ্চা নিয়ে এক সিংহ পরিবার। সিংহ-সিংহী পা ছড়িয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছে, দুটো বাচ্চা পাশে লুটোপুটি করছে। তাদের মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে কতগুলো জেব্রা নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্ছে। বিল বললেন, 'সিংহদের এখন খিদে নেই। তাই জেব্রারা নির্ভয়। সিংহ অযথা শিকার করে না।'

সমতল তৃণভূমির মাঝে মাঝে এক-একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ে গাছপালা খুব কম। ক্ষীণস্রোতা কয়েকটি নদী দেখলাম। উপজাতি গ্রামেরও দেখা পেয়েছিলাম। মাত্র কয়েকটি গ্রামের কাছে আমরা যাইনি।

তৃতীয় দিন ভূপ্রকৃতির চেহারা বদলে গেল। রুক্ষ উঁচু-নিচু মাঠ। পাথুরে জমি। নেড়া ছোট পাহাড়। বাবলাজাতীয় কাঁটাবন। দু-একটা বাওবাব গাছ বেঁটে মোটা শরীরের ওপর ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাসবন কম।

সকাল ৯টা নাগাদ বিল একজায়গায় থামলেন। চারদিক দেখে বললেন—'এইখানে এক গ্রাম ছিল। আমি যে গ্রামে গিয়েছিলাম তাদের সঙ্গে এই গ্রামের লোকেরই যুদ্ধ হয়। দেখছি এ গ্রামও ধ্বংস হয়ে গেছে।'

চারদিকে উঁচু-নিচু মাটির ঢিপি। শুকনো গর্ত। এগুলি কোনো পরিত্যক্ত গ্রামের চিহ্ন সন্দেহ নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা চলে গেল কেন?'

'বোধ হয় জলের অভাবে। গ্রামের পাশ দিয়ে একটা খাল ছিল। দেখ তার শুকনো খাত। টাঙ্গানিকার এ অঞ্চলে জলের বড় অভাব।'

'যে জায়গায় যাচ্ছি সেটা আর কদ্দূর?' মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

'কাছেই। মাত্র মাইল তিনেক।'

আমরা আবার এগোলাম।

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে আমরা উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। এখানেও জনবসতির চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। বিল দেখালেন—'ওই যে কিছু দূরে গ্র্যানিটের স্তূপ দেখা যাচ্ছে, ওর পাদদেশে আমি কালো পাথরের স্তর দেখেছিলাম।'

শিলাস্তূপের কাছে গেলাম। স্তূপের পূর্বদিকে এক বড় গোল চত্বর। চত্বরের পাথরের রঙ কালচে। মামাবাবু দেখে বললেন, 'মনে হয় বহু যুগ আগে এখানে জলাশয় ছিল। কাদামাটি জমে শ্লেট-পাথর হয়ে গেছে। এ ধরনের শ্লেট-পাথরে নানা রকম ফসিল পাওয়া যায়। হঠাৎ কাদায় ডুবে গিয়ে প্রাণিদেহ অবিকৃত অবস্থায় ক্রমে ফসিল হয়ে যায়।'

চত্বরের মাঝখানে বেশ বড় ফাটল। অনেকখানি গভীর। এইখানেই বোধহয় সেই অতি প্রাচীন পাখির ফসিল পাওয়া গিয়েছিল।

ঠিক হল আমরা গ্রামের কাছে তাঁবু ফেলব। কারণ ওখানে জল ছিল। একটা বড় পাথরের গর্তে পরিষ্কার টলটলে জল জমে ছিল। কাল থেকে খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ হবে। মামাবাবু চলে গেলেন খাদটা ভালো করে পরীক্ষা করতে। আমরা তাঁবু খাটালাম, রান্নার জোগাড় করলাম। তারপর কফি খেতে খেতে গল্প শুরু হল।

বিল বললেন, 'আমি যখন কুড়ি বছর আগে এসেছিলাম, তখন জায়গাটা এত রুক্ষ অনুর্বর ছিল না। বেশ ঘাস আর গাছ ছিল।'

'কেন এমন হল?' সুনন্দ বলল।

'ঠিক জানি না। তবে উপজাতিরা অতিরিক্ত গরু-ছাগল চরিয়ে অনেক সময় ওপরের মাটি আলগা করে ফেলে। বৃষ্টি হলে সেই মাটি ধুয়ে পাথর বেরিয়ে পড়ে।'

বিকেলের দিকে বিল রাইফেল নিয়ে বেরোলেন। মাইল দুই-তিন ঘুরে তিনি একটা মস্ত শুয়োর মারলেন। পোর্টাররা শুয়োরটার ছাল ছাড়িয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে তাঁবুতে এসে আগুনে ঝলসাতে শুরু করে দিল। বিল বড় একখণ্ড মাংস নিয়ে নিজের হাতে রোস্ট করলেন। আমরা খেলাম। চমৎকার স্বাদ হয়েছিল।

মামাবাবু, আমি, সুনন্দ এবং তিনজন পোর্টার সকালে সেই কালো পাথরের চত্বরে হাজির হলাম। আমাদের সঙ্গে পাথর খোঁড়ার জন্য গাঁইতি, শাবল, ছেনি ইত্যাদি সরঞ্জাম ছিল। মামাবাবু ফাটলের মধ্যে একটা জায়গা দেখিয়ে দিতে পোর্টাররা পাথর খসাতে শুরু করল। মামাবাবু মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক জায়গায় এইভাবে খোঁড়াখুঁড়ি চলল। কয়েকটা শামুকের ফসিল বের হল। মামাবাবু বললেন, 'সাবধানে কাজ করতে হবে। সময় লাগবে। এ যাত্রায় আমরা যা খুঁজছি পাব কিনা জানি না। তবে জায়গাটায় নানা রকম ফসিল আছে সন্দেহ নেই। এবার না পাই পরে আবার আসব।'

সারাদিন কাজ করে আমরা ফিরে এলাম।

বিল বেরিয়েছিল চারিদিকটা একটু দেখতে। পুরনো গ্রামের চারপাশ ঘুরেছে। একটা ছোট হরিণ মেরে এনেছিল। আমাদের সঙ্গে নানারকম টিনের খাবার আছে কিন্তু পোর্টারদের টাটকা মাংস চাই। সেদিনও বিল নিজের হাতে মাংসের রোস্ট তৈরি করে খাওয়ালেন। বুঝলাম ডেয়ারিং বিল কেবল নামকরা শিকারী নন, পাকা রাঁধুনিও বটে। বিল বললেন, 'বছরের পর বছর বনে-জঙ্গলে মাঠে-ঘাটে ঘুরেছি। শিকারের মাংসই ছিল একমাত্র খাদ্য। সবরকম জন্তুই খেতাম। আর উপজাতির লোকদের কাছে শিখতাম কোন মাংস কী করে রাঁধতে হয়। তার সঙ্গে সভ্য জগতের মশলাপাতি লাগিয়ে জিভে স্বাদ আনতাম। কেমন হয়েছে রান্না?'

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ।

মামাবাবু পোর্টারদের নিয়ে খাদের ভিতর। আমি ও সুনন্দ ওপরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখলাম, শিলাস্তূপের পাশ দিয়ে একজন শ্বেতাঙ্গ এই দিকে আসছে। আশ্চর্য হলাম। হঠাৎ এ কোত্থেকে? ভ্রমণকারী না শিকারী? চাপাস্বরে ডাকলাম—'মামাবাবু, এক সাহেব এদিকে আসছে।'

মামাবাবু তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলেন।

লোকটি ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল।

বেশ লম্বা। বয়সে যুবক। সুপুরুষ। শক্ত জোয়ান চেহারা। পরনে খাকি ফুলপ্যান্ট। রঙচঙে হাফশার্ট। মাথায় শোলার টুপি। লোকটি দরাজ গলায় হেঁকে বলল, 'আপনাদের দেখতে এলাম। এখানে বিদেশি কাউকে দেখব ভাবিনি। খোঁড়াখুঁড়ি করছেন? কিছুর সন্ধান পেয়েছেন নাকি?'

মামাবাবু জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, একটু পরীক্ষা করছি জায়গাটা। এখনও কিছু পাইনি। আপনি?'

লোকটি হেসে উঠল। 'তাই তো, এখনও পরিচয় দিইনি। অভদ্রের মতো প্রশ্ন করছি। অনেক দিন সভ্যজগতের বাইরে কাটাচ্ছি কিনা, ভব্যতা ভুলে গেছি। হ্যাঁ, আমার নাম টেলর। ব্রুস টেলর। পেশা প্রাণিবিজ্ঞান চর্চা।'

মামাবাবু একটু ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন। তাঁর মুখ দেখলাম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আপনিই কি ফেরোমন বিশেষজ্ঞ ব্রুস টেলর? যাঁর প্রবন্ধ এই সেদিন পড়লাম 'জুওলজি' পত্রিকায়?'

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, লেখাটা আমারই বটে। পড়েছেন? কেমন লেগেছে?'

মামাবাবু রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'এ লেখাটা তো দারুণ হৈ-চৈ ফেলেছে বিজ্ঞানীমহলে। ফেরোমন নিয়ে এত গভীর গবেষণা কেউ করেনি। আপনার আর একটা লেখা বোধহয় বছরখানেক আগে 'জুওলজি' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। সেটাও আমি পড়েছি। ফেরোমন যে জীবজন্তু, বিশেষত কীটপতঙ্গের জীবন-যাত্রাকে এতখানি নিয়ন্ত্রিত করে, আগে কেউ ভাবতে পারেনি। অন্তত ভাবলেও, আপনিই প্রথম প্রমাণ দিয়েছেন। আচ্ছা, আপনি লিখেছেন যে, কয়েক রকম শস্যরক্ষায় কৃত্রিম ফেরোমন দ্বারা 'পেস্ট কনট্রোল' সম্ভব। আপনি কি ল্যাবরেটরিতে তেমন কৃত্রিম ফেরোমন তৈরি করেছেন?'

টেলর মৃদু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, করেছি। তাদের ফলাফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে।'

মামাবাবু বললেন, 'যদ্দুর জানি, কয়েকটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু আপনি যাননি। লোকের ধারণা, আপনি একজন রহস্যময় এবং দাম্ভিক ব্যক্তি। যাক, আমার ভুল ভাঙল। আর আপনি যে বয়সে এত নবীন, সেটাও ভাবতে পারিনি।'

টেলর বললেন, 'আমার পরিচয় তো পেলেন। এবার আপনাদেরটা জানতে পারি কি? মনে হচ্ছে, আমরা একই লাইনের লোক।'

মামাবাবু বললেন, 'প্রায় তাই। আমি ভারতীয়। কলকাতায় প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করি। যদিও বিদ্যা অতি সামান্য। নাম—নবগোপাল ঘোষ। এটি আমার ভাগনে সুনন্দ। আর এই ছেলেটি সুনন্দর বন্ধু অসিত। আমাদের সঙ্গে আরও একজন আছেন। আমাদের গাইড। বিখ্যাত শিকারী মিস্টার হার্ডি। তিনি আপাতত বন্দুক নিয়ে কিঞ্চিৎ খাদ্য-সংগ্রহ করতে বেরিয়েছেন।'

টেলর চোখ বড় বড় করে বললেন, 'বাপ্‌রে, আপনি প্রোফেসর! তবে তো বুঝে-শুনে কথা বলতে হবে।'

মামাবাবু বললেন, 'আপনি তো আমার ছাত্র নন যে, নম্বর কাটব। বরং আমি আপনার ছাত্র হতে রাজি আছি।'

টেলর বললেন, 'দলবল বেঁধে এসেছেন যখন, তখন এখানে কিছু পাবার আশা আছে মনে হচ্ছে। কীসের ফসিল? অবশ্য ওই ব্যাপারে আমার বিশেষ উৎসাহ নেই।'

মামাবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, সঠিক কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বেরোইনি। আফ্রিকায় এসেছিলাম কয়েকটা লেকচার দিতে। স্রেফ কেতাবি বক্তৃতা। হাতে ক-দিন সময় পেলাম তাই বেরিয়ে পড়লাম। আফ্রিকা দেখা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সামান্য অনুসন্ধান। যদি লেগে যায় বরাতে, নাম-টাম হয়ে যায়! এত বয়সেও তো তেমন কিছু করে উঠতে পারলাম না। এই পাথরের স্তরটা দেখে মনে হল ফসিল থাকতে পারে। তাই খুঁড়ছি। আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে কত বৈজ্ঞানিক প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব-জন্তুর ফসিল পেয়েছে। তবে আমার আসল লক্ষ্য প্রস্তরচিত্র। আদিম মানবের আঁকা ছবি।'

মামাবাবুর আসল লক্ষ্য শুনে ব্রুস টেলরের মতো আমরাও চমকালাম, এ উদ্দেশ্য তো কখনও টের পাইনি। সুনন্দ ও আমি চোখাচোখি করলাম। বুঝলাম, টেলরের কাছে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য চেপে যাচ্ছেন মামাবাবু।

টেলর চিন্তিতভাবে বললেন, 'রক-পেন্টিং? রকপেন্টিং তো উত্তরে আছে শুনেছি। টাঙ্গানিকার কলডোয়া, কিলোসা, ফেঙ্গা পর্বতে অনেক প্রাচীন চিত্র আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু এধারে কই—'

মামাবাবু বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ, এধারে পাওয়া যায়নি, সেই জন্যেই তো খুঁজছি। পেলে নাম হবে।'

'পেন্টিং আর কোথায় খুঁজছেন? আপাতত তো দেখছি ফসিলের সন্ধানে লেগে গেছেন।' টেলরের কণ্ঠে যেন সামান্য রহস্য।

মামাবাবু হাসেন। 'দেখি কয়েকটা দিন এখানে কাজ করে। কিছু না পাই তো চলে যাব।'

'কোন দিকে যাবেন?' টেলর বলেন।

'ভাবছি দক্ষিণ-পশ্চিমে যাব।'

'দক্ষিণ-পশ্চিমে?' টেলর যেন আঁতকে ওঠেন। 'তেৎসি বেল্টের মধ্য দিয়ে যাবেন? সাধ করে বিপদ ডেকে আনবেন? তাছাড়া ওদিকে কোনো রক-পেন্টিং আছে বলে তো জানি না। বরং সোজা পশ্চিমে যান। ওদিকে অনেক ছোটখাটো পাহাড় আছে। হয়তো পেন্টিং দেখতে পাবেন।'

'দক্ষিণ-পশ্চিমে বুঝি তেৎসি মাছির এলাকা? হুঁ। তাহলে তো বিপজ্জনক রাস্তা।' মামাবাবু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'আপনি ও-এলাকাটা চেনেন?'

'হ্যাঁ, কারণ আমি আপাতত তেৎসি ফ্লাই নিয়ে কিঞ্চিৎ গবেষণা করছি।'

'তাই নাকি?' মামাবাবু উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

টেলর গম্ভীর স্বরে বলেন, 'টাঙ্গানিকার এই অভিশাপকে তাড়ানো যায় কিনা চেষ্টা করছি। আর এ ব্যাপারে ফেরোমন কতটা সাহায্য করতে পারে পরীক্ষা করছি।'

মামাবাবু হঠাৎ বললেন, 'আপনি এখানে কি কোনো রিসার্চের কাজে রয়েছেন? কাছাকাছি কোথাও তাঁবু ফেলেছেন?'

টেলর বললেন, 'না, তেমন কোনো কাজে আসিনি। শ-খানেক মাইল দূরে এক তেৎসি ফ্লাইবেল্ট থেকে ফিরছিলাম, পথে রেস্ট নিচ্ছি। আর আশপাশের ঝোপগুলো পরীক্ষা করছি। কালই পাততাড়ি ওঠাতাম, তবে ইচ্ছে হচ্ছে আপনাদের যখন পেয়ে গেলাম, কাল একবার আড্ডা মারতে আসব। কথা বলার লোক পাই না। পরশু পালাব।'

'আপনার তাঁবু কোন দিকে?'

'ওই দিকে। মাইল দুই দূরে। আচ্ছা, আজ চলি। কাল আসব।' টেলর যেন একটু ব্যস্ত হয়ে পা বাড়ালেন। বোধহয় কোনো কাজের কথা মনে পড়ে গেল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে টেলর ফিরে চললেন। শিলাস্তূপের গা ঘেঁষে বাঁক নেবার আগে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে হাত নাড়লেন। তারপর পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সুনন্দ বলে উঠল, 'এর লেখাই সেদিন পড়ছিলেন, না মামাবাবু?'

'হ্যাঁ। অদ্ভুত লোক। দু-এক বছর আগেও কেউ এর নাম জানত না। পর পর কয়েকটা লেখায় বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়ন তুলে দিয়েছে। ভালো করে এর পরিচয়টা অবধি কেউ জানে না। তবে লেখা পড়ে মনে হয়, লোকটি অতি পণ্ডিত। দীর্ঘ সাধনা আছে। পঙ্গপালের

ফেরোমন যে তাদের বংশবৃদ্ধির জন্য দায়ী, এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার। আরও কয়েকটি কীটপতঙ্গের জীবনযাত্রায় তাদের ফেরোমন কীভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়, টেলর লেখায় তার উল্লেখ করেছেন। তবে বিশদভাবে কিছু বলেননি। লিখেছেন, তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এক্সপেরিমেন্ট শেষ হলে বিষয়টির ওপর একটি প্রামাণিক বই লিখবেন। পৃথিবীর অনেক বৈজ্ঞানিক টেলরের গবেষণার ফলাফল জানার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছেন।'

তাঁবুতে ফিরে দেখলাম, বিল আরাম করে কফি খাচ্ছেন। আমাদের দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'হ্যালো সায়ান্টিস্টস, তারপর, পাখির গ্রেট গ্রেট গ্রেট অ্যানসেসটরের ফসিলের হদিস মিলল?'

মামাবাবু বললেন, 'অত সোজা নাকি? সময় লাগবে। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

'একটা রাউন্ড মেরে এলাম মাইল কয়েক।'

বিলকে টেলরের কথা বলা হল। কালকে আবার টেলর আসবেন শুনে বিল বললেন, 'খেয়েছে! ওসব বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যে আমি নেই। কাল আমি সন্ধের পর ফিরব।'

আমরা আশ্বাস দিলাম, 'কোনো ভয় নেই। টেলর মোটেই খিটখিটে পণ্ডিত নন। দিব্বি হাসি-খুশি, আমুদে।'

'একা-একা ঘুরতে আপনার ভালো লাগে?' একটা মতলব ছিল আমার প্রশ্নে।

বিল বললেন, 'একজন সঙ্গী পেলে তো ভালোই লাগত। পাচ্ছি কই? তুমি আসবে?'

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। আসলে আমারও রোদে দাঁড়িয়ে পাথর কাটা দেখতে আগ্রহ ছিল না। বিলের সঙ্গে ঘোরায় কত মজা!

সুনন্দ আর কী করে! কটমট করে আমাকে দেখে নিল। কিন্তু সে প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্র। আমার মতো ফাঁকি দেওয়া তার শোভা পায় না।

রাত্তিরে খাবার সময় মামাবাবু বললেন, 'সবাই মনে রেখো আমাদের এখানে আগমনের আসল উদ্দেশ্য যেন টেলর টের না পায়।'

'কেন? টেলরকে জানাতে আপত্তি কীসের?' আমি প্রশ্ন করলাম, 'উনি তো অন্য বিষয় নিয়ে কাজ করছেন। বললেন তো ফসিলের ব্যাপারে ওঁর আগ্রহ নেই।'

'মুখে বলছেন বটে, কিন্তু ওঁর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, বেশ আগ্রহ আছে। মিসিং-লিঙ্ক- এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ফসিল এখানে পাবার সম্ভাবনা আছে বলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমরা তো আপাতত ক'দিন পরে চলে যাব। হয়তো খালি হাতে ফিরতে হবে, তারপর উনি যদি এসে ফসিল খুঁজতে শুরু করেন?'

বিল হো-হো করে হেসে উঠলেন। 'বাঃ, আপনারা বৈজ্ঞানিকরা তো সহজ মানুষ নন। কত লুকোচুরি!'

'হ্যাঁ,—তা তো আছেই। বৈজ্ঞানিক জগতে জোচ্চুরির অভাব নেই। কত লোক অন্য লোকের গবেষণার ফল মেরে দিয়ে নিজের নামে প্রকাশ করে বিখ্যাত হয়ে গেছে। তাই সাবধান হতে হয়।'

তিন

পরদিন বিলের সঙ্গে টই-টই করলাম। যেদিকে ব্রুস টেলরের তাঁবু, সেদিকে যাইনি। মামাবাবু বারণ করেছিলেন। নিজে থেকে যখন ডাকছেন না, তখন যাওয়া উচিত নয়। হয়তো ব্যস্ত থাকবেন, তাছাড়া বেড়াবার পক্ষে ওদিকটা সুবিধের নয়! উঁচুনিচু জমি। খাঁজ-খাঁজ চড়াই-উৎরাই। আমরা অন্য দিকে গেলাম। বিল একটা পায়ে-চলা পথ আবিষ্কার করলেন। বললেন, 'সারা আফ্রিকায় বন-প্রান্তরে এমনি অজস্র পায়ে-চলা পথ দেখতে পাবে। পথগুলির শেষে পাবে হয় কোনো গ্রাম কিংবা জলাশয়। ঝর্না বা নদী।'

ঠিকই বলেছিলেন বিল। কয়েক মাইল এগিয়ে দেখলাম এক ছোট জলাশয়। কিন্তু কাছে যেতে পারলাম না। কারণ একপাল হাতি সেখানে মহানন্দে জলকেলি করছে। একটা একাসিয়া গাছের পাশে দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে সেই মজার দৃশ্য দেখতে লাগলাম। মস্ত মস্ত প্রাণীগুলো ছোট ছেলের মতো এ ওর গায়ে জল ছিটোচ্ছে। কাদা ছুঁড়ছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা সেখানে বসে রইলাম। ওখানে বসেই খেয়ে নিলাম। বিকেলে তাঁবুতে ফিরলাম। একটুক্ষণ পরে মামাবাবু ও সুনন্দর সঙ্গে এলেন টেলর। টেলরের সঙ্গে বিলের আলাপ হল। একটু পরেই দেখলাম দুজনে আফ্রিকার গল্পে মেতে উঠেছেন। টেলর আফ্রিকার বহু দুর্গম অঞ্চলে ঘুরেছেন। বহু উপজাতির রীতি-নীতি জানেন।

কিভু হ্রদের তীরবাসী ওয়াটুতসি উপজাতির কথা উঠতে দুজনে ভারি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

বিল বললেন, 'ভারি শৌখিন জাতি। কী লম্বা! ওদের নাচ দেখেছেন?'

'দেখেছি। দারুণ জমকালো ব্যাপার। মাথায় সিংহের কেশর। পরনে হরিণের চামড়া। গায়ে রুপোর গয়না। পায়ে ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা। নাচের তালে তালে কী বিরাট লাফ।'

বিল বললেন, 'সত্যি, লাফাতে পারে বটে। ওদের ন্যাশনাল স্পোর্টস হলো হাইজাম্প। একবার দেখেছিলাম, ঘটা করে হাইজাম্প হচ্ছে। বিশ্বাস করুন, গ্রামের অর্ধেকের বেশি জোয়ান পুরুষ ছ-ফুট হাইট লাফ দিয়ে পেরিয়ে গেল। কায়দা-টায়দার বালাই নেই। স্রেফ ছুটে এসে বেড়া ডিঙোনো লাফ। ওদের ট্রেনড্ করলে নির্ঘাত অলিম্পিক জিতবে।'

হঠাৎ টেলর হো-হো করে হাসতে লাগলেন।

'কী হল?'

'ওয়াটুতসি বৌদের কথা মনে পড়ে গেল। উঃ, কি মোটা!'

বিলও হাসেন। 'রাইট। কেবল খাইয়ে খাইয়ে বৌদের মোটা করে। যত মোটা তত নাকি সুন্দরী। বেচারা বৌগুলো শেষে ভালো করে হাঁটতে পারে না। খেতে না চাইলে স্বামী শাশুড়ি পিটিয়ে, জোর করে খাওয়ায়! বুঝুন যন্ত্রণা!'

আমি ও সুনন্দ মুগ্ধ হয়ে তাঁদের গল্প গিলছিলাম, তবে মামাবাবুর ইচ্ছে ছিল টেলরকে গবেষণা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু টেলর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন। মামাবাবু বললেন, 'কখনও ইন্ডিয়ায় গেলে খবর দেবেন। দেখা করব।'

'নাঃ, এখন বিদেশে যাবার ইচ্ছে নেই। আফ্রিকায় অনেক কাজ বাকি।' টেলর উঠে পড়লেন, 'চলি আজ। আর বোধহয় আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, কাল চলে যাচ্ছি। বড় আনন্দে কাটল বিকেলটা।'

'কোন দিকে যাবেন?' মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

'মাইল দশ দূরে আমার এক আস্তানা আছে। সেখানে কদিন থাকব।'

টেলর সেদিন একজন উপজাতীয় সঙ্গী এনেছিলেন। সে আমাদের পোর্টারদের সঙ্গে বসে খুব আড্ডা দিচ্ছিল। টেলর ডাকলেন—'গোরো, চল।'

সন্ধ্যা নেমে গেছে। গোরো একটা মশাল জ্বালল। দুজনে ফিরে চলল, ক্রমে পাথরের আড়ালে মশালের আলো অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিল মন্তব্য করলেন, 'আশ্চর্য লোক! ইনি চার দেওয়ালের মধ্যে দিনের পর দিন ঘোর গবেষণা করছেন, ভাবা শক্ত। বরং ভ্রমণকারী বা অ্যাডভেঞ্চারার বললে মানায় বেশি।'

চার

টেলর চলে যাবার পর মামাবাবু নিশ্চিন্তে কাজ শুরু করলেন।

রাত্রে মামাবাবু বললেন, 'জানেন বিল, পোর্টারদের হাবভাব সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'কেন?'

'লোকগুলো মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছিল। পাথরের টিলাটার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। কেমন ভয়-ভয় ভাব।'

'ভয়! কেন, স্তূপটাকে ভয় পাবার কী আছে? ওখানে কোনো বন্য জন্তু থাকার কথা নয়। বেশ, কাল আমি যাব। রহস্যটা বোঝার চেষ্টা করব?'

পরদিন বিল মামাবাবুদের সঙ্গে গিয়ে খাদের কাছে একটা পাথরে বসে পাইপ টানতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা আর্তনাদ। তাড়াতাড়ি খাদের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখি একজন পোর্টারের হাত থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। ফার্স্ট-এড-এর বাক্স সঙ্গে ছিল। লোকটির হাতে ব্যান্ডেজ করে দিলাম। সামান্য কেটেছে।

মামাবাবু জানালেন, 'একজনের হাত থেকে গাঁইতি ছুটে গিয়ে লেগেছে। ভাগ্যিস মাথায় লাগেনি। লোকগুলো কেবল নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। অসাবধান হয়ে কাজ করছে। তাই ফস্কেছে।'

পোর্টাররা এদিকে কাজ বন্ধ করে খাড়া দাঁড়িয়ে গেল। 'কী ব্যাপার? তোমাদের তো লাগেনি, সাবধানে কাজ করো।'

তারা মাথা নেড়ে বলল, 'না, বানা (সোয়হিলি ভাষায়—হুজুর), এখানে আমরা খুঁড়তে পারব না।'

'কেন?'

'এই পাহাড়ে এক পুণ্যাত্মা থাকেন। তিনি বিরক্ত হচ্ছেন। এবার অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটেছে। এরপর বিষম বিপদে পড়ব।'

'পুণ্যাত্মা? তিনি আবার কে?' বিল বললেন।

'আছেন বানা। তিনি গোসাপের রূপ নিয়ে আছেন। বহুকাল এই জায়গায় বাস করছেন। তাঁর দয়ায় এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয়। বিষাক্ত মাছিরা এখানে আসে না।'

'কে বলল তাঁর কথা? তোমরা তো এ অঞ্চলের লোক নও।'

'গোরো, হুজুর।'

'বুঝুন কাণ্ডটা,' বিল বললেন, 'টেলরের সঙ্গীটি কেমন উপকার করে গেছে। এরা খুব সাহসী, কিন্তু বড় সংস্কারাচ্ছন্ন। দেবতা, অপদেবতা সবাইকেই বেজায় ভয়। এখন এদের দিয়ে এখানে কাজ করানো খুব শক্ত ব্যাপার।'

বিল অনেক চেষ্টা করলেন। ভয় দেখালেন। লোভ দেখালেন। কিন্তু পোর্টাররা অনড়। শেষে বললেন, 'বেশ, খুঁড়তে হবে না। আপাতত কদিন এখানে থাকো। আমি অন্য লোক খুঁজছি, তখন তোমাদের ছেড়ে দেব।'

বিল আমাদের বললেন, 'দেখি কাল আর একবার চেষ্টা করব। ভালো পুজোটুজো দিলে যদি হয়।'

কিন্তু পরদিন ভোরে উঠে আবিষ্কার করলাম সব ক-জন পোর্টার পালিয়েছে। বোধহয় মাঝরাতে সরে পড়েছে। এরা কিছু টাকা আগাম নিয়েছিল। হয়তো ভাবল, আমরা যদি জোর করে কাজ করাই, তাই পালিয়েছে।

আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। ভারী ভারী শাবল, গাঁইতি ইত্যাদি খোঁড়ার যন্ত্র। মাসখানেকের রসদ। মামাবাবুর বৈজ্ঞানিক জিনিসপত্র। এত মাল চারজনে বয়ে নিয়ে ফিরে যাওয়াও তো অসম্ভব। তাছাড়া এদ্দূর এসে কিছু চেষ্টা না করে ফিরে যাব? এত আয়োজন বৃথা যাবে?

বিল রাইফেল ঘাড়ে বেরোলেন। যদি কাছাকাছি কোনো গ্রাম থেকে লোক জোগাড় করা যায়। ফিরলেন সন্ধের সময়।

'নাঃ, পেলাম না। প্রায় দশ মাইল ঘুরে একটা গ্রাম পেয়েছিলাম, কিন্তু তারাও রাজি হল না এখানে কাজ করতে।'

পরামর্শসভা বসল, কী করা যায়?

বিল বললেন, 'এখন একমাত্র উপায় বৈজ্ঞানিক টেলর। উনি এ অঞ্চল ভালো করে চেনেন। হয়তো চেষ্টা করলে পোর্টার জোগাড় করে দিতে পারবেন। মানে, এরা যাতে এখানে কাজ করে তার ফন্দি বাতলে দিতে পারবেন।'

'আমাদের এত খোঁড়ার আগ্রহ দেখে টেলরের এই জায়গা সম্বন্ধে সন্দেহ বাড়বে না তো?' আমি বললাম।

'কী উপায়!' মামাবাবু জানালেন।

'কিন্তু টেলরের আস্তানায় পৌঁছব কী করে?' সুনন্দ বলল।

'পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করব,' বিল বললেন, 'কিছু কিছু ট্র্যাকারের বিদ্যে আমার জানা আছে। মাত্র দুদিন আগে ওরা ফিরে গিয়েছে। চিহ্ন পাওয়া যাবে। কাল ওদের তাঁবু কোথায় ছিল খুঁজে বার করব। তারপর অনুসরণ আরম্ভ হবে। ওর আস্তানা তো বেশি দূরে নয়।'

টেলরের তাঁবুর চিহ্ন খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি। একটা বড় গাছের তলায় দেখলাম খুঁটি পোঁতার গর্ত, পোড়া কাঠ। কাছেই এক ছোট পাহাড়। বিল মাটির ওপর চোখ রেখে ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'চলুন, এগোনো যাক। ওদের ট্র্যাক পেয়েছি। তবে টেলর যাবার আগে আর একদল এখান থেকে একই পথে গিয়েছিল। পায়ের চিহ্ন কতগুলো কিছু পুরনো। রোদের তেজ বাড়ার আগে রওনা দিই। যতটা পারি জিনিস বয়ে নিয়ে যাই, বাকি কোনো গুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখে যাই।'

পাঁচ

বিল অনেকটা সামনে এগিয়ে চললেন। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মাটির ওপর। আমরা পিছনে চললাম। বিল বললেন, 'আমায় ট্র্যাকারের বিদ্যে শিখিয়েছিল এক ঝানু মাসাই। সে যে-কোনো পশু বা মানুষের পায়ের চিহ্ন ধরে তাকে মাইলের পর মাইল অনুসরণ করতে পারত। পাথর বা শক্ত মাটির বুকেও ঠিক তার চিহ্ন খুঁজে বের করত। চিহ্ন দেখে বলে দিত প্রাণীটির ওজন কত, বয়স ইত্যাদি খুঁটিনাটি। আমিও কিছুটা পারি, তবে তার মতো নয়।'

ঘণ্টা দুই এগোবার পর বিল সহসা থামলেন। মুখে আঙুল দিয়ে আমাদের চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন। কানে কতগুলো বিচিত্র শব্দ এল। খট্‌খট্, ধুপ্‌ধাপ্। নিঃশব্দে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালাম। বন্য-প্রকৃতিরাজ্যের এক অদ্ভুত ছবি আমাদের সামনে ফুটে উঠল।

এক টুকরো সমতলভূমিতে দুটো প্রকাণ্ড পুরুষ-হরিণ মত্ত হয়ে যুদ্ধ করছে। খানিক দূরে সাত-আটটা মেয়ে-হরিণ ও তিন-চারটে বাচ্চা। মেয়ে-হরিণগুলো কৌতূহলী চোখে লড়াই দেখছে। কখনও আবার নির্বিকারভাবে ঘাস-পাতা চিবুচ্ছে।

বিল বললেন, 'ইলান্ড। কে দলপতি হবে তাই নিয়ে লড়াই লেগেছে। যতক্ষণ না একটা হেরে দল ছেড়ে পালাবে ততক্ষণ যুদ্ধ চলবে।'

এই দ্বন্দ্ব কখন আরম্ভ হয়েছিল জানি না। আরও আধঘণ্টা চলল। ক্রমে একটা হরিণ পিছু হটতে লাগল। সে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। একবার গুঁতো খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অন্য হরিণটা তাকে শিং-এর ধাক্কায় ঠেলে নিয়ে চলল। শেষে পরাজিত হরিণটি পিছন ফিরে দৌড় লাগাল। বিজয়ী কয়েক কদম তার পিছনে তেড়ে গিয়ে, দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

ঠিক এই সময় আমাদের ডান ধারে এক ঝোপের ভিতর থেকে একজন বিচিত্র লোক মাথা তুলে দাঁড়াল। ঢেঙ্গা, রোগা, লম্বাটে মুখ। ঘাড় অবধি রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। মুখভর্তি গোঁফ-দাড়ি। গায়ে ময়লা জামা ও কালো প্যান্ট। কাঁধে তিন-চারটে বড় বড় থলি। হাতে একটা মুভি ক্যামেরা। কে রে বাবা! হিপি নাকি? আফ্রিকার এই গহনে?

লোকটি নিশ্চয় আমাদের আসা দেখেছিল? একগাল হেসে হেঁকে বলল, 'হাল্লো, কেমন দেখলে? ভয় হচ্ছিল, বেরসিকের মতো গুলি করে বসবে বুঝি। খুব লড়েছে। ফার্স্ট ক্লাস ছবি উঠল।'

লোকটির গলা শুনে হরিণের দল চকিতে দৌড়ে হাওয়া হয়ে গেল।

লোকটি আমাদের কাছে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে নিজের পরিচয় দিল—'জুসেপি আন্তোনিও। শখের ফোটোগ্রাফার। তোমরা? শিকারী নাকি?'

আমরাও নিজেদের পরিচয় দিলাম। বিল বললেন, 'অতগুলো ঝুলি কেন কাঁধে! পোর্টার নেই?'

'ছিল একজন। পালিয়েছে। একজনকে ধার দাও না তোমরা।'

'আরে আমাদেরও তো পালিয়েছে। পোর্টারের খোঁজেই তো চলেছি।'

শুনে আন্তোনিওর কি হাসি—'বাঃ বাঃ! বেশ বেশ! তা তোমাদের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটানো যাক, আপত্তি আছে? তোমাদের লোক জোগাড় হলে আমারও হয়ে যাবে। তাছাড়া

অনেকদিন কথা বলার লোক পাইনি। একটু আড্ডা দেওয়া যাবে। তবে আমি কিন্তু বাপু আইন মেনে চলতে পারব না, বলে রাখছি।'

'মানে?'

'মানে, ঠিক সময় খাওয়া, শোওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশে ভালো চাকরি করতাম। সময়মতো অফিস যেতে হত বলে কাজ ছেড়ে দিলাম। আগে অবসর সময়ে ফোটোগ্রাফি করতাম, এখন মনের সুখে দিনরাত ওই নিয়ে মেতে আছি। এ দেশটাও চমৎকার। সাবজেক্টের অভাব নেই। কতরকম জন্তু-জানোয়ার, কীটপতঙ্গ।'

আন্তোনিও বয়সে যুবক। তার হাতমুখ নেড়ে চুল ঝাঁকিয়ে কথা বলার ধরন ভারি মজার। বোঝা যায়, লোকটি বেজায় দিলখোলা। সুনন্দ রসিকতা করল—'আপনার নিশ্চয় অনেক পয়সা! চাকরি ছেড়ে দিলেন!'

'মোটেই না।'

'তাহলে চলে কী করে?'

'মাঝে মাঝে দেশে ফিরে ছবি বিক্রি করি। আরে, হলিউডের সিনেমা কোম্পানিগুলো

তো আমার ছবি কেনার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। জীবজন্তুর এমন অ্যাকশন ফোটোগ্রাফি কি সহজে পাওয়া যায়?'

সুনন্দ বলল, 'মিস্টার আন্তোনিও, প্রথম আলাপে আপনি আশা করি আমাদের একটা ছবি তুলবেন। অসিতের চেহারাটা পছন্দ না হলে আমার তুলুন। বলেন তো পোজ্ করি।'

আন্তোনিও গম্ভীরভাবে বলল, 'সরি! মানুষের ছবি তুলে আমি ফিল্ম নষ্ট করি না।'

সুনন্দর দমে যাওয়া মুখ দেখে আমি সুযোগ বুঝে ফোড়ন কাটলাম, 'মিস্টার আন্তোনিও। আপনি অনায়াসে ওর ছবি নিতে পারেন। ওকে মানুষ ভাববার কোনো কারণ নেই।'

মামাবাবু ও বিল হো-হো করে হেসে উঠলেন। আন্তোনিও আমার কথা শুনে যেন কথাটা যাচাই করবার জন্যে সুনন্দকে একবার আপাদমস্তক জরিপ করে নিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছবি তুলল না।

আবার চললাম। বিল সামনে, আমরা তাকে অনুসরণ করছি। আন্তোনিও প্রায়ই দলছাড়া হয়ে পড়ছিল। কখনো গাছের ওপর বাঁদরের দাঁত খিঁচুনি দেখে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। কখনো বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতি দেখে ক্যামেরা তাক করছিল। আবার ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের সঙ্গ ধরছিল।

আট-নয় মাইল যাবার পর বিল দাঁড়ালেন। বললেন, 'ওই দূরে ছোট ছোট ঝোপের ঘন জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, ওখানে নিশ্চয়ই তেৎসি ফ্লাই আছে। দেখ, বনের চারপাশের জমির ঘাস পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সমস্ত ঝোপঝাড় কেটে ফেলা হয়েছে। তেৎসি মাছি ওই রকম বনে আড্ডা গাড়ে। বড় পাতাবহুল গাছের বন বা ছোট ছোট ঘাসবনে থাকে। এখানকার লোকে তাই তেৎসি ফ্লাই এলাকার চারপাশের বড় ঘাস পুড়িয়ে, ঝোপঝাড় কেটে দেয়। যাতে এই মাছি ছড়িয়ে না পড়ে। টেলর দেখছি বনটা এড়িয়ে ডান পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে।'

আমরা চক্রাকারে তেৎসি মাছির এলাকাটা ঘুরে বনের উল্টো দিকে উপস্থিত হলাম। দূরে বড় বড় গাছে ছাওয়া একখণ্ড সবুজ বন দেখা যাচ্ছিল। বিল সোজা সেই দিকে এগিয়ে গেলেন।

বনের মধ্যে এক পায়ে-চলা পথ ধরে মাত্র পঞ্চাশ গজ মতো ঢুকেই দেখি বন শেষ হয়ে গেছে। সামনে ছোট ছোট ঘাসে ঢাকা পরিষ্কার এক টুকরো জমি এবং তার ভিতর উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটি মাটির বাড়ি। মনে হল, বড় বড় গাছের বেড়া দিয়ে বাড়িটিকে যেন ইচ্ছে করেই লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

বিল বললেন, 'টেলর ওই বাড়িতে ঢুকেছে।'

প্রাচীর-সংলগ্ন মস্ত কাঠের গেটটা একটু ফাঁক করা ছিল। আমরা ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বাড়ির দরজায় কয়েকবার করাঘাত করতে শুনলাম ভিতরে খটখট আওয়াজ। দরজা খুলে একটি মুখ উঁকি মারল। সে-মুখ টেলরের নয়।

পুরু চশমার কাঁচে ঢাকা দুটো বিস্ফারিত রাগী চোখের সামনা-সামনি হয়ে আমরা চমকে দু-পা পিছিয়ে গেলাম।

মুখখানা এক বৃদ্ধের। মাথাজোড়া টাক। টিয়াপাখির মতো নাক। তার বাঁ গালের ওপর এক বীভৎস চিহ্ন। পোড়ার দাগ। গালের মাংস কুঁচকে মুখের রূপ বিকৃত করে তুলেছে।—'কাকে চাই?' বৃদ্ধ কড়া গলায় প্রশ্ন করল।

'এখানে মিস্টার টেলর থাকেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে এখন নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'জানি না।'

'কবে ফিরবেন? আমাদের বিশেষ দরকার।'

'ও।' বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দেখল। তারপর বলল, 'বোধহয় দু'-একদিনের মধ্যে। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?' বৃদ্ধ দরজার ফাঁকটা কমিয়ে আনল।

'বলবেন, ঘোষ এসেছিল, আর বিল। একটু দরকার।'

'বেশ, বলব। জাম্বো কোথায় গেলি। যত উটকো লোক ঢুকে পড়ে—' বলতে বলতে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। চকিতে দেখলাম লোকটির হাতে একটি লাঠি। সে লাঠিতে ভর দিয়ে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। টেলরের আস্তানায় এ কোন বদমেজাজি বুড়ো? টেলরের কোনো অ্যাসিস্টেন্ট নাকি? মনে হয়, লোকটার মাথার গোলমাল আছে। যা হোক, টেলর ফেরা অবধি অপেক্ষা করতে হবে।

পাঁচিলের বাইরে একটি উপজাতীয় লোকের সঙ্গে দেখা। এই বোধহয় জাম্বো। সে আমাদের অবাক হয়ে দেখছিল। বিল বলল, 'তুমি টেলরের কাছে কাজ করো?'.

'হ্যাঁ, বানা।'

'টেলর কবে ফিরবেন?'

'দু'-একদিনের মধ্যে।'

'আচ্ছা, এখানে খাবার জল কোথায় পাওয়া যাবে, কাছাকাছি?'

'ওই দিকে একটা ঝর্না আছে।' সে বাড়ির পিছন দিকে দেখাল।

'বেশ। টেলর এলে বলবে তার বন্ধুরা ওখানে অপেক্ষা করছে। আমরা তাঁবু ফেলছি।'

লোকটি ঘাড় নেড়ে জানাল—'বলব।'

হঠাৎ—কোত্থেকে আন্তোনিও হাজির হল। সে কখন সটকে পড়েছিল খেয়াল করিনি।— 'পোর্টারের ব্যবস্থা হল?'

বললাম, 'টেলর নেই। দু'-একদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'বেশ বেশ। জায়গাটা খাসা। অনেক সাবজেক্ট পাওয়া যাবে।' সে উৎসাহিতভাবে চারদিক দেখল।

ঝর্না খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। বাড়ির আধ মাইলের মধ্যেই। কয়েকটা বড় বড় পাথরের চাঙড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ক্ষীণ জলস্রোত। পরিষ্কার টলটলে জল নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। স্রোত ক্রমশ চওড়া হয়ে এঁকেবেঁকে কিছু দূরে ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। উৎসের কাছেই আমরা তাঁবু ফেললাম।

মামাবাবু বেজায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। কথাবার্তা নেই, কী জানি ভাবছেন। তাঁবু খাটিয়ে, রান্নার জোগাড় করছি, হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—'মনে পড়েছে—কার্লো! ডক্টর ফিলিপ কার্লো!'

'কার্লো কে?'

'ওই বৃদ্ধ। কেবল ভাবছি, কোথায় দেখেছি। সেই নাক। কথা বলার ভঙ্গি। গলার স্বর। বড্ড চেনা। তবে দশ বছর আগে দেখেছিলাম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল ; আর গালের পোড়া দাগটা ছিল না। এখন ভীষণ বুড়োটে হয়ে গেছেন। কিন্তু কার্লো এখানে কী করছেন?'

'কার্লো কে?' বিল বললেন।

'একজন প্রাণিবিজ্ঞানী। ট্রপিকাল অঞ্চলের পোকামাকড়-বিশেষজ্ঞ। কলকাতায় এক কনফারেন্সে দেখেছিলাম। বেজায় রাগী। তবে অসাধারণ পণ্ডিত। শুনেছিলাম, তিনি ট্রপিকাল অরণ্যে প্রচুর ঘোরেন। কয়েক বছর ওঁর কোনো লেখা আমার চোখে পড়েনি। কার্লো কি টেলরের সঙ্গে রিসার্চ করছেন?'

বদরাগী বুড়ো কার্লোর রহস্য আমাদের সবার মনে কৌতূহল জাগাল। কিন্তু টেলরের সঙ্গে দেখা না হলে এ-রহস্য সমাধানের উপায় নেই।

ছয়

ব্রুস টেলর পরদিন ভোরেই হই-হই করে হাজির হলেন।

'কী ব্যাপার? আপনারা? বললেন যে পশ্চিমে যাবেন?'

'বিশেষ প্রয়োজনে এলাম। আপনার সাহায্য দরকার।'

'কিন্তু এলেন কী করে?'

'আপনার পদচিহ্ন অনুসরণ করে। বিল নিয়ে এসেছেন।'

'বটে, বটে! তা দরকারটা কী শুনি?'

মামাবাবু আমাদের পোর্টারদের কাহিনি শোনালেন।

শুনে টেলর বেজায় হাসলেন। 'একটা বুড়ো গোসাপ ওই পাহাড়ে থাকে জানি, কিন্তু সে যে দেবতা জানতাম না।' তিনি গোরোর ওপর চটে উঠলেন, 'ব্যাটারা বড্ড বাজে বকে। এখন বুঝুন ঠেলা! ঠিক আছে, আমি আজই লোক পাঠাচ্ছি কাছের গ্রামে। তবে ভয় হয়, সংস্কার বড় মারাত্মক জিনিস। ওখানে কাজ করতে কেউ রাজি হবে কিনা জানি না। যা হোক, আমি সবরকম চেষ্টাই করে দেখব।'

টেলর কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'আমি কাল ছিলাম না। অতিথি সৎকার করতে পারলাম না। তা আমি নেই খবরটা দিল কে?'

'এক বৃদ্ধ।' বিল জানালেন।

'আলাপ হল তার সঙ্গে?'

'আলাপ!' বিল আঁতকে ওঠেন, 'বাপ্‌রে কী মেজাজ! বলল—নেই। শিগগিরি ফিরবে। ব্যস! মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। দুটোর বেশি প্রশ্ন করলে মেরেই বসত!'

টেলর লজ্জিতভাবে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, কী কাণ্ড!'

মামাবাবু এবার প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, বৃদ্ধটির নাম কি ফিলিপ কার্লো?'

টেলর অবাক। 'আপনি চেনেন কার্লোকে? আলাপ আছে?'

'না। একবার মাত্র দেখেছিলাম। অনেক দিন আগে। উনি কি আপনার সঙ্গে কাজ করছেন?'

'হুঁ, কাজ করছেন বটে, কিন্তু তাতে লাভ না হয়ে বরং আমার ক্ষতিই হচ্ছে।'

'কেন? অমন পণ্ডিত লোক।'

'তা ঠিক। কিন্তু ডক্টর কার্লো এখন রুগ্‌ণ। ওঁর শরীর মন কোনোটাই সুস্থ নয়। দেখলেন তো, আপনাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করলেন!'

'ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপার খুবই দুঃখজনক। এত বড় প্রতিভার ওই পরিণতি হবে ভাবিনি।' টেলর বিষণ্ণভাবে একটু চুপ করে থেকে বলতে শুরু করলেন, 'প্রায় আড়াই বছর আগে ডক্টর কার্লোর সঙ্গে আমার আলাপ হয় এক উপজাতি গ্রামে। বিষাক্ত পোকার কামড়ে আদিবাসীরা কী কী টোটকা ব্যবহার করে তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করছিলেন। কয়েকদিন পর আমি সে-গ্রাম ছেড়ে চলে যাই। মাত্র তিন দিন পরে ওই গ্রামের একজন এসে আমায় খবর দিল কার্লোর গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছে। কীভাবে তাঁর কুটিরে আগুন লাগে। জ্বলন্ত পোশাকে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় দৌড়ে পালাতে গিয়ে তিনি এক খাদের মধ্যে পড়ে যান। পায়ে আঘাত লাগে। গ্রামের লোক তাঁকে তিরিশ মাইল দূরে এক মিশনারি হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

'তাড়াতাড়ি হাসপাতালে গেলাম। কার্লো মাস দুই ভুগে সুস্থ হলেন, কিন্তু একটা পা জখম হয়ে গেল। তাছাড়া মুখটা পুড়ে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেল। আমি অনুরোধ করলাম—ফিরে যান। কিন্তু কার্লো রাজি হলেন না। উনি জেদ ধরলেন আমার সঙ্গে যাবেন। আমি একটু সাহায্য করলে এখানে রিসার্চ চালাতে পারবেন।

'বাধ্য হয়ে সঙ্গে নিয়ে এলাম। ল্যাবরেটরিতে এনে রাখলাম। দুঃখের বিষয়, কিছুদিন পরে বুঝলাম কার্লো ভীষণ মানসিক শক্ পেয়েছেন। কোনো কঠিন গবেষণা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দিনের পর দিন গুম্ হয়ে থাকেন। কারো সামনে বেরোতে চান না। রাতে ঘুম হয় না। অকারণে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।'

'ওঁকে ডাক্তার দেখালেন না কেন?' মামাবাবু বললেন।

'চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই ডাক্তারের কাছে যেতে রাজি হলেন না। মনে হয়, ধারণা হয়েছিল, ওঁকে পাগলা গারদে রাখা হবে।'

'কোনো আত্মীয়কে যদি খবর দিতেন।'

'তেমন কারও ঠিকানা পেলাম না। ডারবান থেকে ওঁর পরিচিত এক ভদ্রলোককে ডেকে এনেছিলাম, কার্লো তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। জোর করতে সাহস হল না। যদি স্ট্রোক হয়ে যায়! ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। এত বড় ব্রেন, সত্যি কি পাগল হয়ে যাবে? তাই আমার কাজের মধ্যে ওঁকে ডাকতে লাগলাম। আমার গবেষণা নিয়ে আলোচনা করতাম। একটু একটু করে দেখি উনি ফেরোমন সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তখন ভালোই লেগেছিল। যদি এত বড় পণ্ডিতের সাহায্য পাই! আমিই প্রস্তাব দিই, আসুন আমরা একসঙ্গে কাজ করি। পরে বুঝলাম, নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি। কার্লো ফেরোমন নিয়ে মেতে গেলেন এবং ল্যাবরেটরি অধিকার করে বসলেন। আমাকে একা কিছুতেই কাজ করতে দেবেন না। সব সময় আমার ওপর সর্দারি করবেন। কার্লোকে পেয়ে আমার কোনো উপকার হল না। কারণ, কোনো সমস্যা নিয়ে টানা কাজ করার মতো শরীর বা মনের অবস্থা উনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। বিষয়টা ওঁর কাছে নতুন। শুধু নানারকম উদ্ভট কল্পনা করেন

আর আমাকে তাঁর কল্পনামাফিক কাজ করতে বলেন। আজ বছরখানেকের ওপর এই অবস্থা চলছে। আমার কাজের খুব ক্ষতি হচ্ছে। যতটা পারি ওঁকে লুকিয়ে কাজ করি। উনি উপস্থিত থাকলে বড় ডিসটার্বেন্স হয়। মহা সমস্যায় পড়েছি। কী যে করি—'

টেলর মাথায় হাত দিয়ে হতাশভাবে বসে রইলেন। সত্যি, এত নামী বৈজ্ঞানিকের এই শোচনীয় পরিণতি ভাবতে কষ্ট হয়।

মামাবাবু বললেন, 'যদি অনুমতি করেন তো ডক্টর কার্লোর সঙ্গে আমি একবার আলাপ করব। চেষ্টা করব ওঁকে শহরে ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে।'

'খুব ভালো কথা। যদি পারেন তো মহা উপকার হয়। আমার অবস্থাটা তো বুঝছেন। তবে দয়া করে ওঁর কাছে ফেরোমন প্রসঙ্গ তুলবেন না।'

'কেন?'

'কারণ, এটা হল টপ সিক্রেট, মানে কার্লোর ভাষায়। উনি স্থির করেছেন, ফেরোমন নিয়ে কয়েকটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করবেন। কিন্তু যতদিন না রিসার্চ কমপ্লিট হয়, আমায় বারণ করেছেন যেন এ-বিষয়ে কেউ জানতে না পারে। তাহলেই নাকি অন্য বৈজ্ঞানিকরা এই লাইনে রিসার্চ শুরু করে দেবে। হয়তো আমাদের গবেষণার সূত্র চুরি করার ষড়যন্ত্র হবে।'

'কিন্তু জুওলজি পত্রিকায় যে আপনি পেপার পাবলিশ করেছেন?' সুনন্দ একটু মজা করে।

'লুকিয়ে। জানতে পারলে বৃদ্ধ কেলেঙ্কারি করবে। আচ্ছা বলুন তো প্রোফেসর, আমার এত দিনের সাধনা কি ওঁর খামখেয়ালিপনার জন্য বৃথা যাবে? এতটা আত্মত্যাগ কি সম্ভব? কেন আমি আমার গবেষণার ফল প্রকাশ করব না? কেন আমি আমার একান্ত নিজস্ব পরিশ্রমলব্ধ গবেষণায় অন্যকে ভাগ বসাতে দেব? আমার লেখায় অন্যের নাম যুক্ত করব?'

মামাবাবু সায় দিলেন, 'আপনি ঠিকই বলছেন। আপনার কোনো অন্যায় হয়নি। আপনি যথেষ্ট করছেন। কিন্তু এভাবে চললে তো আপনাদের দু-জনেরই ক্ষতি। আমি একবার চেষ্টা করবই। আপনি কার্লোর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন?'

'নিশ্চয়! তবে সুযোগ বুঝে, যেদিন ওঁর মন বেশ শান্ত থাকবে।'

টেলর বিদায় নিলেন। আমরা কীভাবে টেলরকে কার্লোর কবল থেকে উদ্ধার করা যায় তাই নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিলাম। মামাবাবু বারবার বলতে লাগলেন, 'এত বড় বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া কক্ষনো উচিত নয়। চেষ্টা করতেই হবে ওঁকে ভালো করে তোলার।'

পরদিন সকালে মামাবাবু, সুনন্দ ও আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। ল্যাবরেটরির কাছে টেলরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। টেলর বললেন, 'প্রভাতে বায়ুসেবন ও কিঞ্চিৎ পদচারণ আমার অভ্যাস। চলুন ভিতরে।'

'কার্লো?' আমি সভয়ে প্রশ্ন করি।

'ঘুমোচ্ছেন। ঘুম আসছিল না, তাই মাঝরাতে ঘুমের বড়ি খেয়েছেন। চলুন ল্যাবরেটরি দেখাব।'

ল্যাবরেটরিতে ঢুকে আমরা অবাক। শহর থেকে এত দূরে, গহনে এমন আধুনিক

নানা জায়গায় আমার আরও কয়েকটা ল্যাবরেটরি আছে। তবে এটাই সেরা। নির্জনে কাজ করতে আমার ভালো লাগে।'

মামাবাবু ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। কতগুলো লেবেল-আঁটা শিশি দেখিয়ে বললেন, 'এগুলোর মধ্যে কি ফেরোমন আছে?'

'হ্যাঁ। কৃত্রিম উপায়ে বানিয়েছি।'

টেলর জাম্বোকে ডেকে কফি বানাতে বললেন। বিদায় নেবার সময় আশ্বাস দিলেন, 'আশা করছি আপনাদের পোর্টারের খবর শিগগিরি পাবেন।'

রাত্রে আন্তোনিও জানাল, 'প্রোফেসর ঘোষ, আজ পাগলা বৈজ্ঞানিককে দেখলাম।'

'কে, কার্লো?'

'হ্যাঁ! পাঁচিলের বাইরে একটা পাথরের ওপর বসেছিলেন। আমায় দেখেই চট করে ভিতরে ঢুকে গেলেন। জানেন, ওঁকে আমি আগে দেখেছি।'

'কোথায়?'

'লিবিয়ায়। চার বছর আগে। সাহারার প্রান্তে এক মরূদ্যানে। আলাপ হয়নি। দূর থেকে দেখেছিলাম। সেদিনও ওই এক ভঙ্গিতে বসেছিলেন। বেদুইন শেখরা বলেছিলেন—সাহেব বেশ কিছুদিন ওই মরূদ্যানে আছে। পোকামাকড় নিয়ে কী সব পরীক্ষা করে। বেজায় রাগী।'

'আর কোনো শ্বেতাঙ্গ ছিল সেখানে?'

'না। তখন অবশ্য কার্লোর গালে পোড়া দাগ ছিল না। তবে আমার ফোটোগ্রাফারের চোখ ঠিক চিনেছে।'

সাত

টেলর সেদিন এলেন না। পরদিন সকাল আটটা নাগাদ দেখা করতে এলেন। বললেন, 'কয়েকজন পোর্টার জোগাড় হয়েছে, কিন্তু মুশকিল হল, তারাও পাহাড়ের কাছে পাথর কাটতে রাজি হচ্ছে না। আপাতত না হয় এদের নিয়ে রকপেন্টিং-এর খোঁজে বেরিয়ে পড়ুন! ফসিল উদ্ধার পরে করবেন।'

মামাবাবু চিন্তা করতে থাকেন।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে আন্তোনিও হাজির হল। কোন্ কাকভোরে সে ক্যামেরা ঘাড়ে বেরিয়েছিল। এসেই বলল, 'চা খাব। ওঃ, আজ দুটো জব্বর সাবজেক্ট পেয়েছি।'

'কী সাবজেক্ট?'

'এক নম্বর, একপাল বুনো কুকুর। কী গ্রেসফুল! একটা প্রকাণ্ড জেব্রার পিছনে তাড়া করে ছুটছিল। অনেক ছবি নিয়েছি।'

বিল তাড়াতাড়ি বললেন, 'আন্তোনিও, এমন কর্ম কক্ষনো করবেন না। বুনো কুকুর আফ্রিকার সবচেয়ে হিংস্র জীব। অকারণে শিকার করে। বাগে পেলে মানুষকেও ছাড়ে না।'

তাঁর কথায় কান না দিয়ে আন্তোনিও বলল, 'দু-নম্বর হল পিঁপড়ে। লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে একটা গাছে বাসা বেঁধেছে। গাছের অর্ধেকটা পর্যন্ত থিকথিক করছে, পিঁপড়েতে গুঁড়ি ও ডালগুলো ঢেকে গেছে। মাইলখানেক দূরে ওই বনের মধ্যে। হ্যাঁ, একটা ওয়াটার-হোল আবিষ্কার করেছি। বিল, যাবেন নাকি? দুজনে পাশে লুকিয়ে থাকব। জন্তুদের জল খাবার ছবি তুলব। রাতেও থাকব, দেখব। উঁহু, আর কেউ নয়। ভিড় হলে জন্তুরা আসবে না। বিল, যাবেন?'

'যাব।' বিল সম্মতি জানাল।

আন্তোনিও হুড়হুড় করে কথা বলে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে টেলরের দিকে চাইল, 'মশাইকে তো আগে দেখিনি!'

তাকে টেলরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

'ও, আপনাকে চিনি। মানে নাম শুনেছি, দারুণ বৈজ্ঞানিক। আপনিই তো আমাদের পোর্টার জোগাড় করে দেবেন?'

টেলর বলল, 'চেষ্টা করছি। আপনার পেতে অসুবিধা হবে না। প্রোফেসরের জন্যই ভাবনা। হ্যাঁ, প্রোফেসর, ভেবে দেখলাম আপনার ওই জায়গাটা অনুসন্ধান না করে চলে যাওয়া উচিত হবে না। আমি অন্য গ্রামে চেষ্টা করি। ক'টা দিন ধৈর্য ধরুন। কোথাও যাবেন না। এখানেই থাকবেন। আচ্ছা বিদায়।'

দুপুর একটা নাগাদ টেলর গোরোকে নিয়ে আবার হাজির হলেন। সঙ্গে তাঁবু ও কিছু জিনিস। বললেন, 'এক জায়গায় রকপেন্টিং-এর সন্ধান পেয়েছি। লাঞ্চ হয়ে গেছে তো? তবে যান, দেখে আসুন। গোরো আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। মাত্র দু-মাইল পথ। সন্ধের আগে ফিরে আসতে পারবেন।'

'বেশ যাচ্ছি। কিন্তু তাঁবু নিয়ে বেরিয়েছেন যে?'

'আজ ঝর্নার কাছে কাটাব। ল্যাবরেটরিতে ফিরছি না। কার্লোর মেজাজ অত্যধিক খারাপ। আমার সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। কী করব, মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি হয়। যাহোক, এখন ওর সামনে না যাওয়াই ভালো। কাল সকালে ওর মেজাজ ঠাণ্ডা হলে ফিরব। বনের মধ্যে একটা মস্ত মৌচাক আছে। বসে বসে মৌমাছি দেখি। আপনারা ফিরে এলে গল্প হবে।'

দুই নয়, অন্তত চারমাইল হাঁটতে হল। চৌকো বড় একটা পাথরের গায়ে লাল-কালো রেখায় কয়েকটা জিরাফ ও হরিণ আঁকা। একটা কাগতাড়ুয়া গোছের মানুষের ছবি। দেখলে মনে হয় ছোট ছেলে এঁকেছে।

মামাবাবু একটু পরীক্ষা করেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'বাজে খাটলাম। চলো ফিরি।'

একটু জিরিয়ে ফিরতি পথে হণ্টন দিলাম।

টেলর আমাদের তাঁবুর কাছে অপেক্ষা করছিলেন।

বললেন, 'কেমন দেখলেন?'

'ঠকেছি, এগুলো তেমন প্রাচীন নয়।' মামাবাবু জানালেন।

'ইস্, লোকটা দেখছি বাজে খবর দিল।' টেলর কাঁচুমাচুভাবে বললেন। টেলর তাঁর তাঁবুতে আমাদের কফি খেয়ে যেতে ডাকলেন। কিন্তু মামাবাবু আর গেলেন না। বড্ড ক্লান্ত।

আন্তোনিও একটা বাঁদরছানা ধরেছিল। তাঁবুর খুঁটিতে সেটা বাঁধা থাকত। আবিষ্কার করলাম সেটা ইতিমধ্যে পালিয়েছে।

আট

অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনলাম মামাবাবুর কণ্ঠস্বর, 'সুনন্দ, অসিত। ওঠো, ওঠো।'

ধড়মড় করে উঠে বসলাম—'কী ব্যাপার?'

'কেমন শব্দ হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ?' মামাবাবু বললেন।

গভীর রাত। বাইরে হালকা চাঁদের আলো, অগ্নিকুণ্ডের কাঠগুলো নিবু-নিবু। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালাম। কান পাতলাম। হ্যাঁ, কতগুলো অস্বাভাবিক শব্দ। খড়-খড়, মড়-মড়। বনের ভিতর কারা যেন ছুটোছুটি করছে। মাঝে মাঝে ভীত বাঁদরের কিচিমিচি। পাখির ডাক। শব্দগুলো যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। কে বা কারা আসছে? কোন্ জানোয়ার? রহস্যময় আফ্রিকায় এ কোন্ অজ্ঞাত বিপদের পদধ্বনি? বন্দুক এগিয়ে রাখি। বিল নেই তাই অসহায় লাগছিল।

অগ্নিকুণ্ডের ক্ষীণ আলোয় দেখলাম, কয়েকটা মেঠো ইঁদুর লাফাতে লাফাতে পালাল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো শেয়াল ও পরেই একটা হায়না দ্রুত তাঁবুর গা ঘেঁষে ছুটে গেল। এরা ভয় পেয়েছে। কিন্তু কেন?

মামাবাবু নিশ্চল। সর্ব ইন্দ্রিয় উন্মুখ। একদৃষ্টে বনের দিকে চেয়ে আছেন। সহসা তিনি টর্চ জ্বাললেন। কয়েক মুহূর্ত টর্চের জোরালো আলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হল। তারপরই তিনি সভয়ে বললেন, 'ওই দেখো!'

দেখলাম, অদূরে বনের প্রান্তের মাটির ওপর একটা চওড়া কালো দাগ। ও কি, দাগটা যে সচল। যেন প্রকাণ্ড এক আলকাতরার স্রোত বনের মধ্য থেকে বেরিয়ে ধীরে গড়িয়ে আসছে। স্রোতের মুখ অন্তত দশ গজ চওড়া, বস্তুটি যে কী বুঝতে পারছিলাম না।

মামাবাবু উত্তেজিতভাবে দ্রুত বলতে লাগলেন—'আর্মি-অ্যান্ট। বুঝতে পারছ না? লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পিঁপড়ের বাহিনী। ঠিক সৈন্যবাহিনীর মতো সারিবদ্ধভাবে মার্চ করে চলে। হিংস্র মাংসাশী ক্ষুধার্ত এই পিঁপড়েদের খপ্পড়ে পড়লে দুনিয়ার ছোট-বড় কোনো প্রাণীর নিস্তার নেই। সামনে যাকে পায় আক্রমণ করে। প্রাণভয়ে তাই সবাই পালায়। মনে হয় আন্তোনিও এই বাহিনীটাকেই গাছের গায়ে বিশ্রাম নিতে দেখেছিল। কিন্তু এরা এদিকে এল কেন? আশ্চর্য! এরা বনের ছায়া বা বড় ঘাসবনের মধ্য দিয়ে চলে। উন্মুক্ত প্রান্তর, শুকনো মাটি, পাথরের ওপর দিয়ে চলে না। দেখ দেখ, পিঁপড়ের ঝাঁক সোজা তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে। চল পালাই, সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত!'

তাঁবু ছেড়ে বেরোব, হঠাৎ মামাবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'সুনন্দ, বাঁদর বাচ্চাটা কি দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে?'

'না, দড়ি খুলে। অত শক্ত গেরো কী করে যে খুলল!'

'হুম্! চল। বিলের পিস্তলটা সঙ্গে নাও!' মামাবাবু অন্ধকারে চলতে শুরু করলেন। একবার জিজ্ঞেস করলাম—'কোথায় যাচ্ছেন?'

'টেলরের তাঁবুতে। কথা বোলো না।'

নিঃশব্দে আমরা টেলরের তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়ালাম। দেখি অত রাতেও টেলর

জেগে। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। মামাবাবু যে কাণ্ড করলেন তাতে আমরা তো' স্তম্ভিত। টেলরের পিছনে গিয়ে বন্দুক তাক করে বলে উঠলেন, 'কী শুনছেন মিস্টার টেলর?'

টেলর বিদ্যুৎবেগে ফিরে দাঁড়াতেই মামাবাবু বললেন, 'উঁহু, এগোবেন না, তাহলে গুলি করতে বাধ্য হব। সুনন্দ, তুমি একে পিস্তল নিয়ে পাহারা দাও। নড়লেই গুলি করবে। অসিত, খেয়াল রেখো—গোরো আছে কি না। আমি আসছি—'

টেলর রাগে অগ্নিশর্মা। চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে প্রোফেসর ঘোষ!' মামাবাবু ভ্রূক্ষেপ না করে টেলরের তাঁবুর ভিতর ঢুকলেন।

একটুক্ষণ 'পরে বেরিয়ে এলেন। হাতে একটা বড় শিশি। 'মিস্টার টেলর, আর্মি-অ্যান্ট-এর ফেরোমন-এর শিশি এখানে কেন? আর শিশিটা খালি কেন?'

'তার জন্যে কি আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে? আমাকে যেতে দিন।' টেলর অপমানে ফুলছে।

'যাদের পিঁপড়ে লেলিয়ে দিয়ে মারবার চেষ্টা করেছিলেন, তারা কৈফিয়ত দাবি করতে পারে বৈকি!'

'কী যা-তা বলছেন!'

'ঠিকই বলছি। বোগাস রকপেন্টিং দেখেই বুঝলাম আপনার কোনো মতলব আছে। তাঁবু থেকে কিছুক্ষণ আমাদের সরিয়ে রাখলেন। কোনো ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের আভাস পেলাম। তাই সতর্ক ছিলাম। যাক, আপনি এখন আমাদের বন্দী। ষড়যন্ত্রের কারণ কাল অনুসন্ধান করব। সুনন্দ ওর হাত বাঁধো।'

টেলর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মামাবাবুকে দেখতে লাগলেন। কোনো কথা বললেন না।

বন্দী টেলর সমেত আমরা আমাদের তাঁবুর কাছে আশ্রয় নিলাম। টর্চের আলোয় দেখলাম, তাঁবু এবং তার চারপাশে থিক-থিক করছে পিঁপড়ে। যেন কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে জায়গাটা।

মামাবাবুর নির্দেশে টেলরের পা-ও বাঁধলাম। বলা যায় না যদি দৌড়ে পালায়। তারপর ভোর হওয়ার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

পুবের আকাশ সামান্য ফর্সা হবার সঙ্গে সঙ্গে পাখ-পাখালির কলতান শুরু হল। ঠিক তখুনি কানে এল আন্তোনিওর শিস। মেজাজে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আসছে। চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'আন্তোনিও, মিস্টার হার্ডি, আমরা এখানে।'

আমাদের ওই অবস্থায় দেখে বিল অবাক। 'কী ব্যাপার, টেলরকে বেঁধে রেখেছেন?'

'কারণ উনি আমাদের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন!'

'কীভাবে?'

'পিঁপড়ে লেলিয়ে দিয়ে।'

'অ্যাঁ, পিঁপড়ে লেলিয়ে দিয়ে! লোকটা যাদুবিদ্যা জানে নাকি?' বিস্ময়ে বিলের চোখ গোল হয়ে ওঠে। আন্তোনিও মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ, উইচ-ক্রাফট। আমি শুনেছি উপজাতীয় ওঝারা মন্ত্রের সাহায্যে সিংহ লেলিয়ে দিতে পারে।'

'না, জাদু নয়। অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কৌশল। এই শিশিটা দেখছেন, এর মধ্যে ফেরোমন ছিল। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি। শিশির গায়ে লেখা রয়েছে আর্মি-অ্যান্ট। তার নিচে

লেখা দেখুন—Trail Substance। আর্মি-অ্যান্ট অন্ধ। প্রত্যেক পিঁপড়ে চলার সময় পিছনের দিকের একটি শুঁড়ের সাহায্যে মাটিতে একরকম ফেরোমন লাগাতে লাগাতে যায়। এই ফেরোমন-এর নাম Trail Substance। সেই ফেরোমন-এর গন্ধ শুঁকে পিছনের পিঁপড়ে সামনের পিঁপড়েকে অনুসরণ করে দলবদ্ধভাবে এগোয়। আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে টেলর আন্তোনিওর দেখা আর্মি-অ্যান্ট-এর আস্তানা থেকে আমাদের তাঁবু অবধি এই ফেরোমন ছড়িয়ে রেখেছিল। রাতে পিঁপড়ের ঝাঁক চলতে শুরু করে গন্ধ অনুসরণ করে আমাদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসে।'

'উঃ, খুব বেঁচে গেছেন। টের পেলেন কী করে! ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বুঝি?' বিল বললেন।

'আমি জেগেছিলাম। সুনন্দ, অসিত ঘুমোচ্ছিল। নানা কারণে টেলরের ওপর আমার সন্দেহ দানা বাঁধছিল। আজ রক-পেন্টিং দেখেই বুঝলাম, হয়তো আজই বিপদ আসবে।'

'কেন, রক-পেন্টিংয়ে কী ছিল?'

'বাজে ছবি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আঁকা। হয়তো টেলরের নিজস্ব শিল্পচর্চা। বুঝলাম, আমাদের কায়দা করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘুম আসছিল না। মন কোনো বিপদের আশঙ্কা করছিল। তবে আক্রমণ যে এমন বিচিত্র উপায়ে হবে তা অবশ্য আন্দাজ করতে পারিনি! টেলর আঁটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছিলেন। বাঁদরটাকে অবধি ছেড়ে দিয়েছিলেন, পাছে সে চিৎকার করে আমাদের জাগিয়ে দেয়। আমার আর একটা সন্দেহ হয়, আমাদের খাবার জলে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিলেন টেলর। খুব সম্ভব ঘুমের ওষুধ। টেলর, সত্যি করে বলুন তো কী করেছিলেন?'

টেলর কোনো উত্তর দিল না।

মামাবাবু বললেন, 'রক-পেন্টিং দেখতে বেরোবার আগে আমি তাঁবুর জিনিসপত্র ভালো করে পরীক্ষা করে যাই। ফিরে এসে তাঁবুতে ঢুকে লক্ষ করে দেখলাম মাটিতে বসানো খাবার জলের জগটা যেন একটু সরানো হয়েছে। জলের রঙও কেমন সামান্য ঘোলা। কোনো রিস্ক না নিয়ে জলটা ফেলে দিই।'

'অর্থাৎ ওই জল খেলে?' আমি সভয়ে বলে উঠি।

'হ্যাঁ, আমাদের ঘুম আর কোনো দিনও ভাঙত না।'

'আমার ইচ্ছে হচ্ছে শয়তানটাকে এক্ষুনি গুলি করে মারি।' বিলের ক্রুদ্ধ গর্জনে টেলর যেন শিউরে উঠল। 'কিন্তু প্রোফেসর, একটা রহস্য বুঝতে পারছি না। আপনাদের হত্যা করে ওর লাভ কী?' বিল প্রশ্ন করলেন।

'সেটা বোধহয় ডক্টর কার্লোর সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারব। সুনন্দ, আন্তোনিও, তোমরা টেলরকে পাহারা দাও। বিল, অসিত আমার সঙ্গে এসো।'

গেট বন্ধ ছিল। পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে ঘরের দরজায় করাঘাত করলাম। গোরো কবাট খুলে দিল। তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। বিল গোরোকে কঠোর গলায় বললেন, 'চালাকির চেষ্টা করলেই গুলি খাবে।' বিল তাকে একটা খালি ঘরে পুরে শিকল লাগিয়ে দিলেন। তারপর কার্লোর খোঁজে আমরা ল্যাবরেটরি ঘরে হাজির হলাম।

নয়

কার্লো একটা চেয়ারে বসে চিন্তামগ্ন ছিলেন। আমাদের দেখে চমকে উঠলেন।—'একি, রিপোর্টার! তোমরা এখানে কেন? না, ফেরোমন রিসার্চ সম্বন্ধে আমি এখন একটি কথাও বলব না। কাজ শেষ না হলে কাউকে কিছু জানাব না।' কার্লো প্রায় মারতে আসেন আর কি!

মামাবাবু শান্ত গলায় বললেন, 'আমরা রিপোর্টার, কে বলেছে?'

'কেন, টেলর।'

টেলর আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে। আমি একজন প্রাণিবিজ্ঞানী। আপনার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করি। আমি জানতে এসেছি, ফেরোমন নিয়ে কে গবেষণা করছে? আপনি, না টেলর? না, দুজনে একসঙ্গে?'

'ফুঃ! টেলর ফেরোমন-এর কী বোঝে? কোনো মৌলিক গবেষণা করার মতো ওর মাথাই নেই।'

'কিন্তু জুওলজি পত্রিকায় টেলর নিজের নামে ফেরোমন-এর ওপর দুটি প্রবন্ধ লিখেছে। আমি নিজে পড়েছি। একেবারে মৌলিক গবেষণা। প্রথমটা পঙ্গপালের বংশবৃদ্ধিতে ফেরোমন-এর প্রভাব। দ্বিতীয়টি কৃত্রিম ফেরোমন তৈরি সম্বন্ধে।'

কার্লোর দৃষ্টি বিস্ফারিত। 'সর্বনাশ! তার মানে সে আমার লেখা চুরি করেছে। গবেষণা-সংক্রান্ত আরও অনেক মূল্যবান পেপারস্ একসঙ্গে ছিল। ওর কাজ ছিল আমার লেখা টাইপ করে এখানে গুছিয়ে রাখা। উঃ কী বিশ্বাসঘাতক, কী শয়তান! কোথায় সে—'

কার্লোর চেহারা ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মতো।

'আচ্ছা, টেলরের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয় কীভাবে?' মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

কার্লো কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর বললেন—

'প্রথম পরিচয় এক উপজাতি গ্রামে। তারপর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে হাসপাতালে থাকার সময় ও আমায় দেখতে আসে। সেবাযত্ন করে। হাসপাতাল থেকে বেরোবার পর টেলরই আমাকে এই নির্জনে ল্যাবরেটরি বানিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেয়। দুর্ঘটনায় আমার মুখ বিকৃত হয়ে গেছিল। লোকে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকত। ফলে লোকজনের ভিড় আমার কাছে তখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তার প্রস্তাব তাই সানন্দে গ্রহণ করি। ও আমাকে নিজের পয়সা খরচ করে ল্যাবরেটরি বানিয়ে দিয়েছিল। দরকারমতো নানা জায়গায় সঙ্গে করে নিয়ে যেত।'

'টেলর আফ্রিকায় কী করছিল?' বিল জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক জানি না। বলেছিল, ও একজন প্রাণিবিজ্ঞানী। বিভিন্ন প্রজাতির পিঁপড়ের তালিকা তৈরি করছে। খুব ভদ্র ছিল। কৃতজ্ঞতাবশে ভেবেছিলাম আমার আবিষ্কারে ওর নামটাও জুড়ে দেব। ভাবতে পারিনি আমায় ঠকাবে। আমার এতদিনের সাধনা চুরি করবে! ওঃ!'

'মনকে শক্ত করুন ডক্টর কার্লো। আপনার কাগজপত্র আশা করছি উদ্ধার করতে পারব। মনে হয় ও অপেক্ষায় ছিল আপনার গবেষণা শেষ হলে, আপনাকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে সমস্ত গবেষণা নিজের নামে প্রকাশ করে বিখ্যাত হবে। কেউ টের পেত না তার জোচ্চুরি। দৈবাৎ আমি আপনাকে চিনে ফেলাতে তার প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হল। তখন আমাদের খতম করার পরিকল্পনা করল।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ, আপনারই তৈরি কৃত্রিম ফেরোমন-এর সাহায্যে! আচ্ছা ডক্টর কার্লো, কয়েকদিন আগে টেলর একটা ছোট পাহাড়ের কাছে তাঁবু ফেলেছিল। সেখানে কি আপনিও ছিলেন? আপনার জুতোর ছাপ যেন আমি লক্ষ করেছি।' বিল কার্লোর জুতোর দিকে চেয়ে বললেন।

'হ্যাঁ, ছিলাম। আমি আগে চলে আসি। টেলর পরে এল।'

'ওখানে কী করছিলেন?' মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

'আমি ওই পাহাড়ের গুহায় কিছু আদিম মানবের পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র দেখতে পাই। টেলরকেও দেখিয়েছিলাম। জিনিসগুলো পরীক্ষা করছিলাম হঠাৎ টেলর বলল, বৃষ্টি নামবে। আপনি এখুনি ফিরে যান, আমি কয়েকদিন পরে যাচ্ছি।'

'হুম্। ঠিক আছে। আপনি বিশ্রাম করুন, উত্তেজিত হবেন না। আমরা চললাম।

'আমার পেপার্স?' কার্লো আর্তনাদ করে উঠলেন।

'দেখি, কী করতে পারি।'

বাইরে এসে মামাবাবু বললেন, 'টেলরের ওপর আমার প্রথম সন্দেহ জাগে কখন জানো? আন্তোনিওর কথা শুনে।'

'কী কথা?'

'সেই যে আন্তোনিও বলল, লিবিয়ায় এক মরূদ্যানে সে কার্লোকে দেখেছিল। একা। অথচ টেলরের প্রবন্ধে ছিল সে ঠিক ওই সময়ে এবং ওই জায়গায় পঙ্গপাল নিয়ে রিসার্চ

করে। ফলে আমার ধোঁকা লাগল—কে গবেষণা করছিল? টেলর না কার্লো? টেলর কি তবে কার্লোর কাজ চুরি করেছেন? আমার অনুমান দেখলাম সঠিক।'

বন্দী গোরোর ঘরের শিকল খুলে মামাবাবু ভিতরে ঢুকলেন। গোরো মাটিতে বসে ছিল। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। মামাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'আমাদের পোর্টারদের দেবতার গল্প বলে ভয় দেখাতে কে তোমায় নির্দেশ দিয়েছিল? সত্যি কথা বলবে, নইলে—'

'টেলর সাহেব, বানা।'

মামাবাবু আর কথা না বলে শিকল তুলে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। 'টেলর কেন এখানে আমাদের কাজ বন্ধ করতে চেয়েছিল বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ, পাছে আমরা ওই গুহার সন্ধান পাই।'

'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।' মামাবাবু মন্তব্য করলেন।

দশ

মামাবাবু টেলরকে প্রশ্ন করলেন, 'কার্লোর পেপার্স কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?'

'আমি লুকোইনি।' টেলরের মিষ্ট ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়েছে। চোখে ক্রূর হিংস্র দৃষ্টি।

'ও, ভালো কথায় কাজ হবে না। বেশ আপনার দাওয়াই আপনারই ওপর প্রয়োগ করব। দেখি, কথা বেরোয় কিনা? সুনন্দ অসিত, টেলরকে ওই গাছটার সঙ্গে বাঁধো।'

ফেরোমন-এর শিশিতে সামান্য তলানি পড়েছিল। মামাবাবু তাতে খানিক জল মেশালেন। তারপর আমাদের তাঁবুর কাছে গেলেন।

তখন তাঁবুতে খোলা খাবার একটুকরোও অবশিষ্ট ছিল না। বিল একটা হরিণ মেরে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। শুধু কঙ্কালটা দুলছে। তাঁবুর কাপড়টা অবধি কেটে কুটিকুটি করেছে ক্ষুধার্ত পিপীলিকারা।

মামাবাবু সাবধানে তাঁবুর কাছে গিয়ে পিপীলিকা ব্যূহের গা থেকে ফেরোমন ঢালতে ঢালতে পিছিয়ে এলেন। থামলেন টেলরের সামনে। তারপর সরে আমাদের কাছে এসে বললেন, 'দেখা যাক।'

গভীর আগ্রহে লক্ষ করি। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম কয়েকটা পিঁপড়ে ফেরোমন-এর গন্ধ শুঁকে শুঁকে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে দলে দলে পিঁপড়ে ছুটে এসে তাদের অনুসরণ করতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যে এক বিশাল বাহিনী ফেরোমনের গন্ধ বেয়ে সড়সড় করে এগিয়ে চলল। আন্তোনিও চট করে তার ক্যামেরা বাগিয়ে ধরল।

মামাবাবু বেশ দার্শনিকভাবে বলতে লাগলেন—'বুঝলে অসিত, আর্মি-অ্যান্টরা হল যাযাবর। দল বেঁধে কেবল ঘোরে। দিনের বেলায় গাছ বা পাথরের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, রাতে পথ চলে। এদের আর এক নাম ড্রাইভার অ্যান্ট।'

'আঁ-আঁ!' চমকে উঠে দেখি টেলর প্রাণপণে বাঁধন ছেঁড়বার চেষ্টা করছেন। তার বিস্ফারিত দৃষ্টি আগুয়ান পিঁপড়ে বাহিনীর ওপর নিবদ্ধ।

মামাবাবু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন, 'আর্মি-অ্যান্ট-এর এই প্রজাতির নাম

ডরিলাস। এদের সাউথ আমেরিকান জাতিভাইদের নাম হল অ্যাকিটন। এদের সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে।'

'আমায় ছেড়ে দাও! আমি বলছি।' টেলর আর্তনাদ করে ওঠে। পিঁপড়ের স্রোত তখন মাত্র হাত কুড়ি দূরে।
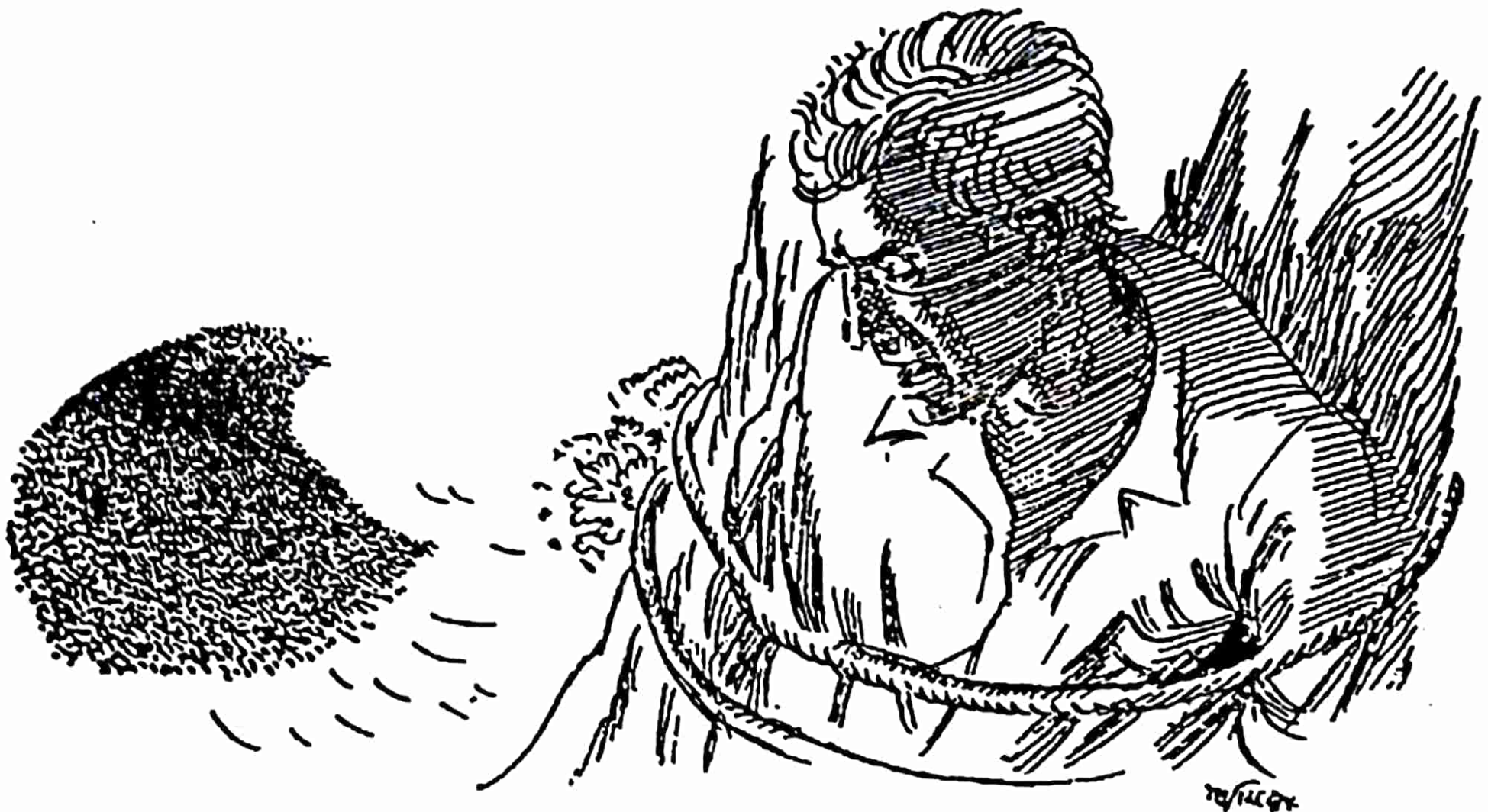
'কোথায়?'

'গুদোম ঘরে, মাটির নিচে সিন্দুকে।'

'উত্তম। সুনন্দ, ওকে খুলে সরিয়ে আনো।'

সুনন্দ বলল, 'মিস্টার আন্তোনিও, তুমি কখনও আর্মি-অ্যান্ট-এর ভোজের ছবি তুলেছ? দারুণ সাবজেক্ট। টেলর যদি অনুগ্রহ করেন—'

'খুলে দাও!' টেলর উন্মাদের মতো চেঁচালো। পিঁপড়ে বাহিনী তখন দশ হাত তফাতে। সুনন্দ দ্রুত তার বাঁধন খুলে সরিয়ে আনল।

মামাবাবু বাকি ফেরোমনটুকু গাছের চারপাশে গোল করে ছড়িয়ে দিলেন। টেলরকে বললেন, 'আশা করি সত্যি কথা বলছেন। মিথ্যে হলে কিন্তু এবার নির্ঘাৎ আপনাকে পিঁপড়ের ভোজে লাগাব।'

একটা মজার ব্যাপার দেখলাম। সারিবদ্ধ পিঁপড়েরা এসে গাছের গুঁড়ির চারধারে ক্রমাগত গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল। চক্কর খেয়েই চলেছে! কখন থামবে কে জানে!

গুদোমঘরের আবর্জনা সরিয়ে, মেঝের তক্তা উঠিয়ে সিন্দুক আবিষ্কার করতে দেরি হল না। মস্ত সিন্দুক। অনেক খোপ। একটা খোপ খুলে মামাবাবু বললেন, 'এই যে পেয়েছি।' তিনি ফাইলটা বাইরে-দাঁড়ানো কার্লোর হাতে দিলেন। ভিতরের কাগজপত্রে চোখ বুলিয়েই কার্লো, 'পেয়েছি, পেয়েছি' বলে মামাবাবুকে আনন্দে জাপটে ধরলেন।

আমি দেখলাম, বিল সিন্দুকের অন্য খোপগুলো ঘাঁটছেন। কয়েকটা বড় বড় মোড়ক খুলে মন দিয়ে দেখলেন। ঘরের তাক ও কোণগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। একটু পরে আমরা বেরিয়ে এলাম।

টেলরকে ল্যাবরেটরিতে একটা চেয়ারে বসিয়ে আমরা ঘিরে বসলাম। টেলরের মুখ ভাবলেশহীন। যেন বেকায়দা অবস্থাটা সে খানিক সামলে নিয়েছে। বলল, 'আপনাদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে। এবার আমায় ছেড়ে দিতে পারেন। মনে রাখবেন, আমার বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগগুলো একটাও কোর্টে টিকবে না। বরং উল্টে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনতে পারি।'

উঃ, সাংঘাতিক লোক! কী নার্ভ! একটু হকচকিয়ে গেলাম।

বিলের গম্ভীর গলা শুনলাম—'মিস্টার টেলর, আইন-কানুন সম্বন্ধে আপনার বেশ জ্ঞান আছে দেখছি। কিন্তু চোরা কোকেন-কারবারিকেও কি আইন ছেড়ে দেবে? কী বলেন?'

টেলরের মুখ দেখলাম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'মোহোরাতে আমার এক পুলিশ ইন্‌সপেক্টর বন্ধু বলেছিল, টাঙ্গানিকায় চোরা কোকেন চালান খুব বেড়ে গেছে। দলটাকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। এদের ব্রেন একজন শ্বেতাঙ্গ। দলের খুব কম লোক তাকে চেনে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টেলর বোধহয় সেই লোক। কি, ঠিক বলছি?'

টেলর রেগে বললেন, 'আমায় মিথ্যে মামলায় জড়াবার চেষ্টা করছেন।'

'বেশ বেশ, পুলিশ আসুক। গুদোম-ঘর সার্চ করুক। তারপর আমার কথার সত্যি-মিথ্যে তারা বিচার করবে।' টেলর গোঁজ মেরে বসে রইল।

টেলরকে একটা খালি ঘরে বন্দী করে বাইরে থেকে তালা দেওয়া হল।

মামাবাবু কার্লোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এখন কী করবেন?'

'ভাবছি ফিরে যাব। আপনারা কবে ফিরছেন?'

'আপনি সঙ্গে গেলে এখুনি ফিরতে পারি।'

'বেশ তাই যাব। আমার কাজ প্রায় শেষ। বাকিটুকু না হয় নাইরোবিতে বসে করব। সেখানে মার্টিন নামে এক ছোকরা প্রাণিবিজ্ঞানী আছে। বহুবার সে আমার অধীনে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নেব। আচ্ছা ঘোষ, এই ল্যাবরেটরির কী হবে?'

'কেন, যা-যা দরকারি জিনিস আছে সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

'কিন্তু এসব তো টেলরের সম্পত্তি।'

'তাতে কী হয়েছে? টেলর আপনাকে ঠকাতে চেয়েছিল। তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বৈকি!' মামাবাবু নির্বিকারভাবে মন্তব্য করলেন।

পরদিন সকালে টেলরের ঘর খুলে দেখা গেল, পাখি পালিয়েছে। ঘর ফাঁকা। আবিষ্কার হল, ঘর থেকে পাঁচিলের বাইরে অবধি এক গোপন সুড়ঙ্গপথ। বিল আপশোস করলেন, 'ঘরটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল।'

সুনন্দর মন খারাপ হয়ে গেল। 'ইস্, লোকটাকে শাস্তি দেওয়া গেল না। এত বড় জোচ্চোর! তার ওপর আমাদের মারার চেষ্টা করেছিল!'

বিল সুনন্দর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ব্রাদার, শাস্তি ও পাবে। আর কোনো দিন টেলর সভ্যজগতে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না। জেলের ভয়ে পালিয়ে বেড়াবে। হয়তো ধরাও পড়বে। এও কি কম শাস্তি?'

ঠিক হল, এখান থেকে আমরা যাব সেই খাদের কাছে। যে ক'দিন হাতে সময় আছে

ফসিলের অনুসন্ধান করব। বিল পোর্টার জোগাড় করে ফেললেন। গোসাপ দেবতার ব্যাপারটা ছিল টেলরের কারসাজি। স্থানীয় লোকদের সে ভয় দেখিয়ে রেখেছিল, যাতে তারা খাদে খোঁড়াখুঁড়ি করতে রাজি না হয়। টেলর পালিয়ে যেতে তাদের ভয় ভেঙে গেল।

মামাবাবুর সঙ্গে কার্লোও মহা উৎসাহে ফসিলের সন্ধানে লেগে গেলেন। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ফসিল উদ্ধার হল কিন্তু দুঃখের বিষয়, মামাবাবু যে ফসিলটি খুঁজতে এসেছিলেন তা পাওয়া গেল না।

ছ-দিন পর আমরা ডার-এস-সালাম ফিরে যাবার জন্য তাঁবু ওঠালাম।

ফসিল পেলেন না বলে মামাবাবুর দেখলাম মোটেই দুঃখ নেই। আমি সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলাম। হেসে বললেন, 'আরে, এসব আবিষ্কার কি সহজে হয়! লাক্ চাই। কেউ সারা জীবন খুঁজেও পায় না, আবার কেউ দুদিনেই আবিষ্কার করে ফেলে। তবে হার মানছি না, পরের বছর আবার আসব। আর, শূন্য হাতে ফিরছি কে বলল? এত বড় একটা আবিষ্কার করে ফেললাম যে!'

'কী আবিষ্কার?' আমার ধাঁধা লাগে।

'কেন, ব্রুস টেলরের প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কার করলাম। এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিলাম। আর ফাউ হিসাবে কেমন এক অ্যাডভেঞ্চার জুটে গেল বরাতে।'

'তা বটে!' সুনন্দ সায় দিল, 'আফ্রিকায় আমাদের দ্বিতীয় অ্যাডভেঞ্চারটা ভালোই হল!'

আমি বললাম, 'যদিও কিঞ্চিৎ বিপজ্জনক!'

আন্তোনিও আমাদের অনেক দূর অবধি পৌঁছে দিল। তারপর একজন পোর্টার সঙ্গে নিয়ে বিদায় নিল। তাকে যেন একটু মনমরা দেখাচ্ছিল। যাবার আগে বিনা অনুরোধে আমাদের সবাইকার ফোটো তুলে সে একগাদা ফিল্ম নষ্ট করে ফেলল!

মিস্টার বাসুর ফরমুলা

মুখবন্ধ

অজেয় রায় হলেন প্রকৃত বিজ্ঞান-ভিত্তিক কিশোর উপন্যাসের জগতে একজন বিশিষ্ট লেখক। এঁর গল্পে সরস বাযায় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করা হয়। এগুলি পাঠ্যপুস্তকের চাইতে বেশি মূল্যবান, কারণ ছেলেমানুষরা আনন্দ এবং আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। এঁর প্রচ্ছন্ন রসিকতাগুলিও পরম উপভোগ্য। আজগুবি গল্প লেখা বরং সহজ, কিন্তু তথ্যসমৃদ্ধ আনন্দের উপাদানের অনেক বেশি দাম।

এই বইটিকে আমি স্বাগত জানাই এবং আশা করি তরুণ পাঠকরাও পড়ে এক অন্য জগতের আস্বাদ পাবে। ইতি—

১৫ জুন ১৯৮৮ **আঃ লীলা মজুমদার**

এক

সুনন্দ ও অসিত মনমরা। কারণ তাদের মামাবাবু অর্থাৎ প্রাণিবিজ্ঞানী প্রফেসর নবগোপাল ঘোষকে পাখিতে পেয়েছে।

পাখি নিঃসন্দেহে জীবজগতের এক অভিনব সৃষ্টি। সুনন্দ বা অসিতের পাখি সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ নেই এমন নয়। বিচিত্র তাদের পালকের রঙ, আচার-আচরণ, আকৃতি। কোনো কোনো পাখির ডাক কী মধুর! সৃষ্টির আদিমকালে কী আশ্চর্য কৌশলে সরীসৃপ থেকে বিবর্তনের ফলে এই খেচর গোষ্ঠীর উদ্ভব। শুধু ভারতবর্ষে আছে পঁচাত্তরটি পক্ষিপরিবার। তাদের প্রায় বারোশো গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। এবং তাদের মধ্যে তিনশো রকম পাখি যাযাবর—বিদেশ থেকে উড়ে আসে এখানে শীত কাটাতে। এসব তত্ত্ব বিলক্ষণ আকর্ষণীয়। সুনন্দর কাছে না হলেও অসিতের কাছে খবরগুলো নতুন বটে। তাই প্রথমটা সে আগ্রহ নিয়ে শুনত। তবে কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি কি ঠিক! কিন্তু মামাবাবুর ক্ষেত্রে তাই যে ঘটছে!

মামাবাবুর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তিনি অত্যন্ত ঝোঁকাল। যখন যা ধরেন, একেবারে চূড়ান্ত করে ছাড়েন।

পাখি সম্বন্ধে মামাবাবুর জ্ঞান যথেষ্টই ছিল। তবে এখন একেবারে বুঁদ হয়ে গেছেন। দিনরাত ওই নিয়ে পড়াশুনা করছেন, ভাবছেন ও আলোচনা করছেন। খাবার সময়ে পাখির কথা, বেড়াতে বেরোলে পাখির চিন্তা। চোখ দুটো তখন পায়ের কাছের জমি ছেড়ে সদাই আকাশে বাতাসে টেলিগ্রাফের তারে, জানলার কার্নিশে বা গাছের ডালে পাখি খুঁজে বেড়ায়। অন্য কোনো বিষয়ে কথাবার্তা বলা তিনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন।

মামাবাবুর ইদানীং কিছু নতুন বন্ধু জুটেছিল। সব পক্ষিপ্রেমিক। এদের হাবভাবই আলাদা। যখন তখন এদের আগমন। সবচেয়ে বেশি আসতেন বঙ্কিম হাজরা। অবশ্য তারা সুনন্দ অসিতের ধাত বুঝে ফেলেছিল। বুঝতে পেরেছিল এই দুইজনের পক্ষিপ্রীতি মোটেই গভীর নয়। তাই সুনন্দদের সামনে পড়লে সামান্য ভদ্রতা করা ছাড়া আলাপের আগ্রহ দেখাত না। তাদের আলোচনার বৈঠক বসত। কখনো সবাই বেরোতেন ফিল্ড স্টাডি করতে। অর্থাৎ মাঠেঘাটে দূরবিন দিয়ে নানান পাখির স্বভাব চরিত্র লক্ষ করা। এদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য পক্ষিবিদ্ হিসেবে বেশ নামী। তবে বঙ্কিমবাবু এ লাইনে নেহাত আনকোরা। সুনন্দ তাঁর নাম দিয়েছিল ভক্ত বঙ্কিম। ভদ্রলোককে নিয়ে তারা হাসাহাসি করত।

মামাবাবু মাইশোর গিয়েছিলেন পক্ষিবিদ্‌দের এক সম্মেলনে মাস তিনেক আগে। সেখান থেকে মাদ্রাজে বেদনথঙ্গল পক্ষিনিবাস দেখতে যান। পথে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়। কৌতূহলী বঙ্কিমবাবু দুটো দিন মামাবাবুর সঙ্গে পাখি দেখে কাটান। ক্রমে ক্রমে সমস্ত

ব্যাপারটায় ভদ্রলোকের এমন দারুণ আগ্রহ জন্মায় যে কলকাতায় ফেরার পরেও তিনি মাঝে মাঝে প্রফেসর ঘোষের কাছে এসে পাখি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে চলেছেন।

বঙ্কিমবাবুর সর্বক্ষণই একটু ব্যস্তসমস্ত ভাব। যদিও ব্যস্ত হবার কারণ তাঁর নেই। সুনন্দরা শুনেছে ভদ্রলোকের পয়সা এবং অবসর দুই-ই অঢেল। চাকরি বা ব্যবসা করেন না। বাড়ির ভাড়া, শেয়ার ইত্যাদি প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তির আয়ে ভর করে দিব্যি কাটাচ্ছেন। স্ত্রী-পুত্রের ঝামেলাও নেই, কারণ তিনি অবিবাহিত। তবে ভারি অমায়িক লোক।

চেহারা সাধারণ। মুখ-চোখে খুঁত না থাকলেও বৈশিষ্ট্য নেই। অবশ্য রঙ ফর্সা। মাঝারি লম্বা। মাঝারি স্বাস্থ্য। মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল এলোমেলো হয়ে থাকে। কিন্তু ভদ্রলোক পোশাকের ব্যাপারে বেশ শৌখিন। চওড়া পাড়ের তাঁতের ধুতি, পাঞ্জাবি, কাঁধে পাট করা চাদর, পায়ে পাম্প শু দিয়ে সর্বদা ফিটফাট থাকেন। ধূমপান করেন দামী ব্রান্ডের সিগারেট। দাড়ি-গোঁফ কামানো। পরিষ্কার মুখখানি হাসি-হাসি, তবে কিঞ্চিৎ বোকা-বোকা। লোকটির কথাবার্তাতেও মোটেই বুদ্ধির ছাপ নেই। যদিও মামাবাবুর কাছে হাজির হলেই তাঁর হাতে থাকে এক ভল্যুম সেলিম আলির লেখা 'বার্ডস অফ ইন্ডিয়া' এবং অত্যন্ত সিরিয়াস মুখে তিনি অন্যদের, বিশেষত মামাবাবুর কথা শোনেন ও বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়েন।

তবে ভদ্রলোকের এক মহৎ গুণ আছে অস্বীকার করা যায় না। মামাবাবুর কাছে এলে প্রায়ই এক বাক্স উত্তম কড়া পাকের সন্দেশ উপহার দিয়ে যান। এ নাকি গুরুদক্ষিণা। বলা বাহুল্য, সন্দেশের ভাগ সুনন্দ অসিতেরও জোটে।

যাহোক মামাবাবুর এই নতুন নেশায় সুনন্দ অসিতের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছে। আরও রাগের কারণ, মামাবাবু প্ল্যান করেছিলেন ভুটান বর্ডারে যাবেন অতি দুর্লভ গোল্ডেন লেঙ্গুর অর্থাৎ সোনালি হনুমান স্বচক্ষে দর্শনের চেষ্টায়। আপাতত সেকথা মনে করিয়ে দিলেও কানে তুলছেন না। বলছেন—'হবে হবে। তাড়াহুড়োর কী?'

ক্ষুব্ধ সুনন্দ রাগে ফুঁসছিল। শেষে একদিন অসিতের বাড়ি এসে বলল, 'চ আমরা দুজনে কোথাও ঘুরে আসি। পাখি-পাখি শুনে বাড়িতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। আর তিষ্ঠনো যায় না।'

হয়তো সত্যি তারা দুজনে কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত, যদি না সেদিন হঠাৎ কুণালের আবির্ভাব হত।

·

অসিতের বাড়ির বৈঠকখানায় একটি মুখ উঁকি মারল।

অসিত দেখল প্রথমে। ডাকল—'আরে কুণাল যে! আয় আয় ভিতরে। অনেক দিন পরে।'

কুণাল মিত্র ছিল সুনন্দ ও অসিতের কলেজের সহপাঠী। চার বছর তারা একসঙ্গে পড়েছে। খুব ভাব ছিল তাদের। গ্র্যাজুয়েশনের পর তাদের ছাড়াছাড়ি হয়। কুণাল পড়তে যায় রসায়ন বিদ্যা। পাস করে সে বছর চারেক এক কারখানায় কেমিস্ট হিসেবে চাকরি করে, তারপর কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করে। নানারকম জিনিস তৈরি করতে থাকে। প্রথম দিকে সাবান, কলমের কালি, মাজন ইত্যাদি তৈরির পর এখন গোটা দুই ওষুধও বানাচ্ছে। শুধু অন্যের আবিষ্কৃত ফরমুলায় তৈরি জিনিস নয়, নিজেও সে গোটা

কয়েক ছোটখাটো ওষুধ উদ্ভাবন করেছে। কুণালের সঙ্গে সুনন্দদের আজকাল দেখা হয় কম। তবে পুরনো টানটা বজায় আছে।

কুণাল ঘরে ঢুকল। ওর চেহারায় বেশ চেকনাই এসেছে। পরনে দামী জামা-প্যান্ট। অর্থাৎ দু-পয়সা কামাচ্ছে আজকাল। সুনন্দরা খুশি হল। বেচারা অনেক কষ্ট করেছে গোড়ায়।

অসিত বলল, 'চা খাবি তো? আর সঙ্গে সেইরকম আলুর চপ চলবে নাকি? না, ওসব ছেড়ে দিয়েছিস?'

'খুব চলবে।' চেয়ারে বসতে বসতে বলল কুণাল—'তরে বুঝলি কিনা ওসব বস্তু একা খেয়ে সুখ নেই। সঙ্গে জুতসই আড্ডার পাট তো ভাই উঠে গেছে। কতবার ভাবি আসব তোদের কাছে, মোটে সময় পাই না।'

'ভালো ভালো', সুনন্দ হাসল, 'মানে তোর ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। তোর মিত্র কেমিক্যালস-এর উইপোকা তাড়াবার ওষুধটা তো খুব নাম করেছে। বিজ্ঞাপন দেখলাম কাগজে।'

'হ্যাঁ, ওটা বেশ চলছে।'

চা এবং গরম আলুর চপ এল।

সুনন্দ লক্ষ করল, কুণাল মাঝে মাঝে কেমন আনমনা হয়ে পড়ছে। ও যেন কিছু বলতে চায় কিন্তু বলে উঠতে পারছে না। একসময় সুনন্দ বলে ফেলল, 'হ্যাঁরে কুণাল, স্রেফ আড্ডা দিতে এসেছিস, না কোনো কাজ-টাজ আছে?'

কুণাল একটু আমতা আমতা করে বলল, 'হ্যাঁ, মানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। ভাবছিলাম তোদের পরামর্শ নিই।'

কথাটা বলে কুণাল একটুক্ষণ চুপ করে রইল। বোধহয় মনে মনে গুছিয়ে নিল ঘটনাগুলো। তারপর বলতে শুরু করল—

'মাসখানেক আগে আমি একটা চিঠি পাই। ইংরেজিতে লেখা। জনৈক মিস্টার বাসু লিখেছেন। বক্তব্য—তিনি ধানের রাক্ষুসে পোকা মারার একটি রাসায়নিক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। উপযুক্ত দাম পেলে ওষুধের ফরমুলাটি তিনি বিক্রি করতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে আমি আগ্রহী হলে যেন তাঁকে জানাই।

'চিঠি পেয়ে ধাঁধায় পড়লাম। বাজে ফরমুলা বিক্রি করে ঠকানোর চেষ্টা এ লাইনে নতুন নয়। প্রথমে ভেবেছিলাম দরকার নেই উৎসাহ দেখিয়ে। কিন্তু ধানের রাক্ষুসে পোকার উল্লেখে আমি মত বদলালাম। এগুলি একজাতীয় খুব ক্ষুদ্র কীট। চাষীরা নাম দিয়েছে রাক্ষুসে পোকা। ধানের শিষ একটু পুষ্ট হলেই এই পোকা তার শাঁস খেয়ে নেয়। ফলে শস্যদানা ছিবড়ে হয়ে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এই পোকার উৎপাত ভারতে আগেও কয়েকবার দেখা গেছে, একরকম কীটনাশক ব্যবহার করে তাকে দমন করাও সম্ভব হয়েছে—কিন্তু এবার পুরনো ওষুধে কোনো কাজ দিচ্ছে না। রাক্ষুসে পোকা ভীষণ তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে। ফলে হু-হু করে ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিম বাংলায়—চব্বিশ পরগনা-হুগলিতে ছড়িয়েছে। আবার শুনছি দক্ষিণ ভারতেও কয়েক জায়গায় উপদ্রব শুরু হয়েছে। কোনো রকমে তাকে বাগ মানানো যাচ্ছে না। উজাড় হয়ে যাচ্ছে ধান। এমন চললে নির্ঘাত দুর্ভিক্ষ লাগবে।'

'এত খবর তুই পেলি কোথায়? কাগজে তো কিছু বেরোয়নি।' জিজ্ঞেস করল সুনন্দ।

'কাগজে কি আর সব খবর দেয়। এখন রোগটার সবে শুরু। আমি এসব খবর রাখি কারণ এখন আমি ফসলের ক্ষতিকারক রোগের ওষুধ তৈরির চেষ্টা করছি। এদেশে কোন্ ফসলের কী কী শত্রু, কী তাদের প্রতিকারের ওষুধ—এসব খবর রাখতে হচ্ছে তাই। মাস ছয় হল মিত্র কেমিক্যালস টমাটো গাছের শত্রু শুঁয়োপোকা মারার একটা নতুন কীটনাশক ছেড়েছে বাজারে। একজন কৃষি-বিজ্ঞানীর আবিষ্কার। আমার কারখানার ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ করেছেন। সুতরাং ভেবে দেখলাম মিস্টার বাসুর অফার একবার যাচাই করে দেখি। যদি সত্যি ওষুধটা কাজের হয় এবং বাসুর চাহিদা আমার সাধ্যে কুলোয়, তাহলে আমার বরাত ফিরে যাবে। অতএব আমার আগ্রহ জানিয়ে উত্তর দিলাম।

'চারদিন পরে রেজিস্ট্রি পার্শেলে এক প্যাকেট পাউডার এল। নমুনা পাউডার জলে গুলে কীভাবে ক্ষেতে ছিটোতে হবে তার নির্দেশও রয়েছে ইংরেজি টাইপে। মিঃ বাসু লিখেছেন— ওষুধের ফলাফল পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে যেন আমি চিঠিতে জানাই। তারপর সাক্ষাতে ব্যবসায়িক কথাবার্তা হবে।

'এক্সপেরিমেন্ট করে আশ্চর্য ফল পেলাম। তক্ষুনি জানালাম বাসুকে, আমি ফরমুলা কিনতে চাই।

'মিস্টার বাসুর নির্দেশমতো চৌরঙ্গির কুতুব হোটেলে সতেরো নম্বর ঘরে দুপুর দুটোর সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। প্রথম দর্শনে বেশ হকচকিয়ে গেলাম। আশা করেছিলাম এক খোলামেলা বৈজ্ঞানিককে দেখব, কিন্তু তার বদলে দেখলাম রীতিমতো রাসভারি সাহেবি কেতার এক মানুষ। গায়ের রং যদিও শ্যামবর্ণ কিন্তু পরনে নিখুঁত স্যুট টাই। কুচকুচে কালো চুল টেনে ব্যাকব্রাস করে আঁচড়ানো, মোটা গোঁফ, মুখে পাইপ, চোখে চওড়া ফ্রেমের চশমা। চশমার কাচের রং ঈষৎ নীল। উপরের পাটির সামনের দুটি দাঁত একটু বড় ও উঁচু। অল্প কুঁজো হয়ে সামনে ঝুঁকে হাঁটেন, কথা বললেন বেশির ভাগ ইংরেজিতে গম্ভীর গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে। হালকা গল্পের ধারকাছ দিয়েও গেলেন না। সোজা কাজের কথায় এলেন। একগোছা টাইপ করা কাগজ এগিয়ে দিলেন—সলিউশন বানানোর পদ্ধতি। ফরমুলার জন্য দর হাঁকলেন বিশ হাজার টাকা। টাকাটা একসঙ্গে দিতে হবে।

'আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম ফরমুলার ওষুধের স্বত্ব বিক্রি করতে চাইছেন কেন? রয়ালটি রাখলে যারা এই ফরমুলায় ওষুধ বানাবে তাদের কাছ থেকে এই ওষুধ বিক্রির আয়ের একটা ভাগ বরাবর পেয়ে যাবেন আপনি। মনে হয় তাতে মোট আরও বেশি অর্থ পেতে পারবেন ভবিষ্যতে।

'উনি বললেন, আমার এখনই অনেক টাকার দরকার বছর বছর একটু একটু করে পেলে চলবে না। যদি এ ব্যবস্থায় আপনার আপত্তি থাকে তাহলে আর কথা বলে লাভ নেই।

'আমি বললাম, আমার আর কী আপত্তি। এরপর আমি কাগজপত্রগুলো একটু দেখতে চাইলাম। ভদ্রলোক আমাকে ঘরে রেখে বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন ঘণ্টাখানেক বাদে। লেখার একটা অংশ ঠিক বুঝতে পারছিলাম না—তাই জিজ্ঞেস করলাম।

'বাসু ভুরু কুঁচকে পড়লেন জায়গাটা। তারপর বললেন, জায়গাটা উনি আরও পরিষ্কার করে লিখে পাঠাবেন পরে।

'এরপর আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। কিন্তু তখন একটাও প্রশ্নের জবাব দিলেন না। প্রশ্নের জায়গাগুলো দাগ দিয়ে নিলেন। বললেন, কয়েকদিন পরেই আমি উত্তর পাব। তারপর কাগজ-পত্র গুটিয়ে সেদিন বিদায় নিলেন।

'তিন দিন পরে আবার সেই কাগজ-পত্রগুলো এল আমার কাছে ডাক মারফত। প্রশ্নের জায়গাগুলো টুকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাউডারটা হাতে-কলমে বানাতে আমার কোনো অসুবিধাই হয়নি। এবার হবে ফাইনাল কথাবার্তা।'

ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। তবু তেমন রহস্যের ইশারা পাচ্ছিল না সুনন্দ বা অসিত। সুনন্দ বলল, 'অর্থাৎ সলিউশনের ফরমুলাটা তুই কিনছিস?'

'পাগল। অত টাকা আমি পাব কোথায়?'

'তবে আর কথা বলার দরকার কী? চিঠিতে তোর মত জানিয়ে দিলেই তো চুকে যায়।'

কুণাল বলল, 'আসলে আমি বাসুর সঙ্গে যোগাযোগটা নষ্ট করতে চাইছি না। তাই ঝুলিয়ে রেখেছি।'

'কেন?'

'মানে আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।'

'কী?'

'কীটনাশক ওষুধটার প্রকৃত আবিষ্কারক হয়তো মিস্টার বাসু নন ; অন্য কেউ।'

'কী করে বুঝলি?' প্রশ্ন করে অসিত।

'পাউডারটা বানাবার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথম দুটো প্রশ্ন আমি সত্যি ভালো বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু উনি একটারও জবাব দিলেন না। মানে, মনে হল যেন উনি ধোঁকায় পড়েছেন। কেমন খটকা লাগল আমার। তখন পরের প্রশ্নগুলো করলাম নেহাত সোজা সোজা।

'এক্সপেরিমেন্টের বিভিন্ন স্টেজে কেমন রেজাল্ট পাওয়া গেছে? গ্রীষ্মে এবং শীতের ধানে কি একই ডোজ ওষুধ ব্যবহার করতে হবে? ধানের ক্ষতিকারক আর কী কী পোকার উৎপাতে এই ওষুধ কাজে দেবে ইত্যাদি। সেগুলোরও জবাব পেলাম না। যে লোক ওষুধের আবিষ্কারক তার পক্ষে ওসব প্রশ্নের তক্ষুনি উত্তর না দেওয়ার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া এত দামী ওষুধের সর্বস্বত্ব অবধি বিক্রি করে দিতে চায় এ খুব অস্বাভাবিক। আর বৈজ্ঞানিক হিসাবে মিস্টার বাসুর নামও কখনো শুনিনি আগে।'

'অর্থাৎ বলতে চাস, বাসু কারো ফরমুলা চুরি করেছে?' বলল সুনন্দ।

'হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে আসল আবিষ্কারকর্তাটি কোনো বিশেষ কারণে আড়ালে থাকতে চায়। বাসু তার হয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। মোট কথা আমি ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে চাই। কিন্তু কীভাবে এগোব বুঝতে পারছি না।'

সুনন্দ অসিত এতক্ষণে বুঝল কুণালের আগমনের উদ্দেশ্য। তারা পরস্পরে চোখাচোখি করল। মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠল। অনেকদিন নিষ্কর্মা থেকে রোমাঞ্চকর কিছু একটা করার ইচ্ছেয় ছটফট করছিল দুজনে।

'তোর সঙ্গে মিস্টার বাসুর আবার কবে দেখা হচ্ছে?' জানতে চাইল অসিত।

'আসছে কাল। বিকাল চারটে। স্থান হোটেল কুতুব। সতেরো নম্বর ঘর। মিস্টার বাসু চিঠিতে জানিয়েছেন।'

ঘরের মধ্যে মিনিট তিনেক নিস্তব্ধতা। সবাই ভাবছে। অসিত একবার উঠে বাড়ির ভিতরে গিয়ে এক রাউন্ড চায়ের বন্দোবস্ত করে এল।

'বাসু কি ওই হোটেলে থাকেন?' সুনন্দ মুখ খুলল।

'না।' বলল কুণাল, 'আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। উনি হঠাৎ হঠাৎ এসে ওঠেন এবং একদিনের বেশি থাকেন না কখনো।'

'ওকে চিঠিপত্র লিখতিস কোন্ ঠিকানায়?'

'ওই হোটেল কুতুব। কেয়ার অফ ম্যানেজার। মাঝে মাঝে উনি নিজে বা ওঁর লোক এসে ডাক নিয়ে যায়।'

'হুম্!' সুনন্দ মাথার চুল টানছে। অর্থাৎ ভাবছে। তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, 'কাল আমরা ওকে ফলো করব। আমি আর অসিত। উনি হোটেল থেকে বেরোলেই। নিশ্চয় উনি বাড়ি ফিরবেন। একবার ওঁর আস্তানার খোঁজ পেলে তারপর ওর পরিচয় বা গতিবিধি জানা অসুবিধে হবে না। তখন জানা যাবে ওই ফরমুলার আসল আবিষ্কারকটি কে?'

বিকেল প্রায় সাড়ে পাঁচটা।

হোটেল কুতুবের গেট থেকে শ-খানেক হাত দূরে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটা ছাইরঙা অ্যামবাসাডর, তার মধ্যে বসে আছে তিনজন—সুনন্দ, অসিত এবং তাদের বন্ধু মিন্টু।

গাড়িখানা মিন্টুর। মিস্টার বাসুকে ফলো করার জন্য গাড়িটা চাওয়া হয়েছিল মিন্টুর কাছে। বলা হয়েছিল কেবল গাড়িটা পেলেই চলবে। সুনন্দ নিজেই ড্রাইভ করবে। বাসু যে ধরনের লোক, মনে হচ্ছে ট্রামে-বাসে ঘুরবেন না, ট্যাক্সি বা নিজের গাড়িতে যাওয়া-আসা করবেন। মিন্টু কিন্তু কেসটা শুনেই লাফিয়ে উঠল। সে বেজায় অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় ডানপিটে। বলল সে স্বয়ং হবে গাড়ির চালক। তার খুব ইচ্ছে ছিল একজোড়া নকল দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে আসে, কিন্তু সুনন্দ বারণ করল। হঠাৎ খুলে-টুলে গেলে বিশ্রী কাণ্ড হবে।

তিনজোড়া চোখ আটকে আছে হোটেল কুতুবের গেটে।

অধীর উত্তেজনায় ঘন ঘন সিগারেট টানছে মিন্টু। গেট দিয়ে কাউকে বেরোতে দেখলেই চট করে আঁকড়ে ধরছে স্টিয়ারিং হুইল। চারটে বাজতে ঠিক পাঁচ মিনিট আগে হোটেলে ঢুকেছে কুণাল। বেরিয়েছে চারটে পঞ্চাশে। গেটের বাইরে এসে একবার আড়চোখে দেখে নিয়েছে সুনন্দদের। তারপর হনহন করে চলে গেছে উল্টো পথে।

ভাগ্য ভালো তাই বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ছ'টা নাগাদ কুতুবের গেট দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল যে ব্যক্তি তাকে কুণালের বর্ণনা অনুযায়ী মিস্টার বাসু বলে চিনতে ভুল হল না। বাসুর হাতে একটা পেট-মোটা ফোলিও ব্যাগ। তিনি এদিক-ওদিক চেয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকলেন এবং তাতে চড়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিন্টুর গাড়ি স্টার্ট দিল।

মিস্টার বাসুর ট্যাক্সি চলল চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ ধরে। প্রায় পঞ্চাশ হাত পিছনে থেকে মিন্টুর গাড়ি তাকে অনুসরণ করল।

সামনের ট্যাক্সি সোজা শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে পড়ল। তারপর টালা ব্রিজ পার হয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরল। অতএব বাসুর গন্তব্যস্থল কলকাতা শহরের বাইরে কোনো শহরতলি অঞ্চলে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। দিন ছোট তাই তখনই সন্ধ্যা নেমে গেছে। মিন্টুর সুবিধেই হল। অন্ধকারের জন্য সামনের আরোহী টের পাবে না যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে। ট্যাক্সির পিছনের কাচের ভিতর দিয়ে মিস্টার বাসুর টুপি দেখা যাচ্ছে। নিশ্চল হয়ে বসে আছেন তিনি। আরও দু-খানা একই রকম ট্যাক্সি বাসুর ট্যাক্সির আগু-পিছু যাচ্ছিল। ফলে বাসুর ট্যাক্সি কোনটা খেয়াল রাখা শক্ত হচ্ছিল। সিঁথির মোড়ে ট্র্যাফিক কনস্টেবল হাত দেখাল গাড়ি থামাতে, একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে যেতে পারল। মিন্টু গাড়ি থামাতে থামাতে হঠাৎ আবার এক্সিলারেটার চেপে গতি বাড়িয়ে পেরিয়ে গেল মোড়। এবং তড়িৎবেগে যে ট্যাক্সিটা এগিয়ে গিয়েছিল তার পিছু ধরল। সামনের গাড়ির নম্বর দেখে সুনন্দ বুঝল ওটা মিস্টার বাসুর ট্যাক্সি। অদ্ভুত নজর মিন্টুর, ঠিক লক্ষ করেছে।

অসিত বলল, 'ট্র্যাফিক পুলিশটা কিন্তু আমাদের গাড়ির নম্বর টুকে নিল। ফাইন করবে।'

'করুক গে।' মিন্টু নির্বিকার।

আরও প্রায় পনেরো মিনিট হু-হু করে ছুটল গাড়ি সিধে রাস্তা বেয়ে।

একটা বড় চৌমাথা। চারপাশে দোকান। অনেক লোকের ভিড়। রাস্তার পাশে একটা সিনেমা হল। জায়গাটা ছাড়িয়েই মিস্টার বাসুর ট্যাক্সি থেমে গেল।

মিণ্টুর গাড়ি তাকে পাশ কাটিয়ে খানিক এগিয়ে থামল পথের ধারে। গাড়িতে বসে তারা দেখল মিস্টার বাসু নামলেন—ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলেন—এবং বাঁ পাশে একটা সরু পথ ধরে হেঁটে অদৃশ্য হলেন।

মিন্টু তার গাড়ি ঘুরিয়ে সেই রাস্তার কাছে গেল।

পাকা রাস্তার খানিকটা অংশ খোঁড়া। মেরামতি হচ্ছে। এই কারণেই বাসুর ট্যাক্সি ঢোকেনি। তারাও নেমে পড়ল।

অসিত বলল, 'কোথায় এসেছে বুঝছিস? এটা পানিহাটি। এ রাস্তাটা সোজা গেছে গঙ্গার ধার অবধি।'

'কী করে জানলি?' সুনন্দ জিজ্ঞেস করল।

'এ জায়গা আমি চিনি। একটু দূরেই যে আমার সেজমাসির বাড়ি। এর পরের বাস স্টপেজে নামতে হয়। কতবার এসেছি।'

তিনজনে পথটা ধরে এগোল। গাড়ি রইল বড় রাস্তায়।

পথ প্রায় অন্ধকার। অনেক দূরে দূরে এক-একটা ল্যাম্পপোস্ট রয়েছে বটে, কিন্তু কুয়াশা ভেদ করে আলোর জ্যোতি খুব আবছা। শীতের রাতে দুধারের বাড়িতে জানলা-দরজা বন্ধ। নিস্তব্ধ লোকালয়। দু-একজন মাত্র পথিক আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে গেল। তিনজনে দ্রুত পা চালাল—যতটা সম্ভব নিঃশব্দে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলল পথের ধারের বাড়িগুলো—সামনে কেউ যাচ্ছে কিনা।

অল্প এগিয়েই চোখে পড়ল মিস্টার বাসুর চলমান মূর্তি। তাঁর জুতোর শব্দ উঠছে—খট্ খট্ খট্।

মিন্টু, অসিত, সুনন্দ গা-ঢাকা দিয়ে এগোল।

রাস্তাটা অবশ্য সিধে নয়। অনেক এঁকেবেঁকে গেছে। হঠাৎ থামলেন বাসু। তক্ষুনি সুনন্দরা গাছের ছায়ায় মিলিয়ে গেল। পুরনো লোহার গেট খোলার কর্কশ আওয়াজ। বাসু ঢুকলেন একটা বাড়িতে।

তিনজনে গুটি গুটি এগোল।

যে বাড়িতে মিঃ বাসু ঢুকেছেন সেটা পাঁচিল ঘেরা একটা দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে অনেকখানি বাগান। বাড়ির যতটুকু অংশ চোখে পড়ছে, কোনো আলোর চিহ্ন নেই। কোনো লোকজনেরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তিনজনে গেটের সামনে থেকে সরে এল।

কী করা যায়?

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করা যাক।

বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে। কনকনে বাতাস বইছে। হাত-মুখ যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এভাবে কতক্ষণ থাকা যায়? তাছাড়া বে-পাড়া। দৃশ্যটা কেউ দেখে ফেললে ফল মোটেই ভালো হবে না। অসিত বলল, 'বাড়িটা তো চিনে গেলাম, এখন চল আমার মাসির বাড়িতে রাত কাটাই। সকালে এসে খোঁজ-খবর করা যাবে।'

প্রস্তাবটা মনঃপূত হল সবার। কিন্তু মিন্টু থাকতে পারবে না। তার কাজ আছে খুব সকালে। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে সে বিদায় নিল। কারণ তার ধারণা কাল একটা জোর অ্যাডভেঞ্চার জুটে যাবে সুনন্দের বরাতে। সে প্রস্তাব দিয়েছিল—'চল ঢুকি পাঁচিল টপকে। বাড়িটা সার্চ করি। হয়তো সেই বৈজ্ঞানিককে বন্দী করে রেখেছে।'

কিন্তু তার বন্ধুরা এমন বেআইনি কারবারে রাজি হল না। সত্যি যে কাউকে এখানে আটক করে রাখা হয়েছে তার প্রমাণ কই? হয়তো বাসু স্বয়ং সেই বৈজ্ঞানিক। অথবা বৈজ্ঞানিকের বন্ধু। অতএব সেক্ষেত্রে বিনা অনুমতিতে পরের বাড়িতে প্রবেশের অপরাধে নির্ঘাত হাজতবাস ভোগ করতে হবে। আপাতত মিস্টার বাসুকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। কাল বরং এসে খোঁজ করা যাবে।

পরদিন বেশ সকাল-সকাল সুনন্দ অসিত এসে মিস্টার বাসুর বাড়ির সামনে হাজির হল। কীভাবে বাসুর সঙ্গে আলাপ জমানো যায়, কোন্ ছুতোয় বাড়ি ঢুকবে ইত্যাদি যুক্তি করছে তারা, এমন সময় একজনকে বাগানের রাস্তা ধরে গেটের দিকে আসতে দেখে তারা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। আগন্তুক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ওরফে ভক্ত বঙ্কিম।

বঙ্কিমবাবুও সুনন্দদের দেখতে পেয়েছিলেন। হাতজোড় করে বললেন—'আরে কী ব্যাপার, আপনারা এখানে?'

সুনন্দরা হকচকিয়ে গেল। কোনো রকমে সামলে নিয়ে অসিত বলল, 'আমরা বেড়াতে এসেছি। এই কাছেই আমার মাসির বাড়ি। আপনি এখানে থাকেন নাকি?'

'পার্মানেন্টলি নয়। মাঝে মাঝে। বাড়িটা ভাড়া নিয়ে রেখেছি। গঙ্গার ধারে, দিব্যি খোলামেলা। কয়েকদিন কাটিয়ে যাই। আসুন ভিতরে।'

অসিত একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমরা ভেবেছিলাম বাড়িটা অন্য এক ভদ্রলোকের।'

'কেন?' বঙ্কিমবাবু রীতিমতো অবাক।

'মানে কাল সন্ধেবেলা ফিরছিলাম এই পথে। দূর থেকে দেখলাম কোট-প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক ঢুকলেন এই বাড়িতে, তাই।'

'ওঃ, বুঝেছি। মিস্টার বাসুকে দেখেছিলেন।' বঙ্কিমবাবু হাসলেন। 'এ কিন্তু অন্যায়। যে কাউকে আমার এ বাড়িতে ঢুকতে দেখলে তাকে মালিক বলে ধরে নেবেন।'

অসিত লজ্জিত হয়।—'না মানে শীতের সন্ধে। এমন অসময়। বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে হয়নি। ভাবলাম আপিস ফেরতা কেউ। এদিককার লোকদের তো চিনি না ভালো।'

বঙ্কিমবাবু বললেন, 'মিস্টার বাসু আমার ঠিক বন্ধু নন, সামান্য পরিচিত বলতে পারেন।'

'ও তাহলে নিশ্চয় জরুরি কাজ ছিল। তাই অমন সময়ে। খুব পাক্কা সাহেব।'

'হুঁ, তা বটে। ভদ্রলোক আমায় বড্ড জ্বালাচ্ছেন।'

'কেন?'

'আমাকে বিজনেস পার্টনার করতে চান। তাই নিয়ে ঝোলাঝুলি। যত বলছি ওসব হাঙ্গামা আমার পোষাবে না। কালকেও অনেকক্ষণ বকবক করে গেলেন।'

'ভদ্রলোক থাকেন কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'কীসের ব্যবসা?' সুনন্দ জানতে চায়।

'দু-তিন রকম প্ল্যান আছে ভদ্রলোকের। আপাতত গেঞ্জির কল করতে চান। কিন্তু ধরনটা ঠিক বুঝছি না।'

'ওনার ঠিকানাটা দিতে পারেন?' বলল সুনন্দ।

'কেন?' হাজরাবাবু ভুরু কুঁচকোলেন।

'মানে আমার এক বন্ধুর খুব ব্যবসার ঝোঁক। ছোটখাটো কিছু ফাঁদতে চায়। পার্টনার খুঁজছে। মিস্টার বাসুর খবরটা ওকে দেওয়া যেতে পারে, সুনন্দ উৎসাহিত হয়ে বলল।

বঙ্কিমবাবু মাথা নাড়লেন। 'সরি। ওঁর ঠিকানা তো জানি না। শ্যামবাজারে কোথাও। দিয়েছিলেন অ্যাড্রেস, হারিয়ে ফেলেছি।'

'আবার যদি আসেন অ্যাড্রেসটা নিয়ে রাখবেন দয়া করে।'

'বেশ নেব। তবে আর আসবে বলে মনে হয় না। সাফ 'না' করে দিয়েছি এবার। আপনার বন্ধুর নাম-ঠিকানা?'

সুনন্দ তৎক্ষণাৎ যে নাম-ঠিকানাটা জানাল তা কুণালের নয়—অশোক নামে তাদের এক বন্ধুর। অশোক ইঞ্জিনিয়ার। সম্প্রতি বাড়ি বানাবার কনট্রাকটারি করছে।

বঙ্কিমবাবু বললেন, 'চলুন একটু চা-টা খাবেন। আমার অবশ্য এখানে লোকজন নেই। একটি বুড়ো মালি ভরসা।

ভিতরে যেতে যেতে সুনন্দ লক্ষ করল বাগানে যত্নের বড় অভাব। ভালো ভালো ফল-ফুলের গাছের পাশে আগাছা জন্মেছে।

বাড়ির কোলেই গঙ্গা। চওড়া বাঁধানো ঘাট নেমেছে ধাপে ধাপে।

নিচের তলায় একটা মস্ত হলঘরে সুনন্দরা বসল। ঘরে পুরনো আমলের কিছু টেবিল চেয়ার।

চা আর অমলেট খাওয়ালেন বঙ্কিমবাবু।

সুনন্দ অসিত একটু লজ্জিত হল ভদ্রলোককে বিব্রত করার জন্য। উনি কিন্তু ভারি খুশি। প্রফেসর ঘোষের ভাগনে, অতএব তারা খাতিরের লোক। খানিক পরে শুরু করলেন পাখির কথা।—'উঃ ব্যাপারটা কিন্তু সাংঘাতিক ইন্টারেস্টিং, মশাই। নতুন একখানা বই কিনেছি পাখি সম্বন্ধে—দাঁড়ান দেখাচ্ছি—'

অমনি অসিত তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। 'হেঁ হেঁ, আজ থাক। একটু কাজ আছে। আর একদিন আসব।'

বঙ্কিমবাবু নিরাশভাবে বললেন, 'কিন্তু আমি যে আজই চলে যাচ্ছি দুপুরে।'

'কোথায়?'

'কলকাতা হয়ে রাজগীর, বুদ্ধগয়া, পাটনা, বেনারস লম্বা ট্যুর। বায়নাকুলার সঙ্গে নেব—বার্ড ওয়াচিং করা যাবে সুযোগমতো।'

'আপনি খুব বেড়ান?'

'হ্যাঁ, ওই আমার নেশা। বেশিদিন একজায়গায় টিকতে পারি না। দূরে যেতে না পারলে, অন্তত ধারেকাছেই ঘুরে আসি।'

বিকেলে সুনন্দ অসিত ফিরল কলকাতায়।

বাসে যেতে যেতে অসিত বলল, 'দেখ সুনন্দ, আমার মনে হচ্ছে বঙ্কিমবাবু মিস্টার বাসু সম্বন্ধে সত্যি কথা বলেননি।'

'কেন?'

যথেষ্ট পরিচয় আছে অথচ তাঁর ঠিকানাটা অবধি রাখেননি। এ ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'চেপে যাওয়ার কারণ?'

'তুই ফট্ করে বাসুর ঠিকানা চাইতে বোধহয় ঘাবড়ে গেলেন।'

'কেন?'

'বাইরে স্বীকার না করলেও হয়তো ওঁর মনে মনে বাসুর সঙ্গে ব্যবসা করার ইচ্ছে আছে। শুনেছি উনি ব্যবসাদার বাড়ির ছেলে। বাবার লোহা-লক্কড়ের দোকান ছিল। আপাতত বাজিয়ে দেখছেন বাসুকে। চট করে কথা দিচ্ছেন না। এদিকে তুই বাসুর জন্যে নতুন পার্টনার জোগাড় করতে চাস শুনে ঠিকানাটা চেপে গেলেন।'

'তা হতে পারে'—বলল সুনন্দ। 'আবার আর একটা কারণও থাকতে পারে। ওষুধের ফরমুলা চুরির ব্যাপারে ওনার সঙ্গে বাসুর যোগাযোগ আছে। তাই'—

'ধুৎ! বঙ্কিমবাবু সে-টাইপের নয়। কাছাখোলা লোক। তাছাড়া, তাহলে তো উনি নিজেই পেটেন্ট নিয়ে বিজনেস ফাঁদতে পারতেন। অন্যকে ফরমুলা বিক্রি করতে যাবেন কোন দুঃখে। ওর কি টাকার অভাব?'

'তা বটে!' সুনন্দ সায় দিল।

কুণাল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সুনন্দদের অভিযানের ফলাফল জানার আশায়। খবর শুনে সে মুষড়ে পড়ল। বলল, 'আমি মিস্টার বাসুর সঙ্গে ফরমুলার জন্য দরাদরি করেছিলাম। যদি তের-চোদ্দ হাজারে নামত, নিয়ে নিতাম। কে আসল বৈজ্ঞানিক তা নিয়ে আর মাথা ঘামাতাম না। এক পয়সাও কমাতে রাজি হল না। যাকগে, তক্কে তক্কে থাকি যদি

ফের খোঁজ পাই বাসুর। বলেছি ওনাকে ভবিষ্যতে আবার এমনি কোনো ফরমুলা বিক্রি করতে চাইলে দয়া করে আমায় একটা চান্স দেবেন। হ্যাঁ, একবার কথাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার ল্যাবরেটরিটা কোথায়? অমনি বাসু কঠোর স্বরে উত্তর দিলেন—'তা জেনে আপনার দরকার নেই। আমি ঘাবড়ে গিয়ে আর ও-প্রসঙ্গ তুলিনি।'

দুই

পুরো একটা বছর কেটে গেছে। মিস্টার বাসুর দেওয়া ফরমুলার প্রকৃত আবিষ্কারক কে এ-রহস্যের সমাধান আজও হয়নি। কিন্তু ফরমুলাটির ভাগ্যে কী ঘটেছিল সে খবর জোগাড় করেছিল কুণাল।

মিস্টার বাসুর পেছনে ধাওয়া করে পানিহাটি যাওয়ার মাস দুই পরে একদিন সে অসিতকে ফোন করে প্রশ্ন করে—'অসিত, মনে আছে মিস্টার বাসুর ফরমুলা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কী হল সেটার?'

'সেটা কে কিনেছে জানিস? ভারত কেমিক্যালস লিমিটেড, পাক্কা কুড়ি হাজার টাকায়। বড় ফার্ম তো, তাই টাকার জোর বেশি। সেই ফরমুলায় তৈরি ওষুধই এখন এফ ফোরটিন নামে বাজারে বেরিয়েছে। দারুণ কাটতি হয়েছে। আচ্ছা, হাজরাবাবুর কাছে কোনো খোঁজ পেলি মিস্টার বাসুর?'

বঙ্কিম হাজরা মামাবাবুর কাছে আসেন বটে কিন্তু সুনন্দ বা অসিতকে একটু এড়িয়ে চলেন।

তবু একদিন তিনি এলে সুনন্দ তাঁকে ধরেছিল। 'এই যে বঙ্কিমবাবু, কেমন আছেন?'

বঙ্কিমবাবু বিগলিত হেসে বললেন, 'এই কাটছে কোনো রকমে ঠাকুরের কৃপায়। প্রোফেসর ঘোষ বাড়ি আছেন?'

'হ্যাঁ আছেন। ওপরে যান। আচ্ছা, সেই মিস্টার বাসু আর এসেছিলেন আপনার কাছে?'

'নাঃ। আর আসেনি। কেন বলুন তো?'

'মানে ওনার ঠিকানাটা, আমার সেই বন্ধুর জন্যে...'

'ওহো, মনে পড়েছে। দেখা হলে নিশ্চয় চাইব।'

বঙ্কিমবাবু এ বিষয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। হয়তো আর দেখা হয়নি মিস্টার বাসুর সঙ্গে।

জানুয়ারির শেষে মামাবাবু রাজস্থান গেলেন। ভরতপুরে কেওলাদেওখানা নামে এক পক্ষিনিবাস দেখতে। বঙ্কিমবাবুও মামাবাবুর সঙ্গ নিলেন। রাজস্থান থেকে পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি বেড়িয়ে কুড়ি-পঁচিশ দিন পরে ফিরলেন দুজনে। বঙ্কিমবাবুর উৎসাহেই এই বাড়তি বেড়ানোটুকু। মামাবাবু ফিরতেই আবার পক্ষিবিদ্দের আনাগোনা শুরু হল। মামাবাবুরা কী কী পাখি দেখেছেন তাই নিয়ে মহা উৎসাহে আলোচনা চলল।

মামাবাবু পক্ষিবিদ্দের আলোচনাসভায় সুনন্দ অসিতকে ডাকতেন না। মানে যোগ দেবার জন্যে জোর করতেন না। তবে একদিন সুনন্দকে ডেকে বললেন, 'কাল সন্ধেবেলা থেকো বাড়িতে। বিখ্যাত এক্সপ্লোরার স্যার ডেভিড ডানকান আসছেন। ওনার

ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা শোনা যাবে। উনি ভোরে হংকং থেকে কলকাতা আসবেন আর পরদিনই চলে যাবেন আফ্রিকা। অসিতকেও আসতে বোলো।'

স্যার ডেভিডের নামে সুনন্দ নেচে উঠল। এই দুর্ধর্ষ পর্যটক কত দেশ যে ঘুরেছেন তার ইয়ত্তা নেই। দুর্গম পাহাড়, বন, মরু, প্রান্তর চষে বেড়ানোই ওঁর নেশা। পক্ষিবিদ্ হিসেবে বেশি নামডাক থাকলেও নানান দেশের জীবজন্তু ফলমূল সম্বন্ধে ওঁর জ্ঞান অসাধারণ। স্যার ডেভিড নিউজিল্যান্ডার। নাইজার নদীর অববাহিকায় অনেক অজ্ঞাত অঞ্চল আবিষ্কারের সম্মানস্বরূপ তিনি স্যার উপাধি পেয়েছেন। স্যার ডেভিড নাকি অদ্ভুত ভালো গল্প বলেন। তাঁর গল্পের বর্ণনায় অজানা দেশের ছবি চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। পাঁচ বছর আগে সুইডেনের স্টকহোমে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের সম্মেলনে ডানকানের সঙ্গে মামাবাবুর বন্ধুত্ব হয়। সেদিনই দুপুরে কুণালের টেলিফোন এল।

'আজ বিকেলে অসিতের বাড়ি চলে আয়, আমিও আসব। দরকারি কথা আছে।'

'কী ব্যাপার? সেই বাসু নাকি?'

'হ্যাঁ। আয় বিকেলে, বলব সব।'

'বিকেল নয়। সন্ধে ছ'টা নাগাদ কর।'

'কেন?'

'বিকেলে স্যার ডেভিডের লেকচার আছে আমাদের বাড়িতে। বিখ্যাত এক্সপ্লোরার। অসিতও আসবে শুনতে, তারপর যাব।'

'অল রাইট।'

সুনন্দ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। কী ব্যাপার? মিস্টার বাসুর কি খোঁজ পেয়েছে কুণাল? ফরমুলার প্রকৃত আবিষ্কারককে জানার সূত্র কি পেল কিছু? ডেভিডের লেকচার না থাকলে সে এখুনি ছুটে যেত কুণালের কাছে।

স্যার ডেভিড হাজির হলেন বিকেল চারটেয়। লম্বা পাতলা গড়নের মানুষটি। বয়স প্রায় ষাট ছুঁয়েছে, কিন্তু ইস্পাতের মতো দৃঢ়। যুবকের মতো চটপটে। হালকা লালচে দাড়ি, কপালে গালে অজস্র ভাঁজ—বহু কষ্টকর দিন যাপনের সাক্ষ্য। ভীষণ আমুদে। হেঁড়ে গলায় যখন তখন হো-হো হাসিতে ফেটে পড়েন। লোকটির একটি বদভ্যাস—উচ্ছ্বাসের মাত্রা প্রবল হলে ফুর্তির চোটে কাছের লোকের পিঠ চাপড়ে দেন সজোরে। একবার সেই কড়া পড়া কঠিন হাতের চাপড় খেয়ে সুনন্দর কাঁধ ঝনঝন করে উঠল। সে সভয়ে সরে বসল।

স্যার ডেভিড কথা বলছিলেন ইংরেজিতে।

গত দু-বছর তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে অরণ্যময় দ্বীপগুলিতে ঘুরেছেন। সেইসব অভিযানের গল্প শুরু করলেন—

ঘরে বঙ্কিমবাবুর মতো কয়েকজন পক্ষিবিদ্ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন—ওইসব দেশে নতুন কোনো পাখি দেখেছেন কিনা স্যার ডেভিড।

'হুঁ দেখেছি বৈকি। তাদের বর্ণনা নোট করা আছে।' তারপর ডেভিড হাসতে হাসতে বললেন, 'গত বছর বোর্নিওর এক দুর্গম অঞ্চলে মাইগ্রেটারি বার্ড পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম!'

'কীরকম শুনি?' সবাই উৎসুক আবেদন জানাল।

স্যার ডেভিড পাইপে লম্বা টান দিয়ে বলতে শুরু করলেন।

'—খবরটা আমায় দেয় চিয়াং। সিঙ্গাপুরে চিয়াংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চিয়াং একজন পক্ষিবিদ্। বিশেষত যাযাবর পাখি নিয়েই তার স্টাডি। চিয়াং বলল, উত্তর বোর্নিওর সারওয়াক অঞ্চলে কাপুয়াস শৈলশ্রেণির কোলে বনের মধ্যে এক গ্রামে যাচ্ছে সে। ছোট্ট নিঃসঙ্গ গ্রাম। কেলাবিট উপজাতির বাস। কাছাকাছি লোকালয় নেই। গ্রামে আধুনিক সভ্যতার কোনো স্পর্শই লাগেনি। আদিম প্রথায় চাষবাস আর শিকার করে জীবনধারণ করে। কেউ লেখাপড়া জানে না, গুনতে পারে না, মাস বা বছরের হিসেবও জানে না। আবার জায়গাটা বিষুবরেখার খুব কাছাকাছি বলে সারা বছর আবহাওয়া গরম থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয়। ফলে বিভিন্ন ঋতুর পার্থক্য বোঝা যায় না।

'কেলাবিটদের প্রধান খাদ্য চাল। বন কেটে, ঝোপ-ঝাড় আগুনে পুড়িয়ে তারা ধানচাষের জমি তৈরি করে। কিন্তু ধান যখন তখন পোঁতা চলবে না। বছরের শেষের দিকে, অন্তত ডিসেম্বরের আগে পুঁততেই হবে। এই চাষের সময় ঠিক করতে তাদের প্রধান ভরসা কিছু যাযাবর পাখি। ওরাই তাদের ক্যালেন্ডার।

'সেনসুলিট অর্থাৎ হলদে খঞ্জনের আবির্ভাব দিয়ে কেলাবিটদের বছর শুরু হয়। এই পাখিরা উত্তর চীন এবং সাইবেরিয়া থেকে বোর্নিও ইন্দোনেশিয়ায় শীত কাটাতে আসে। গ্রামে কেলাবিটরা তখন চাষের জন্য জোগাড় আরম্ভ করে।

'এরপর আসে ব্রাউন শ্রাইক। মধ্য এশিয়া থেকে। গ্রামের লোক তখন ধান পোঁতা শুরু করে।

'তারপর এক জাতের ছোট বাজপাখি জাপানি স্প্যারো হকদের পালা। এবং আরও কিছুদিন পরে ডিসেম্বর জানুয়ারি নাগাদ ছাইরঙা থ্রাশদের আগমন হয়। ব্যস, গ্রামের লোক ইতিমধ্যে ধান পোঁতা শেষ করে ফেলে।

'ক্রমে ধানগাছ বড় হয়। ফসল কেটে নেওয়া হলে কেলাবিটরা ফের সেনসুলিটদের অপেক্ষায় থাকে।

'আমি চিয়াংয়ের কাছে জানতে চাইলাম, ডিসেম্বরের মধ্যে ধান পুঁততে ওরা ব্যস্ত হয় কেন? বৃষ্টিপাতের যখন তেমন হেরফের নেই। একটু দেরি হলেই বা ক্ষতি কী?

'চিয়াং বলল, তারও কারণ এক জাতের যাযাবর পাখি—লম্বা লেজ মুনিয়া। ঠিক মার্চ মাসের গোড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে মুনিয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষেতে। তার আগে ধান ঘরে তুলতে না পারলে একটি দানাও আর রক্ষা পাবে না।

'চিয়াং বলল, আমি গত বছর গিয়েছিলাম ওই গ্রামে। খঞ্জনাদের আবির্ভাব দেখার পর চলে আসি। এবার অন্য পাখিগুলো দেখতে যাচ্ছি।

'আমি তক্ষুনি চিয়াংয়ের সঙ্গে জুটে গেলাম।

'দক্ষিণ চীন সমুদ্রতীরে কুচিং শহর থেকে রওনা হয়ে কিছুটা মোটরে চড়ে তারপর রাজং নদী বেয়ে শ-খানেক মাইল গেলাম সাম্পানে। এরপর নৌকো ছেড়ে পায়ে হেঁটে। তিনদিন হাঁটলাম গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। ঠাসা ট্রপিকাল অরণ্য। বিরাট বিরাট আকাশ-ছোঁয়া গাছ আর বাঁশঝাড়। দিনের বেলাও মাথার ওপর ঘন পাতার আচ্ছাদন ভেদ করে সামান্য আলো ঢোকে। প্যাচপ্যাচে কাদা ও জলাভূমি। বিষাক্ত সরীসৃপ, পোকামাকড়, বুনো শুয়োরের

উৎপাত। আর এক ভয়, কখন হঠাৎ ওরাং ওটাংয়ের মুখোমুখি হব। উত্তর বোর্নিওর ঘন বনে এই বিশাল বানরদের বাস। এমনি লাজুক প্রকৃতির। কিন্তু বিরক্ত হলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ক্রমে সেই গ্রামে পৌঁছলাম। বড় অধিত্যকায় মাত্র চল্লিশটি পরিবারের বাস। তিন-চারটে লম্বা লম্বা খড়ে ছাওয়া বাঁশের ঘরে তারা সবাই মিলে থাকে।

গ্রামের ধারে তাঁবু ফেললাম। চিয়াংয়ের সঙ্গে গ্রামের লোকের আগেই পরিচয় হয়েছিল। ফলে গ্রাম থেকে চাল, ডিম, তরকারি ইত্যাদি খাবার কিনতে অসুবিধা হল না। তবে একটা ভয় ছিল সাপ। সাংঘাতিক বিষাক্ত একজাতীয় ভাইপারের উপদ্রব। প্রতি বছর দু-একজন গ্রামের লোক মারা পড়ে সাপের কামড়ে।

'দিন দশ দিব্যি কাটল।

'ব্রাউন-শ্রাইকরা আসতে আরম্ভ করেছে। প্রথমে অল্প অল্প। তারপরে দলে দলে। চড়ুইয়ের চেয়ে সামান্য বড় পাখি। পেট সাদা, ডানার রং খয়েরি। ঝোপেঝাড়ে, জলের ধারে ধারে তারা পোকামাকড় খেয়ে বেড়াচ্ছে। গ্রামের লোকও ধান পুঁততে শুরু করেছে। হঠাৎ এক কাণ্ড!

'ভোরে তাঁবুর বাইরে বসে কফি খাচ্ছি। চার-পাঁচজন কেলাবিট পুরুষ আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। গ্রামের মোড়লও রয়েছে তাদের মধ্যে। লোকগুলোর হাব-ভাব মোটেই সুবিধের ঠেকল না। কয়েকজনের হাতে ছুরি ও বর্শা।

'মোড়ল কড়া সুরে কী জানি বলল চিয়াংকে। চিয়াং কেলাবিট ভাষা জানত। দুজনে কথা শুরু হল। দুজনেই বেশ গরম হয়ে উঠল। অন্য লোকগুলোও কটমট করে চাইতে লাগল। আমি হতভম্ব। এ যাবত গ্রামবাসীদের তো বেশ ঠাণ্ডা বলে মনে হয়েছিল, কী আবার ঘটল?'

'চিয়াং একবার আমার দিকে ফিরে বলল,—'এক ফ্যাসাদ বেধেছে। আমরা আসার পর গ্রামে এক রোগ দেখা দিয়েছে। দুজন লোক মরেছে। এরা আমাদের দায়ী করছে এই দুর্ঘটনার জন্য।

'আমাদের কেন! আমি অবাক।

'চিয়াং বলল, এদের দারুণ কুসংস্কার। ওদের ধারণা বিদেশিদের আগমনের ফলে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চটে গেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন, বিশেষত লাল দাড়িওয়ালা বিদেশির আগমন দেবীর কোপের কারণ। অর্থাৎ তুমি। আমি এত বোঝাচ্ছি, কান দিচ্ছেই না। বলছে, এখুনি আমাদের চলে যেতে হবে গ্রাম ছেড়ে।

'চিয়াং বেজায় গোঁয়ার। এত কষ্ট করে এসে তাড়াতাড়ি ফিরতে কিছুতেই রাজি নয়। মোড়লের সঙ্গে অনেক তর্ক করল। বলল, চলো দেখি কোথায় তোমাদের রুগী। আমি ওষুধ দিয়ে সারিয়ে দেব।

'গ্রামে গিয়ে একজন রুগী দেখলাম। লক্ষণ দেখে বিশেষ কিছু বুঝলাম না। মনে হল ঘোরালো ধরনের ফ্লু। এ-জ্বর নাকি এখানে কখনো হয়নি আগে। আমাদের সঙ্গে কিছু জ্বর-জ্বালার ওষুধ ছিল। তাই একটা ঠুকে দিলাম আন্দাজে, কিন্তু ফল হল মারাত্মক।

'দু-দিন পরে দুপুরে ক্যাম্পে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। হঠাৎ কুড়ি-পঁচিশ জন কেলাবিট এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ঘাড়ে। এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের হাত-পা বেঁধে ফেলল।

'শুনলাম আমাদের দাওয়াই খাটেনি। সেই রুগীটি পটল তুলেছে। সুতরাং গ্রামের লোক খাপ্পা। তারা আপাতত আমাদের বিচার করবে, ওই দেবীর সামনে শাস্তি দেবে। নইলে নাকি গোটা গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে দেবীর রোষে। আমাদের সঙ্গে বন্দুক ছিল। কিন্তু সেগুলো নাগালের বাইরে। অসহায় অবস্থায় মরতে হবে নাকি?

'সেই দূর অরণ্যভূমিতে সভ্য জগতের আইন-কানুন খাটে না। বিচারের নামে এরা আমাদের ওপর যে কী অত্যাচার চালাবে কে জানে! হয়তো হত্যাই করবে।

'চিয়াং মোড়লকে বোঝাল, আমরা এখুনি চলে যাচ্ছি। মোড়ল একটু নরম হল। কিন্তু ছোকরাগুলো রাজি হয় না। চিয়াংকে রেহাই দিলেও আমাকে তারা ছাড়বে না। শেষে চিয়াং এক প্যাঁচে ফেলল। মোড়লকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে ঘুষের লোভ দেখাল। গ্রামের লোক আমাদের মালপত্র বাজেয়াপ্ত করলে মোড়লের বিশেষ লাভ নেই। কারণ তা ভাগাভাগি হয়ে যাবে। কিন্তু ঘুষ সবটাই পাবে স্রেফ মোড়ল একা। ওতেই কাজ হল।

'মোড়ল অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে অন্যদের রাজি করল আমাদের ছেড়ে দিতে। মোড়লের পায়ে সর্বস্ব সমর্পণ করে প্রায় এক বস্ত্রে গ্রাম ছেড়ে পালালাম।

'তারপর তিন-চার দিন কাটল অসহ্য কষ্টে। খাদ্য বলতে জংলি কলা বা আনারস। আর ঝলসানো মাছ। খোলা আকাশের নিচে শয়ন। কেবল বৃষ্টিতে ভিজেছি।

'হতভাগারা রাইফেল কেড়ে নিয়েছিল। দুটো ছোট ছুরি ছাড়া আত্মরক্ষার আর অন্য ব্যবস্থা ছিল না। ভাগ্যিস নদীতে দেশি মাঝিরা কথামতো আমাদের অপেক্ষায় ছিল, তাই রক্ষে। উঃ, খুব শিক্ষা হয়েছে সেবার বার্ড-ওয়াচিং করতে গিয়ে!'

স্যার ডেভিড এক চোট অট্টহাসির সঙ্গে গল্প শেষ করলেন। শ্রোতারাও চমৎকৃত।

স্যার ডেভিড বললেন, 'সেই গ্রামে রহস্যময় জ্বরের কারণ কিন্তু আবিষ্কার করেছিলাম পরে। ব্যাপারটা অদ্ভুত।'

'কী? কী?' সবাই জানতে চাইল।

'কুচিংয়ে চেনা এক ডাক্তারের কাছে দিলাম ওই জ্বরের বর্ণনা। ডাক্তার অনেক ভেবে, বই-টই উলটিয়ে জানালেন, 'আশ্চর্য! এই রোগ তো মধ্য এশিয়ায় হয়। এদেশে শোনা যায়নি। কী করে ছড়াল ওই গ্রামে?'

'ঝট করে মনে পড়ে গেল একটা কথা। চিয়াং ফিরে আসার সময় একজোড়া খয়েরি শ্রাইক এনেছিল। গ্রামের কাছে ফাঁদ পেতে ধরেছিল পাখি দুটো। ইচ্ছে ছিল চিহ্ন দেওয়া রিং পরিয়ে এই যাযাবর পাখিদের ছেড়ে দেবে। হঠাৎ পালাতে হল। তবু সে ছাড়েনি পাখি। বয়ে বয়ে এনেছিল পাখি দুটো।

'ছুটে গেলাম চিয়াংয়ের হোটেলে। তার খুব জ্বর হয়েছে। তাই পাখিকে তখনও রিং পরানো হয়নি। খাঁচায় রয়েছে। পাখি দুটো নিয়ে গেলাম এক প্যাথলজিস্টের কাছে। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, একটা পাখির ডানার পালকে ওই জ্বরের জীবাণু রয়েছে। অর্থাৎ মধ্য এশিয়া থেকে ওই পাখিগুলির কোনো কোনোটা বহন করে এনেছিল রোগের জীবাণু। চিয়াংয়ের জ্বরও সেই মধ্য-এশিয়ার মারাত্মক ব্যাধি। জ্বরের প্রকৃতি বুঝতে পেরে ঠিকমতো চিকিৎসা হতে সে সে-যাত্রা বেঁচে গেল।'

গল্প শুনতে শুনতে হুঁশ ছিল না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তে সুনন্দ চমকে উঠল—সাড়ে ছ'টা। কুণাল এসে অপেক্ষা করবে অসিতের বাড়ি। অসিতেরও খেয়াল নেই, দুজনে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়ে।

কুণাল অসিতের বাড়িতে অপেক্ষা করছিল।

কুণাল জানাল, 'শোন, মিস্টার বাসু টেলিফোন করেছিলেন আজ সকালে। তিনি নাকি গমের নেতানো রোগের একটা ওষুধ বের করেছেন। একটা সলিউশন। ফরমুলাটা বিক্রি করতে চান। পেটেন্ট-রাইট শুদ্ধু। আগের বারেই মতোই। তোরা বোধহয় জানিস না, গম গাছে একটা অদ্ভুত রোগ দেখা দিয়েছে আগের বছর থেকে। ব্যাকটিরিয়া অর্থাৎ জীবাণু-ঘটিত রোগ! এই রোগ পশ্চিম বাংলা এবং উত্তর ভারতের নানা জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে তাজা গম গাছ শিষ সমেত শুকিয়ে যায়। চাষীরা এর নাম দিয়েছে নেতানো রোগ। জানাশোনা কোনো জীবাণুনাশক ওষুধেও এ রোগ আটকানো যাচ্ছে না। আমি বলেছি ফরমুলা কিনতে চেষ্টা করব। কাল সকাল দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। হোটেল কুতুবে সতেরো নম্বর ঘর। এখন বল কী কর্তব্য?'

সুনন্দ বলল, 'কী আবার! বাসুকে ফের ফলো করতে হবে! ফরমুলা তুই কিনবি কিনা, সে তোর মাথাব্যথা। কিন্তু ওর আস্তানা জানতেই হবে। জানতে হবে ওর প্রকৃত পরিচয়। এমন সুযোগ ছাড়া যায় না।'

'কে ফলো করবে? আমরা?' অসিত জিজ্ঞেস করল।

'না। আগের ব্যাচের কেউ নয়। মিস্টার বাসু আগেরবার আমাদের খেয়াল করেছিলেন কিনা জানি না। তবু সাবধানের মার নেই। ফের সেই এক লোক পিছু ধরেছে দেখলে সতর্ক হয়ে যাবে। তাই এবার ওকে অনুসরণ করবে নতুন লোক—বাচ্চু।'

'মানে তোদের পাড়ায় শেষ লাল বাড়িটায় থাকে? কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের দোকান আছে?'

'হ্যাঁ। ও আগে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের কাজ করত। এসব কাজে খুব পোক্ত। পেশা পালটেছে কিন্তু ডিটেকটিভগিরির শখটা যায়নি। এককথায় রাজি হয়ে যাবে। বাসু প্রথমে হোটেল থেকে গিয়ে কোথায় ওঠে সেটা বের করুক। তারপর আমরা আছি।'

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ বাচ্চু সুনন্দর কাছে হাজির হয়ে রিপোর্ট দিল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে মিস্টার বাসু ট্যাক্সি চেপে যান হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে লোকাল ট্রেন ধরে সপ্তগ্রাম। মেন লাইনে ব্যান্ডেলের পরেই ছোট এক স্টেশন। সপ্তগ্রামের কিছু দূর দিয়ে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড গেছে। স্টেশন থেকে রিক্শা নিয়ে বাসু যান জি. টি. রোডের ধারে এক বাড়িতে। নিরালা জায়গায় মস্ত বাগানঘেরা ছোট দোতলা কোঠা বাড়ি। নাম—সুরভি নার্সারি। সারাদিন বাসুর আর দেখা পাওয়া যায়নি। বাড়িতে কে কে থাকে, স্থানীয় লোকজনের কাছে খোঁজ-খবর নিয়েছিল বাচ্চু। থাকেন তপন দত্ত বলে এক ভদ্রলোক। ইয়ংম্যান। তিন বছর হল বাড়িটায় নার্সারি করেছেন। নানারকম ফল, ফুল ও বীজ তৈরি করে কলকাতার বাজারে বিক্রি করেন। অতি অমিশুক। বাইরে বেরোন কদাচিৎ।

একাই থাকেন তপনবাবু। আর থাকে দুজন মালি এবং একটি বুড়ি-ঝি। সবাই বাইরের

আমদানি। কেউ স্থানীয় লোক নয়। মিস্টার বাসুর সঙ্গে ওখানকার কারো আলাপ হয়নি। তবে মুখ চেনে। আসা-যাওয়া করতে দেখেছে।

বাচ্চু বেশ রাত অবধি পাহারা দিয়েছিল বাড়িটা। অবশেষে শীতে কাবু হয়ে একটা জঘন্য নোংরা দোকানের বেঞ্চিতে শুয়ে কোনোরকমে রাত কাটায়। একজন উটকো লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয় লোকদের একটু সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছিল বৈকি! তবে বাচ্চু বলেছে সে ইঁটের ব্যবসা করতে চায়, তাই জমি খুঁজছে। পরদিন সকালে সে খোঁজ করে শোনে যে বাসু খুব ভোরের ট্রেনে কলকাতার দিকে চলে গেছেন।

তপন দত্তকে দূর থেকে দেখছে বাচ্চু। ময়লা রং। খুব রোগা ছোটখাটো চেহারা। নার্সারির এক বুড়ো মালির সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল বাচ্চু। মালিটি জিনিস কিনতে এসেছিল বাইরের দোকানে। মালি নিজের দেশ এবং স্ত্রী-পুত্রের সম্বন্ধে গাদাগুচ্ছের গল্প শোনালেও মিস্টার বাসু বা তপন দত্ত সম্পর্কে রহস্যজনকভাবে নীরব থেকেছে। ও-বিষয়ে কোনো আলোচনাই যেন করতে চায় না।

হ্যাঁ, একটা কথা মালি বেফাঁস বলে ফেলেছে, বাড়িতে ল্যাবরেটরি জাতীয় কিছু একটা আছে। ল্যাম্প জ্বেলে কীসব ওষুধ-টসুধ বানায় তপনবাবু।

'কনগ্র্যাচুলেশনস, বাচ্চু!' সুনন্দ অসিত চেঁচিয়ে উঠল। 'জব্বর খবর এনেছ ভাই। ওই তপন দত্তই নির্ঘাত আসল বৈজ্ঞানিক।' পেট পুরে খাইয়ে দেওয়া হল বাচ্চুকে।

ঠিক হল আসছে কাল সুনন্দ ও অসিত সপ্তগ্রাম যাত্রা করবে তপন দত্তর উদ্দেশে। কুণালের ইচ্ছে ছিল সঙ্গে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে আটকে গেল ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে।

সুরভি নার্সারি।

সুনন্দ অসিত রিকশা থেকে নেমেই চট করে ঢুকল না ভিতরে। চারপাশে ঘুরে দেখতে লাগল। প্রধান দোতলা বাড়িটা ছাড়া বাগানের পিছনের অংশে আর একটা ইঁটের দেওয়াল ও টালির ছাদওলা বাড়ি নজরে পড়ল। এছাড়া রয়েছে আরো দুটো ছোট মাটির বাড়ি। একজন বুড়ো মতন লোক সামনে ফুলের বাগানে বসে কাজ করছে। দুজনে গেট খুলে গুটি গুটি ভেতরে ঢুকল।

তাদের দেখে মালিটি উঠে দাঁড়াল।

'তপনবাবু আছেন?' জিজ্ঞেস করল অসিত।

'আপনারা কোত্থেকে আসছেন?'

'কলকাতা থেকে। দরকার আছে। ফুলের বীজ কিনতে চাই।'

'ও দাঁড়ান। দিচ্ছি ডেকে।' লোকটি বাড়ির দিকে চলে গেল।

লোকটি তাদের না ডাকলেও সুনন্দরা পায়ে পায়ে এগিয়ে একেবারে বাড়ির সামনে হাজির হল। সদর দরজা বন্ধ। মালি ঘুরে খিড়কি দিয়ে ঢুকেছে।

দরজা খোলার আওয়াজ। এবং তারপর যে যুবকটি তাদের মুখোমুখি দাঁড়াল, তাকে দেখে দুজনে থ। আগন্তুকও অবাক।

প্রায় পনেরো-ষোলো বছর বাদে দেখা হলেও তপনকে চিনতে ভুল হল না তাদের। স্কুলে এই তপন দত্ত ছিল সুনন্দ-অসিতের সহপাঠী। যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল তাদের।

খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল তপন। ইংরেজি আর অঙ্কে খুব পাকা। কিন্তু বড় অভাবী। সব বই কিনে পড়তে পারত না। স্কুল থেকে বেরোবার পর ছাড়াছাড়ি হয় তাদের। আর দেখা হয়নি।

'আরে তপন তুই?' সুনন্দই প্রথমে সামলে উঠল।

'অ্যাঁ, তোরা?' তপন থতমত খেয়ে গেল।

'তুই এই নার্সারি করেছিস?'

'হ্যাঁ ভাই। চাকরির বাজার তো জানিস। কিছু জোটাতে পারলাম না সুবিধে মতো। তাই—'

'কদ্দুর পড়েছিলি? শুনেছিলাম তুই আশুতোষে ভর্তি হয়েছিলি, আই. এস-সি. নিয়ে।'

'হ্যাঁ। তবে পড়া এগোল না বেশি। ওই বি. এস-সি. অবধি টেনেটুনে। তাও ফি জোগাড় করতে পারলাম না, তাই পরীক্ষা দেওয়া হল না। হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। এটা সেটা কয়েকটা চাকরি করলাম, টিকল না কোনোটাও। তারপর নার্সারি করেছি। তা মন্দ নয়, চলে যাচ্ছে একরকম।' তপন ম্লান হাসল।

'তুই এ বিদ্যে শিখলি কোত্থেকে?'

'শিখেছি। বলতে পারিস নিজের চেষ্টায়। আয় ভেতরে।'

নিচের ঘরে বসল সবাই।

ঘরে কয়েকটি সস্তা কাঠের চেয়ার টেবিল বেঞ্চি। একগাদা কাঠের প্যাকিং বাক্স এককোনায় গাদা করা। দেওয়াল-তাকে সুরভি নার্সারির লেবেল মারা কিছু প্যাকেট। টেবিলে কাগজপত্র ফাইল সাজানো। মনে হল এটা অফিসঘর।

'তোরা আমার ঠিকানা পেলি কী করে?' তপন জানতে চাইল।

'পাইনি তো, আবিষ্কার করলাম এই মাত্র।' বলল সুনন্দ—'এসেছিলাম এইদিকে। নার্সারি দেখে ঘুরে দেখতে ইচ্ছে হল। তাই বীজ কেনার নাম করে ঢুকলাম। তা আমরা কী জানি তোর নার্সারি! খাসা জায়গাটা কিন্তু।'

চা-বিস্কুট খাওয়াল তপন।

সুনন্দরা লক্ষ করছিল, তপন কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। পুরনো বন্ধুদের দেখে খুশি হয়েছে বোঝা যায়, তবে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে তার যেন উৎসাহ নেই। হয়তো নিজের দারিদ্র্য ও ভাগ্যহীনতা প্রকাশ করতে লজ্জা পাচ্ছে।

একফাঁকে অসিত বলল, 'তপন তুই নাকি একটা ল্যাবরেটরি করেছিস?'

'কে বলল?' তপন ভুরু কোঁচকালো।

'মালি।' সাফ মিথ্যে চালিয়ে দিল অসিত।

একটু হেসে তপন বলল, 'হ্যাঁ আছে। বীজগুলো শোধন করে নিই। সংক্রামক রোগের হাত থেকে বাঁচাতে। সে অতি সামান্য আয়োজন। পুরোদস্তুর ল্যাবরেটরির মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য নয়। আয় দেখবি।'

অসিতদের পাশের ঘরে নিয়ে গেল তপন। দুটো টেবিলের ওপর একটা স্পিরিট ল্যাম্প ও একটা বার্নার। কিছু কাঁচের বাটি প্লেট টেস্ট টিউব। পাশে আলমারিতে কিছু শিশি—তাতে রাসায়নিক চূর্ণ ও তরল পদার্থ। দেখে বোঝা গেল তপনের কথা ঠিকই।

অনেকক্ষণ ধরে বলি-বলি করে যে প্রশ্নটা করতে চাইছিল দুজনে, সুনন্দ এবার সেই প্রসঙ্গ তুলল—

'হ্যাঁরে, তোর কাছে মিস্টার বাসু নামে কেউ আসেন। গোঁফ আছে। সাহেবি পোশাক পরেন।'

তপন কেমন চমকে উঠল।—'কেন?'

'মানে একটু দরকার ছিল।'

তপন জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল। উত্তর দিল না।

সুনন্দ বলল, 'আসল ব্যাপারটা খুলে বলি। ওই ভদ্রলোক এক মেডিক্যাল ফার্মকে একটা ওষুধের ফরমুলা বিক্রি করেছেন আগের বছর। ধানগাছের শত্রু রাক্ষুসে পোকা দমন করার কীটনাশক। আশ্চর্য ফল দিয়েছে ওষুধটায়। আমাদের এক পরিচিত লোকের কেমিক্যালস ফ্যাক্টরি আছে। তিনি মিস্টার বাসুর সঙ্গে দেখা করতে খুব আগ্রহী। কারণ নানা শস্য রোগের কিছু ভালো প্রতিরোধক যদি বাসু আবিষ্কার করে থাকেন, মিস্টার পাকরাশি তা কিনতে চান। আসলে সেবার মিস্টার বাসু পাকড়াশিকেই প্রথমে অফারটা দিয়েছিলেন। কিন্তু অচেনা লোককে বিশ্বাস না হওয়ায় পাকড়াশি পিছিয়ে যান। তখন বাসু অন্য কোম্পানিকে ফরমুলাটা বিক্রি করে দেন। এখনও পাকড়াশি সেকথা ভেবে হা-হুতাশ করেন। ইদানীং গমে নাকি একরকম নতুন রোগ ধরেছে। নেতানো রোগ। মিস্টার বাসু যদি এই রোগের কোনো প্রতিরোধক বের করতে পারেন—তাই মিস্টার পাকড়াশি তাঁর খোঁজ করছেন।

'কিন্তু মুশকিল হল মিস্টার বাসুর ঠিকানা কেউ জানে না। কীভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়? পাকড়াশি আমাকেও বলেছিলেন মিস্টার বাসুর কথা—যদি তাঁর ঠিকানা জোগাড় করে দিতে পারি। অ্যাক্সিডেন্টলি গত পরশু হঠাৎ মিস্টার বাসুর দেখা পেয়ে গেলাম। বাসুকে আমি দেখেছি হোটেল কুতুবে। সেবার পাকড়াশি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে বাসুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। অবশ্য তাদের কথাবার্তার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না।

'যা হোক, গত পরশু এই পথ দিয়ে ব্যান্ডেলে যাচ্ছিলাম মোটরে। হঠাৎ দেখি মিস্টার বাসু সাইকেল রিকশা থেকে নেমে এই নার্সারিতে ঢুকলেন। তখন সময় ছিল না হাতে, অন্যের গাড়ি তাই। জায়গাটা চিনে রেখেছিলাম। তারপর আজ চলে এলাম।'

তপন গম্ভীরভাবে শুনছিল। বাঁকা হেসে বলল—'বুঝেছি, এই জন্যেই তোদের আগমন। কিন্তু ভাই আমিও মিস্টার বাসুর ঠিকানা জানি না।'

'বাসু এখানে আসেন?'

'আসেন মাঝে মাঝে। আসলে এই নার্সারির জমি আর বাড়ির মালিক হচ্ছেন মিস্টার বাসু। উনি কখনো কখনো এখানে আসেন। ভাড়া নিয়ে চলে যান। দু-একদিন বাসও করেন—ওই টালির ঘরটায়।'

'মনি অর্ডার বা চিঠি পাঠাসনি কখনো?'

'না, সে ব্যবস্থা নেই।'

'মিস্টার বাসু বোধহয় বায়ো-কেমিস্ট্রির লোক।'

'হুঁ, সায়েবের লোক।'

'আবিষ্কারটা ওর নিজের হলে বলতে হয়, আশ্চর্য প্রতিভা। অথচ অবাক ব্যাপার—সায়েন্টিস্ট মহলে কেউ ওঁর নাম জানে না। তোর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেননি কখনো?'

'না।'

তপনের মুখ ক্রমে থমথমে হয়ে উঠছিল। হয়তো বাসু প্রসঙ্গ তার মনঃপূত হচ্ছিল না। অসিত তাই কথা ঘোরাল—'বাদ দে তোর মিস্টার বাসু। চল তোর বাগান দেখি।'

বাগানে ঘুরল তিনজনে।

পরিচ্ছন্ন নার্সারি। গাছপালার মধ্য দিয়ে সরু সরু কাঁকর বিছানো পথ। তপন বন্ধুদের চিনিয়ে দিল নানা ফুলফলের গাছ। তবু আড্ডার সুর যেন আর তেমন জমল না। কেমন ভাসা-ভাসা দায়সারা ভদ্রতা দেখাচ্ছিল তপন। বোধহয় মিস্টার বাসুর প্রসঙ্গই তার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছিল। সত্যি বলতে কি, এতদিন পরে তপনের খোঁজ পেয়ে সুনন্দ অসিত খুব খুশি হলেও মিস্টার বাসুর হদিশ ফের হারিয়ে যেতে তারা বেশ দমে গিয়েছিল।

একবার তপন জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা ধানের রাক্ষুসে পোকা আর গমের নেতানো রোগ সম্বন্ধে কী বলছিলি যেন? আমার অবশ্য লাইন আলাদা—এ ব্যাপারে বিশেষ ধারণা নেই।'

কুণালের মুখে এ বিষয়ে যা যা শুনেছিল তাই বলল অসিত। তপন দুপুরে খেয়ে যেতে বলেছিল। কিন্তু সুনন্দরা রাজি হল না। সেখানে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে ফিরল কলকাতা।

পথে অসিত বলল, 'দেখ সুনন্দ, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তপন অনেক কথা চেপে গেল।'

'হুঁ, কিন্তু তাতে ওর স্বার্থ?'

'সেটাই তো ধরতে পারছি না। আচ্ছা তপন স্বয়ং সেই রহস্যময় বৈজ্ঞানিক নয়তো?'

'ধ্যেৎ! তপনের বিদ্যেতে এমন আবিষ্কার সম্ভব নয়।'

কুণাল শুনে রেগে বলল—'অদ্ভুত ব্যাপার! লোকটা বারবার যেন পিছলে যাচ্ছে। কেন বাসু কাউকে তাঁর ঠিকানা জানান না! এত লুকোচুরি কীসের?'

সুনন্দ হেসে বলল, 'হয়তো তোদের মতো ফরমুলা-চোরদের হাত এড়াতে। বৈজ্ঞানিকের সাধনা গাপ মেরে দেবার মতো সৎ লোকের তো অভাব নেই দেশে। তাই তো এত সাবধানতা।'

'কিন্তু বৈজ্ঞানিকটি যে বাসু, এইখানেই আমার ঘোর সন্দেহ। কারণ ফরমুলা সংক্রান্ত কাগজ পরীক্ষা করে এবারও আমি একটা ফ্যাকড়া তুলেছিলাম। ওষুধটা 'সিসটেমিক' অর্থাৎ প্রয়োগ করলে সলিউশনের রাসায়নিক বস্তু উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করে। এবং তাকে আক্রমণকারী জীবাণুর পক্ষে বিষাক্ত করে তোলে। বললাম—সলিউশন ক্ষেতে স্প্রে করার পর তার প্রভাব দূর হতে কতদিন লাগবে সেটা তো লেখা নেই পরিষ্কারভাবে। পাকা গম কাটার অন্তত কতদিন আগে এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত? নইলে যে ফসল বিষাক্ত হয়ে থাকলে মানুষের ক্ষতি করবে।

'বাসু বললেন—সেসব ডিটেলস পরে দেব। সমস্ত নোট করা আছে। এখন ঠিক মনে পড়ছে না।'

'যে লোক হাতে-কলমে এই ওষুধ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছে তার পক্ষে এই তুচ্ছ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য নোট কনসাল্ট করতে চাওয়া হাস্যকর। পরিষ্কার মনে থাকার কথা। তাই বাসু সম্বন্ধে আমার সন্দেহটা আরও বেড়েছে।'

দিন চারেক পরে এক দুপুরে উদ্‌ভ্রান্ত কুণাল অসিতের বাসায় এসে হাজির হল।

'কী ব্যাপার?'

কুণাল বলল, 'হরিধনকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কে হরিধন?'

'মিত্র কেমিক্যালস-এর একজন সেলস্‌ম্যান। ঘুরে ঘুরে ওষুধ বিক্রি করে। খুব চালাক-চতুর ছেলে। ওকে গতকাল হোটেল কুতুবের সামনে পাহারায় বসিয়েছিলাম।'

'কেন?'

'দুদিন আগে কুতুবের ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিলাম মিস্টার বাসুর খোঁজে। বললাম—ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার। প্রথমে স্রেফ এড়িয়ে গেল ম্যানেজার। শেষে অনেক পেড়াপীড়িতে মুখ খুলল। বাসুর সঙ্গে আমার দুবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে, তা তো সে দেখেছে। বলল, মিস্টার বাসু নাকি শিগগিরি আসতে পারেন হোটেলে। কয়েকখানা চিঠি এসেছে ওঁর নামে, সেগুলো নিয়ে যাবেন। বাসু ফোনে তাই জানিয়েছেন। ম্যানেজারকে অনুরোধ জানালাম—মিস্টার বাসুকে বলবেন, আমি ওঁর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই। কোথায় কখন দেখা হবে যেন চিঠিতে জানান।

'ফিরে গিয়ে হরিধনকে বললাম যদি বাসুর ঠিকানা বের করে দিতে পারো তোমার প্রোমোশন হবে। হরিধন তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল। গত রাতে হরিধন বাসায় ফেরেনি। আজ সারা সকাল থানা-হাসপাতাল চষে বেড়িয়েছি। হরিধনের পাত্তা নেই। ওর বাড়ির লোক কান্নাকাটি করছে। হয়তো আমার জন্যেই বিপদে পড়ল ছেলেটা?'

'কাল বাসু এসেছিলেন কুতুবে?'

'হ্যাঁ, বিকেল পাঁচটায় আসেন, খানিক পরে চলে যান।'

কুণালের সঙ্গে বেরলো দুজন। অনেক খোঁজাখুঁজি করল বিকেল অবধি। হরিধনের খোঁজ পাওয়া গেল না। সন্ধেবেলা মামাবাবুর বাসায় ফিরতে বাধ্য হল সুনন্দ অসিত। কারণ স্যার ডেভিড ডানকান আসবেন আজ। সেই উপলক্ষে আরও কয়েকজন অতিথি আসবেন বাড়িতে। তাদের যত্নের ভার সুনন্দদের ওপর।

আবার আগামীকাল এক প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে আছে। মামাবাবু ডানকানকে নিয়ে কলকাতার বাইরে যাবেন বেড়াতে। সুনন্দ অসিত যাবে সঙ্গে।

সুনন্দদের ইচ্ছে ছিল না কুণালকে ফেলে রেখে যায়। কুণালই জোর করল—'তোরা আর থেকে কী করবি। মাঝ থেকে প্রোফেসর ঘোষের অসুবিধে হবে। তোরা যা—'

ভাগ্যিস গিয়েছিল তারা। নইলে এক অতি জটিল রহস্যের জাল হয়তো কোনোদিনই ভেদ করা সম্ভব হত না।

রাতে সুনন্দ একবার ফোন করল কুণালকে—'হরিধনের খোঁজ পেলি?'

উত্তর এল—'না।'

তিন

আফ্রিকা সফর সেরে হইহই করে উপস্থিত হলেন স্যার ডেভিড ডানকান। ডানকান গিয়েছিলেন মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকায় অতি দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে—ওকাপি নামে এক দুর্লভ প্রাণী দর্শনের আশায়। ওকাপি জিরাফের জ্ঞাতি। ১৯০০ সালে এই জন্তুটি প্রথম আবিষ্কার হয়। বন্য ওকাপির স্বভাবের বৈচিত্র্য আজও জানা যায়নি। তার কারণ শুধু গভীর জঙ্গল, অল্প সংখ্যা বা তাদের লাজুক স্বভাব নয়—ওই একই জঙ্গলে বাস করে বর্বর পিগমি বা বামন জাতি। তাদের বিষাক্ত তিরকে সবাই ডরায়।

স্যার ডেভিড লুকিয়ে ওকাপির ছবি তুলেছেন, পিগমিদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের সাথে নাচ-গান করেছেন এবং নিতান্ত উপস্থিতবুদ্ধির জোরে চিতাবাঘের কবল থেকে প্রাণে বেঁচে গেছেন। গোটা সন্ধে সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনল তাঁর গল্প।

পরদিন খুব ভোরে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে রওনা হল পাঁচজন—মামাবাবু, ডানকান, সুনন্দ, অসিত এবং বঙ্কিম হাজরা। তিনি ঠিক ম্যানেজ করে ঢুকে পড়েছেন দলে। বীরভূমে যে ঝিল দেখতে যাওয়া হচ্ছে, শীতকালে সেখানে প্রচুর যাযাবর হাঁস নামে। ডানকানের ইচ্ছে পশ্চিমবাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবেন, সঙ্গে খানিক বার্ডওয়াচিং হলে তো সোনায় সোহাগা।

এই ঝিলে আগে কয়েকবার গেছেন মামাবাবু। উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে জলাভূমি। কিছুদূর দিয়ে বইছে সরু পাহাড়ি নদী কোপাই। ঝিলের কাছে একটি মাত্র গ্রাম বৈকুণ্ঠপুর। গ্রামের লোকরা বৈষ্ণব, তারা ঝিলের পাখি মারে না, বাইরের কাউকেও মারতে দেয় না। অতএব ঝিলের জলে এবং আশেপাশে পাখিরা নির্ভয়ে চরে।

বোলপুর স্টেশনে সকাল এগারোটা নাগাদ ট্রেন থেকে নামল পাঁচজনে।

বৈকুণ্ঠপুরের শ্রীমন্ত বৈরাগী মামাবাবুদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল স্টেশনে। শ্রীমন্ত মামাবাবুর পুরনো পরিচিত। বছর চল্লিশ বয়স। ভারি বিনয়ী। সর্বদা মুখে মিষ্টি হাসি লেগে রয়েছে। মামাবাবুর সঙ্গে ঘুরে বার্ডওয়াচিং সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে শ্রীমন্তর।

তিনটে সাইকেল রিকশা ভাড়া করা হল। শ্রীমন্ত চলল বাইসাইকেলে। মাইল দুই যাবার পর রাস্তা খারাপ হয়ে উঠল। এই মেঠো রাস্তায় রিকশা চলে না—গরুর গাড়ি চলে। শুধু মালপত্র নিয়ে রিকশা চালকরা চলল গাড়ি ঠেলে ঠেলে।

শীতের রোদ্দুরে হাঁটতে কষ্ট নেই। গল্প করতে করতে এগোল সবাই। দুপাশে বিস্তীর্ণ ক্ষেতি জমি। বর্ষাকালে সারা মাঠে ধান চাষ হয়। শীতে অবশ্য অনেক জমি খালি পড়ে আছে। তবে যে জায়গায় জলসেচের সুবিধে আছে সেখানে টুকরো টুকরো জমিতে চাষ হয়েছে। কোথাও ধান কোথাও বা গম।

পথের ধারে এক ছোট্ট গ্রাম পড়ল। বট অশ্বত্থ আম জাম তেঁতুল গাছে ছায়াচ্ছন্ন। ঝুপড়ি চায়ের দোকানও রয়েছে একটা। একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। চায়ের অর্ডার দিয়ে দোকানের বাইরে বেঞ্চে বসল সবাই। রিকশাওলারাও রিকশা রেখে এসে দোকানের পাশে ঘাসে বসে পড়ল।

দেখতে দেখতে ছোটখাটো এক ভিড় জমে গেল মামাবাবুর পার্টিকে ঘিরে। ছোট ছেলেমেয়ে, অকর্মা লোক তো আছেই—যারা কাজে যাচ্ছিল তারাও হাঁ করে দাঁড়িয়ে গেল। রিকশাওলা ও শ্রীমন্তকে হাজারো প্রশ্ন করতে লাগল আগন্তুকদের সম্বন্ধে। ডানকান সাহেবই তাদের প্রধান আকর্ষণ। সাহেব নিজে কিন্তু বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করলেন না। বললেন—'এ আমার অভ্যেস আছে। অচেনা জায়গায় এমনও হয়েছে যে কয়েকশো লোক গা ঘেঁষে বসে আমায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লক্ষ্য করেছে। শোওয়ার সময় অবধি রেহাই দেয়নি। আবার গায়ে আঙুল ঘষে যাচাই করে দেখছে রংটা আসল না নকল। একবার হয়েছিল কী জানো? ইস্টার্ন তুর্কিস্থানে গোবি মরুভূমির প্রান্তে মঙ্গোলিয়ানদের এক গ্রামে সন্ধের ঠিক আগে পৌঁছলাম আমি আর তেহেরান ইউনিভার্সিটির আর্কিওলজির প্রোফেসর ডক্টর বেন গাজি'—

'গেল গেল, নিয়ে গেল। ধর ধর! হেট্ হেট্'—ইত্যাদি বহু কণ্ঠের উত্তেজনাময় বাক্যস্রোতে ডানকানের গল্পে অকালে ছেদ পড়ল।

সচকিত হয়ে দেখল সবাই একপাল ছোট ছেলে তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে একদিকে ছুটে গেল। তারা ঘাড় তুলে কাছে এক বিরাট তেঁতুল গাছের ডালে তাকিয়ে দেখছে, উত্তেজিতভাবে অঙ্গভঙ্গি করছে এবং ঢিল ছুঁড়ছে ওপরে।

তাদের উত্তেজনার কারণ প্রথমে ধরা গেল না।

তারপরই শ্রীমন্ত লাফ দিয়ে উঠে ছুটল গাছের দিকে—'হেই বাবা, সব্বনাশ হয়ে গেল।'

মামাবাবুরাও হাজির হলেন গাছের নিচে। ব্যাপার বুঝে সবার চক্ষুস্থির।

এক মস্ত লালমুখো বাঁদর গাছের উঁচু ডালে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। তার হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ব্যাগের মালিক—বঙ্কিমবাবু।

বাঁদরটা ব্যাগের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে ফেলেছে। এবং হাটকে হাটকে ব্যাগের ভিতরকার জিনিস বের করে প্রত্যেকটি চোখের সামনে একবার ঘুরিয়ে দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। বোঝা গেল খাদ্যদ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুতে তার রুচি নেই।

বঙ্কিমবাবু তো এই দৃশ্য দেখে বিকট আর্তনাদ করে নৃত্য জুড়ে দিলেন।

গ্রামের একজন বলল, 'ভারি শয়তান বাঁদর, বাবু। কী উৎপাত যে করছে! একজনা এনেছিল পুষবে বলে। বাগ মানেনি। বুনো হয়ে গেছে।'

ধপ্! এবার ব্যাগটা পড়ল মাটিতে। বাঁদরটা কী জানি চিবুচ্ছে। বঙ্কিমবাবু জানালেন—'নিশ্চয় পিপারমেন্ট। ছিল এক বাক্স।'

বঙ্কিমবাবু পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে তাঁর ফেলে দেওয়া জিনিস উদ্ধার করতে লাগলেন। সুনন্দ, অসিত, মামাবাবু, ডানকান সাহেব—আর গ্রামসুদ্ধু লোক তাঁকে সাহায্য করতে লেগে গেল। যাহোক আধঘণ্টার মধ্যে হারানো জিনিস প্রায় সবই উদ্ধার হল। অবশেষে ফের রওনা দিল তারা।

বৈকুণ্ঠপুরের ঝিল সত্যি অপূর্ব।

অন্তত আধ মাইল লম্বা, হাত পঞ্চাশ চওড়া জলাশয়। চারিধারে উঁচু পারে তালগাছের সারি এবং শর ঝোপ। তীরের কাছে অগভীর জলে কিছু নলখাগড়া ও আগাছা জন্মেছে। ঝিলের তিন পাশে চাষের ক্ষেত। একপাশে উঁচু-নিচু লালচে রুক্ষ খোয়াই। খোয়াইয়ের

পথে মাইল দেড় গেলে কোপাই নদী। ঝিলের পশ্চিম দিকে প্রায় দুশো গজ দূরে গ্রাম বৈকুণ্ঠপুর।

শীতের দুপুরে গাঢ় নীল জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। আর জলের বুকে মনের আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে অসংখ্য হাঁস। শুধু হাঁস নয়, আরও অনেক রকম পাখি—কেউ ভাসছে জলে, কেউ চরছে পারের কাছে ডাঙায়। কেউ ডানা মেলে উড়ছে আকাশে। এতগুলো মানুষের আগমনে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বোঝা গেল এরা মানুষকে ভয় করে না।

ডানকান তো দৃশ্য দেখে মুগ্ধ।

মামাবাবু, ডানকান এবং বঙ্কিম হাজরা চোখে দূরবিন লাগালেন পাখি দেখতে।

সুনন্দ অসিত, শ্রীমন্ত ও আরও কয়েকজন বৈকুণ্ঠপুরবাসীর সহায়তায় তিনটে তাঁবু খাটিয়ে ফেলল ঝিলের কাছে। গ্রামের লোক তাদের রাতে থাকার জায়গা দিতে চেয়েছিল কিন্তু মামাবাবু ও ডানকান এমন খাসা জায়গাটি ছেড়ে বদ্ধ ঘরে ঘুমোতে রাজি হলেন না। ডানকান হেসে বললেন, 'বুঝলে ব্রাদার, সত্যি বলতে কি ক্যাম্পে শুতে আমি নিজের বেডরুমের চেয়েও আরাম পাই। অভ্যেস!'

বৈকুণ্ঠপুরের ঝিলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় রয়েছে পিন্‌টেল বা সূচ্যগ্রপুচ্ছ হাঁস। জলের মধ্যিখানটা তাদের দখলে। এরা যাযাবর। উত্তর এশিয়া ও ইউরোপ থেকে শীতকালে এদেশে আসে। বেশ বড় হাঁস।

ঝিলে আর এক জাতের হাঁস ছিল—নাক্‌টা। আকারে পিনটেলের চেয়েও বড়। নাক্‌টা যাযাবর নয়। এখানে স্থায়ীভাবে বাস করে।

হাঁস ছাড়াও জলে সাঁতার কাটছিল কিছু পানকৌড়ি। তীরে গাছের ডালে বা মাটিতে বসেছিল কয়েকটি ধ্যানমগ্ন বক। থেকে থেকে জলে ছোঁ মারছিল মাছরাঙা। দূরে খোলা মাঠের আকাশে প্রকাণ্ড ডানা মেলে উড়ছিল শামুকখোল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে আসা হয়েছিল স্টেশনে। এক রাউন্ড কফি খেয়ে সবাই চলল নদী দেখতে।

অগভীর ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী। টলমলে জলে হাঁটু অবধি ডোবে না। তবে বর্ষায় নাকি এই নদীতেই বান ডাকে—কূল ছাপিয়ে যায় জল। নদীতটে ঝোপ-ঝাড়, হালকা জঙ্গল। ভারি নির্জন। এই জায়গা নানা জাতের পাখির আদর্শ বিহারভূমি।

মামাবাবু উত্তেজিতভাবে ডানকানকে খোঁচা মারলেন 'ওই দেখুন একজোড়া ব্রাহ্মণী হাঁস।'

'অ্যাঁ, হাঁসেরও 'বামুন কায়েত' আছে?' আশ্চর্য হয়ে বললেন বঙ্কিমবাবু।

'না না, সে ব্রাহ্মণী নয়, হাঁসের নাম। চলতি বাংলায় যাদের বলি চকাচকী।' বললেন মামাবাবু। 'এরাও যাযাবর হাঁস। তুর্কিস্থান সিকিম তিব্বত ইত্যাদি দেশ থেকে আসে। সর্বদা জোড়ায় জোড়ায় ঘোরে।'

মামাবাবু গ্রামের লোকের সাহায্যে ঝিল ও নদীর তীরে কয়েকটা পাখি ধরার ফাঁদ পাতলেন। পাখি ধরে তাদের পায়ে রিং পরানো হবে। রিং বের করে দেখালেন তিনি। ছোট ছোট অ্যালুমিনিয়ামের বলয়। তাতে পাঞ্চ করে খুদে খুদে অক্ষরে ছেপে দেওয়া হয়—রিং

পরানোর তারিখ, কে পরাচ্ছে, কোথায়, পাখির ওজন কত ইত্যাদি তথ্য। বিশেষ করে যাযাবর পাখিদের জানতে এই রিং পরানোর প্রয়োজন খুব বেশি।

শীতের শেষে যাযাবর পাখির দল আবার নিজের দেশে ফিরে যাবে। হয়তো দূর দেশে এখানের রিং পরানো কোনো পাখিকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে। পক্ষিবিশারদরা তখন ওর পায়ের রিং দেখে জানতে পারবেন পাখিটা কত দূরে গিয়েছিল, কবে, ইত্যাদি খবর।

দিনান্তের অস্পষ্ট আলো যখন যাই-যাই করছে, আকাশের পশ্চিমপ্রান্ত অস্তগামী সূর্যকিরণের আভায় রাঙা হয়ে উঠেছে, তখন দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য। পিনটেলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে আরম্ভ করল জল ছেড়ে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে প্রথমে ঝিলের ওপরে কয়েক পাক ঘুরে তারা উঠে গেল বহু উঁচুতে। তারপর তীরবেগে অদৃশ্য হল দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে। তাদের ডানায় শনশন আওয়াজ হচ্ছিল যেন ঝড়ের বাতাস। নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে তারা এখন চরতে চলল—দূরে খাল-বিল-শস্যক্ষেতে। কারণ রাতের আঁধারে শিকারীর দৌরাত্ম্য নেই। আবার ওরা বৈকুণ্ঠপুরের ঝিলে ফিরবে খুব ভোরে। সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। এই ওদের দৈনিক রুটিন।

সকালে আবিষ্কার হল ঝিলের পাশে ফাঁদে পাঁচটি পাখি বন্দী হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনটি যাযাবর পিনটেল। সাবধানে বের করা হল পাখিগুলোকে। যাযাবর পাখিগুলোর পায়ে রিং পরিয়ে দিলেন মামাবাবু। সুনন্দ অসিত বঙ্কিমবাবু ছাড়াও গ্রামের অনেক লোক গভীর আগ্রহে দেখল তাঁর কাজ। ডানকান তখন নিজের মনে ফোটো তুলতে ব্যস্ত।

ঘণ্টাখানেক পরে এক ব্যাপার দেখে সুনন্দরা হেসে অস্থির।—গ্রামের একটি লোক দুটো পায়রা এনে দিল বঙ্কিমবাবুকে। স্রেফ গোলা পায়রা। যারা গেরস্ত-বাড়ির ঘুলঘুলিতে বাস করে, কাছাকাছি মাঠে-ময়দানে চরে বেড়ায়। বঙ্কিমবাবু লোকটির হাতে একখানা নোট গুঁজে দিলেন। তারপর চুপিচুপি পায়রা দুটো থলিতে ভরলেন।

অসিত হেঁকে বলল, 'কী হাজরা মশাই, রোস্ট খাবেন নাকি?'

বঙ্কিমবাবু জিভ কাটলেন। 'আরে ছি ছি। বৈকুণ্ঠপুরে পক্ষিবধ! গ্রামের লোক মনে করবে কী? এই পায়রা দুটোকে আমি রিং পরাব। মানে প্র্যাকটিস করব।'

মামাবাবু হেসে বললেন, 'আপনার রিং পরানোর ইচ্ছে আছে বলেননি কেন? দুটো হাঁস তো এমনি ছেড়ে দিলাম। সেগুলোকে পরাতে পারতেন।

লাজুক হেসে বঙ্কিমবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। আগে একটু প্র্যাকটিস করে নিই ; নিজের হাতে পরিয়ে দেখাব আপনাকে।' পায়রা দুটো নিয়ে বঙ্কিমবাবু খোয়াইয়ের ঢালে নেমে অদৃশ্য হলেন।

প্রথম পায়রাটির পায়ে পরানো অ্যালুমিনিয়াম বলয় পরীক্ষা করে মামাবাবু বঙ্কিমবাবুকে সার্টিফিকেট দিলেন—'গুড! কেবল আর একটু টাইট হবে। হ্যাঁ, পয়সা দিয়ে পায়রা কেনার দরকার নেই। আপনি বরং নদীর তীরে চলে যান। শ্রীমন্ত বলেছে, একজোড়া বালি-তিতির পড়েছে ফাঁদে। ওরা অবশ্য যাযাবর নয়, তবু ওদের ওপর হাত পাকাতে পারেন। রিং পরিয়ে ছেড়ে দেবেন।' বঙ্কিমবাবু বেজায় খুশি হয়ে চলে গেলেন।

সুনন্দ দুপুরের খাওয়ার আয়োজন শুরু করল। সে রান্নায় ভারি পটু। অসিতকে বলল, 'ডানকান বাঙালি রান্না খাবে। খিচুড়ি, ডিম ভাজা, আলুর দম বানাচ্ছি।'

সুনন্দকে ব্যস্ত দেখে অসিত বলল, 'একটু ঘুরে আসি।'

মামাবাবু তখন ঝিলের ধারে চোখে দূরবিন লাগিয়ে বসে আছেন। ডানকান গ্রামে গেছেন একটা প্রাচীন মন্দির দেখতে।

অসিত যখন ফিরে এল, সুনন্দর রন্ধনপর্ব সমাপ্ত।

সুনন্দকে ফিসফিস করে বলল অসিত—'হ্যাঁরে ভক্ত বঙ্কিমের মাথার গোলমাল নেই তো?'

সুনন্দ অবাক।—'কই, মনে তো হয় না। কেন?'

অসিত একটু চুপ করে থেকে বলল—'আমার মনে হয় আছে।'

'হঠাৎ?'

'একটা উদ্ভট ব্যাপার দেখলাম, তাই।'

'কী?'

'নদী পেরিয়ে ওপারে গেসলাম। খানিক ঘুরে বায়নোকুলার দিয়ে দেখলাম চারধার। তারপর গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লাম চিৎপটাং হয়ে। একটু বাদে পাশ ফিরেছি, চোখে পড়ল নদীর উল্টো তীরে ঝোপের আড়ালে বসে বঙ্কিমবাবু। তিনি'—

'হ্যাল্লো দেয়ার!' ডানকানের গমগমে গলা শুনে দুজনে চমকে উঠল। ডানকান সাহেব পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন হাসি মুখে। 'এক কাপ কফি খাওয়াবে?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই'—সুনন্দ তৎপর হয়ে ওঠে। ডানকান জুৎ করে বসলেন সামনের মোটা গাছের শিকড়ের ওপর। বোঝা গেল শুধু কফির তেষ্টা নয়, তাঁর কিঞ্চিৎ আড্ডা দেওয়ার বাসনা জেগেছে।

'জানো, খাবার-দাবার নিয়ে আমার কোনো বাছবিচার নেই। শুধু এই কফির ওপর একটু যা দুর্বলতা। এই যে ইচ্ছে করলেই কফি খেতে পাচ্ছি, এ যে কত বড় সৌভাগ্য সে তোমরা বুঝবে না। আমিও বুঝিনি আগে। প্রথম টের পেলাম উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার জঙ্গলে পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে। তখন কেবল গরম কফিতে চুমুক দেওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। নৌকাডুবি হয়ে আমার কফির প্যাকেট গেল ভেসে। তারপর পাক্কা চল্লিশ দিন কফি খেতে পাইনি।'

'ওখানে গিয়েছিলেন কেন?' প্রশ্নটা দুজনের।

'নাইজার নদীর গতিপথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। বড্ড ভুগিয়েছিল সেবার।'

'কী—কীরকম?'

স্যার ডেভিড কফিতে চুমুক দিতে দিতে তাঁর অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি আরম্ভ করলেন। রুদ্ধশ্বাসে শোনে দুই বন্ধু। বঙ্কিমবাবুর অদ্ভুত আচরণের কথা আপাতত মুছে গেল তাদের মন থেকে। কথাটা অবশ্য সুনন্দর মনে পড়েছিল—তবে অনেক—অনেক পরে।

সেই রাতে কলকাতার বাসায় ফিরে, শুতে যাওয়ার আগে সুনন্দর মনে পড়ল—তাই তো, হরিধনের খবর পাওয়া গেছে কি? আর বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে কী একটা রহস্যময় ঘটনা বলতে যাচ্ছিল অসিত? কিন্তু রাত সাড়ে এগারোটার সময় কাউকে বিরক্ত করা উচিত নয়। পরদিন সুনন্দ কুণাল ও অসিতকে টেলিফোন করল।

কুণাল জানাল—'হ্যাঁ, ফিরেছে হরিধন। খুব বেঁচে গেছে। আমি এখুনি আসছি তোর কাছে।'

অসিত বলল—'সত্যি, বঙ্কিমবাবুর ব্যাপারটা ভুলেই গেসলাম। অদ্ভুত লোক। আমি তো কিছু মাথামুণ্ডু বুঝলাম না। ফোনে বলা যাবে না সব গুছিয়ে। আমি যাচ্ছি। তবে একটু দেরি হবে। কাজ আছে বাড়িতে।'

চার

মিত্র কেমিক্যালস-এর সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হরিধনের রহস্যময় অন্তর্ধান সম্পর্কে কুণাল যা বলল তার সারমর্ম এই—

হোটেল কুতুবের সামনে এক পার্কের বেঞ্চে বসে হোটেলের ওপর নজর রাখছিল হরিধন। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মিস্টার বাসু এলেন ট্যাক্সিতে। আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি বেরিয়ে আসেন। ট্যাক্সি ডাকলেন না। পাইপ ধরিয়ে ধীরে সুস্থে হাঁটতে শুরু করলেন চৌরঙ্গীর দিকে।

সুবিধেই হল হরিধনের। অফিস-ফেরতা জনস্রোতে গা-ঢাকা দিয়ে সে হাত কুড়ি পিছনে থেকে বাসুকে অনুসরণ করল।

চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে অনেক রাস্তা ঘুরে বাসু ঢোকেন চীনে পট্টিতে। পথে একবার মাত্র থেমেছিলেন—দেশলাই কিনতে।

একটা সরু গলি। দুপাশে পুরনো আমলের বড় বড় বাড়ি। পথচারী কম। মিস্টার বাসু টপ করে এক বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে গেলেন। মিনিট পনেরো গলির মোড়ে অপেক্ষা করে হরিধনও ঢুকল সেই বাড়িতে।

সরু প্যাসেজ—দুধারে সার-সার ঘর। নোনা-ধরা ইঁট বের করা দেওয়াল। প্যাসেজে মিটমিট করছে বৈদ্যুতিক আলো। কোনো ঘর তালাবন্ধ। কোনোটা খোলা—মানুষজনের কথার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ভিতরে। দু-চার জন লোক ঢুকছে বা বেরুচ্ছে। ঘরগুলোয় লোক বাস করে না। গুদাম বা অফিস হিসেবে ব্যবহার হয়। খোলা দরজা পেলেই ভিতরে উঁকি দেয় হরিধন।

প্যাসেজের শেষ প্রান্তে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। হরিধনকে দেখছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। হরিধন জিজ্ঞেস করল তাকে—'একজনকে দেখেছেন যেতে? কোট-প্যান্ট পরা।'

লোকটি আঙুল তুলে দেখাল—'হ্যাঁ, ওই দিকে।'

বাড়ির এ অংশ একেবারে নির্জন। হঠাৎ থামের আড়াল থেকে যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হল এক ব্যক্তি—দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, পরনে রঙচঙে লুঙ্গি ও শার্ট। চোখের নিচে হতে মুখের বাকি অংশ রুমাল বেঁধে ঢাকা।

মুহূর্তে সে হরিধনের বুকের ওপর উঁচিয়ে ধরল একখানা লম্বা ঝকঝকে ছোরা। চাপা কর্কশ স্বরে বলল—'খবরদার, চেঁচালেই মরবি।'

আর তখুনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হরিধনের ঘাড় পেছন থেকে দৃঢ়মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরল কেউ। এবং আর একখানা হাত ভিজে কাপড়ের টুকরো সমেত তার মুখ চাপা দিল। ঝাঁঝাল মিষ্টি গন্ধ ঢুকল নাকে। হরিধনের মাথা ঝিমঝিম করে উঠল এবং সে জ্ঞান হারাল।

হরিধন যখন চেতনা পেল তখন বুঝতে পারল যে একটা দরজা-জানলা বন্ধ অন্ধকার ঘরে সে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে শুয়ে রয়েছে। মুখও বাঁধা, গালের ভিতর কাপড় ঠাসা। চেঁচাবার উপায় নেই। ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য আলো ঢুকছে।

দারুণ তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। গড়িয়ে গড়িয়ে দরজার কাছে গেল হরিধন। দুম্ দুম্ করে জোড়া পায়ে লাথি মারতে লাগল কবাটে। বাইরে তালা খোলার আওয়াজ। সেই মুখ-ঢাকা লোকটা ঢুকল ঘরে। হিংস্রভাবে দাবড়ানি দিল—'টুঁ শব্দ করলে গলা কেটে পুঁতে ফেলব।'

হরিধন ইঙ্গিতে বোঝাল—জল।

লোকটা এক মগ জল এনে হরিধনের বাঁধন খুলল। হরিধন হাঁ করতে ঢেলে দিল জলটুকু। তারপর বেরিয়ে গিয়ে দরজায় তালা দিল। দরজার বাইরে আলো। দেখে হরিধনের মনে হয়েছিল তখন সকালবেলা।

খানিকক্ষণ পরে তার কানে এল দরজার বাইরে দুজন লোকের কথাবার্তা।

'ফেউটাকে নিয়ে কী করব স্যার?'

'দেখি ভেবে।'

'খতম করে পাচার করে দিই। ঝামেলা চুকে যায়।'

'উহুঁ ব্যস্ত হয়ো না। আমি আসছি ঘুরে।'

একজনের গলা চিনেছিল হরিধন—মুখ-ঢাকা গুণ্ডাটা। দ্বিতীয় জনকে চিনতে পারেনি।

ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল হরিধন। আর কোনো শব্দ করতে সাহস পায়নি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় একভাবে পড়ে থেকে তার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

আবার দরজা খুলল সেই গুণ্ডাটা। তখন নিশুতি রাত। হরিধনের মুখ খুলে দিয়ে এক গ্লাস দুধ দিল তাকে খেতে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। তাই বিনা আপত্তিতে দুধটুকু খেয়ে ফেলল হরিধন। একটুক্ষণ পরেই তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। অবশ অচেতন হয়ে পড়ল তন্দ্রায়।

কুণাল বলল, 'ভোরবেলা হরিধনের দেহ আবিষ্কার হল। ওই বাড়িরই এক নোংরা উঠানে। প্রথমে লোকে ভেবেছিল মৃত। তারপর বুঝল অজ্ঞান। তখন ওকে হাসপাতালে পাঠাল। দুপুরে ওর জ্ঞান হল। ডাক্তার বলেছে কড়া ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল।'

'কিছু খোয়া গেছে হরিধনের?' জিজ্ঞেস করল সুনন্দ।

'হুঁ। ওর মনিব্যাগ এবং রিস্টওয়াচ। পুলিশ ওই বাড়ি সার্চ করেছে। কিন্তু হরিধনের আততায়ীর সন্ধান পায়নি। এমনকি কোন ঘরে বন্দী ছিল তাও ঠিক করে বলতে পারেনি হরিধন। কয়েকজনকে জেরা করে আপাতত হাল ছেড়ে দিয়েছে। কী করতে হরিধন ওই বাড়িতে ঢুকেছিল তার আসল কারণ অবশ্য পুলিশের কাছে চেপে গেছি। কে জানে, তাহলে হয়তো আমাদেরই অযথা হয়রানি করত পুলিশ।'

অল্পক্ষণ নীরব থেকে কুণাল বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় এ অর্ডিনারি ছিনতাই কেস নয়। মিস্টার বাসুই গুণ্ডা লাগিয়েছিল।'

'তোর ধারণার কারণ?'

'কারণ হরিধনের প্যান্টের পকেটে একটা চিঠি ছিল, সেটা উধাও হয়েছে। এমনি অফিস চিঠি। অফিসিয়াল প্যাডে আমি লিখেছিলাম হরিধনকে কিছু কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে। আমার

সই ছিল তাতে। এ চিঠি সাধারণ গুণ্ডা নেবে কী করতে? তাছাড়া ওকে ফেউ বলছিল কেন?'

'হতে পারে। বাসু সন্দেহ করেছিল ওকে ফলো করা হচ্ছে, তাই। লোকটা তাহলে ডেনজারাস—'

সদর দরজার কলিং বেল বাজল।

দরজা খুলে সুনন্দ দেখে বঙ্কিমবাবু।

বঙ্কিমবাবু বললেন, 'নমস্কার। প্রফেসর ঘোষ আছেন?'

'না, বেরিয়েছেন। আপনি বসুন। ফিরবেন এবার।'

'ডানকান সাহেব কি চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওঃ দুর্দান্ত লোক মশাই। এই প্রথম স্বচক্ষে একজন পর্যটককে দেখলাম। বইয়ে পড়েছি কত।'

সুনন্দ জবাব দিতে যাচ্ছিল—কেন, মামাবাবু? কিন্তু তার নজরে পড়ল বঙ্কিমবাবু হাঁ করে চেয়ে আছেন বৈঠকখানার খোলা দরজা দিয়ে কুণালের দিকে।

সুনন্দ বলল, 'আমার বন্ধু কুণাল মিত্র।'

'ও, ইনিই বুঝি মিস্টার বাসুর খোঁজ করছিলেন?' চাপা গলায় বললেন বঙ্কিমবাবু।

'না না, সে অন্য লোক।'

'ওঃ সরি। আচ্ছা আমি এখন চলি। পরে আসব'খন। নমস্কার।'

দরজা বন্ধ করে এসে সুনন্দ বলল, 'কুণাল, ভদ্রলোক কী বলছিলেন জানিস?'

'কী?'

'ইনিই কি মিস্টার বাসুর খোঁজ করছেন?'

'অ্যাঁ!' কুণাল আঁতকে ওঠে।

'ভয় নেই। আমি বলেছি সে অন্য লোক।' সুনন্দ আশ্বাস দিল।

'কে ভদ্রলোক?'

'বাবু বঙ্কিম হাজরা। মামাবাবুর চেলা। লোক খারাপ নয়, তবে মগজ কিঞ্চিৎ নিরেট।'

'সত্যি, বোকা লোকগুলো এক-একসময় এমন বেফাঁস কথা বলে ফেলে!'

কুণাল বিদায় নেবার ঘণ্টাখানেক পরে এল অসিত।

সুনন্দ অসিতকে সংক্ষেপে জানাল হরিধনের অন্তর্ধান-কাহিনি। তারপর বলল, 'বল শুনি, বঙ্কিমবাবুর রহস্যময় আচরণ সম্বন্ধে কী জানি বলছিলি?'

অসিত বলতে শুরু করে—

'কোপাই নদীর তীরে গাছতলায় শুয়ে আছি। খানিক পরে কাৎ হয়ে দেখি, অন্য পারে ঝোপের আড়ালে বঙ্কিমবাবু। আমার দিকে একটু পাশ ফিরে বসেছেন। তাঁর হাতে একটা পাখি,—তিতির। আমি ভাবলাম পাখিটাকে রিং পরাবেন, তাই কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইলাম।'

'উনি কিন্তু কী করলেন জানিস? ব্যাগ থেকে ছোট একটা শিশি বের করলেন। তারপর

আঙুল শিশির মধ্যে ঢুকিয়ে কী জানি তুলে পাখিটার ঠোঁটে, মুখে, ডানায়, পায়ে ঘষে দিতে লাগলেন। বারবার এমনি করলেন। এমনকি সেটা খাওয়ানোর চেষ্টাও করলেন।'

'আমি তো হাঁ। করছেন কী? এরপর তিনি তিতিরটা উড়িয়ে দিলেন।'

'রিং পরালেন না?' প্রশ্ন করল সুনন্দ।

'না। আমি দূরবিন ফোকাস করে লক্ষ করেছি। রিং দেখতে পাইনি পাখির পায়ে। বঙ্কিমবাবু এরপর আর একটা তিতির নিলেন হাতে। এবং আগের মতোই উদ্ভট কাণ্ড করে সেটাকেও ছেড়ে দিলেন।'

'রিং?'

'উঁহু, তার পায়েও রিং ছিল না। বঙ্কিমবাবু এরপর চলে গেলেন উঠে। শিশিটা ফেলে দিয়ে গেলেন একটা গর্তে। আমি পরে গিয়ে শিশিটা তুলে নিলাম। কিন্তু শিশিতে যে কী ছিল ধরতে পারছি না।'

'কই দেখি শিশিটা।'

অসিত পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাচের শিশি বের করল। চ্যাপ্টা ক্রিমের শিশির মতো সাইজ। স্বচ্ছ কাচের তৈরি। প্লাস্টিকের ঢাকনা—তাতে সূক্ষ্ম কয়েকটি ছিদ্র। শিশির ভিতরে কাচের গায়ে পাতলা সরের মতো কী জানি লেগে রয়েছে জায়গায় জায়গায়।

সুনন্দ শিশিতে নাক লাগিয়ে শুঁকল। কেমন বোটকা গন্ধ। চোখের কাছে এনে পরীক্ষা করল। কিন্তু ভিতরে যে কী বস্তু ছিল আন্দাজ করতে পারল না। অবাক হয়ে বলল, 'কী ছিল এতে? আশ্চর্য! এটা কী লেগে আছে?'

'জানিস, এই শিশিটা আমি আগেও একবার দেখেছিলাম।' বলল অসিত।

'কখন?'

'সেই যখন বাঁদরে বঙ্কিমবাবুর জিনিস ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল। আমি তার জিনিস খুঁজতে খুঁজতে এই শিশিটা পাই। ওটা হাতে পেয়ে একটুক্ষণ লক্ষ করেছিলাম। ঢাকনা খুলিনি। তখনও কিন্তু মনে হয়েছিল শিশিটা প্রায় খ্যালি শুধু অল্প ক্রিম জাতীয় কী বস্তু রয়েছে ভিতরে।'

দুই বন্ধু হতভম্ব হয়ে বসে থাকে শিশিটার দিকে তাকিয়ে।

সুনন্দ বলল, 'আমি তো ভাই কিছু কূল পাচ্ছি না।'

'আমিও না।'

'একটা কাজ করব?'

'কী?'

'মামাবাবুকে বলি ব্যাপারটা। উনি যদি কোনো ক্লু—'

'হুঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম। তুই রাখ শিশিটা। মামাবাবুকে দেখাস।'

'তবে মামাবাবু পাখি নিয়ে যা মেতে আছেন। হয়তো কানেই তুলবেন না। দেখা যাক।'

বিকেলে মামাবাবুর স্টাডিতে ঢুকল সুনন্দ। সামান্য ইতস্তত করে বলে ফেলল বঙ্কিমবাবুর শিশি-রহস্য।

মামাবাবু শিশিটা দেখলেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। বললেন—'বেশ, দেখব পরীক্ষা করে। তবে তোমাদের বোধহয় নিরাশ হতে হবে। হয়তো শুনবে নেহাত ছেলেমানুষী ব্যাপার।'

মামাবাবুর হাতে ওই শিশি তুলে দেওয়ার তিন দিন পরের ঘটনা।

সবে ব্রেকফাস্ট সেরে পড়ার টেবিলে এসে বসেছেন প্রোফেসর ঘোষ অর্থাৎ মামাবাবু। সামনে মুখোমুখি বসে সুনন্দ ও অসিত। টেবিলের ওপরে রাখা বঙ্কিমবাবুর সেই রহস্যময় শিশি।

'এই শিশিতে কি ছিল জান?' বললেন মামাবাবু।

'কী?'

'একরকম ব্যাকটিরিয়া। জীবাণু।'

'সে কী!!' মহা বিস্ময়ে অসিত ও সুনন্দ হতভম্ব। 'কীসের?' প্রশ্ন করল তারা।

'একে একে বলছি।' মামাবাবু শিশিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, 'প্রথমে আমি শিশির ভিতরে কাচের গায়ে লাগা আঠাল বস্তু একটু নিয়ে স্লাইডস্‌য়ে লাগিয়ে মাইক্রোস্কোপের তলায় পরীক্ষা করি, এবং একরকম ব্যাকটিরিয়ার অস্তিত্ব আবিষ্কার করি। ওই বস্তু বারবার বিশ্লেষণ করলাম নতুন করে নিয়ে। প্রত্যেক বারই পেলাম সেই একই জাতের ব্যাকটিরিয়া—প্রচুর পরিমাণে। অবাক হলাম। বুঝলাম, ওই সরের মতো আঠাল বস্তু কোনো কালচার মিডিয়া। এবং তার মধ্যে এই ব্যাকটিরিয়ার বংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। কিন্তু এ-জীবাণু যে কী জাতীয় বুঝে উঠতে পারলাম না।'

'কালচার মিডিয়া কী?' প্রশ্ন করল অসিত।

মামাবাবু জবাব দিলেন, 'একরকম রাসায়নিক পদার্থ। ল্যাবরেটরিতে যার মধ্যে জীবাণুকে কালচার অর্থাৎ পালন করা হয়।'

হ্যাঁ, তখন গেলাম মাইক্রোবায়োলজিস্ট ডক্টর আয়ারের কাছে। জীবাণু নিয়েই তাঁর গবেষণা। ডক্টর আয়ারও ধরতে পারলেন না। তিনি আমায় নিয়ে গেলেন আর একজন বিশেষজ্ঞের কাছে—কৃষিবিজ্ঞানী ডক্টর সাহা।

'ডক্টর সাহারও বেশ সময় লাগল জিনিসটা কী সেটা বুঝতে। তারপর যা রিপোর্ট দিলেন সেটা অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য।

'ডক্টর সাহা বলেছেন—এই ব্যাকটিরিয়া হচ্ছে গমের নেতানো রোগের কারণ। গমের পাতা ও শিষের নরম অংশের কোষ থেকে এই জীবাণু খাদ্য আহরণ করে। ফলে পুষ্ট গাছ যায় শুকিয়ে। সাহা বলেছেন—এই গমের রোগ ভারতবর্ষে একেবারে নতুন। কৃষিবিজ্ঞানীরা এ-রোগ নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু এখনো এর প্রতিরোধের কোনো উপায় বের হয়নি।

'ডক্টর সাহা ভেবেছিলেন, কেউ বুঝি এই ব্যাকটিরিয়া নিয়ে রিসার্চ করছে। তিনি তার নাম জানতে চাইছিলেন।'

'গমের নেতানো রোগ।' সুনন্দ লাফিয়ে ওঠে।

'ঠিক এই রোগের ওষুধের ফরমুলা তো বিক্রি করতে চাইছেন মিস্টার বাসু।

'কে মিস্টার বাসু?' মামাবাবু প্রশ্ন করলেন।

সুনন্দ ও অসিত পালা করে বলে গেল মিস্টার বাসুর কাহিনি—একেবারে শুরু থেকে। কুণালের কাছে গত বছর রহস্যময় মিস্টার বাসুর চিঠি—ফরমুলা বিক্রির প্রস্তাব—কুণালের

সন্দেহ—প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের খোঁজে তাদের বারবার অভিযান এবং ব্যর্থতা—সমস্ত খুঁটিনাটি।

মামাবাবু ভুরু কুঁচকে শুনে গেলেন আগাগোড়া। সুনন্দদের বর্ণনা শেষ হলে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, 'বটে বটে! শোনো, আমি কুণালের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওকে আসতে বলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

আধঘণ্টার মধ্যেই কুণাল হাজির হল।

মামাবাবু কুণালকে মিস্টার বাসুর ধরন-ধারণ ও তাঁর ফরমুলাগুলি সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ধানের রাক্ষুসে পোকা বা গমের নেতানো রোগের ইতিহাসও জেনে নিলেন। সব শুনে গুম মেরে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। অতঃপর সুনন্দকে হুকুম দিলেন—'বঙ্কিমবাবুর বাড়ি যাও। ওনাকে ডেকে আনো আমার কাছে। তবে এ-ব্যাপারে কিছু ফাঁস কোরো না। বলবে, আমি বার্ড-ওয়াচিংয়ে বেরোচ্ছি। তাই ওঁর সঙ্গে প্রোগ্রাম করতে চাই।'

বঙ্কিম হাজরার এন্টালির বাসায় আগে যায়নি সুনন্দ। ঠিকানা খুঁজে বের করল। মস্ত পাঁচতলা বাড়িতে তিন কামরার এক ফ্ল্যাট নিয়ে বাস করেন বঙ্কিমবাবু। নিজের বাড়ি নয়, ভাড়া।

দুঃখের বিষয় ফ্ল্যাটের দরজায় তালা ঝুলছে।

দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে সুনন্দ জানল, বঙ্কিমবাবু কলকাতার বাইরে গেছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

সুনন্দর রিপোর্ট পেয়ে মামাবাবু আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরের দিন তিনি কোথায় কোথায় জানি ঘুরলেন। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেই সুনন্দকে ডেকে বললেন, 'কাল ভোরে তোমাদের বন্ধু তপন দত্তর সঙ্গে দেখা করতে যাব। অসিতকেও নিয়ে চলো।'

'মানে সুরভি নার্সারি?'

'হুঁ। এই তপন দত্তর পরিচয় জানো? জান ওর ইতিহাস?'

'কেন, তপন কী করেছে?'

'ঠিক কী করেছে সেটাই জানতে চাই। যেটুকু জানতে পেরেছি তপন দত্ত ছিল প্রোফেসর তালুকদারের রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট। বহুদিন কাজ করেছে ডক্টর তালুকদারের ল্যাবরেটরিতে। তালুকদার একবার তপন সম্বন্ধে ডক্টর সাহার কাছে খুব প্রশংসাও করেছিলেন।'

'ডক্টর তালুকদার মানে বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, যিনি বছর চারেক আগে আমেরিকায় ভিজিটিং প্রোফেসর হয়ে গিয়ে হঠাৎ মারা যান হার্ট অ্যাটাকে?'

'হ্যাঁ। ওঁর অকালমৃত্যুতে দেশের মস্ত ক্ষতি হয়েছে। ডক্টর তালুকদারের সাবজেক্ট ছিল মানুষের খাদ্যশস্য ও ফলমূলের নানান ক্ষতিকারক রোগের কারণ অনুসন্ধান এবং তাদের প্রতিরোধ করার উপায় আবিষ্কার। এই মানুষের কাছে যে অনেক দিন কাজ করেছে সে এসব রোগ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে বলেই আমার ধারণা।'

সুরভি নার্সারির রূপ এর মধ্যে বিশেষ পালটায়নি। শুধু দেখা গেল প্রধান বাড়িটার দরজা-জানালা সব বন্ধ।

মামাবাবুর সঙ্গে সুনন্দ ও অসিত নার্সারির গেট খুলে ঢুকতে চেনা সেই মালিটি এগিয়ে এল।

'তপনবাবু আছে?' জিজ্ঞেস করল সুনন্দ।

'আজ্ঞে না। বাইরে গেছেন।'

'কোথায়?'

'আজ্ঞে জানি না।'

থমকে গেল তিনজনে। এ-সম্ভাবনা কারো মনে জাগেনি। অসিত প্রশ্ন করল—'কবে ফিরবেন?'

'তা জানি না হুজুর।'

মামাবাবুর মুখের দিকে তাকাল ওঁরা, এবার কী করা?

মামাবাবু মালিকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কাছে চাবি আছে বাড়ির?'

মালি একটু ইতস্তত করে বলল—'আছে।'

'শোনো আমরা এই বাড়ির ভিতরটা দেখতে চাই।'

ভয়মাখা চোখে মালি বলল, 'আজ্ঞে, হুকুম নেই। বাবু বকবেন।'

'কোন্ বাবু?'

'বাসু সাহেব।'

'ও, বাসু সাহেবের সঙ্গে বুঝি গেছে তপনবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমার নাম কী?'

'আজ্ঞে, বলরাম।'

'কদ্দিন আছ এখানে?'

'আজ্ঞে তিন বছর। নার্সারি খোলার গোড়া থেকে।'

'বাড়িতে আর কেউ আছে?'

'না। রাঁধুনি আর ধ্রুব মালি বাড়ি গেছে।'

মামাবাবু বেশ অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'শোনো বলরাম, আমি খবর পেয়েছি এই নার্সারি বিক্রি করে দেওয়া হবে। আমি নার্সারিটা কিনব ভাবছি। ঘরগুলো একটু দেখতে চাই। নইলে বুঝব কী করে কত দরে পোষাবে। অনেক দূর থেকে এসেছি। এজন্যে বারবার আসা অসুবিধে। তুমি একটু ইচ্ছে করলেই কাজটা আজ চুকে যায়। ভয় নেই বাসু সাহেব বা কেউ জানতে পারবে না একথা। এই নাও রাখো এটা, ছেলেদের মিষ্টি কিনে দিও।' মামাবাবু মানিব্যাগ থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে বলরামের নাকের সামনে ধরলেন।

বলরামের সসেমিরা অবস্থা। তক্ষুনি হাত বাড়াল না বটে, কিন্তু লোভী জুলজুল চোখে দেখতে লাগল।

মামাবাবু উৎসাহ দিলেন, 'আরে কোনো ভয় নেই। তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। একটিবার ঘুরে দেখে নেব। কোনো জিনিস নেব না। হ্যাঁ, নার্সারি যদি কিনি তোমাকে আমার চাই। তোমার মতো পাকা লোককে ছাড়ছি না। মাইনে এখন যা পাও তাতেই হবে তো? ঠিক আছে, তখন দেখা যাবে।'

ব্যস্, ওতেই কেল্লা ফতে। বলরাম একগাল হেসে ঘাড় নাড়ল এবং নোটটি টেনে নিয়ে ট্যাকে গুঁজে বলল, 'আসুন বাবু।'

বাড়িতে নিচের তলা সুনন্দরা আগে যেমন দেখে গিয়েছিল তেমনি রয়েছে—গুদাম, অফিস, বীজ পরীক্ষার সামান্য আয়োজন।

দোতলার সিঁড়ির মুখে তপনের শোওয়ার ঘর। তক্তপোশ খালি। কোনো বাক্স-প্যাঁটরা বা বিছানার চিহ্ন নেই। কেবল বুকসেল্ফে কতকগুলো ইংরেজি-বাংলা বই ও পত্রিকা। প্রায় সবই কৃষি বা রসায়ন বিদ্যার।

দ্বিতীয় ঘরে ঢুকে তিনজনে থ।

এ যে পুরোদস্তুর ল্যাবরেটরি!

বেশ বড় ঘর। দুধারে লম্বা টেবিল—লাগোয়া র‍্যাক। টেবিলে গ্যাসবার্নার। টেবিল ও র‍্যাকে রকমারি মাপের শিশি-বোতল, টেস্টটিউব, বিকার, বকযন্ত্র প্রভৃতি গবেষণার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। কাচ বা প্লাস্টিকের পাত্রে নানা রঙের চূর্ণ তরল পদার্থ, শস্যদানা, শুকনো পাতা ইত্যাদি। কোনোটা বা খালি। তবে বোঝা যায় এই গবেষণাগার গত কিছুদিন যাবৎ ব্যবহার করা হয়নি। কেমন এলোমেলোভাবে ছড়ানো জিনিসগুলো। ধুলো জমেছে। কয়েকখানা কাচের স্লাইড রয়েছে টেবিলে, কিন্তু মাইক্রোস্কোপ নেই। বড় আলমারি রয়েছে দেওয়ালের গায়ে। তাতে নিচের তাকে কয়েকটা খালি শিশি। ওপরের তাক সব ফাঁকা।

মামাবাবু টেবিল থেকে একটা শিশি তুলে নিলেন। বঙ্কিমবাবুর কাছে যে শিশিটা পাওয়া গিয়েছিল অবিকল সেরকম। আরও চার-পাঁচটা শিশি রয়েছে। অসিত তাকাল সুনন্দর পানে। চোখের ভাষায় বুঝিয়ে দিল—যে বৈজ্ঞানিকের খোঁজে তাদের অ্যাডভেঞ্চার শুরু, এতদিনে বুঝি তার হদিস মিলল। কিন্তু এত লুকোচুরির কারণ কী?

সুরভি নার্সারির বাড়িঘর বাগান ইত্যাদি ঘুরে দেখে ঘণ্টাখানেক পরে সকলে বিদায় নিলেন।

ট্রেনে মামাবাবু প্রায় কথাই বললেন না। কপালে চিন্তার ভাঁজ। সুনন্দরা তাঁকে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পেল না। এরকম মুডে থাকলে মামাবাবু কথাবার্তা পছন্দ করেন না। হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছাল তখন বিকেল প্রায় তিনটে।

ট্রেন থেকে নেমেই মামাবাবু বললেন, 'পানিহাটি চলো। বঙ্কিমবাবুর সেই বাগানবাড়ি।'

'এখনই?'

'হুঁ। সময় নষ্ট করা চলবে না। অলরেডি লেট।'

মামাবাবুর স্বভাব এমনি। একবার ঝোঁক চাপলে নাওয়া-খাওয়া চুলোয় যায়। সুনন্দ অসিতও উত্তেজিত। টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি ক্রমে যেন একটি সূত্রে বাঁধা পড়ছে। ঘটনাপ্রবাহ ছুটে চলেছে কোন রহস্যময় পরিণতির দিকে, কে জানে?

পানিহাটির বাগানবাড়ি আগের মতোই নিস্তব্ধ। গেট খুলে ভিতরে ঢুকল তিনজনে। সুনন্দ অসিত লক্ষ করল গেট থেকে বাড়ি অবধি পথ চেঁছে পরিষ্কার করা হয়েছে। বাগানও আগের তুলনায় ছিমছাম। বঙ্কিম হাজরা কি বাড়ি আছেন? থাকার কথা নয়। কলকাতার বাইরে গেছেন। তাহলে, এখানে কী করতে এসেছেন মামাবাবু?

সদর দরজার কাছাকাছি পৌঁছে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে কারো দেখা পাবার আশায়। গেট খোলার শব্দ হল। এক ভদ্রলোক ঢুকলেন বাড়িতে। সন্দিগ্ধ চোখে দেখতে লাগলেন

তাদের। লম্বা শুঁটকো, টাক মাথা, নাকের ডগায় চশমা-ঝোলা এক বৃদ্ধ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। হাতে শৌখিন লাঠি।

'কী চাই?' তীক্ষ্ম সুরে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'নমস্কার। বঙ্কিমবাবু আছেন? মানে শ্রীবঙ্কিম হাজরা।' বললেন মামাবাবু।

'এখানে কোনো হাজরা-ফাজরা থাকে না। আমি থাকি। আমার নাম শ্রীদোলগোবিন্দ ঢোল।'

'ও। কিন্তু তিনি ছিলেন আগে। আমরা এসেছি একবার,' বলল সুনন্দ।

'হতে পারে। কত লোকই তো ছিল এখানে। একশো বছরের বাড়ি। আমি ছ-মাস হল ভাড়া নিইচি।'

'বঙ্কিমবাবু কোথায় থাকেন জানেন?' জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু।

'আজ্ঞে না।'

'আচ্ছা সেই পুরনো মালি আছে? সে হয়তো বলতে পারে।'

'ও, সেই আপিংখোর বুড়ো। তাকে ছাড়িয়ে দিইচি। বলল, পুরনো লোক তাই রেখেছিলাম গোড়ায়। দেখি, বেটা অকম্মার ঢেঁকি। কেবল বসে বসে ঝিমোয়। ওকে কী কত্তে যে পুষেছিল মাইনে দিয়ে?'

অগত্যা তিনজনে ফিরে চলল।

দোলগোবিন্দ অতি অভদ্র। গেট অবধি পৌঁছে তো দিলই না, বরং পেছন থেকে খনখনে গলায় হেঁকে বলল, 'ও মশাই, গেটটা বন্ধ করে যাবেন। নইলে গরু-ছাগল ঢুকবে।'

ট্যাক্সিতে মামাবাবু চোখ বুজে চুপচাপ বসে রইলেন। একবার কেবল বলে উঠলেন, 'বুঝলে হে, তিনটে শয়তান ক্রিমিনাল। একসঙ্গে চক্রান্ত করেছে। অথচ বাইরে থেকে তাদের প্রায় যোগাযোগই নেই। কাউকে ধরাছোঁয়া যাবে না। চমৎকার প্ল্যান।'

মামাবাবু দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলেন, 'বেশ দেখা যাক, কদ্দুর দৌড়।' যেন তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন ওই তিনজনের উদ্দেশে।

পাঁচ

দিনান্তে সন্ধ্যার আগমনে কলকাতা শহরের চৌরঙ্গী অঞ্চলের পথ-ঘাট দোকান-পাট ঝলমল করে উঠল নানা রঙের বৈদ্যুতিক আলোর বন্যায়।

এই চৌরঙ্গীর বিলাসবহুল প্রিন্স হোটেলের সামনে একটু ট্যাক্সি এসে থামল। গাড়ি থেকে নামলেন এক ব্যক্তি—নিখুঁত সাহেবি পোশাকে সজ্জিত, একটু সামনে ঝোঁকা কুঁজো ধরন, দাঁতে কামড়ানো পাইপ, হাতে একটি ব্রিফকেস। এই ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পাঠক আগেও কয়েকবার পেয়েছেন। ইনি মিস্টার বাসু।

মিস্টার বাসু গটগট করে ঢুকলেন হোটেলে। রিসেপসনিস্টের কাছে গিয়ে বললেন, 'মিস্টার কার্পেন্টারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কুড়ি নম্বর সুইট।'

'আপনার নাম?' জানতে চাইল রিসেপসনিস্ট মেয়েটি।

'মিস্টার বি বাসু।'

'আঃ, মিস্টার বাসু! ইউ আর ওয়েলকাম। আপনি সোজা চলে যান কুড়ি নম্বরে। মিস্টার কার্পেন্টারের নির্দেশ আছে আপনি এলেই পাঠিয়ে দিতে। আমি ফোনে ওনাকে আপনার খবর দিচ্ছি।'

কুড়ি নম্বর ঘরের বেল টিপলেন মিস্টার বাসু।

'আপনি কি মিস্টার বাসু?' দরজা খুলে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন এক লম্বা ফর্সা সুদর্শন প্রৌঢ়।

'ইয়েস।'

'গুড ইভনিং। আমি কার্পেন্টার।' তিনি সাদরে করমর্দন করলেন বাসুর সঙ্গে। আহ্বান জানালেন, 'দয়া করে ভিতরে আসুন।'

চেয়ারে বসলেন বাসু। লক্ষ করে দেখলেন মিস্টার কার্পেন্টারকে। ভদ্রলোকের চোখে-মুখে প্রখর বুদ্ধির ছাপ। তবে কথা বা ভাবভঙ্গি বেশ সহজ। ভারত কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের মতো বড় ওষুধ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর আরও ভারিক্কি জাঁদরেল-দর্শন হবেন বলে তিনি আশা করেছিলেন।

'আপনার ফরমুলার কাগজ-পত্র এনেছেন? আর সলিউশনের সাম্প্‌ল?' মিস্টার কার্পেন্টার কথা বলছিলেন চোস্ত ইংরেজিতে।

'হ্যাঁ।'—মিস্টার বাসু ব্রিফকেস খুললেন। একতাড়া টাইপ করা কাগজ বের করলেন এবং ছোট একটি শিশি। শিশি ভর্তি কোনো তরল পদার্থ। কাগজ ও শিশি রাখলেন সামনের টেবিলে।

'এবার আপনার দর বলুন মিস্টার বাসু।'

সামান্য ইতস্তত করলেন বাসু। বললেন, 'আগে পেপারস পরীক্ষা করুন। সলিউশন টেস্ট করুন। তারপর না হয় দর-দাম নিয়ে কথা হবে।'

'পরীক্ষা করা হবে বইকি! কিন্তু ওসব হচ্ছে স্রেফ ফরম্যালিটি। আমি জানি আপনার ফরমুলা খাঁটি। কাজেই আসল কথাবার্তা যত তাড়াতাড়ি এগোয় ততই ভালো।'

একটুক্ষণ চুপ করে, ভেবে বাসু বললেন, 'মাই প্রাইস ইজ টুয়েন্টি-ফাইভ থাউজেন্ড। রয়ালটি চাই না। পেটেন্ট রাইট আপনাদের দিয়ে দেব।'

'দ্যাটস অল রাইট। কোম্পানির এক্সপার্টকে পেপারস এবং সলিউশন পরীক্ষা করিয়ে আশা করছি দু-সপ্তাহের মধ্যে আমরা ফাইনাল এগ্রিমেন্ট করে ফেলতে পারব।'

মিস্টার বাসুর ভাব দেখে মনে হল যে কার্পেন্টার এত সহজে রাজি হয়ে যাবে তিনি ভাবেননি।

'লেট আস সেলিব্রেট। ড্রিঙ্কস? অথবা চা-কফি?'

'থ্যাঙ্ক-য়্যু। কফি।'

মিস্টার কার্পেন্টার বেয়ারাকে ডেকে কফির অর্ডার দিলেন।

কফি খেতে খেতে কার্পেন্টার বললেন, 'আচ্ছা মিস্টার বাসু রিসার্চের খরচ নিশ্চয় অনেক?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বোধহয় অনেক টাকা?'

'মোটেই না।'

'একটা কথা বলি, যদি আপনাকে আমাদের কোম্পানির রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের ভার নিতে অনুরোধ করি, রাজি আছেন? আপনি কত মাইনে চান বলুন, হোয়াটস ইওর প্রাইস?'

'সরি। আপনার অফার আমি গ্রহণ করতে পারলাম না,' জানালেন মিস্টার বাসু।

মিস্টার বাসু বুঝলেন এই কারণেই জোনাল ম্যানেজারের বদলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্বয়ং আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। ভারত কেমিক্যালসকেই তিনি গত বছর ধানের রাক্ষুসে পোকা মারার ওষুধের ফরমুলা বিক্রি করেছিলেন। কিন্তু সেবার তাঁর সঙ্গে ব্যবসায়িক কথা বলেন জোনাল ম্যানেজার মিস্টার গুরদেব সিং। এবার এই কোম্পানিকে গমের নেতানো রোগের জীবাণুনাশক ওষুধের ফরমুলা বিক্রির প্রস্তাব দিতে জোনাল ম্যানেজারের উত্তর আসে স্বয়ং ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন এ-বিষয়ে। তিনি যেন মিস্টার কার্পেন্টারের সঙ্গে এই হোটেলে দেখা করেন। সাক্ষাতের সময় নির্দেশ করা ছিল চিঠিতে।

চিঠি পেয়ে বেশ অবাক হয়েছিলেন বাসু। এবার বোঝা গেল হেতু।

মিস্টার কার্পেন্টার হাসলেন, 'আমি জানতাম আপনি রাজি হবেন না। বৈজ্ঞানিকরা কারো অধীনে কাজ করতে চান না বড়। অবশ্য এতে আপনার লোকসান হত না। বরং উভয়পক্ষের লাভ। আপনাকে গবেষণার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সুযোগ দিত কোম্পানি।'

'নো। ভেরি সরি।' ঘাড় নাড়লেন বাসু।

'ঠিক আছে। আপনার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই। আমার প্রস্তাব দিলাম। এখন আপনার অভিরুচি। যদি মত পরিবর্তন করেন, আমায় জানাবেন।'

কফি খেতে খেতে স্যাম্পলের শিশিটা নাড়াচাড়া করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যান কার্পেন্টার। মিস্টার বাসু কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ করেন। মিস্টার কার্পেন্টার বুঝতে পারেন। অপ্রস্তুতভাবে হেসে বললেন, 'আমি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। এক বিরাট আশাভরা স্বপ্ন।'

'কী স্বপ্ন, শুনতে পারি?'

'আমি ব্যবসায়ী মানুষ। আমার স্বপ্ন আর আপনার মতো বৈজ্ঞানিকের স্বপ্নের প্রকৃতি আলাদা। আমার স্বপ্ন, আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমার ব্যবসাকে ঘিরে।'

মিস্টার বাসু জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকেন।

কার্পেন্টার বলে চলেন, 'আমি ভাবছিলাম এই সলিউশন আমাদের কোম্পানিকে নিশ্চয় লাভ এনে দেবে। কিন্তু তা আর কতটুকু? এমনি আরও কয়েকটা আশ্চর্য প্রোডাক্ট যদি বাজারে ছাড়তে পারতাম। তাহলে—ওঃ, কী বিপুল লাভ! ভারত কেমিক্যালসের চেহারা পালটে যেত। সারা দুনিয়ায় তার নাম ছড়িয়ে পড়ত।'

মিস্টার বাসু হেসে বললেন, 'অর্থাৎ প্রথমে ঘটা চাই ফসলের মহামারী। তারপর চাই তাদের প্রতিরোধক ওষুধ। তবে আপনার স্বপ্ন সার্থক হবে। তাই না?'

'তা বটে।' হতাশভাবে মাথা নাড়েন কার্পেন্টার। 'আমার স্বপ্ন একটু অবাস্তব মানছি। তবু ভাবি যদি তা সম্ভব হত'—তিনি কেমন যেন উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকেন মিস্টার বাসুর চোখে।

মিস্টার বাসু চোখ সরিয়ে নিলেন। মাথা নিচু করে চিন্তা করলেন কী জানি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'মিস্টার কার্পেন্টার, বৈজ্ঞানিক যেমন রোগ দমন করার উপায় আবিষ্কার করে, তেমনি সে ইচ্ছে করলে রোগের বীজও তৈরি করতে পারে।'

কার্পেন্টার তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'মিস্টার বাসু, আমি জানি বিজ্ঞানের ক্ষমতা সীমাহীন। আমি জানি, আপনি ইচ্ছা করলে মানুষের খাদ্য ফসল ধ্বংসের জীবাণু আবিষ্কার করতে পারেন এবং সেই জীবাণুকে রোধ করার ওষুধ। কি, পারেন না? সত্যি করে বলুন?'

'হয়তো পারি।' মৃদু কণ্ঠে জবাব আসে।

'তাহলে দিন আমাদের। অন্তত একটা কোনো জুৎসই শস্য রোগের জীবাণু। আর তাকে প্রতিরোধ করার ওষুধ। ভারত কেমিক্যালস আপনার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার যথাযোগ্য মূল্য দিতে প্রস্তুত।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমি নিঃসঙ্গ বৈজ্ঞানিক। আপনি যে বিরাট এলাকা জুড়ে ব্যবসার কথা ভাবছেন, এইসব জায়গায় মাঝে মাঝে চাষের ক্ষেতে ওই রোগের বীজকে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু সে ক্ষমতা আমার নেই।'

'লোকবল আপনার না থাক আমার আছে।' কার্পেন্টার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'ভারত কেমিক্যালসের টাকা বা অনুগত বিশ্বাসী কর্মচারীর অভাব নেই। আপনি শুধু অস্ত্রটি আমার হাতে তুলে দিন।' বিকট উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন তিনি।

'আচ্ছা, রোগটা কোন্ শস্য নষ্ট করবে?' জিজ্ঞেস করলেন কার্পেন্টার।

'ধান।'

'রোগ সৃষ্টির কারণ কী হবে? পোকা না জীবাণু?'

'পোকা বা জীবাণু নয়। একরকম ছত্রাক।'

'ভেরি গুড। কবে পাওয়া যাবে?'

মিস্টার বাসু ভুরু কুঁচকে ভেবে উত্তর দিলেন, 'আমার রিসার্চ এখনো সামান্য বাকি। সাত-আট দিন বাদে আমি জানাব এই ছত্রাক এবং তার উপযুক্ত ওষুধের ফরমুলা কবে নাগাদ আপনাদের দিতে পারব।'

মিস্টার কার্পেন্টার বললেন, 'বেশ। আমি আপনার খবরের প্রতীক্ষায় থাকব। আর চিঠিটা দেবেন আমার নামে—কোম্পানির বোম্বাই হেড অফিসের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখে দেবেন—পার্সোনাল।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কার্পেন্টার চুরুট ধরিয়েছেন। মিস্টার বাসু গম্ভীরভাবে টানছেন পাইপ। অল্প উসখুস করে কার্পেন্টার বললেন, 'আর একটি অনুরোধ।'

'বলুন।'

'আমার এক বন্ধু। বিদেশি। ওদের ফল-মূলের বিরাট কারবার। দেশে-বিদেশে চালান দেয়—বিশেষত আলু। গত দু-বছর ধরে ওদের কারবার মন্দা যাচ্ছে। কারণ প্রধানত যে দেশে ওরা আলু চালান দিত তারা অনেক কম কিনছে। ওই দেশে নাকি আলুর উৎপাদন বেড়েছে। ফলে বন্ধুর ফার্মের গুদামে প্রচুর আলু জমে গেছে। সে আলু বাজারে বিক্রি করতে হলে অনেক কম দামে ছাড়তে হবে। বেজায় লোকসান। বন্ধু বলছিল, যদি কোনো উপায়ে অন্তত এক বছর ওই দেশে আলুর ফলন মার খেয়ে যায় তাহলে ওই দেশ ফের তার ফার্ম থেকে বেশি করে আলু কিনতে বাধ্য হবে। তাদের বাড়তি আলুর স্টকের সদ্গতি

হয়ে যাবে। আমার বন্ধু ভাবছিল, দৈবের ওপর নির্ভর না করে কোনো কৃত্রিম উপায়ে যদি খদ্দের দেশটির আলুর ফলন নষ্ট করা যায়? আপনি কি এ-ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পারেন না? এজন্য সে যথেষ্ট খরচ করতেও রাজি।'

'কত?' প্রশ্ন করলেন বাসু।

'যদি মোটামুটি তিরিশ ভাগ আলুর ফলন নষ্ট করার ব্যবস্থা করতে পারে কেউ—লাখ দুই দিতে আটকাবে না।'

দু-লাখ টাকা! লোভে জ্বলজ্বল করে ওঠে মিস্টার বাসুর চোখ। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বাঁকা হেসে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'হয়তো এরকম ব্যবস্থাও আমি করতে পারি। একরকম ভাইরাস আমার নজরে এসেছে—যা আলুর পক্ষে মারাত্মক। এবং অতি দ্রুত তার বংশবৃদ্ধি ঘটে।'

'ও ভাইরাস? আচ্ছা ভাইরাস তো একরকম জীবাণু?' গম্ভীর ভাবে বললেন কার্পেন্টার।'

মনে মনে হাসলেন বাসু। বুঝলেন, মিস্টার কার্পেন্টার জাঁদরেল পরিচালক হতে পারেন কিন্তু ভদ্রলোকের প্রাণবিজ্ঞানের জ্ঞান কম। মিস্টার বাসু বললেন, 'ভাইরাসকে জীবাণু বলতে পারেন, আবার নাও বলতে পারেন। এদের কেউ বলে জড়। কেউ বলে জীব। বরং বলা যায় এই দুইয়ের মাঝামাঝি। এমনিতে এরা জড় অবস্থায় থাকে। কিন্তু কোনো সজীব প্রাণী বা উদ্ভিদকোষের আশ্রয় পেলেই এরা বংশ বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ জীবন্ত হয়। আকারে অতি ক্ষুদ্র। খুব জোরালো মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না। এরা জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে নানা ধরনের রোগ ছড়ায়। এ যাবৎ অনেক রকম ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে। আমি যে ভাইরাসের খোঁজ পেয়েছি তা আলুর ক্ষেতে ছড়ালে শতকরা ত্রিশ কেন চল্লিশ ভাগ ফসল ধ্বংস হতে বাধ্য।'

'স্প্লেনডিড!' টেবিল চাপড়ালেন কার্পেন্টার। 'আমার বন্ধুর এজেন্টের হাতে ওই ভাইরাস তুলে দেওয়া মাত্র অর্ধেক পেমেন্ট পেয়ে যাবেন। বাকি অর্ধেক পাবেন কার্যসিদ্ধির পর।'

'আমার কিন্তু সময় চাই—অন্তত কয়েক মাস। ল্যাবরেটরিতে কালচার করে প্রচুর ভাইরাস তৈরি করতে হবে—এ তাড়াহুড়োর ব্যাপার নয়।'

'বেশ-বেশ। নিন সময়। আমি আমার বন্ধুকে সুসংবাদটি জানিয়ে দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, আমার কোম্পানির ইন্টারেস্ট কিন্তু প্রথম। আগে আমার অর্ডারটা সাপ্লাই করে তারপর আমার বন্ধুর ব্যবস্থা।'

'নিশ্চয়।' সম্মতি জানালেন মিস্টার বাসু।

বাইরে নির্বিকার দেখালেও মিস্টার বাসুর হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার। আঃ, আজ বড় শুভ দিন! কী বিরাট উপার্জনের সুযোগ এসে গেল—কত সহজে!

এবার মিস্টার বাসু বিদায় নিলেন।

প্রিন্স হোটেলের ঠিক উল্টো দিকে এসপ্লানেড। এলাকাটা তখন গমগম করছে। ফুটপাত ঘেঁষে লাগানো সারি সারি অপেক্ষমাণ মোটরগাড়ির পিছনে তিন ব্যক্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে— সুনন্দ, অসিত এবং মামাবাবু। তাদের দৃষ্টি ওই হোটেলের গেটে নিবদ্ধ। মিস্টার বাসুকে ঢুকতে দেখেছিল তারা। দেড় ঘণ্টা বাদে তাঁকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

সুনন্দ অসিতকে নিয়ে মামাবাবু যখন এইখানে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন তখন অবাক হয়ে গিয়েছিল দুই বন্ধু। তারপর সামনের হোটেলে হঠাৎ মিস্টার বাসুকে ঢুকতে দেখে আঁচ করল ব্যাপার। তাকে দেখে মামাবাবু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মিস্টার বাসু না?'—'হ্যাঁ'—তারা ঘাড় নেড়েছিল। কিন্তু মামাবাবু কী করে এখানে এই সময়ে বাসুর আগমন হবে টের পেলেন সে-রহস্য তাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি। বাসু ট্যাক্সি ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে দাঁড়ানো এক ট্যাক্সির চালক ঘাড় ফিরিয়ে মামাবাবুর দিকে চাইল। মামাবাবু কী জানি ইঙ্গিত করলেন তাকে। অমনি তার গাড়ির ইঞ্জিন সচল হয়ে উঠল। এবং সুনন্দরা লক্ষ করল যে বাসুর ট্যাক্সির পিছন ধরল এই ট্যাক্সিটা। দুটো গাড়িই মিলিয়ে গেল রাজপথে।

'চলো ফিরি।' বললেন মামাবাবু।

ঘণ্টাখানেক পরে টেলিফোন বাজতেই মামাবাবু ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিলেন রিসিভার। মিনিট পাঁচ কথা হল কারো সঙ্গে। রিসিভার নামিয়ে তিনি ডেকে বললেন, 'সুনন্দ রেডি হও। এখুনি বেরোতে হবে। মিস্টার পিল্লাই গাড়ি নিয়ে আসছেন আমাদের তুলে নিতে।'

শুধু সুনন্দ নয়, মামাবাবুর সঙ্গে আরও দুজন যাবার জন্য প্রস্তুত। অসিত এবং কুণাল। বাড়ি ফিরেই সুনন্দ কুণালকে ফোনে ডেকে বলেছিল, 'মিস্টার বাসুর দেখা পাওয়া গেছে। একটা সিরিয়াস কিছু ঘটতে যাচ্ছে। চলে আয় এখানে। কুইক।'

রাত প্রায় আটটা।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে এক ধূসর রঙা ফিয়াট গাড়ি।

গাড়ির সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন মামাবাবু এবং মিস্টার পিল্লাই। পিছনের সিটে—সুনন্দ, অসিত ও কুণাল।

মিস্টার পিল্লাই মাঝবয়সী, শক্তসমর্থ মানুষ। মাঝে মাঝে তিনি ও মামাবাবু নিচু সুরে কী সব পরামর্শ করছেন, কখনো ইংরেজিতে কখনো বা বাংলায়। পিল্লাইয়ের বাংলা ঝরঝরে। যদিও সামান্য অবাঙালি টান আছে। পিছনের তিন আরোহী বাক্যহারা। টানটান হয়ে একাগ্র চিত্তে লক্ষ্য রাখছে সামনের দুজনের হাব-ভাব।

হু-হু করে এগোয় মোটর। পেরিয়ে যায় সোদপুর, খড়দা, টিটাগড়—ক্রমে পৌঁছয় পথের শেষ প্রান্তে। ব্যারাকপুর।

গঙ্গার ধারে চওড়া পিচ-ঢাকা নির্জন রাস্তা। দু-পাশে বড় বড় কম্পাউন্ডওলা বাড়ি। বেশিরভাগ খুব পুরনো। এক রাস্তার মোড়ে গাড়ি থেমে পড়ল। গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে একজন কাছে এল। সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার। চৌরঙ্গীর প্রিন্স হোটেল থেকে মিস্টার বাসুর ট্যাক্সিকে অনুসরণ করেছিল যে।

মামাবাবু ও মিস্টার পিল্লাইয়ের সঙ্গে লোকটির কী জানি কথা হল। মামাবাবু সুনন্দদের ডাকলেন, 'নেমে এসো।'

পিল্লাইয়ের গাড়ি সহ ড্রাইভার রইল সেখানে। বাকি ছয়জন হেঁটে চলল। পথ দেখিয়ে চলেছে সেই ট্যাক্সিচালক। একটা গেটের সামনে থামল ওরা। লোহার প্রকাণ্ড গেট। উঁচু

পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। দোতলা। বিশাল বিশাল গাছে অন্ধকার হয়ে আছে মস্ত বাগান। আবছা চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে লাগছে বাড়িখানা।

গেট ঠেললেন পিল্লাই। ক্যাঁচ—শব্দ হল।

হঠাৎ কোত্থেকে সামনে এসে দাঁড়াল একটা লোক।

রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোতে দেখা গেল—লোকটা রীতিমতো গাঁট্টাগোট্টা। গায়ে স্পোর্টস গেঞ্জি ও ফুলপ্যান্ট। রুক্ষ মুখ।

'মিস্টার বাসুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।' বললেন মামাবাবু।

'এখানে মিস্টার বাসু বলে কেউ থাকে না।' কড়া সুরে বলল লোকটা।

মামাবাবু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন তাদের গাইডের দিকে। নিঃশব্দে মাথা হেলাল লোকটি। এবার মামাবাবু দৃঢ় স্বরে বললেন, 'মিস্টার বাসু এখানে থাকেন কিনা জানি না। তবে আপাতত তিনি এ-বাড়িতে আছেন। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

'না, বাড়িতে ঢোকা চলবে না।' লোকটি ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে পথ আগলে দাঁড়াল। বোঝা গেল সে সহজে কাউকে ঢুকতে দেবে না। দরকার হলে হাঙ্গামা বাঁধাতেও প্রস্তুত।

মিস্টার পিল্লাই এবার পকেট থেকে একখানি কার্ড বের করে লোকটির চোখের ওপর তুলে ধরলেন। 'পুলিস'—তাঁর মৃদু স্পষ্ট উচ্চারণ কারোরই কান এড়াল না।

লোকটা চমকে পিছিয়ে গেল কয় পা।

'খবরদার পালাবার চেষ্টা কোরো না।' পিল্লাইয়ের ডান হাতে আবির্ভূত হল এক চকচকে রিভলভার। তিনি ডাকলেন, 'ফাগুলাল।'

'ইয়েস স্যার।' গাইড এসে লোকটির হাত চেপে ধরল। 'যাও এর সঙ্গে,' কঠিন স্বরে আদেশ দিলেন পিল্লাই। লোকটা সুড়সুড় করে ফাগুলালের সঙ্গে চলে গেল যেদিকে পিল্লাই গাড়ি রেখে এসেছেন। সুনন্দদের বুঝতে অসুবিধে হল না যে পিল্লাই এবং ফাগুলাল পুলিসের লোক।

পাঁচজনে এবার এগিয়ে চলল দোতলা বাড়িখানা লক্ষ্য করে।

বাড়ির বাইরে মিটমিট করে জ্বলছে একটা বৈদ্যুতিক বাতি। নিচের তলা ঘুটঘুট করছে। মাথার ওপর ঝুলবারান্দা। দোতলায় একটিমাত্র জানলায় আলোর রেখা। সদর দরজা বন্ধ।

বাড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকে দলটা। পকেট থকে টর্চ বের করেছেন পিল্লাই। আলো ফেলে দেখছেন একতলার প্রত্যেকটি জানলা। জানলাগুলো প্রকাণ্ড। খড়খড়ি লাগানো পাল্লাগুলো বন্ধ। তার পেছনে কাচের শার্সি আঁটা। গরাদ নেই। প্রত্যেক জানলার খড়খড়ি তুলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে পরীক্ষা করছিলেন পিল্লাই। হঠাৎ তিনি সামান্য খুটখাট করে একটা জানলার পাল্লা খুলে ফেললেন। দেখা গেল সেই শার্সির একজায়গায় ভাঙা। পিল্লাই বললেন, 'একজন নিচে থাকুন পাহারায়। অন্যরা ভিতরে ঢুকবে। কে থাকবেন? আপনি?' তিনি কুণালকে জিজ্ঞেস করলেন।

'বেশ।' কুণাল সম্মতি জানাল।

হাতে ভর দিয়ে জানলার আলসেয় উঠে ঘরের মধ্যে নেমে পড়ল একে একে চারজন। ভাগ্য ভালো, ঘরের দরজা ভেজানো। ঠেলতে খুলে গেল। মনে হল সেটা রান্নাঘর।

ঘর থেকে বেরিয়ে চওড়া প্যাসেজ। দু-পাশে ঘর। বেশিরভাগ দরজা হাট করে খোলা বা ভেজানো। ক্রমে সিঁড়ির মুখে হাজির হল তারা। দোতলায় কাদের কথা শোনা যাচ্ছে। পা টিপে টিপে চারজন ওপরে উঠল।

দোতলায় মুখোমুখি দুই দুই চারখানা ঘর। একটা ঘর থেকে ভেসে আসছিল মানুষের গলার আওয়াজ। অন্য ঘরগুলোয় জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। সবাই গিয়ে দাঁড়াল ওই ঘরের সামনে। দরজার কবাট বন্ধ। কবাটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভিতরের আলোর ক্ষীণ রেখা। মামাবাবুর দল দরজার গায়ে কান পাতল।

'আর একবার ভালো করে ভেবে দেখ, তপন।' কর্কশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কথা বলল কেউ।

'আমি ভেবে দেখেছি মিস্টার বাসু।' এ-গলা তপনের। চিনতে ভুল করেনি সুনন্দ বা অসিত।

'অর্থাৎ আমার প্রস্তাব তুমি মানবে না?'

সুনন্দর মনে হল এ-গলাও যেন তার চেনা। কোথায় শুনেছে।

'মূর্খ! নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে চাও? আমি এই শেষ বারের মতো জিজ্ঞেস করছি। বল রাজি কি না?'

'না না।' তপন আর্তস্বরে বলে উঠল।

মিস্টার বাসু ধমকে উঠলেন, 'বোকামি কোরো না। বেশ! তোমায় আরও দু-হাজার বেশি দিচ্ছি। মোট সাত হাজার টাকা। আর পুরনো ধার সব ছেড়ে দেব। এবং ভবিষ্যতে তোমার কাছে এ-ধরনের কিছু আর কখনো চাইব না।'

'আমায় মাপ করুন। আমার গুরু ডক্টর তালুকদার বলতেন, মানুষের মঙ্গলের জন্য বিজ্ঞান। এ কাজ করলে তিনি স্বর্গ থেকে আমায় অভিশাপ দেবেন।'

'সাট-আপ! আবার লেকচার। বটে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। তোমার মতো একগুঁয়েকে টিট করার রাস্তা আমি জানি। শোনো, তোমার ছোট ভাই বিমান, আপাতত তাকে গায়েব করে এনে লুকিয়ে রেখেছি এক গুণ্ডার আড্ডায়। যদি আমার কথামতো না চলো, তাকে আর কোনোদিন ফিরে পাবে না।'

'মিস্টার বাসু, প্লিজ!' তপন কাতর অনুনয় জানাল। 'আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন, আমি কৃতজ্ঞ। আমায় দয়া করুন।'

'দয়া?' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন বাসু।

'দয়া-দাক্ষিণ্য বিতরণ আমার ব্যবসা নয়। আমি যা করেছি তার প্রতিদান চাই।'

'বলুন কীভাবে আপনার ঋণ শোধ করব। শুধু জেনেশুনে মানুষের ক্ষতি করতে পারব না। এইটুকু ভিক্ষা চাই। তাছাড়া যা আদেশ করেন। আচ্ছা আপনার তো টাকা চাই? আমায় একটু সময় দিন। এখনো আমাদের দেশে ফসলের কত রোগ দমন করার কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই। আমি ওইসব রোগ প্রতিরোধের ওষুধ আবিষ্কার করব। তার সমস্ত স্বত্ব দিয়ে দেব আপনাকে। তাই থেকে প্রচুর রোজগার করতে পারবেন।'

'নো। অত অপেক্ষা করার সময় আমার নেই। আমি এখুনি টাকা চাই। অনেক—অনেক টাকা। এবং তার উপায় তোমায় বলেছি। কি রাজি?'

'না।'

'অল রাইট। তোমার জেদের ফল কী হবে জানো।'

'কী?'

'তোমার ভাইয়ের সর্বনাশ। ওকে জোর করে মরফিয়া ইনজেকশন দিয়ে নেশা ধরাব। নেশার জিনিসের লোভ দেখিয়ে তখন ওকে দিয়ে যে-কোনো কুকর্ম করানো যাবে। ভেবেছি, ওকে বানাব—ফার্স্ট ক্লাস খুনে গুণ্ডা। অবশ্য মরফিয়ার অভ্যেস ভালোমতো ধরলে মানুষ বেশি দিন আর সুস্থ থাকে না। কয়েক বছরের মধ্যেই ও জড়বুদ্ধি বিকলাঙ্গ হয়ে মরবে।'

'শয়তান!' ধড়াম্ করে শব্দ হল ঘরে।

'উঃ!' কাতরে উঠলেন মিস্টার বাসু। বিকৃত তর্জন শোনা গেল তার কণ্ঠে, 'কী! আমার গায়ে হাত! দাঁড়াও, চাবকে তোমার ছাল তুলে দিচ্ছি।'

সপাং সপাং। বাতাস কেটে চাবুকের হিংস্র ছোবলের শব্দ শোনা গেল দু-দু-বার। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল তপন।

ঘরের বাইরে চারজন রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। সুনন্দ আর স্থির থাকতে পারল না। দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চিৎকার করে উঠল—খবরদার। দরজা খুলুন মিস্টার বাসু। ভয় নেই তপন! আমি সুনন্দ।'

মুহূর্তে ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দপ্ করে নিবে গেল ঘরের আলো।

খুট্ করে শব্দ হল। যেন ছিটকিনি খুলল কেউ। তারপর কবাট খোলার মৃদু আওয়াজ। সুনন্দ যেটা ঠেলছে সেটা কিন্তু খুলল না। মামাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও পালাচ্ছে। বারান্দার দরজা খুলে। নিশ্চয়ই বাইরে সিঁড়ি আছে নামার।'

সুনন্দ অসিত দুড়দাড় করে ছুটল নিচে। তাদের মনে পড়েছে—একটা সরু ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দেখেছিল বাড়ির পিছনে। বাইরে থেকে ওই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠা-নামা করা যায়।

ছয়

অন্ধকার প্যাসেজ। সিঁড়ি হাতড়ে হাতড়ে এগোতে সময় নিল। নিচের সদর দরজা খুলে দুজনে ছুটল সিঁড়ির কাছে। কেউ কোথাও নেই। বিমূঢ় হয়ে এদিকে সেদিকে তাকাচ্ছে, কানে এল ভারী কিছু পড়ার শব্দ। তারপরই ধস্তাধস্তির আওয়াজ। ডান পাশে শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গেল তারা।

পাঁচিলের কাছে দুজন ঝটাপটি করছে। একজন মাটিতে। অন্যজন তার বুকের ওপর।

সুনন্দরা পৌঁছনোর আগেই ওপরের লোকটি হেঁচকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটল পাঁচিলের দিকে। চাঁদের আলোয় চেনা গেল তাকে—মিস্টার বাসু।

'ওকে ধর।' চেঁচিয়ে উঠল বাসুর বাধাদানকারী কুণাল।

মিস্টার বাসু পাঁচিলের গায়ে লাফ দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সুনন্দ ও অসিত।

বাপ্‌রে, বাসুর গায়ে কী প্রচণ্ড শক্তি! প্রথম ঝটকায় দুজনকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু একটু পরে তারা বাসুকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। রুমাল দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধল তার হাত।

একটা টর্চের আলো ছুটে আসছে। পিল্লাই এবং মামাবাবু। বাসুকে টেনে তুলে দাঁড় করানো হল। আলো পড়ল বাসুর মুখে। একি!

মিস্টার বাসুর নিখুঁত সাহেবি মূর্তি এখন বিপর্যস্ত। নেই তার চশমা। বোতাম ছিঁড়ে কোট আলগা। টুপিহীন মাথার চুল এলোমেলো। সেজন্য অবাক হয়নি কেউ। কিন্তু তার পুরু গোঁফের এক অংশ খুলে ঝুলে পড়েছে কেন? এ যে নকল গোঁফ। আর মুখের শ্যামলকান্তির জায়গায় জায়গায় চটা উঠে নিচের চামড়ার ফরসা রং বেরিয়ে পড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে! সবাই স্তম্ভিত নয়নে দেখল, মিস্টার বাসুর ছদ্মবেশ ভেদ করে যেন পরিচিত কারো আদল ফুটে উঠছে।

কুণাল এগিয়ে এল। তার কপাল কেটে রক্ত গড়াচ্ছে। কিন্তু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই।

'মেক-আপখানা খোলো তো চাঁদু'—বলতে বলতে সে হাত বাড়িতে এক টানে ছিঁড়ে নিল বাসু সাহেবের বাকি গোঁফ। যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠল বাসুর মুখ।

'একি! এ যে বঙ্কিম হাজরা!!'

'বঙ্কিমবাবু আপনি! ইউ স্কাউনড্রেল,' মামাবাবু গর্জন করে ওঠেন। তিনি মিস্টার বাসু ওরফে বঙ্কিমবাবুর চুলে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, 'কালো রং মেখেছে। কিন্তু সামনের দাঁত দুটো উঁচু করল কী করে? দেখি। হুঁ, ফল্‌স টুথ। প্লাস্টিকের দাঁত বসিয়েছে আসল দাঁতের ওপর।'

অসিত হাঁ হয়ে থেকে বলল, 'হাঁটা-চলা পালটে ফেলেছিল কেমন! এমনকি গলার স্বর অবধি। বাস্‌রে!'

'আমায় নিয়ে কী করতে চান?' বললেন বঙ্কিম হাজরা। সাংঘাতিক নার্ভ বটে লোকটার। এখনো দমেনি। তবে ভক্ত বঙ্কিমের গদগদ বিনয়ের মুখোশ খসে পড়েছে। মারমুখী তেরিয়া ভাব।

'অ্যারেস্ট।' এতক্ষণে কথা বললেন মিস্টার পিল্লাই। তিনি খানিক দূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফোকাস করে রেখেছিলেন বঙ্কিমবাবুর ওপর।

প্রশ্ন হল, 'কেন?'

পিল্লাই উত্তর দিলেন, 'একনম্বর চার্জ তপনবাবুর ওপর অত্যাচার। দু-নম্বর—তার ভাইকে অপহরণ। তিন নম্বর—দেশের ক্ষতিকারক অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ।'

'ননসেন্স! আপনার তৃতীয় অভিযোগের কোনো প্রমাণ নেই।'

'আছে। তপনবাবু তার সাক্ষী। এবং দ্বিতীয় সাক্ষী আমি। কি, চিনতে পারেন?'

পিল্লাই টর্চের আলো ঘুরিয়ে নিজের মুখে ফেললেন।

ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল বঙ্কিম হাজরা, 'অ্যাঁ, মিস্টার কার্পেন্টার!'

'সরি। আমি ভারত কেমিক্যালস-এর ডিরেক্টর কার্পেন্টার নই। আমি ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল অফিসার নারায়ণ পিল্লাই। ডিউটির খাতিরে মিস্টার কার্পেন্টারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল। আপনাকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, প্রিন্স হোটেলের কুড়ি নম্বর ঘরে কার্পেন্টারের সঙ্গে আপনার সমস্ত গোপন কথাবার্তা, ষড়যন্ত্র, টেপ-রেকর্ডে ধরা আছে। রেকর্ডটা লুকনো ছিল সোফার নিচে।'

বঙ্কিম হাজরার চোখে-মুখে এবার সত্যিকার ভয়ের ছাপ দেখা গেল।

সুনন্দ অসিত ছুটল তপনকে আনতে।

বঙ্কিমবাবুকে দেখে আহত শ্রান্ত তপন হতভম্ব—। 'একি, মিস্টার বাসু! না-না, এ যে বঙ্কিমবাবু!'

মামাবাবু বললেন, 'তুমি চেনো একে?'

'চিনি। তবে আলাপ নেই। স্যার, মানে ডক্টর তালুকদারের কাছে আসতেন মাঝে মাঝে, দেখেছি। কিন্তু উনি?'

'হ্যাঁ, মিস্টার বাসুই ছদ্মবেশী বঙ্কিম হাজরা।' উত্তর দিলেন মামাবাবু।

সবার মনেই উদগ্র কৌতূহল, কী করে তপন এই লোকটির খপ্পরে পড়ল। কিন্তু তখন আর এ-প্রশ্নের জবাব পাবার সুযোগ ছিল না।

বাড়ি সার্চ করা হল। একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস আবিষ্কার হল—একটা ছোট ল্যাবরেটরি।

মামাবাবু কুণালের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'সাবাস কুণাল। খুব সময়ে আটকেছ বাসুকে। একবার নাগালের বাইরে ফসকে গেলে বাসু সাহেব নির্ঘাত চিরকালের মতো অদৃশ্য হত। অর্থাৎ সে খোলস ছেড়ে বঙ্কিম হাজরা বনে যেত। আর এই অপরাধে বঙ্কিম হাজরার যোগ আছে সন্দেহ করলেও তাকে শাস্তি দেবার মতো প্রমাণ আমাদের হাতে ছিল না। আর ওই যে স্বয়ং মিস্টার বাসু এ কার মাথায় আসবে?'

প্রফেসর নবগোপাল ঘোষ অর্থাৎ মামাবাবুর বালিগঞ্জের বাড়ির বৈঠকখানা।

একে একে সেখানে হাজির হল অনেকে—অসিত, কুণাল, সুনন্দর ডানপিটে বন্ধু মিণ্টু, মিত্র কেমিক্যালস-এর সেলসম্যান হরিধন এবং সব শেষে এলেন আই. বি. ইন্সপেক্টর মিস্টার নারায়ণ পিল্লাই, সঙ্গে তপন দত্ত। মামাবাবু ও সুনন্দ তো উপস্থিত রয়েছেনই।

ব্যারাকপুরে বাগানবাড়িতে মিস্টার বাসু ওরফে বঙ্কিম হাজরা ধরা পড়ার দুদিন পরে এক বিকেলে এই জমায়েত। ইতিমধ্যে তপন ছিল পিল্লাইয়ের হেফাজতে। পুলিস তাকে জেরা করেছে, নানা জায়গায় নিয়ে ঘুরেছে। ফলে তার সঙ্গে সুনন্দ অসিত ইত্যাদির সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। এই জটিল রহস্যের বহু প্রশ্নই তাই এখনো তাদের অজানা। শুধু একটি সুসংবাদ জানতে পেরেছে—তপনের বন্দী ছোট ভাই বিমানকে অক্ষত দেহে উদ্ধার করেছে পুলিস।

অতিথিদের জন্য চা এবং কিঞ্চিৎ 'টা' সরবরাহ হল।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে মামাবাবু বললেন, 'প্রথমে শোনা যাক তপনের কথা। কী করে সে মিস্টার বাসু, মানে বঙ্কিম হাজরার পাল্লায় পড়ল! বলো তপন'—

তপন বলতে শুরু করল।

'প্রায় চার বছর আগে ডক্টর তালুকদার যখন হঠাৎ মারা গেলেন বিদেশে, চোখে অন্ধকার দেখলাম। আবার নিঃসহায় হয়ে পড়লাম। ডক্টর তালুকদারের কাছে কাজ পেয়ে বর্তে গিয়েছিলাম। তার আগে বেশ কয়েক বছর আমার বড় করুণ অবস্থায় কেটেছিল। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নেই। নেই সহায় সম্বল। বাবা মারা গেছেন। সংসারের পুরো দায়িত্ব আমার কাঁধে। প্রাণপণে চাকরির চেষ্টায় ঘুরেছি। কখনো জুটেছে কিছু। কখনো বেকার।

ডক্টর তালুকদারের সঙ্গে আলাপ হয় শিল্পমেলায়। অতি মহৎ ব্যক্তি। আমার দুঃখের কাহিনি শুনে সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকরি জুটিয়ে দিলেন। কোনো প্রতিষ্ঠান বা সরকারি অফিসে নয়। তেমন কিছু তাঁর হাতে ছিল না। ওঁর নিজস্ব রিসার্চ অ্যাসিসট্যান্ট করে নিলেন। ওনার বাড়িতে একটা ল্যাবরেটরি ছিল—সেখানে কাজ।

'শুধু যে খেয়ে বাঁচলাম তাই নয়। আরও বড় উপকার হল—আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম। কাজটা ভালোবেসে ডুবে গেলাম ওই রিসার্চে।

'কী নিয়ে রিসার্চ?' জানতে চাইল কুণাল।

'মানুষের প্রয়োজনীয় ফলমূল শস্যের রোগ অর্থাৎ উৎপাদন নষ্টের কারণ যেসব পোকামাকড়, ব্যাকটিরিয়া, ফাঙ্গাস, ভাইরাস তাদের নিয়ে ছিল তাঁর গবেষণা। শুধু আমাদের দেশের চেনাশোনা ফসল-রোগ নিয়ে মাথা ঘামানো নয়, আরও সুদূরপ্রসারী ছিল তাঁর চিন্তা। যেসব ফসল-রোগ আমাদের দেশে সম্পূর্ণ অজানা বা সামান্য দেখা গেছে তাদের নিয়েও স্টাডি করতেন। উদ্দেশ্য ছিল—ভবিষ্যতে ওইসব রোগ যদি এখানে ছড়ায় তখন তাদের রোধ করা।'

'গমের নৈতানো রোগ এদেশে এল কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু।

'দক্ষিণ আমেরিকা। দেখা গেছে, ফসলের শত্রু কোনো কোনো কীট, জীবাণু, ছত্রাক ইত্যাদি এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে পরিবেশ বদলের ফলে ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে। গমের নেতানো রোগের জীবাণু দক্ষিণ আমেরিকায় গমের অল্পস্বল্প ক্ষতি করে কিন্তু ভারতের আবহাওয়ায় কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।'

'এ জীবাণু আনল কে? বললেন মামাবাবু।

'স্যার। মানে ডক্টর তালুকদার। গবেষণার উদ্দেশ নিয়ে আসেন।'

'আচ্ছা, ধানের রাক্ষুসে পোকার ব্যাপারটা কী?' ফের প্রশ্ন করলেন মামাবাবু।

'এও স্যারের এক আশ্চর্য রিসার্চের ফল। আপনারা হয়তো জানেন, ফসল-রোগ ঠেকাতে কয়েকটি রাসায়নিক বস্তু ক্রমাগত ব্যবহার করতে করতে এমন অবস্থায় পৌঁছয় যখন রোগের কারণ পোকামাকড় বা জীবাণু ইত্যাদি দমন করতে ওইসব ওষুধে আর কাজ দেয় না। কারণ তাদের শরীরে ওই ওষুধকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা গড়ে ওঠে। তখন অন্য রাসায়নিক বা আর কোনো উপায় খুঁজতে হয়। ডক্টর তালুকদার এই লাইনেও গবেষণা করতেন। উনি রাক্ষুসে পোকা ল্যাবরেটরিতে এমনভাবে লালন করেছিলেন যে তাদের শরীরে ওই কীটনাশকগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি তৈরি হয়েছিল। তারপর ফের তাদের দমন করার জন্য তিনি ওষুধ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। অনেকখানি এগিয়েছিল রিসার্চ। আমি তা শেষ করি।'

'অতি বিপজ্জনক গবেষণা। এসব স্পেসিমেন কোনোক্রমে বাইরে ছড়িয়ে পড়লে দেশের উৎপাদনে মহামারী ঘটাতে পারে।'

'হ্যাঁ, তাই তিনি এই ধরনের রিসার্চ বা এক্সপেরিমেন্ট করতেন খুব গোপনে। নিজের বাড়ির ল্যাবরেটরিতে। ডক্টর তালুকদারের এই গবেষণায় আমি ছিলাম তাঁর সহকারী। ক্রমে স্বাধীন গবেষণা করার মতো খানিক বিদ্যে-বুদ্ধিও আমার হয়েছিল। স্যার আমায় উৎসাহ দিতেন। কাজ শেখাতেন। এ বিষয়ে বই দিতেন পড়তে।'

তপন চোখ বন্ধ করে অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। বুঝি পরম শ্রদ্ধেয় সেই পরলোকগত বিজ্ঞানীর স্মৃতিচারণ করল। তারপর আবার বলল—

'প্রায় ছ-মাস বেকার হয়ে ছিলাম। নিজের দুঃখের চেয়ে মা-ভাই-বোনের কষ্টটাই যেন পাগল করে তুলেছিল। সেই সময় মিস্টার বাসুর সঙ্গে আলাপ হল। মানিকতলায় একটা বস্তির খুপরি ঘরে থাকতাম। আমার পাশে থাকত এক রাজমিস্ত্রি। বাসু সেই মিস্ত্রির খোঁজে এলেন এক দুপুরে। মিস্ত্রি নেই, কাজে বেরিয়েছে। বাসু আমাকে ডেকে অনুরোধ করলেন মিস্ত্রিকে ক'টা কথা বলে দিতে। ব্যস্, এই সূত্র ধরেই ভাব করে ফেললেন আমার সঙ্গে। এখন বুঝি উনি ওই মতলব নিয়েই এসেছিলেন। মিস্ত্রির খোঁজ করতে আসা স্রেফ ছুতো।

'যাহোক মিস্টার বাসু আমাকে সাহায্য করতে চাইলেন। আমি যদি একটা নার্সারি করি তাহলে জমি ও বাড়ি দেবেন, এবং ব্যবসার প্রয়োজনীয় টাকা—ধার হিসেবে।'

'নার্সারি সম্বন্ধে তুই কিছু জানতিস?' সুনন্দর প্রশ্ন।

'কিছু না। কিন্তু আমি তখন মরিয়া। নার্সারির ব্যাপার, তাই সই। আগের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না বটে, তবে ফুল-ফল গাছের যত্ন ও তত্ত্বাবধান শিখছিলাম স্যারের কাছে। মস্ত বাগান ছিল তাঁর।'

—'আর একটা লোভ দেখিয়েছিলেন বাসু। তাই না?' মুচকি হেসে বললেন পিল্লাই।

—'হ্যাঁ। অতি লোভনীয় প্রস্তাব।—বলেছিলেন ইচ্ছে হলে, নার্সারিতে ল্যাবরেটরি তৈরি করে আমি নিজে রিসার্চ করতে পারি। ডক্টর তালুকদারের অসমাপ্ত গবেষণা চালিয়ে যেতে পারি। ডক্টর তালুকদারের অনেকগুলি গবেষণা অর্ধসমাপ্ত বা প্রায় সমাপ্ত অবস্থায় ছিল। ল্যাবরেটরি বানাবার খরচও ধার দেবেন মিস্টার বাসু। তখন অবশ্য বুঝেছিলাম, ডক্টর তালুকদারের গবেষণার মূল্য বাসু জানেন।'

'কেন ডক্টর তালুকদারের ল্যাবরেটরির কী হল?' জানতে চাইলেন মামাবাবু।

'বন্ধ হয়ে গেছিল। ওঁর একমাত্র ছেলে থাকত দিল্লিতে। বিজ্ঞানের ধার ধারে না। সে ল্যাবরেটরির দামি যন্ত্রপাতি বিক্রি করে বাকি জিনিস বিলিয়ে দিতে চাইল। আমায় বলল—যা ইচ্ছে হয় নিয়ে যাও। এমনকি বাবার গবেষণা সংক্রান্ত নোটস্‌ও দিয়ে দিল আমায়। আসলে সে যত তাড়াতাড়ি পারে বাড়িটা খালি করে ভাড়া দিতে চাইছিল। আমি মহা খুশি। আমার ভবিষ্যৎ গবেষণার সমস্ত উপকরণ নিয়ে এসে রেখেছিলাম সেই বস্তির কুঠুরিতে। তবে দিনে দিনে ভয় হচ্ছিল, হয়তো এগুলি আমার আর কাজে লাগবে না। ল্যাবরেটরিতে গবেষণার সুযোগ আমি আর পাব না। এক-একবার ভাবতাম নষ্ট করার চেয়ে এসব বরং দিই অন্য কোনো গবেষককে। তাই বাসুর প্রস্তাব লুফে নিলাম। তাঁর কাছে ধার নিয়ে ল্যাবরেটরি খাড়া করে ফেললাম নার্সারিতে। ফসলের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতো জমিও পেলাম খানিকটা।'

'বঙ্কিম হাজরা কি প্রথম থেকেই তোমার রিসার্চ সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছিল?' জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু।

'না। প্রথম দু-তিন মাস তিনি এ-বিষয়ে কোনো ইন্টারেস্টই দেখাননি। তারপর খোঁজ নেন।'

'ক্রমে ওর কাছে আমার ধার আরও বাড়ল। আমার ছোট ভাই মরণাপন্ন হল। শিগগিরই হার্ট অপারেশন করতে বললেন ডাক্তার। প্রচুর খরচ। মিস্টার বাসু তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার

টাকা দিলেন। এরপর আমায় আরও পাঁচ হাজার ধার দিলেন একরকম গায়ে পড়ে—আমার বোনের বিয়ের খরচের জন্য। আমি তো মুগ্ধ। বললাম—কী করে যে শোধ দেব জানি না। তিনি বলেছিলেন—কেন, তোমার গবেষণা আছে। তাঁর কথার তাৎপর্য সেদিন ধরতে পারিনি।

'ছ-সাত মাস পরে তিনি নিজ মূর্তি ধরলেন। অর্ডার দিলেন। ধানের রাক্ষুসে পোকা চাই। কালচার করে প্রচুর পরিমাণে স্পেসিমেন দিতে হবে। এবং এই রোগ দমন করার কীটনাশক ওষুধের ফরমুলা—যা আমি আবিষ্কার করেছি। এ-বিষয়ে সমস্ত গবেষণাগত তথ্যসুদ্ধ। উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতাবোধে আমার রিসার্চ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে অনেক কিছু বলে ফেলেছিলাম বাসুকে।

'ওনার দাবি শুনে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন? এ নিয়ে কী করবেন আপনি? উত্তরে বললেন—আমিও এ-বিষয়ে একটু কাজ করতে চাই।

'খুব বিশ্বাস হয়নি তাঁর কথা। কারণ মোটামুটি বিজ্ঞান জানেন বুঝলেও এত দুরূহ গবেষণা করার যোগ্যতা ওঁর কাছে আছে কিনা আমার সন্দেহ ছিল। ভেবেছিলাম, হয়তো আমার রিসার্চ উনি নিজের নামে ছাপিয়ে নাম কিনতে চান। অথবা ভবিষ্যতে ভারতে এই পোকার উপদ্রব বাড়লে ওই কীটনাশকের ফরমুলা গোপনে বিক্রি করে পয়সা কামাবার তালে আছেন।'

'তবু দিলি?' রেগে বলল অসিত।

'কী করব? আমি তখন নিরুপায়। বাসুর কাছে দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে। তাই হুকুম তালিম করতে বাধ্য হলাম। মনে হল, এইভাবে যদি আমার ঋণ শোধ হয় হোক।

'কিছুদিন পরে তিনি গমের নেতানো রোগের জীবাণু চাইলেন। এবং তার প্রতিরোধক ওষুধের ফরমুলা। শুধু যে শস্য রোগের বীজ এবং তাদের ওষুধ তৈরির ফরমুলা নিলেন তাই নয়। কী করে ওইসব রোগ সৃষ্টিকারী পোকা জীবাণু ইত্যাদির ল্যাবরেটরিতে কালচার করে বংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয় সে পদ্ধতিও আমার কাছে শিখে নিলেন বাসু। আবার মাঝে মাঝে এসে যে গবেষণাগুলি নিয়েছিলেন সে-বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করতে লাগলেন আমাকে এবং আমার রিসার্চ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলতে একদম নিষেধ করে দিলেন।

'নানান প্রশ্ন দেখা দিল মনে। তবু ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না ওঁর আসল উদ্দেশ্য কী। বাইরের খবরাখবর তো প্রায় রাখতামই না। মাসান্তে একবার বাড়ি যেতাম। দু-একদিন থাকতাম বড় জোর। এদেশের কৃষি-পত্রিকাগুলো আসত বাসু মারফত। আমার সন্দেহ জাগতে পারে এমন খবর থাকলে নিশ্চয় উনি সেসব সংখ্যা চেপে গিয়েছেন।'

'তুমি প্রথম হাজরা আই মিন বাসুকে সন্দেহ করলে কখন?' মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'যখন সুনন্দ আর অসিত এল নার্সারিতে, ওদের কথা শুনে আমার চোখ ফুটল। বুঝতে পারলাম, কী জঘন্য ষড়যন্ত্র করছেন মিস্টার বাসু, আমারই আবিষ্কারকে হাতিয়ার বানিয়ে। কারণ বাসু আমার কাছ থেকে রাক্ষুসে পোকা নিয়ে যাওয়ার পরই এর উপদ্রব দেখা দেয়। তাছাড়া গমের নেতানো রোগ এদেশে এল কী করে?'

'বুঝতে পারলাম, আমারই কালচার করা ফসলের শত্রু, কীট, জীবাণু বাসু ছড়িয়ে দিচ্ছেন ক্ষেতে। ফসল নষ্ট হতে শুরু করলে তখন বিক্রি করছেন প্রতিরোধের ওষুধ। কিন্তু

রোগ আটকাবার আগেই যে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়। দেশের কত বড় ক্ষতি। ঠিক করলাম, এইসব ভয়ঙ্কর ধ্বংসের বীজ আমি আর কিছুতেই বাসুর হাতে তুলে দেব না।'

—'বাকিটুকু আমি বলি। আপনি রেস্ট নিন তপনবাবু।' বললেন মিস্টার পিল্লাই। 'বাসু আবার চাইতে এলেন ধানের ক্ষতিকারক একজাতের ছত্রাক এবং আলুর পক্ষে মারাত্মক একরকম ভাইরাস। তপনবাবু দিতে অস্বীকার করলেন। তখন ভীষণ চাপ দিতে লাগলেন। প্রথমে দেখালেন লোভ। কাজ না হতে আরম্ভ হল অত্যাচার। তাইতো?'

ক্লান্তভাবে মাথা নাড়ে তপন।

'ইস্, সেদিন আমি থাকলে—লোকটাকে এমন উত্তম-মধ্যম—তোরা কিস্সু কাজের নস!' মিন্টু দীর্ঘশ্বাস ফেলল আফশোসে। 'কী করব? মামাবাবুরা এসে পড়লেন যে। তা নইলে'— সাফাই গাইল সুনন্দ।

'তোমাকে বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল কেন?' কুণাল জিজ্ঞেস করল তপনকে।

'দুজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা হয়েছে জানতে পেরে। নিশ্চয় মালিদের কাছে শুনেছিলেন। তখন আমায় নার্সারি থেকে সরিয়ে আনেন। তবে বন্ধুদের সঠিক পরিচয় আমি বলিনি।

'আমি কিন্তু সত্যি সত্যি ওঁর ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই উপায়ে? নাঃ, অসম্ভব।'

'তোর ঋণ শোধ হয়ে গেছে।' বলে উঠল সুনন্দ।

'কী করে?' তপন অবাক।

'তোর তৈরি ফরমুলা বেচে উনি পাক্কা বিশ হাজার টাকা কামিয়েছেন।'

'তাই নাকি?' তপন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'আচ্ছা পুলিস, মানে মিস্টার পিল্লাই ব্যাপারটা জানলেন কী করে?' প্রশ্ন করল অসিত।

'আমি জানিয়েছি,' বললেন মামাবাবু। 'যখন তিন-তিনটে সাসপেক্ট বেপাত্তা হয়ে গেল তখন আমার পরিচিত এক পুলিস কমিশনারকে বললাম সমস্ত ঘটনা। তিনি মিস্টার পিল্লাইকে কেসটা তদন্ত করার ভার দিলেন। আমরা পরামর্শ করে কলকাতা বোম্বাইয়ের যত নামকরা ওষুধ কোম্পানিকে জানিয়ে রাখি, কেউ গমের নেতানো রোগ দমনের ওষুধের ফরমুলা বিক্রি করতে চাইলে যেন তৎক্ষণাৎ পিল্লাইকে খবর দেওয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই বাসুর প্রস্তাব এল ভারত কেমিক্যালস-এর কাছে। মিস্টার পিল্লাই ওই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সেজে বাসুর সঙ্গে দেখা করলেন। আচ্ছা মিস্টার পিল্লাই বঙ্কিম হাজরার অতীত ইতিহাস কিছু জানতে পারলেন?'

'পেরেছি কিছু কিছু।' বললেন পিল্লাই। 'লোকটা শিক্ষিত। সায়ান্স গ্র্যাজুয়েট। এককালে শখের থিয়েটারে অ্যাকটিং করে বেশ নাম করেছিল। নানারকম ব্যবসা করত। বছর দশ আগে এক নামকরা কোম্পানির ফাউন্টেন পেনের কালি জাল করার ব্যাপারে সন্দেহ করে পুলিস ওকে ধরেছিল। কিন্তু প্রমাণের অভাবে খালাস পেয়ে যায়। বছর পাঁচেক আগে বোম্বেতে স্মাগলিং শুরু করে। ছদ্মবেশে এবং ছদ্মনামে। তারপর একটা খুনের কেসে পুলিস ওর পিছু নিতেই বেমালুম উবে যায়। আর তার পাত্তাই পাওয়া যায়নি। তবে পুলিস রেকর্ডে স্মাগলার শাহাজাদার ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে। বঙ্কিম হাজরার আঙুলের ছাপের সঙ্গে তা মিলে গেছে। সে-মামলাও এবার ওর ঘাড়ে চাপবে।'

'লোকটা অসাধারণ চতুর।' বললেন মামাবাবু। 'আমার ধারণা, ও প্রথম দিকে নিজে হাতেই লুকিয়ে লুকিয়ে ধান আর গমের রোগের বিষ ছড়িয়েছে ক্ষেতে। কিন্তু স্যার ডেভিডের বোর্নিও অ্যাডভেঞ্চার শোনার পরে যাযাবর পাখির মাধ্যমে ব্যাকটিরিয়া ছড়ানোর আইডিয়া ওর মাথায় আসে। কারণ তারপরেই ও আমার কাছ থেকে মাইগ্রেটরি বার্ড সম্বন্ধে কয়েকটা বই নিয়েছিল। আর আমাদের সঙ্গ ধরার হেতু, নিরীহ পক্ষিবিদ্‌দের দলে ঘুরলে কেউ ওর মতলব টের পাবে না।'

'রাইট।' সায় দিলেন মিস্টার পিল্লাই। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এমন এক ধূর্ত ক্রিমিনালকে গ্রেফতার করতে সাহায্য করার জন্য পুলিস ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

সবাই খুশিতে ভরপুর। সবার মুখে হাসি। শুধু তপন কেমন বিমর্ষ।

সুনন্দ অসিত কুণালের চোখে-চোখে কী জানি ইশারা খেলে গেল।

সুনন্দ বলল, 'তপন এবার কী করবি? সুরভি নার্সারি তো গণেশ ওলটাল।

'হুঁ, ভাবছি তাই।' ম্লান হাসে তপন। 'আমার কপালই খারাপ।'

কুণাল উঠে গিয়ে বসল তপনের পাশে। বলল—'ভাই তপন, তুমি তো শুনেছ আমার একটা ছোট ফার্ম আছে। ফসল রোগের কীট বা জীবাণুনাশক ওষুধও তৈরি করি। আমার কারখানার ল্যাবরেটরিতে যদি তোমায় চিফ কেমিস্টের পোস্ট দিই, নেবে? তোমার প্রতিভার যোগ্য মূল্য দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তবু যথাসাধ্য দেব।'

সুনন্দ ফট করে চেঁচিয়ে উঠল—'খবরদার তপন। নিস্‌নে ও চাকরি। কুণালটা মহা ধড়িবাজ। তোকে বেকায়দায় পেয়ে ঠকাচ্ছে। সস্তায় সারছে। আরে তোর টাকার ভাবনা কী? স্বয়ং ভারত কেমিক্যালস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার কার্পেন্টার এখানে হাজির। ওঁর অফারটা শুনেছিস। দু-লাখ তো তোর হাতের মুঠোয়।

হো-হো করে হেসে উঠলেন পিল্লাই। হেসে উঠল অন্যরা। তপন পরম কৃতজ্ঞভাবে—কুণালের ডান হাতখানি জড়িয়ে ধরল নিজের হাতে। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের আবেগে মুখে তার কথা সরল না। তবে আনন্দ উজ্জ্বল চোখে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল কুণালের প্রস্তাবে।

মানুক দেওতার রহস্য সন্ধানে

‘সে কীরে, ব্যাংকক!’ তপনের বন্ধুরা শুনে আঁতকে উঠল।

‘কেন, তাতে কী?’ তপন দৃঢ়স্বরে জানায়, ‘লোকে ইউরোপ-আমেরিকায় যাচ্ছে না? পড়তে যাচ্ছে, চাকরি করতে যাচ্ছে। এ-তো ঢের কাছে। ব্যাংকক চমৎকার শহর। আর সুনীলদা বলেছে চাকরিটাও ভালো। এক পাঞ্জাবি ব্যবসাদার ও-দেশ থেকে মশলা নিয়ে ভারতে চালান দেয়। ওর ব্যাংকক অফিসের জন্য একজন বিশ্বাসী লোক চাই। ভালো মাইনে দেবে। অনেক বাঙালি থাকে ওখানে। সাউথ-ইস্ট-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের কদ্দিনের যোগাযোগ জানিস?’

সব শুনে বন্ধুরা ঘাড় নাড়ল, ‘তা বটে, তা বটে। ঠিক আছে, যা দেখ কেমন লাগে। ছুটি-টুটি দেবে তো?’

‘অত দূরে?’ মা খবরটা শুনে তপনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন। তপনের বাবা নেই। মা একটা স্কুলে পড়ান।

তপন বলল, ‘কিছু দূরে নয়। তুমি ভেবো না। সুনীলদা অ্যাদ্দিন রয়েছেন।’

‘বেশ, যা তবে। সাবধানে থাকবি। তোর বাবা থাকলেও বারণ করতেন না। খুশিই হতেন।’

বি. এ. পাস করে দু-বছর ধরে চাকরি খুঁজছিল তপন। হঠাৎ বন্ধু গুরুপদর পিসতুতো দাদা সুনীল ব্যানার্জির সঙ্গে আলাপ। সুনীলদা মালয়েশিয়ায় থাকেন। সেখানে স্কুলে পড়ান। ছুটিতে কলকাতায় এসেছেন। সুনীলদা কথায় কথায় বললেন, ‘আমার বিশেষ পরিচিত ব্যাংককের ব্যবসায়ী গোবিন্দ সিং একজন লোক খুঁজছে। যাবে ব্যাংকক? তাহলে তোমার জন্য লিখি।’

তপন রাজি হয়ে গেছে।

তপনের ভাই-বোন তিলু মিলু খবরটা শুনেই লাফাতে লাগল। তিলু তক্ষুনি ম্যাপ নিয়ে বসে গেল, ‘থাইল্যান্ডের রাজধানী, তাই না? এই তো ব্যাংকক। কীসে যাবে দাদা? প্লেন, না জাহাজে?’

মিলু বলল, দাদা, ওঙ্কারভাট দেখতে যাবে না?’

তপন বলল, ‘ইচ্ছে আছে। ব্যাংককের কাছেই তো।’

‘উঃ, কী লাক তোমার! গভীর বনের মধ্যে বিরাট ধ্বংসাবশেষ নগর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির। আমি বইয়ে ছবি দেখেছি। প্রায় হাজার বছর আগে হিন্দু-রাজত্ব ছিল ওখানে। আর জানো দাদা, ওদেশের বাটিকের কাজ খুব সুন্দর। ছুটিতে আসার সময়—আমার জন্যে একটা...’

বাইরে বেপরোয়া ভাব দেখালেও প্রথমটা ভিতরে ভিতরে বেশ ঘাবড়াচ্ছিল তপন। কলকাতার বাইরে বড় একটা যায়নি সে। দিনে দিনে মনটা তার অস্থির হয়ে ওঠে। ভ্রমণ

কাহিনি বা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়তে পড়তে মনে মনে বইয়ের চরিত্রদের পাশে নিজেকে কল্পনা করেছে। ওইসব অজানা দেশে বিচিত্র সব ঘটনার মধ্যে নিজেও যেন জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই কল্পনার জগৎ যে খানিকটা বাস্তবে ফলে যেতে পারে তা কোনো দিন আশা করেনি। এই কলকাতা, এই ভবানীপুরের এত দিনের জীবন ছেড়ে কোথায় যেতে হবে?

মনে সে সাহস আনে। কেন, এই তো সুনীলদা গিয়েছেন? বাবা নাকি পাস করেই বর্মায় গিয়েছিলেন চাকরি নিয়ে। চার বছর ছিলেন। ওঁরা শহরের লোক ছিলেন না। আর সে খাস কলকাতায় মানুষ। কত বেশি জানে-শোনে। তার অত ভয় কী?

ভালো মাইনে। বাড়িতে বেশ কিছু টাকা পাঠানো যাবে। সে কী কম আনন্দের কথা? তাতেই সব কষ্ট সয়ে যাবে।

মাসখানেকের ভিতর গোবিন্দ সিং-এর চিঠি এল। চাকরি মঞ্জুর। তপনের পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি হয়ে গেল। সিং ব্রাদার্সের কলকাতায় বড়বাজারের অফিস থেকে তপনকে দেওয়া হল ব্যাংকক যাবার একখানি প্লেনের টিকিট। যাওয়ার দিনও এসে পড়ল।

মায়ের চোখ ছলছল। বন্ধুরা ঘটা করে একটা বিদায় সংবর্ধনা দিয়ে ফেলল তপনকে। তারপর সত্যি একদিন তপন রওনা দিল দমদম থেকে ব্যাংককের পথে।

ব্যাংকক। থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশের রাজধানী।

তপন এক মাস হল ব্যাংককে এসে কাজে যোগ দিয়েছে।

সিং ব্রাদার্সের মালিক গোবিন্দ সিং-এর বয়স প্রায় ষাট। শক্ত সমর্থ সর্দারজি। বহু দেশে ঘুরেছেন, অনেকগুলো ভাষা জানেন, দিলদরিয়া লোক। তপনের সঙ্গে কথা বলেন ইংরেজি বা হিন্দিতে। মেনাম নদীর কাছে রাজাবংশী রোডে সিং ব্রাদার্সের মস্ত গুদাম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অগুনতি ছোট-বড় দ্বীপ। অনেক দ্বীপেই নানারকম মশলার গাছ জন্মায়। তাই ইউরোপীয়ানরা এইসব দ্বীপকে বলত স্পাইস-আইল্যান্ডস। সিং ব্রাদার্স এই অঞ্চলের নানা জায়গা থেকে লবঙ্গ, গোলমরিচ, জায়ফল, এলাচ ইত্যাদি আমদানি করে। বড় বড় নৌকো আর লঞ্চে করে নদীপথে ব্যাংককে আনে। সেগুলো জমা হয় গুদামে, তারপর চালান যায় ভারতবর্ষে। আবার ভারত থেকে সিং ব্রাদার্স আনে রেশম ও চা। মালের হিসেব রাখা, নদীর ঘাট থেকে জিনিস ছাড়িয়ে আনা। সব কাজই করতে হয় তপনকে। এসব ব্যাপারে তার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে মন দিয়ে শেখে, মশলার রকমফের চেনে।

গোবিন্দ সিং থাকেন নিউ রোডে। গুদাম থেকে বেশি দূরে নয়। তপনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে মহারাজ রোডে, গোবিন্দ সিং-এর বাড়ির কাছেই। খায় একটা পাঞ্জাবি হোটেলে—ভাত রুটি সবজি ডাল তরকারি। দইও মেলে।

তপন সপ্তাহে একখানা চিঠি দেয় বাড়িতে। মাকে লেখে—'কিছু ভেবো না। দিব্যি আছি।' তিলু মিলুকে লেখে ওই দেশের খবর—

'ব্যাংকক বিরাট শহর, মেনাম নদীর দু-ধারে ছড়ানো। পুব পাশেই শহর বেশি জমজমাট। নদী থেকে অনেকগুলো খাল বেরিয়ে ঢুকে গেছে শহরের ভিতর। খালগুলোর ওপর দিয়ে অজস্র সাঁকো। থাইরা খালকে বলে কেলাং। বইয়ে পড়েছিস তো, ইটালির

ভেনিস শহরে যেমন খাল আছে তেমনি। এই খালগুলোকে রাস্তাও বলা চলে, কারণ তাই দিয়ে চলে অসংখ্য ছোট ছোট নৌকো, লোকজন জিনিসপত্র নিয়ে। নৌকোর ওপর রীতিমতো বাজার বসে। নাম দিয়েছে—ফ্লোটিং মার্কেট। মাসখানেকে এত বড় শহরের কতটুকুই বা দেখেছি।

'কলকাতার মতোই এর কোনো অংশে আধুনিক বাড়িঘর হোটেল, চওড়া ঝকঝকে রাস্তা, আবার কোনো কোনো অংশে গলিঘুঁজি বস্তি, পুরনো নোংরা ঘুপচি বাড়ি, দোকানপাট। মেনাম নদীতে নৌকো, বজরা, স্টিমার গিজগিজ করে। শ্যাম উপসাগরে পড়েছে মেনাম। বড় জাহাজ মোহনার বেশি ঢুকতে পারে না।

'এদেশে বেশিরভাগ লোকই বৌদ্ধ। সাত-আটশো বছর আগে এখানে ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল। তাই শহরে ছড়িয়ে আছে এই দুই ধর্মের নিদর্শন। পথের ধারে কত যে বৌদ্ধ মন্দির বা ওয়াট। ঢালু ছাদ, ছুঁচালো মাথা, প্যাগোডা চেহারার মন্দিরগুলি। মন্দিরের গায়ে কেবল বুদ্ধমূর্তি—নানান আকার, নানান ছাঁদ দেখে দেখে একঘেয়ে লাগছে।

'পথের নাম দেখে ভারি মজা লাগে। মহারাজ রোড, রাম এক, রাম দুই, এমনি সব নাম। আগে এখানকার রাজাদের নাম ছিল নাকি রাম দিয়ে। প্রাচীন রাজধানীর নাম অযোধ্যা। ঘুরতে ফিরতে বিদেশ বলে মনে হয় না।

'কত দেশের লোকের বাস। বিদেশিদের মধ্যে চিনারাই সবচেয়ে বেশি। বেশিরভাগ লোক বাইরে প্যান্ট-শার্ট পরে। তাছাড়া পাজামা লুঙ্গি কুর্তা এমনকি ধুতি-পরা লোকও দেখেছি। পথেঘাটে ঘোরে প্রচুর হলুদ আলখাল্লা-পরা পুরুষ। এরা নাকি শ্রমণ অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। শুনেছি প্রত্যেক বৌদ্ধ থাই অন্তত কিছু দিনের জন্য সন্ন্যাস নেয়, শ্রমণ হয়। থাইরা বেশ আমুদে। চিনা প্যাটার্নের চেহারা। জানিস, এ-দেশের টাকার নাম ভাট। প্রায় চল্লিশ পয়সার সমান এক ভাট।'

শান্ত ভদ্র তপনকে গোবিন্দ সিং-এর পছন্দ হয়েছে। গোবিন্দ সিং-এর সঙ্গে থাকেন তাঁর স্ত্রী এবং ছোট ছেলে। ছেলের বয়স বছর পঁচিশ। বাবার ব্যবসা দেখে। বড় ছেলে গেছে কানাডা, কাগজ তৈরি শিখতে। ফিরে এসে এখানে কাগজের কল বানাবে।

সময় পেলে গোবিন্দ সিং গল্প করেন। তিনি তপনকে কখনো ডাকেন তপনবাবু, কখনো শুধু বাবু। বলেন, 'কত দেশ দেখলাম, কত কী শিখলাম, বড় ছেলে ফিরে এলে আমার ছুটি। আর দু-তিন বছর। তারপর দেশে চলে যাব, লুধিয়ানা। খেত-খামার করব। তখন ইচ্ছে হলে তুমি চলে যেও আমার কলকাতার অফিসে। ওখানে ভালো লোক দরকার।'

তিলু মিলুকে লিখল তপন—

'কয়েকটা নামকরা বৌদ্ধমন্দির দেখে ফেলেছি। যেমন ওয়াট পো, ওয়াট অরুণ, ওয়াট ফ্রা-কিও। ফ্রা-কিওতে আছে বিখ্যাত এমারেল্ড বুদ্ধ। মন্দিরগুলোয় বিষ্ণু, গরুড়, কিন্নর, ড্রাগন ইত্যাদির মূর্তি। বড় বড় মন্দির সোনা আর মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি। আর দেখেছি রাজপ্রাসাদ ও মিউজিয়াম। একটা ছুটির দিনে প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যা দেখতে যাব। ঘোরার সময় তেমন পাই না। এত রাস্তা, ভয় হয় পথ না হারাই। পকেটে ব্যাংককের একটা ম্যাপ রাখি। হ্যাঁ, মিলু ঠিক বলেছিলি, এখানে কাপড়ের ওপর বাটিকের কাজ চমৎকার। থাইরা ঘরে ঘরে বাটিক করে। নিয়ে যাব তোর জন্যে।'

এই অযোধ্যা দেখতে গিয়েই এক রবিবার তপনের সঙ্গে আলাপ হল ডক্টর ইন্দ্র দত্তর। ফলে তার জীবনে আর একটা চমকপ্রদ মোড় ফিরল।

ব্যাংককের উত্তরে অযোধ্যা। সকালে ট্রেনে চড়ে রওনা দিল তপন। ঘণ্টা দুই লাগল পৌঁছতে। মেনাম নদীর ভিতর কয়েকটি দ্বীপ এবং নদীর দুই তীরে ছড়িয়ে আছে এই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। প্রায় দুশো বছর আগে বর্মীদের আক্রমণে এই নগর ধ্বংস হয়।

তপন ঘুরে ঘুরে দেখছিল। আরও অনেক ট্যুরিস্ট এসেছিল। একটি লোককে তার বিশেষ ভাবে নজরে পড়ল।

ভদ্রলোক অন্তত ছ-ফুট লম্বা। শক্ত গড়ন, ফর্সা রং, সুশ্রী ধারাল মুখ। জুলপি ও রগের চুলে সামান্য পাক ধরেছে। পরনে ট্রাউজার্স ও ফুলশার্ট, মাথায় সাদা পানামা টুপি।

ভদ্রলোক মোটেই পুরনো মন্দির বা প্রাসাদ দেখছিলেন না। দূরবিন চোখে লাগিয়ে গাছে গাছে পাখি দেখে বেড়াচ্ছিলেন। চারপাশের লোকজন সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ নেই।

তপনের কৌতূহল হয়। সে ভদ্রলোকের পিছু পিছু ঘুরতে থাকে। এইরকম দূরবিন দিয়ে পাখি দেখার ব্যাপারটায় তার আগ্রহ ছিল। তার এক মামার ছিল এই শখ। উনি আসামে থাকেন। একবার কলকাতায় এসে তপনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ঢাকুরিয়ায় পাখি দেখতে। ইনিও বোধহয় পক্ষিবিদ্।

জায়গাটা নিরালা। ভদ্রলোক চোখ থেকে দূরবিন নামিয়ে ফিরলেন। তপন হাত কুড়ি পিছনে। তপনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত দেখে তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'বাঙালি?'

তপন চমকে থতমত খেয়ে ঘাড় নাড়ল।

'বেড়াতে এসেছেন?'

'না। মানে আমি ব্যাংককে থাকি,' জবাব দিল তপন।

'ও! কী করেন?'

'চাকরি।'

'হুঁ। ঠিক চিনেছি বাঙালি।' ভদ্রলোক হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

'কী করে বুঝলেন?'

'খানিকটা চেহারায়, আর খানিকটা কথা শুনে। তখন নিজের মনে বিড়বিড় করছিলেন যে বাংলায়।'

'আপনিও কি বাঙালি?' তপন জিজ্ঞেস করল।

'না, তা ঠিক নয়। আমি থাই,' বলেই ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে উঠলেন।

'মানে!' তপন ভ্যাবাচ্যাকা খায়।

'মানে জন্মসূত্রে বাঙালি বটে কিন্তু এই দেশের নাগরিক, এই দেশেই মানুষ হয়েছি। আমার নাম ইন্দ্র দত্ত।'

'আমি তপন রায়। কলকাতায় থাকতাম।'

'পাখির শখ আছে নাকি?'

'নাঃ, তেমন কিছু নয়। আপনাকে দেখেই বেশি কৌতূহল হচ্ছিল।'

'কফি চলবে?'

ভদ্রলোক কাঁধে ঝোলানো কফির ফ্লাস্ক নামিয়ে ঘাসে বসলেন। তপন বসল পাশে। একটু একটু করে আলাপ জমে উঠল।

ডক্টর ইন্দ্র দত্ত ব্যাংকক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিতত্ত্বের অধ্যাপক। এই দেশেই জন্মেছেন। এদেশেই পড়াশোনা। অবশ্য ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সেও পড়েছেন কিছুকাল। বাবা বিষ্ণু দত্ত ছিলেন ডাক্তার। কলকাতায় থাকতেন। ভারতের স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে ইংরেজ সরকারের বিষনজরে পড়েন। জেল খাটা এড়াতে তিনি ভারত ছেড়ে পালান। বর্মা ঘুরে আসেন শ্যামদেশে। ব্যাংককে বাস করতে থাকেন। ডক্টর ইন্দ্র দত্তর মা ছিলেন বর্মা-প্রবাসী বাঙালি। ভদ্রলোকের বাংলা উচ্চারণ একটু বাঁকা বাঁকা। এদেশে মানুষ হয়েও বাংলা চর্চা করেছেন এই আশ্চর্য।

ইন্দ্র দত্ত দিলখোলা মানুষ। তপনের সব খবর নিলেন। চট করে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলেন—'তোমাকে আবার আপনি বলব কী হে।'

কথায় কথায় ডক্টর দত্ত বললেন, 'আমার বাবা বিদেশে থেকে গেলেও মনেপ্রাণে ছিলেন ভারতীয়। পুরো বাঙালি। বাংলা বই আনতেন, বাংলায় কথা বলতেন ঘরে। বাবার মনে বড় দুঃখ ছিল ভারতবর্ষ পরাধীন। তাই যেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এদেশে এলেন, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন নিয়ে বাবা একেবারে মেতে উঠলেন। কোন্ সাল হবে সেটা? বোধহয় ১৯৪৩। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে। আমিও যোগ দিয়েছিলাম নেতাজির বাল-সেনায়। তখন আমার সাত-আট বছর বয়স।

'ভারত স্বাধীন হবার পর বাবা দুবার ওদেশে যান। আমি গেছি সঙ্গে। কলকাতায় আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন থাকে। তবে যোগাযোগ তেমন নেই। বড় হয়ে আমি তিনবার ইন্ডিয়ায় গেছি। সুন্দরবন আর জলদাপাড়া রিজার্ভ-ফরেস্ট দেখে এসেছি। বাংলাটা প্রায় ভুলেই গেছিলাম। আমার স্ত্রীর কল্যাণে ফের চর্চা। ও কলকাতার মেয়ে। কেমব্রিজে পড়তে গেছিল। সেখানেই আমাদের আলাপ, তারপর বিয়ে। চলো আজই তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। মণিকা ভীষণ খুশি হবে দেশের ছেলে দেখলে।'

দুপুরে ইন্দ্র দত্তর সঙ্গে ব্যাংককে ফিরল তপন।

ডক্টর ইন্দ্র দত্তর সঙ্গে আলাপ হয়ে তপন বিদেশে একা থাকার দুঃখ অনেকখানি ভুলে গেল। ব্যাংককে আরও কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল বটে, তবে এমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

ডক্টর দত্তর স্ত্রীও খুব ভালো। ভারি গোপ্পে। ওঁরা থাকেন সাদার্ন রোডে। নিজেদের বাড়ি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এলাকা। একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, সামনে টুকরো জমিতে ফুলের বাগান। তপন সপ্তাহে দু-তিনবার সাইকেলে চেপে হাজির হতে লাগল ডক্টর দত্তর বাড়ি। ওকে বাড়ির ছেলের মতনই আপন করে নিয়েছিলেন তাঁরা। ডক্টর দত্তর ছেলেপুলে নেই। একটি থাই ছেলেকে দত্তক নিয়েছেন। তার বয়স বছর পাঁচ-ছয়। ফুটফুটে দেখতে। নাম রেখেছেন রবি।

ডক্টর দত্ত সন্ধের সময় সাধারণত বাড়িতেই থাকতেন। তপনের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করতেন—তার নানা দেশের অভিজ্ঞতা, নানান জীবজন্তুর কথা। কত জায়গায় ঘুরেছেন যে ঠিক নেই। জীবজন্তু সম্বন্ধে তপনের আগ্রহ ছিল। ডক্টর দত্তর সঙ্গে আলাপ হয়ে তার নতুন করে চোখ ফোটে। ডক্টর দত্তর কাছ থেকে সে জীবজন্তু ও ভ্রমণ কাহিনির বই নিত পড়তে।

ইন্দ্র দত্তকে প্রথমে তপন ডক্টর দত্ত বলে ডাকত। ওঁর স্ত্রী আপত্তি জানালেন, 'তা হবে না। আমায় যখন বউদি বলেছ, ওঁকেও দাদা বলতে হবে।'

অতএব ডক্টর দত্তকে তপন দত্তদা বলে ডাকতে শুরু করল।

চার মাস কেটেছে। গোবিন্দ সিং একদিন বললেন, 'তপনবাবু, আমার এক বন্ধুলোক ব্যাংককে বেড়াতে আসছে। ওর জন্য একটা কিউরিও কিনে এনে দিও। এই আট-দশ ডলারের মধ্যে। তোমার পছন্দ ভালো।'

রাজাবংশী রোডের গায়ে একটা রাস্তায় অনেকগুলো কিউরিও-শপ দেখেছিল তপন। বিকেলে সেখানে গেল।

সরু গলিতে ছোট্ট দোকান। কাচের দরজা। ভিতরে কতরকম জিনিস সাজানো। নীলাভ আলোয় রহস্যময় লাগছে। দোকানদার কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এটা কিউরিও-শপ। অর্থাৎ দুর্লভ জিনিসের দোকান। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল তপন।

কাউন্টারে একটি মুখ আবির্ভূত হল। শুকনো হর্তুকির মতো মুখখানা। অজস্র ভাঁজ। তপনের দিকে চেয়ে হাসল সে। চোখ সরু হয়ে গেল। খুদে খুদে দাঁতের মাঝে একটি সোনা-বাঁধানো দাঁত ঝিলিক দিল।

বৃদ্ধাটিকে মনে হল চিনা রমণী। চুল টান করে ঘাড়ের কাছে গিঁট দেওয়া। গায়ে নীল রঙের ঢোলা জামা ও পাজামা। একগাল হেসে সে দোকানের শো-কেসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—'সী।'

তপন এ ধরনের দোকানে কখনো ঢোকেনি আগে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত যে জিনিস, কতরকম মূর্তি, ছুরি, পাত্র, ছবি।

হঠাৎ একটা শো-কেসের ওপর তার চোখ আটকে গেল। সেখানে কয়েকটা পাখি সাজানো রয়েছে। জ্যান্ত নয়, স্টাফ করা। যেমন মিউজিয়ামে থাকে। তপন শুনেছে, গোটা পাখির পালকসুদ্ধু চামড়ার মধ্যে কাঠের গুঁড়ো পুরে সেলাই করে দেওয়া হয়। দেখতে মনে হয় স্বাভাবিক পাখি। স্থির অবস্থায় বসা বা দাঁড়ানো।

শো-কেসের ওপর রয়েছে একটা বাজপাখি, একটা মস্ত কালো কাকাতুয়া, আর একটা অদ্ভুত দেখতে পাখি। কোনো পাখির পালকের এমন বাহার তপন কখনো দেখেনি, কল্পনাও করেনি। একখণ্ড কাঠের ওপর স্ট্যান্ড দিয়ে আটকে দাঁড় করানো রয়েছে পাখিটা। উঃ কী রং! গাঢ় লাল, কমলা, নীল, সবুজ, সাদা, কালো—রেশমের মতো নরম চকচকে পালকে আলো ঠিকরোচ্ছে। লাল আর নীল রঙের পালকই বেশি।

পাখিটা ছোট। সাত-আট ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। খাটো ল্যাজ। সবচাইতে সুন্দর হচ্ছে তার ল্যাজ থেকে বেরনো দুটি লম্বা পালক। ঠিক যেন দুটি সরু লোহার তার লম্বা হয়ে ডগায় গিয়ে পাকিয়ে গেছে। আর তারের ডগায় সবুজ পালকের গুচ্ছ। ছোট মাথাটি উঁচু করা, ডানা ছড়ানো, যেন এখুনি উড়বে। চোখের মণির জায়গায় দুটি টুকটুকে লাল পুঁতি বসানো। বাঃ! ওই পাখি যখন উড়ে বেড়াত! তপন কল্পনা করে। ঠিক একটুকরো রামধনু যদি উড়ে বেড়ায় তেমনি দেখতে লাগত নিশ্চয়ই।

সেয়ানা দোকানি তপনের দৃষ্টি অনুসরণ করে অমনি পাখিটাকে নামিয়ে এনে সামনে রেখে বলল, 'বুরং রাজা।'

তপন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তখন দোকানি বৃদ্ধা আধো আধো ইংরেজিতে বলল, 'প্যারাদাইজ বার্ড.।'

ও, এই হচ্ছে বার্ড অফ প্যারাডাইস! এ পাখির কথা পড়েছিল তপন। শুধু নিউগিনি অস্ট্রেলিয়ায় নাকি এই পাখি মেলে। পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর পাখি। এ পাখিটায় কিন্তু বেশ খুঁত আছে। দূর থেকে বোঝা যায় না এমনভাবে রেখেছিল। পাখির একটা ডানার পালক প্রায় উঠে গেছে, আর একটি পায়ের আধখানা কাটা।

হঠাৎ তপনের মাথায় এল এটা দত্তদাকে প্রেজেন্ট করলে কেমন হয়? ওর বাড়িতে এমনি স্টাফ করা একটা কাঠঠোকরা পাখি আছে। এটা পেলে উনি খুশি হবেন নিশ্চয়। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে দরদস্তুর শুরু হল।

'কত দাম?'

বুড়ি মাথা নেড়ে, দাঁতের ঝিলিক দেখিয়ে দু-হাতের দশ দশ আঙুল ছড়িয়ে জানাল— 'টুয়েন্টি ডলার।'

'বাপরে থাক, অত পয়সা নেই। তাছাড়া অনেক খুঁত রয়েছে।'

অমনি দাম নেমে এল—'ফিফটিন।'

'নাঃ।'

'কত দেবে?'

'টেন।'

'থার্টিন।'

'নো নো টেন।' তপন মাথা নাড়ল।

বুড়ি মিটিমিটি করে দেখল খানিক। বুঝল তপন আর উঠবে না কিছুতেই। সে একটু হতাশভাবে বলল, 'অলরাইট, তেক্।'

তপন হিসেব করে দাম দিল ভাট-এ।

দোকানি বুড়ি স্ট্যান্ড থেকে পাখিটা খুলে তার পাখা মুড়ে ছোট্ট করে ফেলল। তারপর প্লাস্টিকের থলিতে পুরে বেঁধে দিল। স্ট্যান্ডটা আলাদা দিল। আবার ইচ্ছেমতো এটাকে সাজিয়ে রাখা যাবে।

গোবিন্দ সিং-এর বন্ধুর জন্য তপন নিল একটা কাগজ-কাটার ছুরি—পিতলের হাতলে রঙচঙে পাথর বসানো।

দুই

সেই দিনই সন্ধ্যায় সে পাখিটাকে নিয়ে হাজির হল দত্তদার বাড়ি।

'দত্তদা, আপনি বসে বসে বই পড়ুন, একটু পরে আপনাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি।'

তপনের কথা শুনে দত্তদা একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কী জিনিস?'

'দেখবেন—দেখবেন।'

তপন দত্তদার দিকে পিছন ফিরে টেবিলের ওপর পাখিটা ফিট করতে থাকে।

'দেখুন দত্তদা,' ডাকল তপন।

'বাঃ,', দত্তদা উৎফুল্ল, 'কোথায় পেলে? এ যে বার্ড অফ প্যারাডাইস!'

'কিনলাম।'

'কোত্থেকে?'

'রাজাবংশী রোডের গায়ে গলিতে, এক বুড়ির দোকান থেকে।'

'ও বুঝেছি। পা ইংএর দোকান।'

'এটা আপনাকে প্রেজেন্ট করব।'

'বল কী হে! থ্যাঙ্ক ইউ ভাই। কিন্তু কত নিল?'

'দশ ডলার।'

'যাক, তবু ভালো। খুব সস্তায় পেয়েছ। এখন তো নিউগিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে এ পাখির চালান নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে লুকিয়ে চুরিয়ে যে হয় দেখতেই পাচ্ছি।'

'নিষিদ্ধ কেন?'

'সাফ হয়ে যাচ্ছিল। হাজার হাজার জীবন্ত বা মৃত পাখি চালান হয়ে যাচ্ছিল বাইরে। অপূর্ব পালকের সৌন্দর্যই এদের কাল হয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশের লোক এদের রঙচঙে

পালক মুকুটে পরে, পাগড়িতে পরে, মেয়েদের পোশাকের শোভা বাড়ায়। ভীষণ চাহিদা। এখন শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে বা চিড়িয়াখানার জন্য বিশেষ অনুমতি নিয়ে এই পাখি ধরা বা মারা চলে। ওখানকার আদিবাসীরা অবশ্য এখনো প্যারাডাইস বার্ড বিনা অনুমতিতেই শিকার করতে পারে। তাদের পালক লাগিয়ে সাজগোজ করে। কিন্তু বাইরের লোককে পাখি বা পালক বিক্রি করা নিষেধ।'

তপন বলল, 'জানেন দত্তদা, দোকানি বুড়ি এটার নাম বলছিল বুরং রাজা।'

দত্তদা বললেন, 'বুরং রাজা? কথাটা মালয়ী। মানে রাজা পাখি। কিং বার্ড। বুরং মানে পাখি। আরও আগে মালয়ীরা প্যারাডাইস বার্ডের কী নাম দিয়েছিল জানো?—মানুক দেওতা। মানে দেবতার পাখি। নিউগিনির ধারে কাছে কিছু জায়গায় পাখিকে বলে মানুক।'

'সত্যি, যা সুন্দর দেখতে,' বলল তপন।

'ঠিক রূপের জন্য নয়। নামটার আর একটা কারণ ছিল। বহুকাল ধরে নিউগিনি অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা ছাড়া এই পাখি কেউ জীবন্ত দেখেনি। নিউগিনির আদিবাসী জংলি পাপুয়ানদের কাছ থেকে মালয় বণিকরা কিনত শুধু মৃত পাখি—পালকসুদ্ধ দেহ। কিন্তু তাদের পা থাকত না। কেন জানি না পা কেটে ফেলা হত। মালয়ীদের তাই ধারণা হয়েছিল, এই জাতের পাখির পা নেই। তারা মাটিতে বা ডালে বসে না। সর্বদাই উড়ে উড়ে বেড়ায়। খায় বৃষ্টির জল আর শিশির। এমন পাখি যার পা নেই, পালক এমন অপূর্ব সুন্দর, নিশ্চয়ই দেবলোক স্বর্গের পাখি। দেবপক্ষী বা দেবতার পাখি।'

'মালয়ীদের থেকে এই ধারণাটা হয় ইউরোপিয়ানদের। তাই পর্তুগীজরা এর নাম দেয় প্যারারস্-ডা-সোল। অর্থাৎ সূর্যের পাখি। ডাচরা বলে, অ্যাভিস প্যারাডাইসিয়াস। মানে স্বর্গের পাখি। পরে অবশ্য জানা যায় এরা মর্তেরই পাখি এবং এদের দুটি পা-ও আছে। তবে নামের সঙ্গে স্বর্গ কথাটা জুড়ে গেল। বোধহয় ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে, প্রথম একজন ইউরোপিয়ান প্যারাডাইস-বার্ড জীবন্ত দেখে। এদের সম্পর্কে প্রথম বিস্তারিতভাবে লেখেন চার্লস ডারউইনের বন্ধু প্রাণিবিদ্ আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে।'

'ওটা কাছে নিয়ে এসো তো। দেখি স্পিশিসটা কী? বুরং রাজা সাধারণত বলা হয় কিং বার্ড অফ প্যারাডাইসকে।'

পাখিটা আনতে আনতে তপন বলল, 'এর আরও স্পিশিস আছে নাকি?'

'আছে বইকি! প্যারাডাইসেয়িডেয়ি পরিবারে প্রায় চল্লিশ রকম স্পিশিস অর্থাৎ প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের পালকের রং ও আকার নানারকম।'

পাখিটা হাতে নিয়ে ডক্টর দত্ত বললেন, 'ও এই জন্যে, এই খুঁতগুলোর জন্যে এত সস্তায় ছেড়েছে।'

পাখিটা দেখতে দেখতে দত্তদা বললেন, 'জানো তো এরা কাকের জ্ঞাতি। একই গোত্রের পাখি।'

'বলেন কী!'

'হুঁ, প্রকৃতির কী অদ্ভুত খেয়াল। আর এই পালকের বাহার শুধু পুরুষ পাখিদের। মেয়ে প্যারাডাইস বার্ড দেখতে নেহাৎ সাদামাটা। নাঃ, এটা তো ঠিক কিং বার্ড অফ প্যারাডাইস নয়। একটু অন্যরকম। আচ্ছা, টেবিল থেকে ওই লাল মলাটের মোটা বইটা দাও দেখি।'

তপন বইটার নাম দেখল—বার্ডস অফ নিউগিনি অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া! বইয়ের পাতায় পাতায় রঙিন ছবি। একজায়গায় পরপর দশটি পাতায় শুধু নানারকম বার্ড অফ প্যারাডাইসের ছবি। দত্তদার নজর একবার ছবির দিকে, আর একবার পাখিটার দিকে যায়। তপন চুপ করে দেখে। প্রত্যেক ছবির তলায় নাম লেখা। যেমন—রেড বার্ড অফ প্যারাডাইস, গ্রেট বার্ড অফ প্যারাডাইস, কিং বার্ড অফ প্যারাডাইস, প্রিন্স রুডলফ বার্ড অফ প্যারাডাইস—এমনি সব নাম।

দশটি পাতাই ওল্টানো হল। ডক্টর দত্তর ভুরু কুঁচকে গেছে। বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! একটার সঙ্গেও মিলল না। আমার ধারণা এই বইয়ে এ পর্যন্ত পাওয়া সব প্যারাডাইস বার্ড-এর ছবি আছে। এ কি তবে নতুন স্পিশিস? আচ্ছা আর একটু খুঁজব আমি। ওঃ তপন, তুমি একটা দারুণ জিনিস দিয়েছ।'

পরদিন বিকেলে তপন দোকান থেকে বেরিয়ে সোজা হাজির হল দত্তদার বাড়ি। দত্তদা তপনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন ড্রইং-রুমে। তপনকে দেখেই বললেন, 'এটা নতুন স্পিশিস, আই অ্যাম অ্যাবসোলিউটলি সিওর। কোথাও এর রেফারেন্স নেই। তোমাকে পা ইং-এর দোকানে যেতে হবে, আজই। জানতে হবে এই পাখি সে কীভাবে পেয়েছে, কে দিয়েছে, কোথায় পাওয়া গেছে? আমি যাব না আজ। পাইং আমায় চেনে। হয়তো ঘাবড়ে যাবে আমায় দেখলে। কারণ এসব জিনিস চোরাপথে আসে। তুমি বিদেশি, তোমার কাছে হয়তো মুখ খুলতে পারে সহজে। তবে তোমায় না বললে তখন জোর করতেই হবে। সে-ব্যবস্থা আমি করব। তুমি সোজাসুজি জিজ্ঞেস কোরো না। কথার ছলে জেনে নেবে। উইশ ইউ গুড লাক।'

পা ইং-এর কিউরিও শপ ফাঁকাই ছিল। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল তপন। পা ইং উঠে দাঁড়াল। তার সোনা বাঁধানো দাঁতটি ঝিলিক দিল। দু-দিন আগের খদ্দের ফের ফিরে এসেছে দেখে সে ভারি খুশি। হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওয়েল কাম।'

কাছে গিয়ে তপনের চোখ পড়ল দোকানের ভিতরে পা ইং-এর কাছে আর একটি লোক চেয়ারে বসে। এতক্ষণ সে দেখতে পায়নি। লোকটি এদেশীয়। চিনা বা মালয়ী। বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা। পরনে ছাই রঙের স্যুট, হাতে জ্বলন্ত চুরুট। বয়স বোঝা গেল না, তবে নেহাৎ ছোকরা নয়।

কীভাবে আসল কথাটা পাড়বে তপন মনে মনে ভেবে গিয়েছিল। কিন্তু অচেনা লোকের সামনে ও-প্রসঙ্গ তুলতে চাইল না। এটা-সেটা দেখে সময় কাটাতে লাগল। লোকটা কি উঠবে না? কে লোকটা?

পা ইং একটার পর একটা জিনিস নামিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছে। আর তপন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সব কটাই তার বেজায় পছন্দ। তপনের বেশি জিনিস কেনার সামর্থ্য নেই তা বুড়ি বোঝে। তবু তার আগ্রহ দেখে একটু স্নেহ ভরেই বোঝাতে লাগল। জিনিসগুলোর বিশেষত্ব, তার সেই অদ্ভুত ইংরেজি আর থাই মেশানো ভাষায়।

স্যুট-পরা লোকটি বসে বসে চুরুট টানছে। অধৈর্যভাবে তাকাচ্ছে। শেষে উঠেই পড়ল। পা ইংকে দুর্বোধ্য ভাষায় কয়েকটা শব্দ বলে বেরিয়ে গেল। তপনের মনে হল ও চিনা ভাষা বলল।

কয়েক মিনিট বাদেই আসল কথাটি পাড়ল তপন। 'মাদাম সেই দিনের পাখিটা চমৎকার। ওটা আমি দেশে নিয়ে যাব। সাজিয়ে রাখব ড্রইং রুমে।'

'উ উ'—পা ইং খুশির আওয়াজ করল। বলল, 'এখানে তুমি কী করতে এসেছ?'

'চাকরি। বছরখানেক বাদে ফিরে যাব দেশে—ইন্ডিয়া। ক্যালকাটা।'

বুড়ি ঘাড় নাড়ল। ক্যালকাটার নাম সে জানে।

তপন জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মাদাম, ওই পাখিটা পেলে কীভাবে?'

'হোয়াই?' পা ইং-এর চোখ কুঁচকে যায়।

'মানে ওই পাখি শুনেছি খুব গভীর জঙ্গলে থাকে। ওটা মারতে নিশ্চয়ই ওইরকম জঙ্গলে যেতে হয়েছে। খুব অ্যাডভেঞ্চার হয়েছে। আসল কথাটা বলি—আমি গল্প লিখি। অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। অনেকগুলো বই আছে আমার। ওই পাখির শিকারের অ্যাডভেঞ্চারটা যদি জানা যায়, ঢুকিয়ে দেব আমার কোনো গল্পে। দারুণ জমবে।'

'উ রাইতার!' পা ইং-এর নরুণ-চেরা চোখে বিস্ময় জাগল। বলল, 'কী ভাষায় লেখো?'

'বেঙ্গলি।'

পা ইং হতাশভাবে ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ সে বাংলা জানে না।

'এই পাখিটা তুমি ধরেছ?' জিজ্ঞেস করল তপন।

'নো নো।'

'যে ধরেছে তার সঙ্গে দেখা হয় না?'

'হতে পারে,' পা ইং মাথা দোলায়। তার মনে আর সন্দেহ নেই। তপনকে ঠাউরেছে নেহাৎ এক কল্পনাবিলাসী লেখক। এর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে ভয় কী? বরং মজাই পাচ্ছে। পা ইং নিজের মনেই বলল, 'জিয়ান কী আর মেরেছে পাখিটা? না কেউ দিয়েছে ওকে? কে জানে!'

'জিয়ান কে?' প্রশ্ন করল তপন।

'ওই পাখির মৃতদেহটা যে আমায় বিক্রি করেছে। তারপর আমি স্টাফ করেছি,' উত্তর দিল পা ইং।

'কী করে সে? কোথায় থাকে?'

'থাকে সিঙ্গাপুরে। এখন ব্যাংককে আছে। জিয়ান একজন নাবিক। মালয়ী।'

'অ্যাঁ! সেলার।' তপন একেবারে হামলে পড়ল, 'ওঃ! কক্ষনো কোনো নাবিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। কত দেশ, কত সমুদ্র ঘুরেছে! কত অ্যাডভেঞ্চার! ভাবতেই পারি না। ওর গল্প আমায় শুনতেই হবে। জিয়ানের সঙ্গে কী করে দেখা করা যায়? বলো বলো—প্লিজ।'

পা ইং হেসে বলল, 'হবে হবে। জিয়ানের ঠিকানা আমি জানি না, তবে কাল ও আসবে এখানে। আমার কাছে টাকা পাবে। ওকে বলব তোমার কথা। জিয়ান মাই ডিয়ার লোক। খুব ঘুরেছে। বেশ গল্প বলে। তোমার কাজে লাগতে পারে।'

'নিশ্চয় লাগবে। আলবৎ লাগবে। রিয়াল লাইফ অ্যাডভেঞ্চার, তপন উত্তেজিত, 'কাল সকালে আসবে? কখন? ইংরেজি জানে? বেশ বেশ। 'আমি আসব তাহলে দশটা নাগাদ। জিয়ান আগে এসে গেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বোলো। বলবে, আমায় গল্প শোনালে ওকে খুব ভালো প্রেজেন্ট দেব। প্লিজ বোলো কিন্তু'—

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' পা ইং আশ্বাস দিল।

পা ইং-এর কাছে বিদায় নিয়ে তপন দত্তদাকে রিপোর্ট করল।

দত্তদা বললেন, 'তুমি জিয়ানকে নিয়ে তোমার ঘরে যাবে। আমিও হাজির হব তোমার ঘরে। সেখানে কথা হবে। পাখিটা নিয়ে যাও। তোমার ঘরে সাজিয়ে রাখো। অন্য কথা বলতে বলতে পাখির কথায় আসবে। আমার পরিচয় দিও—চেনা লোক। অ্যাডভেঞ্চারের গল্পের ভীষণ ভক্ত। টিচার। ভ্রমণ কাহিনি লেখে। জিয়ানের কথা শুনে থাকতে পারিনি। কিছু ভালোমন্দ খাবার-দাবারের ব্যবস্থা রেখো। তোয়াজ করতে হবে। যদি দামি খবর কিছু দেয় তখন আরও খাতির দেখানো যাবে।'

গোবিন্দ সিং-এর কাছে ছুটি নিয়ে তপন সকাল দশটা নাগাদ পা ইং-এর দোকানে হাজির হল। কাউন্টারের ভিতরে একটি লোক বসেছিল, সে উৎসুক চোখে দেখল তপনকে। পা ইং লোকটিকে দেখিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে জিয়ান। বসিয়ে রেখেছি তোমার জন্যে।'

জিয়ান তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল। জিয়ানের চেহারা রোগা পাকানো। মাঝারি লম্বা। হাত দুটো শিরাবহুল, তাতে ভর্তি উল্কি। খুদে খুদে চোখ দুটো পিটপিট

করছে। পরনে হলুদের ওপর কালো ডোরা কাটা স্পোর্টস গেঞ্জি ও পুরনো নীল জিনস। পায়ে রবারের জুতো।

তপন কৃতার্থ হয়ে ইংরেজিতে বলল, 'আপনার কথা শুনেছি। আপনার গল্প শুনতে চাই। আমার কথা বলেছে কি পা ইং?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছি বইকি,' জানাল পা ইং, 'রায় ইন্ডিয়ান। অ্যাদভেঞ্চার রাইতার।'

জিয়ান বেশ গর্বিতভাবে বলল, 'তা ঘুরেছি অনেক। প্রচুর অ্যাডভেঞ্চার করেছি বটে।'

তপন বলল, 'এখানে গল্প জমবে না, খদ্দের আসবে, চলো, আমার ঘরে যাই। কাছেই মহারাজ রোডে। বেশ বসা যাবে।' সে জিয়ানকে বেশি ভাবনা-চিন্তার সুযোগ না দিয়ে প্রায় ঠেলে বাইরে এনে ফেলল। একদফা ধন্যবাদ জানিয়ে আসল পা ইংকে। খানিকটা হেঁটে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিল।

তপনের ঘরে ঢুকেই জিয়ানের নজরে পড়ল টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা সেই বার্ড অফ প্যারাডাইস।

তপন হেসে বলল, 'চিনতে পারছ? তোমার সেই পাখি। আমি কিনেছি। চমৎকার।'

জিয়ান বসল। তপন তৎক্ষণাৎ তার সামনে এগিয়ে দিল এক বোতল উত্তম সুরা। তারপর এক প্যাকেট দামি সিগারেট সামনে রেখে বলল, 'দাঁড়াও, পাশের দোকান থেকে গরম গরম মাংসের চপ নিয়ে আসি। হ্যাঁ—আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক, বাঙালি, তাঁকে বলেছিলাম তোমার কথা। তিনি তোমার গল্প শুনতে চান। খুব ধরেছিলেন আমায়। ভদ্রলোক টিচার, লেখেন-টেখেন—ভ্রমণ কাহিনি। এসে পড়তে পারেন। তোমার আপত্তি নেই তো?'

একটা সিগারেট ধরিয়ে জিয়ান ঘাড় নেড়ে জানাল—'না না, আপত্তির কী?' তার মুখে গর্ব ও আত্মপ্রসাদ। সে বুঝে নিয়েছে, এই বিদেশিদের চোখে সে একজন হিরো। তার অতি কষ্টকর একঘেয়ে নাবিক জীবনের অভিজ্ঞতা কেউ যে এত আগ্রহ করে শুনতে চায়, সে বোধহয় এই প্রথম জানল।

তপন বাইরে গিয়ে দত্তদাকে টেলিফোন করল।

মিনিট পনেরোর ভিতর দত্তদা এসে পড়লেন। জিয়ানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। তিনজনে বসল। জিয়ানের খাবার চটপট শেষ। বোতলের পানীয় ঢেলে অল্প অল্প চুমুক দিতে দিতে সিগারেটে টান মেরে জিয়ান বলল, 'কোথাকার গল্প শুনবেন? প্যাসিফিক? সাউথ সী আইল্যান্ডস না অ্যাটলান্টিক? আমি ক্যালকাটাতেও গেছি।'

'আগে সাউথ সীর কথাই বলো,' দত্তদার অনুরোধ।

বাঁকা বাঁকা ইংরেজিতে জিয়ান বলে চলে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা। প্রায় একঘণ্টা কাটল। দত্তদা গোপনে ইশারা করলেন তপনকে—অর্থাৎ এবার পাখির কথা পাড়ো।

জিয়ানের সমুদ্র জীবনের কাহিনি ; নতুন দেশ, নতুন জাতি ; নতুন নতুন বন্দর। ঝড়ে পথ হারিয়ে দিক-দিশাহীন সাগরবক্ষে ভেসে চলা। কত অজানা প্রাণীর দেখা পাওয়া। কূলহীন অতল সাগরগর্ভে কত অজানা বিস্ময়, রোমাঞ্চ, ভীতি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছিল ওর একার জীবনে এত কাণ্ড সত্যি ঘটেছে কি না! হয়তো বা গুণমুগ্ধ শ্রোতা পেয়ে অন্যের কাছে শোনা গল্প ও নিজের নামে চালাচ্ছে। তবু তপনের চমৎকার লাগছিল। পাখির ব্যাপারটা না থাকলে খুশিমতো বলতে দিত জিয়ানকে।

গল্পের স্রোত একবার থামতেই তপন জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, এই পাখিটা কোত্থেকে পেলে? এ পাখি তো ঘোর জঙ্গলে থাকে শুনেছি।'

'তা বটে, টেবিলে খাড়া করা পাখিটা দেখে নিয়ে গম্ভীরভাবে জানাল জিয়ান।'

'পাহাড়ে উঠতে হয়েছিল বুঝি?' তপনের আগ্রহভরা প্রশ্ন।

'না, দ্বীপ। ভীষণ জঙ্গুলে দ্বীপ,' বলল জিয়ান।

'দ্বীপ? কোথায়?' এবার প্রশ্ন করেন দত্তদা।

'ওয়াইজিওর কাছে, দক্ষিণ-পশ্চিমে, ডেম্পিয়ার প্রণালীতে ঢোকার মুখে, মেস্‌মন আইল্যান্ডস। উঃ, সেবার ঝড়ে মারা পড়েছিলাম আর কী!'

'কী রকম? কী রকম? ওখানে গিয়েছিলে কী করতে?' বলল তপনদা।

'মলুক্কা সাগরে কচ্ছপ ধরতে বেরিয়েছিলাম একদল জেলের সঙ্গে। জাহাজের কাজ ছিল না তখন। ভাবলাম এইভাবে দু-পয়সা রোজগার করি। নির্জন দ্বীপের বেলাভূমিতে কচ্ছপ ডিম পাড়ে। আড্ডা গাড়ে। সেখানে তাদের ধরা যায়।'

'পাখিটাকে কি তুমি নিজে শিকার করেছিলে? কোন দ্বীপে? নিশ্চয়ই খুব অ্যাডভেঞ্চার হয়েছিল? বলো, বলো, শুনি।' ডক্টর দত্তর কণ্ঠে অধীর আগ্রহ।

জিয়ান থমকে গেল। বলল, 'না, ঠিক নিজে মারিনি, পেয়েছি একদল সামুদ্রিক জিপসির কাছ থেকে। তবে দ্বীপটা জানি, ওরা দেখিয়ে দিয়েছিল।'

'সেই দ্বীপটায় গিয়েছিলে তোমরা?' ডক্টর দত্তর প্রশ্ন।

'না। তখন আমরা ফিরছি। মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এর একটা ছোট দ্বীপে থেমেছি। সেখানে জিপসিরা এল নৌকায়। ওদের কাছে মরা পাখিটাকে দেখলাম। চমৎকার পালক দেখে কিনে নিলাম, একখণ্ড কাপড়ের বদলে।'

'কী করে পেয়েছে ওটা বলল জিপসিরা?' প্রশ্ন করল তপন।

'বলেছিল। মৃত অবস্থায় সমুদ্রের জলে ভাসছিল একটা দ্বীপের পাশে। বোধহয় ঝড়ের তোড়ে ছিটকে পড়েছিল জলে। আমাদের একজন জেলে পাখিটার পেট-টেট কেটে পরিষ্কার করে দিল। তবে বেটা আনাড়ি ছিল। কেটে-কুটে নষ্ট করে দিল পাখিটা। নইলে ভালো দাম পেতাম।'

দত্তদা আনমনে ভাবছেন কিছু। তপন কথা চালাতে জিজ্ঞেস করল, 'জিয়ান, তুমি তিমি শিকার দেখেছ?'

'দেখেছি বইকি।' জিয়ান ফের বক্তৃতা শুরু করে।

মিনিট দশ বাদে দত্তদা বলে উঠলেন, 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। ওই দ্বীপে আমি যাব, যে দ্বীপের পাশে পাখিটা ভাসছিল। তুমি হবে আমার গাইড। ওই দ্বীপে নিশ্চয় এরকম পাখি আরও আছে। সেই পাখিদের ফোটো তুলব। জীবন্ত পাখির মুভি ফোটোগ্রাফ। দারুণ হবে। ভয় নেই তোমার লোকসান করব না। জাহাজে তুমি যা মাইনে আর যা যা পাও তাই দেব আমি।'

'এই পাখি?' জিয়ান আমতা আমতা করে।

জিয়ানের মুখের ভাব দেখে দত্তদা বললেন, 'কেন, দ্বীপটা তো তুমি চেনো। ওই দ্বীপে গেলে এই পাখি ঠিক খুঁজে পাব।'

'হ্যাঁ, তা চিনি। তবে চোখে দেখিনি। জিপসিরা দেখিয়ে দিয়েছিল কোন্‌ধারে। মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এর একদম পুবে। আমরা যে দ্বীপে গিয়েছিলাম তার থেকে বেশি দূরে নয়। পাখির দেহটা তখনো বেশ টাটকা ছিল। তবে ঠিক কোন দ্বীপটা কে জানে!'

'কেন, ওখানে কি অনেক দ্বীপ?'

'হ্যাঁ, অনেকগুলো, আর সবকটাই জঙ্গুলে। বেশির ভাগেই মানুষ থাকে না। কখনো আর যাইনি ওদিকে। শেষে যদি পাখি পাওয়া না যায়? এত কষ্ট করে যাবেন? জিয়ান যেন ভরসা পায় না। সে বলল, 'বুরং রাজা তো অন্য জায়গাতেও আছে।'

'না না, আমি ওইখানেই যেতে চাই,' দত্তদা জোর দিলেন, 'প্যারাডাইস বার্ডের ফোটো তুলতে না পারলেই বা কী? খাসা একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে। ভ্রমণ কাহিনি লিখে ফেলব। ওখানকার দ্বীপে ঘুরে ঘুরে ফোটো তুলব। জিপসিদের সঙ্গে যে দ্বীপে দেখা হয়েছিল সেখান অবধি চিনে যেতে পারবে তো?'

'হ্যাঁ, তা পারব।'

'ব্যস, তাহলেই হবে। তোমার কি এখন জাহাজে কাজ আছে?'

'না। তবে সাত-আট দিন বাদে একটা জুটবে।'

'দরকার নেই তোমার ও কাজে। আমরা সপ্তাহখানেকের ভিতরেই বেরিয়ে পড়ব। কাল এসো এখানে। আমার বাড়ি নিয়ে যাব। তারপর সব প্ল্যান ছকে ফেলব। কি, রাজি?'

জিয়ান বলল, 'অলরাইট। তবে কাল নয়, পরশু আসব, সন্ধে ছ'টা নাগাদ।'

অমনি দত্তদা উঠে দাঁড়িয়ে সাড়ম্বরে করমর্দন করলেন জিয়ানের সঙ্গে। তারপর বললেন, 'বারোটা বাজে। চলো বাইরে কোথাও লাঞ্চ খাওয়া যাক। আমার মোটর আছে বাইরে। চলো'—

এক নামকরা চিনা হোটেলে তিনজনে খেতে ঢুকল। জিয়ানকে দেখে মনে হচ্ছিল বেজায় খুশি। এমন খাতির-যত্ন তার ভাগ্যে কদাপি জুটেছে কিনা সন্দেহ। লোকটি বকে একটু বেশি। ফুর্তির চোটে সমানে কথা বলে চলেছে। মেনু এল। জিয়ানকে অনুরোধ জানানো হল খাবার পছন্দ করতে। সে একধারসে অর্ডার দিল—বার্ড-নেস্ট স্যুপ, চাওমিন, ডাক রোস্ট, গলদা চিংড়ি ভাজা ইত্যাদি। ভক্তদের পকেট হালকা করতে তার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই। পয়সা বেশ খরচা হলেও খাওয়াটা হল তোফা।

বেলা একটা নাগাদ জিয়ান ঘড়ি দেখে বলল, 'এবার আমি উঠি। ব্লু-ড্র্যাগনে একজন আমার জন্য অপেক্ষা করবে। পরশু আসব মিস্টার রায়ের ঘরে সন্ধে ছ'টায়।

'ব্লু-ড্র্যাগন কী?' জিজ্ঞেস করল তপন।

'রেস্টুরেন্ট,' জবাব দিল জিয়ান।

সকলে উঠে পড়ল। জিয়ান বিদায় নিল। তপন ডক্টর দত্তর সঙ্গে গেল তাঁর বাড়ি।

গাড়িতে যেতে যেতে তপন জিজ্ঞেস করল, 'দত্তদা, ওয়াইজিও কোথায়? আর মেস্‌মন আইল্যান্ডস?'

'বাড়ি চলো দেখাচ্ছি,' দত্তদা জবাব দিলেন।

তিন

দত্তদার পড়ার ঘরের দেওয়ালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মস্ত একখানা ম্যাপ ঝোলানো। দত্তদা দেখালেন, 'এই দেখ ডাচ নিউগিনির উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত। তারপর সমুদ্র। ডেম্পিয়ার প্রণালী। তার উত্তরে এই ওয়াইজিও দ্বীপ। প্রায় নিরক্ষরেখার ওপরে। আর ওয়াইজিওর একটু নীচে দক্ষিণ-পশ্চিমে এই যে ফুটকিগুলো, এই হচ্ছে মেস্‌মন আইল্যান্ডস। এই দ্বীপগুলো ছোট ছোট, জঙ্গুলে, ভলক্যানিক বা কোরাল আইল্যান্ড। বেশির ভাগেই মানুষের বসতি নেই। অস্বাস্থ্যকর। কাঠ, জায়ফল, নারকেল ইত্যাদির খোঁজে লোক এসব দ্বীপে কখনো কখনো যায় বটে, কিন্তু থাকে না। মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এর দ্বীপগুলোর আলাদাভাবে নাম দেওয়া নেই। ম্যাপে পয়েন্ট-আউট করা হয়নি ভালোভাবে। কিন্তু তপন আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে'—

'কী?'

'এটা ডিক্সন দ্বীপের পাখি।'

'—ডিক্সন দ্বীপ?'

'—নামটা আমার দেওয়া। জন ডিক্সন ছিল একজন অর্নিথলজিস্ট অর্থাৎ পক্ষিবিদ্। বিশেষত বার্ড অফ প্যারাডাইস স্পেশালিস্ট! পাঁচ বছর আগে ম্যানিলায় এক কনফারেন্সে

ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়। কথায় কথায় ডিক্সন বলেছিল যে ও একটা এক্সপেরিমেন্ট করছে। পাপুয়া নিউগিনি থেকে কয়েক জাতের প্যারাডাইস বার্ড এনে মলুক্কা সী-তে একটা জনহীন জঙ্গুলে দ্বীপে ছেড়েছে। দেখা যাক তাদের মধ্যে মিশ্রণ ঘটে নতুন স্পিশিস তৈরি হয় কিনা! প্যারাডাইস বার্ডস-এর মধ্যে একরকম মিশ্রণ ঘটেছে আগে। ডিক্সন খুব গোপনে করেছে ব্যাপারটা। সেই দ্বীপটা যে ঠিক কোন জায়গায় বলতে চায়নি ডিক্সন। শুধু বলেছিল, ‘মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এ।

‘আমি বলেছিলাম, দ্বীপে ছাড়লে? যদি লোকে জানতে পারে, সব ধরে মেরে সাফ করে দেবে। জানোই তো বার্ড অফ প্যারাডাইস-এর কী ভীষণ দাম! উত্তরে ডিক্সন বলেছিল, একটা চান্স নিয়েছি। বন্য পরিবেশ ছাড়া এদের মিশ্রণ ঘটে না। তেমন রিজার্ভ-ফরেস্ট পাচ্ছি কোথায়? দ্বীপ হলে পাখিগুলো একটা জায়গায় আটকে থাকবে। যদি সফল হই, ওখানে তৈরি নতুন স্পিশিস নিয়ে গিয়ে অন্য জঙ্গলে বা রিজার্ভ ফরেস্টে ছাড়ব। তবে এমন দ্বীপে ছেড়েছি যেখানে কেউ পা দেয় না। তাই ভরসা এখুনি কেউ টের পাবে না। তবে যত তাড়াতাড়ি পারি পাখিগুলোর প্রোটেকশনের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তোমায় লিখব তখন, সাহায্যের জন্য।

‘দুঃখের বিষয়, এর তিন মাস বাদে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে ডিক্সন মারা যায়। তাই ওর দ্বীপের হদিশও গোপন থেকে যায়। আমার বিশ্বাস, জিয়ানের পাওয়া স্পেসিমেনটা ডিক্সনের তৈরি কোনো নতুন প্রজাতি। ডিক্সন দ্বীপের পাশেই সমুদ্রে পেয়েছিল জিপসিরা! কারণ পাপুয়া-নিউগিনির কাছাকাছি মিশুল, আরু, জোবি ইত্যাদি কয়েকটা দ্বীপে বার্ড অফ প্যারাডাইস পাওয়া যায় বা আগে পাওয়া যেত, কিন্তু মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এ এই পাখি পাওয়া গেছে বলে কখনো শুনিনি। এইজন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্বীপটা আবিষ্কার করা দরকার। পাখিগুলোর রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন কোনো স্পিশিস পেলে নিয়ে গিয়ে চিড়িয়াখানায় রাখব বা রিজার্ভ-ফরেস্টে ছাড়ব।’

পরদিন বিকেলে তপন গোবিন্দ সিং-এর অফিস থেকে নিজের ঘরে ফিরে দেখে দরজার তালাটা ভাঙা। সে ঘরে ঢুকল। আলনায় ঝোলানো একটা নতুন শার্ট নেই এবং টেবিলের ওপর বসানো তার প্যারাডাইস বার্ডটি উধাও। ঘরে আর কোনো জিনিস বেপাত্তা হয়নি। চুরি করার মতো দামি জিনিস কী বা আছে তার? কিন্তু পাখিটা নিল কেন? এ-বস্তুর দাম কি চোর জানে? আশ্চর্য!

তপন থাকে এক তলায় একখানা ঘরে। এক তলার বাকি অংশে থাকে এক বর্মী পরিবার— স্বামী ও স্ত্রী। তারা দু'জনেই দিনের বেলা চাকরি করতে বেরিয়ে যায়। তাদের দরজায় তালা দিব্যি ঝুলছে। দোতলায় থাকে এক পরিবার। তারা একতলায় নজর রাখে না। তপন তক্ষুনি টেলিফোন করল দত্তদাকে।

দত্তদা আধঘণ্টার মধ্যে হাজির হলেন। ব্যাপার দেখে তিনি থ। বললেন, ‘ইস্, পাখিটা আমার এখান থেকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। গতকাল সময় পেলাম না আসতে।’

পুলিসে ডায়রি করা হল।

একটা স্টাফ-করা পাখি এবং একখানা মাত্র শার্ট খোয়া গেছে জেনে ইন্সপেক্টর চুরির ব্যাপারে বিশেষ গা করলেন বলে মনে হল না।

থানা থেকে বেরিয়ে দত্তদা বললেন, 'স্পেসিমেনটা হারাল, এটা মস্ত ক্ষতি। তবে ও-পাখির রং চেহারা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। দেখলে ঠিক চিনব। এখন জিয়ান আসুক।'

স্টাফ-করা পাখিটা চুরি যাওয়ার পরদিন সন্ধ্যা ছ'টায় তপনের ঘরে জিয়ানের আসার কথা ছিল। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত ন'টা অবধি দত্তদা ও তপন অপেক্ষায় রইল। জিয়ান এল না।

পরদিনও এল না জিয়ান। দুশ্চিন্তায় দত্তদার মুখ কালো হয়ে গেল। কী ব্যাপার? জিয়ানের ঠিকানা তারা জানে না। জিজ্ঞেস করেছিল, জিয়ান এড়িয়ে গেছে—'এক ফ্রেন্ডের কাছে থাকি। সে আপনারা খুঁজে পাবেন না।' বোঝা গিয়েছিল কোনো ঘুপচি নাবিকদের আস্তানায় তার বাস। সেখানে তপন বা ডক্টর দত্তর আগমন তার পছন্দ নয়।

দত্তদা তপনকে পা ইং-এর দোকানে পাঠালেন জিয়ানের খোঁজে। না, জিয়ান আসেনি। জিয়ান কোথায় থাকে তাও বুড়ি জানে না। বলে আসা হল, জিয়ান এলেই বলতে, তপনের কাছে যেন সে অবশ্যই যায়, ভীষণ দরকার।
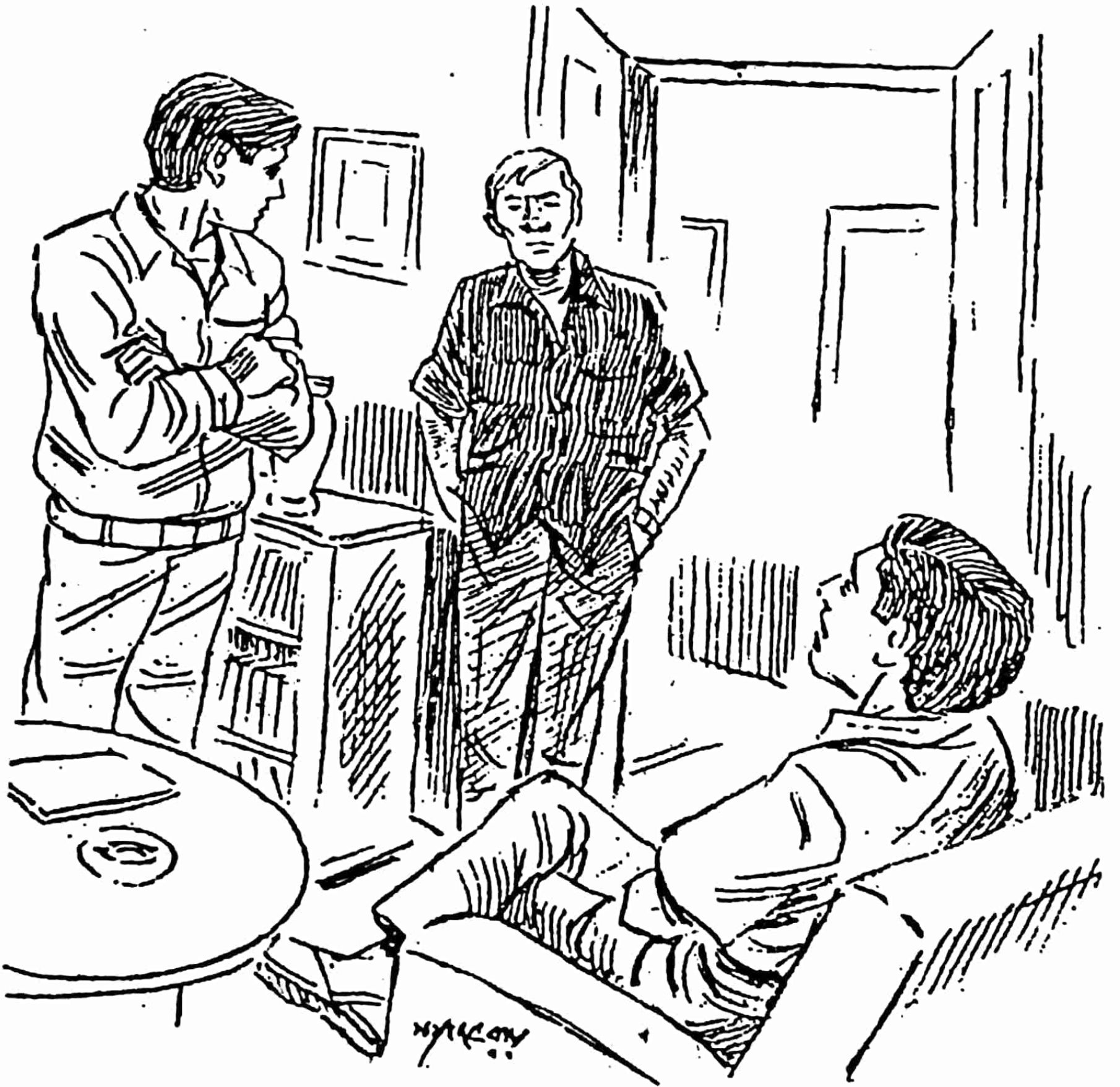
পা ইং-এর দোকানে পরপর তিনদিন খোঁজ করেও জিয়ানের পাত্তা পাওয়া গেল না। মোটে আসেনি সে। পা ইং বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠল—'কী এত দরকার? এত ঘনঘন খোঁজ?'

তপন দত্তদার বাড়িতে বসে। একটি লোক এল। মাঝারি লম্বা, মজবুত গড়ন, চেহারায় মঙ্গোলীয় এবং শ্বেতাঙ্গের মিশ্রণ। লাল চুল, চৌকো চোয়াল, গায়ের রং লালচে, তবে নাক চাপা। সরু বাঁকা চোখ। দত্তদা ইংরেজিতে বললেন, 'এসো ডন, তোমাকে খুব দরকার। একজনের খোঁজ করতে হবে। নাম—জিয়ান, মালয়ী নাবিক। সে কোথায় থাকে জানি না, তবে ব্লু-ড্র্যাগন নামে একটা রেস্টো-রেন্টে যায়। চেন ব্লু-ড্র্যাগন?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ডন। লোকটির দৃষ্টি স্থির, মুখে কোনো ভাবান্তর নেই।

'ব্লু-ড্র্যাগন কোথায়?' দত্তদার প্রশ্ন।

'নদীর ধারে। জাহাজীদের আড্ডাখানা।' ইংরেজিতে উত্তর দিল ডন।

'তবে একবার খোঁজ করে এসো। জিয়ান কেমন দেখতে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার গাড়িটা নিয়ে যাও। হ্যাঁ, এ হচ্ছে তপন রায়—'

ডন চলে গেল। দত্তদা তপনকে বললেন, 'ডন আমার অনেক অভিযানের সঙ্গী। ভালো শিকারী! ওর পূর্বপুরুষ ছিল পর্তুগীজ বোম্বেটে। ব্যাংককে থাকে। কাঠের ব্যবসা করে।'

আধঘণ্টা বাদে ডন ফিরে এল। জানাল, 'ব্লু-ড্র্যাগনে জিয়ান যায় মাঝে মাঝে। তবে বেশ কয়েকদিন যায়নি। ও কোথায় থাকে কেউ বলতে পারল না। বলে এসেছি, জিয়ান এলে তাকে যেন মিস্টার রায়ের কাছে অবশ্য যেতে বলা হয়।'

কিন্তু তবু জিয়ানের পাত্তা পাওয়া গেল না।

জিয়ানের সঙ্গে তপনদের শেষ দেখার পর আট দিন কেটে গেল। ডন প্রত্যেক দিন একবার ব্লু-ড্র্যাগনে খোঁজ নেয়। তপন যায় পা ইং-এর কাছে খোঁজ নিতে। কিন্তু জিয়ান যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ও ব্যাংককে আছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। দত্তদা দিনে দিনে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি শান্ত প্রকৃতির আমুদে লোক। কিন্তু এখন সর্বদা তাঁর মুখ গম্ভীর। হলটা কী জিয়ানের? অ্যাক্সিডেন্টে পড়ল নাকি? ডনের সঙ্গে ইতিমধ্যে তপনের আলাপ গাঢ় হয়েছে। দুজন দুজনকে নাম ধরে ডাকে। তবে ডন কথা বলে খুব কম।

আট দিনের মাথায় ডন এসে খবর দিল, 'জিয়ান ব্লু-ড্র্যাগনে এসেছিল আজ সকালে। সঙ্গে আর একজন ছিল। মাঝারি হাইট। গাঁট্টাগোট্টা। ছাই রঙের স্যুট পরা। চুরুট খায়। রেস্টো-রেন্টের বাকি পাওনা দিয়ে গেছে জিয়ান। কথাবার্তায় মনে হয়েছে, সে বাইরে যাচ্ছে কোথাও। অল্পক্ষণ থেকে দুজনে চলে যায় একটা ছোট কালো রঙের মোটরে চেপে। ব্লু-ড্র্যাগনের ম্যানেজার বলেছিল জিয়ানকে, তপন ও আপনার কথা। বোঝা যাচ্ছে, লাভ হয়নি। ও ইচ্ছে করেই আপনাদের এড়াচ্ছে।'

জিয়ানের সঙ্গীর বর্ণনা শুনে তপনের ধাঁ করে মনে পড়ে গেল একজনের কথা। সে বলে উঠল, 'দত্তদা, ঠিক এমনি চেহারার একটা লোককে দেখেছিলাম পা ইং-এর দোকানে, যেদিন প্রথম পাখিটার বিষয়ে খোঁজ করতে যাই। পা ইং-এর সঙ্গে বসে গল্প করছিল। আমি ঢুকতে একটু বাদে বেরিয়ে যায়। ঠিক ওইরকম দেখতে আর চুরুট খায়। লোকটাকে ফের দেখেছি আমি। জিয়ানকে নিয়ে যখন আমরা লাঞ্চ খেয়ে বেরুচ্ছি চিনা হোটেল থেকে, সেই লোকটা রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে দেখছিল আমাদের।'

দত্তদা যেন চমকে উঠলেন। উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আরে একথা আগে বলোনি কেন? ডন, বুঝতে পারছ, লোকটা কে? নির্ঘাৎ চ্যাং। চ্যাং-এর তো একটা ছোট কালো

গাড়ি আছে। এইবার আন্দাজ করছি ব্যাপার। তপন, চল এখুনি আমার সঙ্গে পা ইং-এর কাছে। ডন, আমি ফিরে এসে তোমায় টেলিফোন করব।'

পা ইং-এর দোকানের উল্টো দিকে দত্তদা গাড়ি থামালেন।

দোকানে একজন খদ্দের ছিল। গাড়িতে বসে দত্তদা ও তপন অপেক্ষা করে। খদ্দেরটি বেরিয়ে গেলে দুজনে দোকানে ঢুকল।

দত্তদাকে দেখেই পা ইং প্রথমে কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। তারপর হেসে অভ্যর্থনা জানাল, 'ওয়েলকাম ওয়েলকাম, কী সৌভাগ্য আমার। মিস্টার দত্ত অনেক দিন বাদে। বলুন কী খুঁজছেন?'—সেই থাই আর ইংরেজি মেশানো অদ্ভুত ভাষায়।'

দত্তদা কোনো ভণিতা না করেই পা ইং-এর কাছে গিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ইংরেজিতে বললেন, 'পা ইং, আমি একবার তোমার উপকার করেছিলাম, মনে আছে?'

'আছে বইকি!' পা ইং-এর হাসি মিলিয়ে যায়।

'তবে আশা করি উপকারীর মর্যাদা দেবে। আমায় ঠকাবে না।'

'না না, এ কথা কেন?'

'বেশ, তাহলে বলো, এই তপন তোমার দোকান থেকে যে একটা স্টাফ-করা পাখি কিনে নিয়ে গিয়েছিল সে খবর কি চ্যাং জানে? আর পাখিটা সম্বন্ধে সে কি তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করেছে? আর জিয়ানের সঙ্গে কি তার আলাপ হয়েছে? সত্যি করে বলো।'

পা ইং-এর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে সে খুব নিচু স্বরে আস্তে আস্তে বলল, 'প্লিজ মিস্তার দত্ত, আমি সত্যি কথা সব বলছি। কিন্তু চ্যাং যেন না জানতে পারে আমি আপনাকে এসব বলেছি। ও আমায় বারণ করে দিয়েছে বলতে। জান তো ও কী করম ভয়ঙ্কর লোক।'

দত্তদা বললেন, 'বেশ, চ্যাং জানতে পারবে না, কথা দিলাম। এবার বলো।'

পা ইং বলল, 'ওই রায় পাখিটা সম্বন্ধে খোঁজখবর করে বেরিয়ে যাবার পর চ্যাং ফের আসে। পাখিটা নিয়ে রায় খোঁজ করছিল জেনে কৌতূহলী হয়। জিয়ানের খোঁজখবর নেয়। পরদিন রায় জিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে যেতেই চ্যাং ওদের অনুসরণ করে। ও আমার শো-কেসের পিছনে লুকিয়ে ছিল কী কথা হয় শুনতে। আমায় ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেছিল এই ব্যবস্থায়। এরপর চ্যাং কী করেছে, না করেছে আমি কিচ্ছু জানি না, দিব্যি গালছি। এ শুধু আমায় নিষেধ করে যায় এই বিষয়ে কাউকে কিছু না বলতে। দোহাই মিস্তার, চ্যাং যেন জানতে না পারে আমি এসব বলেছি, তাহলে মারা পড়ব।'

দত্তদা আর কথা না বাড়িয়ে বিদায় নিলেন। কেবল পা ইংকে বলে এলেন—'জিয়ানের কোনো খবর পেলে আমায় জানিও।'

পথে বেরিয়ে তপন জানতে চাইল, 'চ্যাং' কে?

দত্তদা বললেন, 'নামে পশুপাখির ব্যবসায়ী, কিন্তু ওর আসল কারবার—দুর্লভ পশুপাখির চোরাই চালান। এই করে প্রচুর পয়সা কামিয়েছে। মহা ধূর্ত। পুলিস একবারও ওকে বাগে পায়নি। সাউথ-ইস্ট এশিয়ার অনেক দুষ্প্রাপ্য জন্তু ও পাখি ওর কল্যাণে নির্বংশ হতে চলেছে। আগের বছরই সুলু সাগরে ফিলিপিনো পুলিস একটা লঞ্চ আটক করে। তাতে পাওয়া যায়, খাঁচায় বন্দী ছ'টা লুচু র্যাবিট, দুটো ব্ল্যাক সেলিবিস এপ্ এবং তিনটি সেলিবিস দ্বীপের পিগ্‌মি বাফেলো। সব কটিই দুর্লভ প্রাণী। এদের ধরতে বা রপ্তানি করতে স্পেশাল পারমিশন নিতে হয়। জন্তুগুলি কে পাঠাচ্ছে, কার কাছে, কোনো হদিশই পাওয়া যায়নি। দেখা গেল সব ভুয়ো নাম-ঠিকানা। তবে কানাঘুষায় জানা যায় যে এটা চ্যাং-এর কীর্তি।

'এসব প্রাণী কেনে কে?' তপন জানতে চায়।

'কিছু কেনে চিড়িয়াখানাগুলো। সোজা পথে না পেলে তারা এইভাবেও সংগ্রহ করে। তাছাড়া আছে বেশ কিছু প্রাইভেট কালেক্টর। নানা দেশের অনেক ধনীরই পশুপাখির শখ। তারা রীতিমতো চিড়িয়াখানা বানায়। তাতে দুর্লভ প্রাণী রাখা ভীষণ প্রেস্টিজের ব্যাপার। ফলে চোরা পথে, টাকার জোরে রেয়ার পশুপাখি জোগাড় করে। আর চ্যাং-এর মতো লোক আছে তাদের শখ মেটাতে।'

'এ ব্যবসায় তো খুব রিস্ক?' বলল তপন।

'তা বটে, তবে লাভও তেমনি। যেমন ধরো, ব্রেজিলের হায়াসিন্‌থ ম্যাকাও-এর এক্সপোর্ট নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই পাখি চোরাই পথে বিক্রি হয় এক-একটি দশ হাজার ডলারে। চোরাবাজারে এমনি নিষিদ্ধ পাখি, একজোড়া অস্ট্রেলিয়ান গোল্ডেন সোলডার্ড প্যারাকীট বা ব্রাউন প্যারাকীটের দাম কমপক্ষে দশ-বারো হাজার ডলার।'

তপন বলল, 'লুকিয়ে মেরে বাঘের চামড়া, গণ্ডারের সিং খুব দামে বিক্রি হয় শুনেছি। কিন্তু জ্যান্ত প্রাণীরও যে এমন চোরাই-চালান হয় জানতাম না।'

'হয় হয়,' দত্তদার কণ্ঠে ক্ষোভ উত্তেজনা, 'এই প্রাইভেট কালেক্টরের শখ আছে, টাকা আছে, কিন্তু জ্ঞান কম। তাই রেয়ার স্পিশিস সংগ্রহ করে প্রায়ই তাদের বাঁচাতে পারে না। ফলে স্পিশিসগুলি সংখ্যায় দিন দিন কমছে।

দত্তদা বলে উঠলেন, 'বুঝছ ব্যাপার। পাখিটার বিষয়ে খোঁজ করার কথা চ্যাং-এর কানে যায়। তার সন্দেহ হয়। পরে জিয়ানকে ধরে। বুঝতে পারে দেশ-ভ্রমণ বা অ্যাডভেঞ্চারটা ছল। আসলে লক্ষ্য পাখিটা। হয়তো এটা দুর্লভ কোনো বার্ড অফ প্যারাডাইস এবং তুমি নয়, আসলে আমিই খোঁজখবর করছি। ওই ঠিক চুরি করেছে পাখিটা লোক দিয়ে। ওর মতলবটা কী?'

মোটরে উঠে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে খানিক চুপ করে বসে থেকে দত্তদা বললেন, 'চলো একবার চ্যাং-এর সঙ্গে মোলাকাত করে আসা যাক।'

গাড়ি স্টার্ট নিল।

মিনিট দশেক এঁকেবেঁকে চলে থামল গাড়ি। পাড়াটা নির্জন। রাস্তা পেরিয়ে ওধারে একটা মাঝারি দোতলা বাড়ির নিচের দরজার বেল টিপলেন দত্তদা। একজন মালয়ী দরজা খুলে দিল। দত্তদা মালয়ী ভাষায় বললেন, 'মিস্টার চ্যাং আছেন?'

লোকটি ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে রইল। জবাব দিল না।

দত্তদা ফের বললেন, 'বলো গিয়ে প্রফেসর দত্ত এসেছেন।'

লোকটি তখনো চুপ। নড়ছেও না। এমন সময় তার পিছন থেকে কেউ ইংরেজিতে বলে উঠল, 'আরে প্রফেসর দত্ত! কী সৌভাগ্য! আসুন, আসুন।'

তপন দেখল, সেই ছাইরঙা স্যুট পরা লোকটি। এখন অবশ্য তার পরনে হাফশার্ট ও ট্রাউজার্স। তবে ঠোঁটে সেইরকমই চুরুট। লোকটির কণ্ঠস্বরে বিনয় ও ভদ্রতা যেন ঝরে পড়ছে। মুখে বিগলিত হাসি।

ঝকঝকে সাজানো ড্রইং-রুমে বসল তিনজনে। 'কোনো ড্রিঙ্কস?' জানতে চাইল চ্যাং।

'না, ধন্যবাদ,' উত্তর দিলেন দত্তদা। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'মিস্টার চ্যাং, আমি একজনের খোঁজে এসেছি। লোকটির নাম জিয়ান। নাবিক! ওর কোনো হদিশ দিতে পারেন?'

'জিয়ান?' চুরুটে একটা লম্বা টান মেরে ঊর্ধ্ব মুখে তাকিয়ে চ্যাং না জানার ভান করে।

দত্তদা দৃঢ়স্বরে বললেন, জিয়ানকে আপনি চেনেন মিস্টার চ্যাং, আমি ভালোভাবেই জানি।'

'তাই নাকি! কে বলল?' চ্যাং-এর চোখ ছোট হয়।

'কেউ বলেনি। তবে ব্লু-ড্র্যাগনে আপনাদের একসঙ্গে দেখা গেছে। ওর বিল আপনি মিটিয়েছেন। ব্লু-ড্র্যাগনের অনেকেই দেখেছে।'

'হুঁ। মনে পড়েছে।' চ্যাং যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'লোকটা আমার কাছে ধার চাইল কিছু। ব্লু-ড্র্যাগনের পাওনা শোধ করবে। নইলে নাকি রেস্টোরেন্টের ম্যানেজার ওকে ঠ্যাঙাবে। ওইখানেই জিয়ানের সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল কয়েকদিন আগে। খুব ঝুলোঝুলি করতে মিটিয়ে দিলাম ওর ধার। বলেছে তো শোধ করে দিয়ে যাবে বাড়িতে এসে। জানি ওসব বাজে কথা। তবু জানেন তো, কেউ হাত পাতলে আমি না বলতে পারি না।' চ্যাং উদার হাসি হাসল।

'জিয়ানের ঠিকানাটা জানেন?' বললেন দত্তদা।

'নাঃ। তা, ব্যাপারটা কী? ওকে কী জন্যে দরকার? আপনারও টাকা মেরেছে নাকি?'

'না। অন্য একটা কাজ আছে। যাক, চলি এখন।' দত্তদা উঠে পড়লেন।

'ঠিক আছে, ও যদি আসে ধার শোধ করতে, ওর ঠিকানাটা নিয়ে রাখব,' সবিনয়ে জানাল চ্যাং, 'তবে সে-আশা খুবই কম।' চ্যাং-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে তপনরা রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। পিছনে চ্যাং-এর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ঠিক তখুনি একটা প্রকাণ্ড ঝকঝকে মোটরগাড়ি এসে থামল সামনে। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে নামল এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক—টকটকে রং, বেজায় মোটা, পরনে দামি স্যুট। লোকটিকে দেখে মনে হয় আধা-ইউরোপিয়ান।

আগন্তুক দত্তদাকে একমুহূর্ত ভুরু কুঁচকে দেখে চোস্ত ইংরেজিতে বললেন, 'হ্যাল্লো প্রফেসর, খবর ভালো?'

দত্তদা কেমন আড়ষ্টভাবে বললেন, 'হুঁ।'

'চ্যাং-এর কাছে এসেছিলেন বুঝি? দেখা হল?' বললেন আগন্তুক।

দত্তদা একবার মাথা নেড়েই পা চালালেন।

'আবার শিগগিরি কোনো অভিযানে যাচ্ছেন নাকি? আমার সেই অফারটা কিন্তু মনে রাখবেন প্রফেসর। প্লিজ।' আগন্তুকের কথা ভেসে এল।

দত্তদা থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফেরালেন। আগন্তুকের মুখে যেন বাঁকা হাসি।

ঝটিতি ফিরে দত্তদা গটগট করে নিজের গাড়িতে উঠলেন। তপন উঠে বসল পাশে। বাকি পথ দত্তদা থমথমে মুখে গাড়ি চালালেন। একেবারে চুপ। বাড়ি এসেই টেলিফোন করতে গেলেন ডনকে।

দত্তদা ফোন করে ফিরে আসতেই তপন বলল, 'ওই লোকটা কে? মস্ত গাড়ি থেকে নামল?'

'প্রিন্স,' জবাব দিলেন দত্তদা, মানে আমরা প্রিন্স বলেই ডাকি। ওর আসল নাম হেনরি উয়ান। থাকে রেঙ্গুনে। মহা ধনী। গণ্যমান্য ব্যক্তি। রাজার মতোই বিলাসিতায় থাকে। ওর খুব পাখির শখ। ফেমাস বার্ড কালেক্টর। অনেক রেয়ার স্পেসিমেন আছে ওর সংগ্রহে। কিন্তু ইদানীং ওর অ্যামবিশন বেড়েছে। শুধু কালেক্টর নয়, আবিষ্কারক হতে চায়। তবে নতুন পাখির খোঁজে বন-জঙ্গলে ঘুরে দিনের পর দিন কষ্টভোগ করে অভিযান চালাবার মতো ধৈর্য ওর নেই। তাই টাকার জোরে আবিষ্কার কিনতে চায়।'

'আবিষ্কার কেনা! সে আবার কী!' তপন অবাক।

'অর্থাৎ অন্য কারও আবিষ্কার করা কোনো নতুন পাখি ও নিজের আবিষ্কার বলে চালাবে। তার জন্য প্রকৃত আবিষ্কারককে দেবে প্রচুর টাকা। এইভাবে কিনবে। তিন বছর আগে চ্যাং মারফত প্রিন্স আমার কাছে এইরকম এক প্রস্তাব পাঠায়। আমি তখন ইস্ট জাভার অঞ্চলে এক এক্সপিডিশনে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। প্রিন্স আমায় মোটা টাকা অফার করে এই শর্তে।'

'আপনার আবিষ্কার প্রিন্সের নামে চালাবে কীভাবে? ও যদি সঙ্গে না যায়?' তপন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

'খুব সোজা ব্যাপার,' বললেন দত্তদা, 'ধরো' আমি একটা নতুন পাখি আবিষ্কার

করলাম। তার দু-একটা জীবিত বা মৃত স্পেসিমেন নিয়ে গেলাম। তাদের ফোটো তুলে আনলাম। ফিরে এসে স্পেসিমেন এবং ফিলম-রোল সমর্পণ করলাম প্রিন্সের হাতে। আর কেউ জানবে না ব্যাপারটা। এরপর প্রিন্স ঘটা করে এক্সপিডিশনে যাবে সেই জঙ্গলে। পাখির দেখা পাক বা না পাক, ওখান থেকে একটু ঘুরে এসে ঘোষণা করবে যে সে একটি নতুন জাতির পাখি আবিষ্কার করেছে। লোককে দেখাবে, আমার দেওয়া স্পেসিমেন, এবং ফিলম্ থেকে ডেভেলপ করা ফোটো। ফলে আবিষ্কারক হিসেবে তার নাম রেকর্ডেড হয়ে যাবে। খুব সম্মান মিলবে। বদলে আমি পাব প্রচুর টাকা। চ্যাং পাবে মোটা কমিশন। প্রিন্সের প্রস্তাব আমি কড়াভাবে নাকচ করি। সেই থেকে চ্যাং এবং প্রিন্স আমার ওপর বেজায় চটা।'
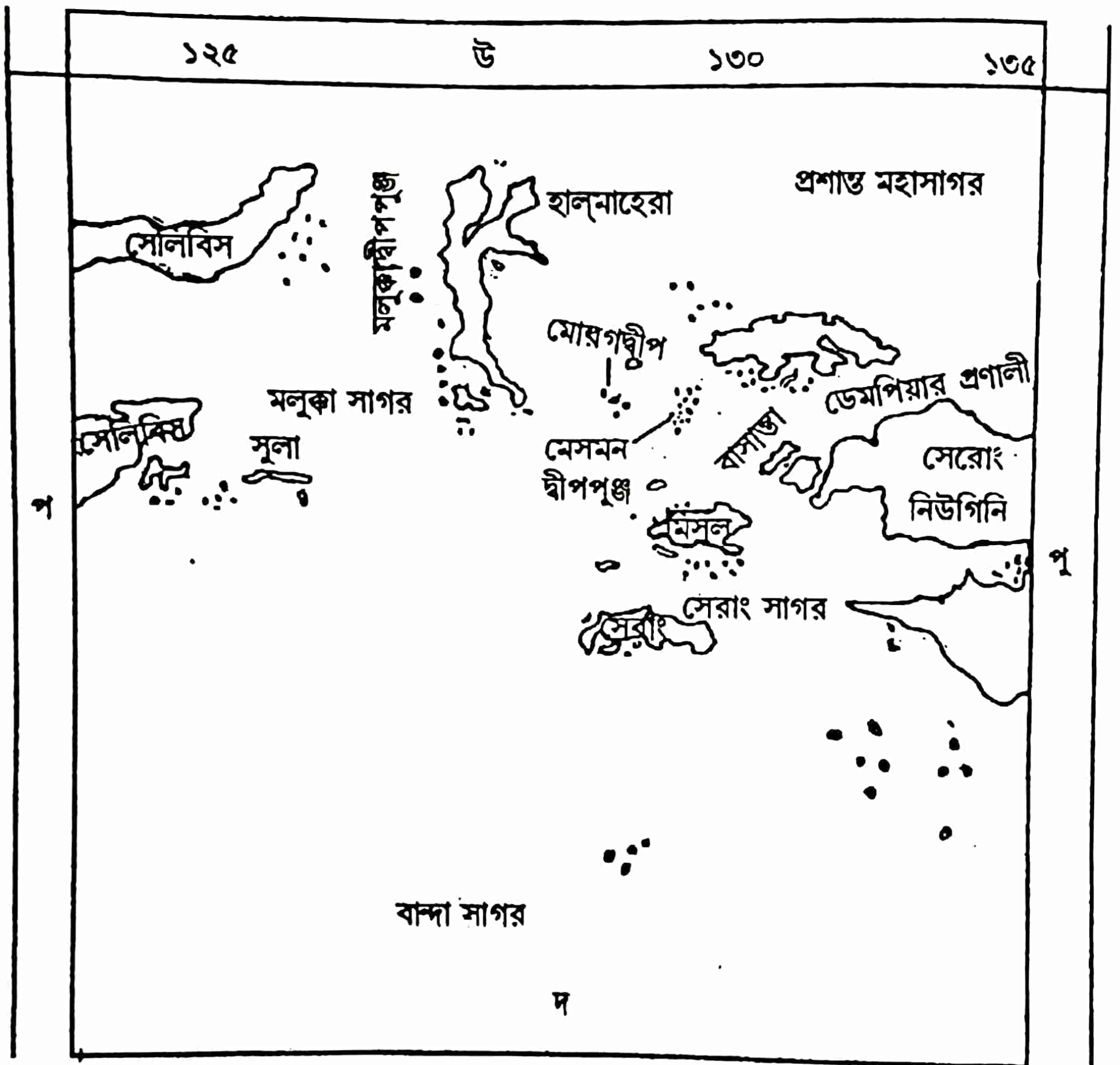
দত্তদা উত্তেজিতভাবে বললেন, 'চ্যাং ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। জিয়ানকে ও ঠিক কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তবে প্রথমে ভেবেছিলাম চ্যাং শুধু আমায় জব্দ করতে চায়। জিয়ানকে সরিয়ে দিয়ে আমার অভিযানটা ভেস্তে দিতে চাইছে। এবং হয়তো চুরি করা স্পিশিসটা বিক্রি করবে কোথাও। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এর পিছনে প্রিন্স আছে। ব্যাপারটা আরও গোলমেলে। আমি ডনকে বলেছি চ্যাং-এর ওপর নজর রাখতে।'

দু-দিন বাদে বিকেলে ডন এসে জানাল, 'প্রফেসর দত্ত, খবর পেলাম চ্যাং আজ দুপুরে সিঙ্গাপুরে চলে গেছে প্লেনে। প্রিন্সও চলে গেছে ব্যাংকক থেকে।'

দত্তদা একটুক্ষণ গুম মেরে থেকে বললেন, 'আমার বিশ্বাস, চ্যাং প্রিন্সকে জানিয়েছিল জিয়ানের আনা পাখির বিষয়ে আমার আগ্রহের কথা। তারপর প্রিন্সের নির্দেশেই চ্যাং ওটা চুরি করায়। এবং পাখিটা দেখে প্রিন্স ধরতে পেরেছে যে এটা নতুন স্পিশিস। এখন প্রিন্স নির্ঘাৎ চ্যাংকে পাঠাবে ওই পাখির খোঁজে। ওই টাকা জোগাবে। প্যারাডাইস বার্ড-এর নতুন স্পিশিসটা চ্যাং খুঁজে পেলে প্রিন্স তার আবিষ্কারটা কিনে নেবে। ফলে প্রিন্সের অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হবে। এর জন্যে সে প্রচুর টাকা ঢালতে পিছপা হবে না। হ্যাঁ, এর সঙ্গে আমাকেও জব্দ করাটা হবে ফাউ। এক ঢিলে দুই পাখি বধ।

'নাঃ, আর একটা দিনও বাজে নষ্ট নয়। চ্যাং ঠিক ডিক্সন আইল্যান্ডের পথে রওনা হয়ে গেছে। কিন্তু জন ডিক্সনের কীর্তি চুরি করে কেউ বিখ্যাত হবে, তা আমি হতে দেব না। ডন, চলো বেরোই, কাজ আছে।'

দত্তদা ও ডন বেরিয়ে গেলেন। তপন তার ঘরে ফিরল।

চার

পরদিন সকালে দত্তদার বাড়ি হাজির হয়ে তপন দেখল সেখানে হুলুস্থূল চলছে। দত্তদার হাতে একটা লিস্ট। সামনে নানা আকারের কয়েকটা ব্যাগ। চারপাশে হরেক রকম জিনিস ছড়ানো। বউদি সমানে এ-ঘর ও-ঘর ছুটছেন। রবি নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

দত্তদা বললেন, 'বসো তপন, বসো। এই গোছগাছ করছি।'

বউদি তপনকে এক কাপ কফি ধরিয়ে দিলেন।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' তপন জিজ্ঞেস করল।

'প্রথমে ওয়াইজিও, সেখান থেকে মেস্‌মন আইল্যান্ডস।'

'ওয়াইজিও কেন? চ্যাং কি ওখানে গেছে, হদিশ পেলেন?'

'না। চ্যাং-এর কোনো খবর পাইনি। তবে ডিক্সন বলেছিল, সে ওয়াইজিও থেকে মেস্‌মনের দিকে যাত্রা করে। গিয়ে খুঁজে দেখব, ডিক্সন কোন দ্বীপে গিয়েছিল কেউ বলতে পারে কিনা।'

'যদি তেমন কাউকে না পান?'

'তাহলে অগত্যা অজানার পথে পাড়ি। মেস্‌মনের পুব ধারের দ্বীপগুলো খুঁজে দেখব, যদিও কাজটা বেশ শক্ত।'

'একাই যাবেন?'

'না। ডনকে সঙ্গে নিচ্ছি। জিয়ানকে পেলে অবশ্য ডনকে দরকার হত না। বিশেষ খোঁজাখুঁজিও করতে হত না তাহলে।'

'আপনি আগে কখনো ওয়াইজিও গেছেন?'

'না।'

'ডন?'

'না ডনও যায়নি।'

'দ্বীপগুলো তো ভালো নয়, সেদিন বললেন।'

'হুঁ, মোটেই ভালো নয়। তাছাড়া ইকুয়েটরের ওপরে বলে ওই অঞ্চলে সারা বছর ঝড়-জল লেগেই থাকে।'

'তবে তো রিস্কি।'

'তা একটু।' হাসলেন দত্তদা।

তপন বলল, 'বউদি, আপনি বারণ করছেন না যে?'

বউদি হেসে বললেন, 'বারণ করলেই কী আর শোনে, যা মানুষ।'

ব্যাগের স্ট্র্যাপ বাঁধতে বাঁধতে দত্তদা মুখ তুলে বললেন, 'এ ভারি জব্বর নেশা ভাই। একবার স্বাদ পেলে আর ছাড়ান নেই। একটা কবিতা পড়েছিলাম, বাংলা। কবির নামটা মনে নেই। কয়েকটা লাইন মুখস্থ করে রেখেছি।—'

"শুনে কাল হল ভাই।
অরণ্য-পথ গভীর গহন সাগরের তল নাই!"

ঠিক লিখেছেন। আমার মনের কথা। অমন কোনো জায়গার কথা শুনলেই যে ছটফটিয়ে উঠি।'

তপনের মনটা আনচান করে উঠল। ব্যাংককে এসে তার মনে হয়েছিল মস্ত এক অ্যাডভেঞ্চার করেছি। বেশ গর্ব হয়েছিল মনে মনে। কিন্তু সে এসেছিল পেটের দায়ে, বাধ্য হয়ে, অনেক সাতপাঁচ ভেবে। আর এই মানুষটি? কেমন সাজানো সংসার, চাকরি, নিশ্চিন্ত জীবন—সব ছেড়ে হুট করে পা বাড়াচ্ছেন অজানা পথে, বিপদের মাঝে, প্রায় শখ করে। নাঃ,—এর তুলনায় তার জীবনটা নেহাৎই সাদামাটা। অ্যাডভেঞ্চারের সে কিছুই জানে না।

খানিক চুপচাপ থেকে ধাঁ করে বলে বসল তপন, 'দত্তদা, আপনাদের সঙ্গে যেতে ভীষণ লোভ হচ্ছে।'

হো-হো করে হেসে উঠলেন দত্তদা, 'বটে, বটে। কিন্তু ভাই এ লোভ না করাই ভালো।'

'সিরিয়াসলি বলছি দত্তদা।'

ডক্টর দত্ত তীক্ষ্ণ চোখে তপনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রিস্কগুলো খেয়াল আছে?'

'আছে।'

'কিন্তু তোমার চাকরি? ছুটি পাবে?'

তা সত্যি। তপন দমে গেল। নতুন চাকরি। ছুটি কি আর দেবে?

দত্তদা উঠে এসে তপনের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'দুঃখ কোরো না ভাই। যার অজানাকে জানবার ইচ্ছে আছে, বিপদে ঝাঁপ দেবার সাহস আছে, তার বরাতে অ্যাডভেঞ্চার ঠিক জুটে যায়। জীবনভোর সামনে দিয়ে কত রোমাঞ্চের সুযোগ পেরিয়ে যায়। কেউ তা দেখে এড়ায়। আর যে তাকে ধরতে চায়—ঠিক ধরে। তাই বলছি, হতাশ হয়ো না।'

'ধরুন যদি ছুটি পাই?'

'নিশ্চয়ই নেব তোমায়। খুশি হয়ে নেব। তোমার খরচাও কিছু লাগবে না। সে ভার আমার,' বললেন দত্তদা।

দুপুরে গোবিন্দ সিংকে ব্যাপারটা বলল তপন।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সিংজি বললেন, 'তুমি সত্যি যেতে চাও?'

'হ্যাঁ। অবশ্য যদি ছুটি পাই। সবে জয়েন করেছি—'

গোবিন্দ সিং-এর দাড়ি-গোঁফ ভরা মুখে বিচিত্র হাসি ফুটল। তিনি বললেন, 'বেশ, ছুটি

তুমি পাবে। যাও। তোমার উৎসাহ দেখে আমি খুশি হয়েছি। এই তো দেখার বয়স। তোমার চেয়েও কম বয়সে আমি ঘর ছেড়েছি। কত দেশ ঘুরেছি। কত কী দেখলাম। এখনো ইচ্ছে করে বেরিয়ে পড়তে, কিন্তু আর তাগদ নেই। তবে হ্যাঁ, বৃদ্ধের পরামর্শ নাও তো বলি। রোজগার করাও দরকার। তাই চোখ-কান খোলা রাখবে। কোথায় কী রোজগারের ধান্দা জেনে নেবে।'

'একটা ঘটনা বলি শোনো। তখন আমার বয়স তিরিশ। ব্যাটাভিয়ায় এক রবার বাগানে কাজ করি। এক ফিলিপিনোর সঙ্গে ভাব হল। ফিলিপিনো জিপ একদিন বলল যে, সে টরেস্‌স্ট্রেটে একটা ডুবে-যাওয়া জাহাজের খোঁজ পেয়েছে, তাতে অনেক দামি মাল আছে। একজন পার্টনার পেলে সে জাহাজটা খুঁজে দেখে। টরেস্‌-স্ট্রেট কোথায় জানো? অস্ট্রেলিয়া আর নিউগিনির মাঝখানে। ওখানে অগুনতি দ্বীপ আর ডুবো পাহাড়। রাজি হয়ে গেলাম। চলে গেলাম ওর সঙ্গে। একটা মোটর-বোট ভাড়া করলাম। ডুবুরির পোশাক কেনা হল। জিপই শেখাল আমায় সমুদ্রে ডাইভিং। জাহাজটা খুঁজেও পেলাম। খুব অ্যাডভেঞ্চার হল। আবার দু-পয়সা রোজগারও হয়ে গেল।'

'কী পেয়েছিলেন জাহাজটায়?' তপনের ভারি আগ্রহ।

'খুব দামি কিছু নয়। তবে অনেক রুপোর জিনিস ছিল। তাই বলছি, অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে পয়সার মতলবটাও ছেড়ো না। যদি কিছু মেলে মন্দ কী? জাহাজটা পেলাম ভালো, না পেতেও পারতাম।'

'আচ্ছা, তোমরা সিঙ্গাপুর হয়ে যাবে নিশ্চয়ই? ওখানকার এক পার্টি অনেকদিন ধরে আমায় মাল পাঠাচ্ছে না। চিঠি দিচ্ছি, উত্তর নেই। ঠিকানা দিয়ে দেব। ওদের সঙ্গে দেখা করে, কথা বলবে। আমি নিজেই একবার সিঙ্গাপুর যাব ভাবছিলাম। তুমিই ভারটা নাও। তাহলে ছুটির মাইনেটা পাবে।'

তপন তক্ষুনি ফোন করল, 'দত্তদা, ছুটি মিলেছে। আমি যাচ্ছি'

ব্যাংকক থেকে রওনা হয়ে বার-কয়েক প্লেন বদল করে তপনরা পৌঁছল নিউগিনির উত্তর ভাগে সোরোং বন্দরে। সোরোং থেকে লঞ্চে ডেম্পিয়ার প্রণালী পেরিয়ে ওয়াইজিওর দক্ষিণ তটে মুকা গ্রামে হাজির হল।

মুকা ছোট্ট গ্রাম। সামনে সমুদ্র। পিছনে চাষের ক্ষেত। তারপর বনজঙ্গল। একটি পাতা-ছাওয়া মাটির কুটিরে ওরা আস্তানা করল। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা ওখানে সম্ভব নয়। দত্তদা ডনকে বললেন, 'খবর নাও, জন ডিক্সনকে কেউ চেনে কিনা? দেখ এমন কাউকে পাও কিনা যে ডিক্সনের সঙ্গে মেস্‌মেন আইল্যান্ডস, এ গিয়েছিল।'

আগস্ট মাস। রাতে একদিন বৃষ্টি হল। ঘরের চাল চুঁইয়ে জল পড়ে। মশার প্রচণ্ড উৎপাত। রাতে ভালো ঘুম হয় না। তপন টের পেতে শুরু করল অ্যাডভেঞ্চারের ধকল। এ তো কলির সন্ধে। এখনো আসল অভিযানটাই বাকি। দত্তদা ও ডন কিন্তু নির্বিকার। কোনো অসুবিধাতেই তাদের যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

মুকার অধিবাসীরা মালয় ও পাপুয়ান জাতের মিশ্রণ। বছরের অনেকখানি সময় এরা সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। মাছ, কাঁকড়া, কচ্ছপ ইত্যাদি ধরে। জংলি দ্বীপ থেকে ফল-পাকুড় সংগ্রহ করে আনে।

চারদিন কেটে গেল। ডিক্সনকে দেখেছে এমন দু-চারজনের খোঁজ মিললেও ওর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করেছে তেমন কারও সন্ধান পাওয়া গেল না। দত্তদা অধীর হয়ে উঠলেন। জানালেন—'আর দু-তিন দিন দেখব। কাউকে না পেলে গাইড ছাড়াই রওনা দেব।'

চ্যাং বা জিয়ানের কোনো খবর মেলেনি। তবে একজন জেলে জানাল যে দুজন বিদেশিসহ একটা নৌকোকে তারা হাল্‌মাহেরার দিক থেকে মেস্‌মনের দিকে যেতে দেখেছে।

ডন একটি বছর কুড়ির যুবককে দত্তদার কাছে নিয়ে এল। বলল, 'এ নাকি জানে ডিক্সন কোন্ দ্বীপে গিয়েছিল। এর নাম আলী। ও মালয় জানে।'

'তুমি ডিক্সন সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলে?' দত্তদা মালয় ভাষায় আলীকে জিজ্ঞেস করলেন।

'না। আমার বাবা গিয়েছিল। আমি বাবার কাছে গল্প শুনেছি,' উত্তর দিল আলী।

'তোমার বাবা কোথায়?'

'বাবা সমুদ্রে বেরিয়েছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই। মাস দুইয়ের আগে নয়।'

'বাবা তোমায় বলেছে, ডিক্সন কোন্ দ্বীপে গিয়েছিল?'

আলী বলল, 'ঠিক কোন্ দ্বীপটায় বলেনি বাবা। সাহেবের বারণ ছিল বলতে। বাবা শুধু বলেছিল, 'মোরগ দ্বীপ থেকে সোজা পুবে, খানিক খোলা সমুদ্র পেরিয়ে ফের অনেকগুলো দ্বীপ। সেখানে কাছাকাছি একজোড়া দ্বীপ। তারই একটায় গিয়েছিল তারা।'

দত্তদা ডনকে বললেন, 'বুঝেছ, মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এর কথা বলছে। জোড়া দ্বীপ ওইখানেই হবে। মেস্‌মনের পশ্চিমে কয়েকটা দ্বীপ আছে, তারই একটা নিশ্চয়ই মোরগ দ্বীপ।'

তিনি ফের আলীকে বললেন, 'সাহেব কী করতে গিয়েছিল, সে-কথা কি বাবা বলেছে তোমাকে?

'না।'

'সেই নৌকোর অন্য মাঝিরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন দত্তদা।

আলী বলল, 'সাহেব বাইরে থেকে নৌকা এনেছিল। কোত্থেকে জানি না। মাঝিদের চেনে না কেউ। একজন মাঝি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার জায়গায় বাবাকে নেয়। অসুস্থ মাঝিকে ফেরত পাঠায়।'

'তুমি মোরগ দ্বীপ চেন?' দত্তদার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, চিনি।'

'আর জোড়া দ্বীপ? সেখানে গেছ কখনো?'

'না।'

'ঠিক আছে। তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে? মোরগ দ্বীপের পুবে যাব। ডিক্সন সাহেব যে দ্বীপে গিয়েছিলেন সেই দ্বীপটা খুঁজে বের করতে চাই।'

'বেশ, যাব।'

আলী এককথায় রাজি।

মলুক্কা সাগর দিয়ে ভেসে চলেছে এক বড় নৌকো। মালয় ভাষায় একে বলে প্রাউ। আলীকে নিয়ে নৌকোয় মাঝি পাঁচজন। অন্য আরোহীরা হচ্ছে—ডক্টর দত্ত, ডন এবং তপন।

ক্রমে ওয়াইজিওর তটরেখা মিলিয়ে গেল। এবার কূলহীন সাগর। ফেনার মুকুট পরে ঢেউগুলি নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে। আছড়ে পড়ছে নৌকোর গায়ে। একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ কানে আসে।

ছইয়ের বাইরে এলে হু-হু বাতাস। লোনা জলের ছিটে লাগে গায়ে। মুকা গ্রাম ছাড়ার পর দু-দিন দু-রাত ওয়াইজিওর দক্ষিণ কূল ঘেঁষে চলেছিল তরী। মাঝে মাঝে থেমেছে কোনো দ্বীপে। বড় বিপজ্জনক যাত্রা। ডেম্পিয়ার প্রণালীর এই ধারটায় অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ, শিলাস্তূপ ও প্রবাল প্রাচীর। খাঁজ খাঁজ কাটা প্রবাল স্তূপে ধাক্কা খেলে ফুটো হয়ে যাবে নৌকোর কাঠ। তাই খুব সাবধানে এগোতে হয়েছে।

সর্দার মাঝি পোকো মাঝবয়সী, দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ। মাথায় ঘন কোঁকড়া কালো চুল। পরনে লুঙ্গি ও কুর্তা।

প্রণালীটা পেরোবার সময় পোকো প্রায় সমস্তক্ষণ স্বয়ং হালের কাছে ছিল। খোলা সাগরে পৌঁছে সে হাঁপ ছাড়ল। কারণে অকারণে দাঁত বের করে তার কেবলই হাসি। পোকো জাতিতে পাপুয়ান। এরা খুব ফুর্তিবাজ।

দত্তদা চিনিয়ে দিচ্ছিলেন, 'তপন, প্রবাল দ্বীপ দেখ। ওই দেখ প্রবাল প্রাচীর। দ্বীপের ধারে ধারে জল থেকে মাথা তুলে আছে। কাটা কাটা গা, খাঁজ খাঁজ। ডেনজারাস। নৌকো ঠোক্কর

খেলেই চিত্তির। এর ভয়ে ডেম্পিয়ার প্রণালীর এই ধারটায় জাহাজ বা স্টিমার চলে না। এই দেশি নৌকোগুলোই কেবল দেখে দেখে বাঁচিয়ে চলতে পারে।'

দু-চারটে ন্যাড়া শিলাস্তূপ ছাড়া সব দ্বীপই বন-জঙ্গলে ঠাসা। তীর ঘিরে সাগরজলে পা ডুবিয়ে রয়েছে ম্যানগ্রোভের ঘন বন।

মলুক্কা সাগরে ঢোকার মুখে একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখিয়ে দত্তদা বললেন, 'ওই দেখ ভল্‌ক্যানিক আইল্যান্ড। এখন অবশ্য মৃত।'

সমুদ্র থেকে খাড়া উঠেছে দ্বীপটা। পিরামিডের মতন দেখতে। মাথাটা ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। কয়েক শো ফুট উঁচু। পাহাড়ের গায়ে ঘন উদ্ভিদের আবরণ, দূর থেকে দেখাচ্ছে কালচে-সবুজ।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত গেল। সাগরের গাঢ় নীল জল যেন আবির-রাঙা। কী অপূর্ব দৃশ্য! এরপর আকাশে একফালি চাঁদ এবং অজস্র তারা। ঢেউয়ের মাথায় নৌকাখানি দুলছে দুলছে।

ছইয়ের বাইরে পাটাতনে চিৎ হয়ে শুয়ে তপন চোখ মেলে ভাবে—জীবন কী বিচিত্র! মাত্র ছ'মাস আগে কলকাতায় গলির মোড়ে সেই সকাল-সন্ধে আড্ডা। মাঝে মাঝে ঠাকুরের দোকানের চা। দুপুরে ঘুম। টিউশনি। কখনো কখনো টাইপ-মেশিন খটখটিয়ে কিছু রোজগার। চাকরি খোঁজা। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, টেস্ট-ক্রিকেট নিয়ে তুমুল তর্ক, উত্তেজনা। সদ্যমুক্ত কোনো হিট সিনেমার টিকিট জোগাড় করে ভারি গর্ব, মস্ত বীরত্ব। একঘেয়েমির অবসাদ কাটাতে ওই যা জুটত। আর এখন?

এমন জীবন কি সে কল্পনা করেছে কখনো? করেছে। বইয়ের পাতায় ছবি দেখে, কল্পনায় কত নতুন নতুন অজানা দেশে মন চলে গেছে। কিন্তু এখন বুঝছে কল্পনা আর বাস্তবে কী ভীষণ ফারাক! প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিটে এ কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা! বদলে যাচ্ছে প্রকৃতি। বদলাচ্ছে শব্দ গন্ধ জীবজগৎ। স্নায়ু টান-টান। নতুনের স্বাদ নিতে উন্মুখ। যেন নেশা লাগে।

কলকাতার ছকে-বাঁধা জীবন, বহুদিনের চেনা মানুষ-জন বাড়িঘরের গণ্ডি কাটিয়ে কখনো বোঝেনি সে এই পৃথিবীটা কী বিশাল, কী অভিনব। কত কী দেখার আছে। দত্তদা ঠিকই বলেছিলেন, নেশা ধরে যায়। এই দশ দিনেই সে খুব টের পেয়েছে এর মর্ম।

অসীম জলরাশির বুকে মোচার খোলার মতো এই আশ্রয়টুকু। বাতাস বাড়লে ঢেউ উত্তাল হয়। ভয়ে বুক কাঁপে। কিন্তু সে ভয় রোমাঞ্চকর, উত্তেজনায় ভরা। মন মুষড়ে পড়ে না, উল্লসিত হয়।

অনেক রাত অবধি তপন বাইরে শুয়ে শুয়ে জল ও বাতাসের মাতামাতি শুনল। কখনো উঠে বসে দেখল, সাগরজলে চাঁদের আলোর কাঁপন। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় শুভ্র ফেনার গতি, ফসফরাসের ঝিকিমিকি।

পরদিন উড়ুক্কু মাছ দেখল তপন। এই মাছের কথা বইয়ে পড়েছিল, ছবি দেখেছিল, নিজের চোখে দেখে বুঝল কী অদ্ভুত দৃশ্য। পারশে মাছের মতো আকার, চকচকে রুপোলি গা। খানিকক্ষণ তারা জল থেকে হাত তিনেক ওপর দিয়ে হাওয়ায় ভেসে চলল। পাক খেল বাতাসে। কখনো একটু ওপরে ওঠে, কখনো ফের নিচে নামে। ঠিক যেন পাখি। অন্তত শ-খানেক গজ এমনি ভেসে ভেসে গিয়ে মাছগুলো ফের ডুব দিল জলে। কে বলবে ওদের ডানা নেই!

কোত্থেকে একটা বড়সড় পাখি এসে বসল মাস্তুলের বাঁশে। হয়তো অনেক উড়ে উড়ে ক্লান্ত, তাই একটু জিরিয়ে নিতে চায়। একজন মাঝি টপ করে ধরে ফেলল পাখিটা। খানিক ছটফটিয়ে সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। গায়ে তার চকচকে সবুজ আর তামাটে পালক। ল্যাজ ধবধবে সাদা। দত্তদা দেখে বললেন, 'এটা নিকোবর পিজিয়ন। খুব উড়তে পারে।'

তপনের মায়া হল। ইঙ্গিতে মাঝিকে বোঝাল, 'ছেড়ে দাও। মাঝি তার কথা রাখল। মুক্তি পেয়ে তির বেগে উড়ে পালাল পাখিটা।

সর্দার মাঝি পোকো হাল ধরে দাঁড়িয়েছিল। সে উত্তেজিতভাবে কী জানি বলে উঠল। অমনি বাকি মাঝিরা ছুটে গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে। তাদের দৃষ্টি দূর সাগরের বুকে। ডন বসেছিল বাইরে। সেও গেল। কী বলছে ওরা? মালয় ভাষা বোঝে না তপন। দত্তদা ছইয়ের ভিতরে বসে বই পড়ছিলেন। তপন তাঁকে বলল, 'ওরা কী দেখছে দত্তদা?'

দত্তদা ওদের কথা একটু শুনে বললেন, 'তিমি। চলো দেখি।'

দত্তদা চোখে দূরবিন লাগিয়ে তাকিয়ে থাকেন। ডন তপনকে বলল, 'লক্ষ কর, জলের ফোয়ারা উঠছে।'

কোথায়? কত দূরে? অবশেষে দেখল তপন, অনেক দূরে দক্ষিণে। ছোট তোরণের মতো জলের বাঁকা ধারা। রোদ পড়ে চিকচিক করছে। কী আশ্চর্য চোখ ওদের! দত্তদার দূরবিনটা নিয়ে ভালো করে দেখল সে। পাঁচটা প্রকাণ্ড কালচে পিঠ ঢেউয়ের তালে তালে ভাসছে ডুবছে। যেন এক-একখানা মস্ত নৌকো উল্টো হয়ে ভেসে চলেছে। জলের ফোয়ারাটা সে দেখতে পেল স্পষ্ট। মোটা ধারায় অর্ধচন্দ্রাকারে পড়ছে। দত্তদা জানালেন, 'তিমি ডুব দিয়ে জলে ভেসে ওঠে গরম বাষ্পপূর্ণ নিঃশ্বাস ছাড়ে। সেই বাষ্প বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে এসে জলকণায় পরিণত হয়ে ফোয়ারার মতো পড়ে।'

তিমিগুলো কাছে এল না। ক্রমে মিলিয়ে গেল দূরে।

দুপুরে উল্টো দিক থেকে এসে বড় বড় দুটো নৌকো পাশ কাটিয়ে চলে গেল। দু-দিকের যাত্রীরাই আগ্রহভরা চোখে তাকিয়ে রইল পরস্পরের পানে। ওদের একটা নৌকো থেকে একজন চিনা হাতে ঝুলিয়ে তুলে দেখাতে লাগল—কলার কাঁদি, নারকেল, কচ্ছপের খোলা, আরও কী কী। অর্থাৎ ব্যবসা করতে চায়। কিনতে চাইলে গায়ে ভেড়াবে তাদের প্রাউ। আঙুল তুলে বোঝাতে চাইল জিনিসগুলোর দাম। তবে তাদের হতাশ হতে হল। পার হয়ে মিলিয়ে গেল নৌকো দুটো। এই জলের রাজ্যে মানুষের দেখা পেলে ভারি আনন্দ হয়।

খানিক বাদে দেখা গেল সাগরের বুকে একটা কালো ফুটকি। আলী কী দেখাচ্ছে? দত্তদা জানালেন, 'মোরগ দ্বীপ এসে গেছে। ওখানে থামব আমরা। তারপর যাব পুবমুখো। ডিক্সন আইল্যান্ড আমি ঠিক খুঁজে বের করব। শুধু একটা ভাবনা—আমাদের আগেই যদি চ্যাং ওখানে হাজির হয়।'

'যদি হয় কী হবে?' প্রশ্ন করল তপন।

'ঝামেলা হবে। চ্যাং সোজা লোক নয়।' উত্তর দিলেন দত্তদা।

সন্ধের ঠিক আগে মোরগ দ্বীপে পৌঁছল নৌকো।

ছোট্ট দ্বীপ। লম্বায় মাইলখানেকের বেশি নয়। জলের ধারে কোথাও ম্যানগ্রোভের বন, কোথাও খোলা বালুময় তট। পিছনে জঙ্গল। তীরে সুদীর্ঘ নারকেল গাছের সারি। একটা

খাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নৌকোর নোঙর ফেলা হল। রাতে দত্তদা, তপন ও ডন রইল সমুদ্রতীরে তাঁবু ফেলে। মাঝিরা শুলো নৌকোয়। অন্ধকার হয়ে গিছল। দ্বীপের ভিতরে তখন তাই ঢোকা হল না। এখানে মাঝিরা খানিক জিরিয়ে নেবে। তাজা মাংস আর খাবার জল নেওয়া হবে সঙ্গে।

পরদিন সবাই দ্বীপ ঘুরতে বেরোল।

দত্তদার সঙ্গ ধরল তপন। সমুদ্রতট থেকে বেশি দূরে নয়, একটা ঝরনার উৎস থেকে গুবগুব করে জল বেরোচ্ছে ঠেলে। এছাড়া নাকি আর কোথাও এখানে খাওয়ার মতো মিষ্টি জল মেলে না। ওই জল ক্ষীণধারায় বয়ে গিয়ে বালিতে হারিয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গলে ঢুকল তারা। বনের মাঝে পায়ের চলার পথ। সেই পথ ধরে এগোয়। কতরকম অজানা গাছ। মোটা মোটা লতা উঠেছে গাছ বেয়ে। মাথার উপর ডালপালা পাতার ঘন আচ্ছাদন। বড় গাছের তলায় ঝোপ-ঝাড় কম। তাই হাঁটতে অসুবিধা হয় না। তবে ছায়া-ছায়া স্যাঁতসেঁতে। নিস্তব্ধ বনভূমি। মাঝে মাঝে শুধু পাখির ডাক কানে আসে। কোনোটা সুরেলা শিস। কোনোটা তীক্ষ্ণ কর্কশ। দত্তদা মন দিয়ে শুনে বললেন, 'ওই চাঁচাছোলা ডাকটা টিয়াপাখির। রেড-লরি।'

ঢং ঢং ঢং—গুরুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনির মতো পরপর কয়েকটা আওয়াজে চমকে উঠল তপন। বন যেন কেঁপে উঠল।

দত্তদা বললেন, 'নাট্‌মেগ পিজিয়নের ডাক। নাট্‌মেগ হচ্ছে জায়ফল। এই পায়রারা জায়ফলের দারুণ ভক্ত। ফলের শাঁসটুকু খেয়ে নিয়ে বীচি ফেলে দেয়। এরাই সাউথ-ইস্ট এশিয়ার দ্বীপে দ্বীপে জায়ফলের গাছ ছড়ায়। এ-দ্বীপেও নিশ্চয়ই জায়ফলের গাছ আছে।'

একটা জলাভূমি। চারপাশে সাগু গাছ—সুপুরি গাছের মতো দেখতে। জলের ধারে এগোলেন না দত্তদা। বিষাক্ত সাপ থাকতে পারে। বললেন, 'এসব দ্বীপে বুনো বেড়াল, হরিণ বা বুনো শুয়োর ছাড়া বড় স্তন্যপায়ী জন্তু নেই।'

বন একটু পাতলা হল। জমি ঢালু হয়ে উঠে গেছে টিলার মতন! তার গায়ে ঘন বাঁশঝাড়। কী একটা প্রাণী উড়ে গেল এক গাছ থেকে আর এক গাছে। ঠিক যেন কাঠবেড়ালী। হ্যাঁ, তাই বটে। দত্তদা বললেন, 'মলুক্কায় উড়ুক্কু কাঠবেড়ালী আছে। মোটা ল্যাজ ফুলিয়ে হাওয়ায় ভেসে লাফ দেয়। উড়ুক্কু অপোসামও আছে কোথাও কোথাও।'

তপন আবিষ্কার করল, মাথার ওপর গাছের ডালে কী একটা অদ্ভুত প্রাণী। লম্বা ল্যাজ। ছোট্ট মাথা। মস্ত গোল গোল চোখ। ধবধবে সাদা লোমে ঢাকা গায়ে কালো কালো ছোপ। খুদে ভাল্লুক যেন। দত্তদা দেখে বললেন, 'কুস্‌কুস্‌। একরকম মারসুপিয়াল। মানে, যে জন্তু পেটের তলায় থলিতে শাবক বহন করে। যেমন ক্যাঙারু। কুস্‌কুস্‌ ভারি কুঁড়ে প্রাণী। শুধু পাতা খায়।'

'মোরগ দ্বীপে মোরগ কই? জিজ্ঞেস করল তপন।'

'একসময় ছিল, এখন নেই। যারা দ্বীপে আসে, খাওয়ার লোভে মেরে শেষ করে দিয়েছে।'

একবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। ডন হয়তো শিকার পেয়েছে। কিছুক্ষণ বাদে আর একবার।

'সাপ'—লাফ দিয়ে ছিটকে গেল তপন।

'কই? না! সাপ নয়।' দত্তদা দেখালেন—ফার্ন গাছের পাতার তলা দিয়ে বেরিয়ে আছে এক সবুজ গিরগিটির লম্বা ল্যাজ।

কী অদ্ভুত জনহীন দ্বীপ। নির্জন ট্রপিকাল বনভূমি। তপন মুগ্ধ। এমন জগতে কোনোদিন পা দেবে কখনো সে ভাবেনি।

একজোড়া সবুজ রঙের পায়রা উড়ে গেল ঝটপট করে। কী সুন্দর সব প্রজাপতি। কোনোটা এক বিঘতের চেয়েও বড়। ছোট্ট মৌচুষি পাখি নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। দত্তদা

সাবধান করে দিলেন—'দেখে চলো, বড় বড় মৌচাক আছে বনে। কাছে ঘেঁষলে আক্রমণ করবে।'

আবার সমুদ্রতীরে ফিরল দুজনে।

ডন তিনটে নাট্‌মেগ পিজিয়ন শিকার করেছে। বেশ বড় আকারের গোলা পায়রার মতো। তবে রং ঢের সুন্দর। মাঝিরা তির দিয়ে মেরেছে একটা ছোট হরিণ। মহা ফুর্তি তাদের। পাকা জংলি কলাও জোগাড় করেছে। স্বাদ একটু কষা কষা। কাঁচা থাকলে এ-কলা ভাজা খাওয়া যায়। কয়েক কাঁদি নারকেল আর ডাব পাড়া হয়েছে। তপন ডাবের জল খেল প্রাণ ভরে। বাবুর্চি আলীর খাসা হাত। সে আজ বেজায় ব্যস্ত। দাউ-দাউ করে কাঠের উনুন জ্বলল। দুপুরে খাওয়াটা হল রীতিমতো ভোজ।

এক জায়গায় প্রবাল প্রাচীরে ঘেরা কিছুটা সমুদ্র। যেন এক ছোট্ট শান্ত হ্রদ। পাঁচিলের মাথায় মাথায় হেঁটে গিয়ে নিচে তাকাল তপন।

স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্যরশ্মিতে জলের ভিতরে রামধনুর বাহার। কত রঙের, কত বিচিত্র আকারের মাছ সাঁতার কেটে খেলে বেড়াচ্ছে। প্রবালকীট জমে জমে উঠেছে তলায়। যেন ডালপালা মেলা নানান আকৃতির ক্যাকটাস গাছ। কত রঙের নুড়িপাথর। ভেসে ভেসে দুলছে লম্বা লম্বা ঘন সবুজ জলজ উদ্ভিদ। ওই বুঝি পাতালপুরী, পরীর দেশ। আশা মিটিয়ে দেখল তপন। অ্যাকোয়ারিয়ামে অনেকটা এমনি সাজায়। তবে তা সাজানো। আসলে নকলে আকাশ-পাতাল তফাত। এই দৃশ্য সে কখনো ভুলবে না। চোখ বুজে ভাবলেই ভেসে উঠবে মনে।

পরদিন নৌকো ছাড়ল। মোরগ দ্বীপ থেকে সোজা পুব মুখে। এখানে কাছাকাছি তিন-চারটে দ্বীপ আছে। এরপর মাইল পনেরো খোলা সমুদ্র। তারপর মেস্‌মন আইল্যান্ডস।

পাঁচ

মাইলখানেক এগিয়েছে নৌকো। পালে হাওয়া লেগে তরতর করে চলেছে। তপন দেখল, আলী একবার ছইয়ের ভিতরে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে কী জানি বলল পোকোকে! পোকো, ডন ও দত্তদার কাছে গিয়ে নিচু স্বরে কিছু বলল। ডনের ভুরু কুঁচকে গেল। তারা দুজনে উঠে ঢুকল ছইয়ে। বেরিয়ে এল খানিক বাদে। দুজনের মুখ থমথমে। তপন আর থাকতে পারল না। গুটিগুটি গিয়ে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার দত্তদা?'

দত্তদা বললেন, 'ব্যাপার মুশকিল। খাবার জল নেই। পড়ে গেছে। পিপের তলায় একটা চিড় খেয়েছে। সেখান দিয়ে সব জল চুঁইয়ে বেরিয়ে গেছে।'

একটা বড় পিপেতে খাওয়া ও রান্নার জল থাকে। ছইয়ের কোণে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে পিপেটা। তপন দেখল, পিপের তলার দিকে কাঠে সামান্য ফাটা। চোখে দেখে চট করে বোঝা যায় না। সেখানটা ভিজে ভিজে। জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে। পিপের তলায় ওই ছিদ্রটুকুর নিচে আর সামান্যই জল তখনো রয়েছে।

পোকো বলল, 'গতকাল পিপেটা পরিষ্কার করার জন্য নামানো হয়েছিল। তখন একবার হাত ফসকে আছড়ে পড়ে পাথরে। চিড় তখনই খেয়েছে। তারপর জল ভর্তি করে রাখা হয়। সারা রাতে একটু একটু করে জল বেরিয়ে গেছে। কেউ খেয়াল করেনি।'

পিপের ফাটল আঠা দিয়ে বন্ধ করা হল। দত্তদা ভরসা দিলেন, 'ভাবনার কিছু নেই, সামনের দ্বীপ থেকে খাবার জল ভরে নেব। তবে সময় নষ্ট। জল খুঁজতে হবে। ভেবেছিলাম সোজা গিয়ে থামব মেস্‌মনে।'

সাগরের বুকে একটা দ্বীপ দেখা গেল। নৌকো চলল সেই দিকে। ঘণ্টা দুই বাদে পৌঁছল সেখানে। নিবিড় বনে ভরা ছোট্ট দ্বীপ। নৌকোর নোঙর পড়ল। আলী বাদে চারজন মাঝি বালতি হাতে নেমে পড়ল ডাঙায়। তারা অদৃশ্য হল গাছপালার ভিতরে।

তখনো পিপের তলায় প্রায় এক বালতি জল ছিল। তারই কিছুটা খরচ করে রান্না করল আলী। প্রায় দু-ঘণ্টা বাদে প্রথম ফিরল পোকো। ডাঙা থেকে হাত নেড়ে জানাল—জল পাওয়া যায়নি। আধঘণ্টার মধ্যে বাকি তিনজন মাঝিও ফিরল। তারাও এল শূন্য পাত্র নিয়ে।

দত্তদা বললেন, 'জল হয়তো আছে। ছোট ছোট গর্তে জমা বৃষ্টির জল। কিন্তু এ-বন ভেদ করে তা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কাজ। এসব দ্বীপের মাটির পাথর প্রায়ই এমন হয় যে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। ওপরে জমতে পায় না।

দুপুরে খাওয়া হল। বাকি জল থেকে ভাগ করে খেল সবাই। সন্ধের সময় জোয়ার আসতে ফের নৌকো ছাড়ল। পোকো বলল, 'সামনে পুবে আর একটা দ্বীপ আছে। বেশ বড় দ্বীপ। ওখানে ঠিক জল মিলবে।'

হঠাৎ বাতাস একেবারে পড়ে গেল। পাল চুপসে গেছে। নৌকো এগুচ্ছে অতি ধীরে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে সামনে দিগন্তরেখায় কালো পাহাড়ের মতন এক দ্বীপ। কিন্তু ওটা আর কাছে এগিয়ে আসছে না কেন? বেগতিক বুঝে মাঝিরা দাঁড় হাতে নিল। ঝপাঝপ দাঁড় বাইতে শুরু করল। নৌকো এগোয়। আর সিকি মাইলও নেই। সহসা মাঝিরা চিৎকার করে উঠল। খোলের ভিতরে ছিল তপন, দত্তদা ও ডন। পোকোর গলা শুনে তারা সবাই বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

'কী হয়েছে পোকো?'

'সর্বনাশ হয়েছে,' বলল, 'আমরা চোরাস্রোতে পড়েছি। দ্বীপ থেকে সরে যাচ্ছি।'

মাঝিরা পাগলের মতো দাঁড় বাইছে। পোকো ঝুঁকে পড়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে হালের চাকা। তবু শেষ রক্ষা হল না। দেখতে দেখতে দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে যেতে লাগল নৌকো। ক্রমে ছাড়িয়ে গেল দ্বীপ।

কাতর আর্তনাদ করে দাঁড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাঝিরা লুটিয়ে পড়ল পাটাতনে। বাকিরা স্তব্ধ। হতাশ চোখে চেয়ে আছে পিছনে ফেলে আসা দ্বীপটার দিকে। দত্তদা শুধু একবার বলে উঠলেন, 'সাবধান, মেস্‌মনে পৌঁছনো চাই তাড়াতাড়ি, নইলে বিপদ।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অনুকূল বাতাস দিল। স্রোত গেল ঘুরে। নৌকো চলতে লাগল ঠিক পথে, সামান্য উত্তরমুখো হয়ে পুবে। লক্ষ্য—মেস্‌মন আইল্যান্ডস।

মাঝিদের অবস্থা শোচনীয়। প্রচণ্ড পরিশ্রমে শ্রান্ত ঘর্মাক্ত। জলের অভাবে শরীর টলছে। কেবল ঠোঁট চাটছে, হাঁপাচ্ছে।

পিপের তলায় কয়েক মগ জল বাকি। সেইটুকু ভাগ করে দেওয়া হল সবার মধ্যে। মাঝিরা একটু বেশি জল খেল। ভাগ্য প্রসন্ন হলে কাল দুপুরের আগেই মেস্‌মন দ্বীপপুঞ্জের দেখা পাওয়া উচিত।

সূর্য উঠল। বেলা আটটা না বাজতেই ট্রপিকাল গ্রীষ্মের রোদের কী তেজ! আরও এক ঘণ্টা কাটল। বড় কষ্ট হচ্ছে তপনের। জিভটা শুকিয়ে ফুলে উঠেছে। গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চায় না। তেষ্টায় যেন ছাতি ফেটে যাবে। চারপাশে এত জল। অকূল পাথার জলের ভাণ্ডার। তবু তৃষ্ণা নিবারণের উপায় নেই। তপন ভাবে, আচ্ছা কখনো কখনো কতক্ষণই তো জল না খেয়ে কাটাই। তেষ্টায় এত কাতর হই না। এখন কেন এত কষ্ট? জল নেই। চাইলে পাব না এই সত্যটাই বুঝি অভাবকে এত তীব্র করে তুলেছে। কিছুকে পাওয়া যাবে না। জানলেই তার প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা বেশি তীব্র হয়। মরুভূমিতে তৃষ্ণার কবলে যারা পড়ে তাদেরও এমনি কষ্ট হয়? বোধহয় না। এই জলের রাজ্যে বসে তেষ্টার জল না পাওয়া আরও কষ্টকর।

তপনের মাথা ঝিমঝিম করছে। বারো ঘণ্টার ওপর সে প্রায় কিছুই খায়নি। অন্যরাও কেউ খায়নি ভয়ে। কারণ খেলে গলা আরও শুকিয়ে যাবে। তেষ্টা বাড়বে। সকালে টিন খুলে টোমাটো-সস দিয়েছিল ডন। সেই সামান্য খেয়েছে। দুটো নারকেল ছিল। মাঝিরা খেয়েছে তার জল ও শাঁস।

ওয়াইজিও ছাড়িয়ে পথে দুদিন বৃষ্টি হয়েছিল। নৌকোয় বসে তখন কী বিরক্তিকরই না লেগেছিল! আহা এখন যদি বৃষ্টি নামে। নাঃ, কোনো আশা নেই। নির্মেঘ আকাশ।

আলী ছিল হালে। চেঁচিয়ে উঠল, 'পুলো, পুলো!'

মালয় ভাষায় পুলো মানে দ্বীপ। সকলে দেখল সাগরের বুকে জেগে উঠেছে একটা কালো বিন্দু। বড় জোর মাইল তিন দূরে।

কী আশ্চর্য! অমনি শরীরের জ্বালা কমে গেল তপনের। আর ভয় কী!

দ্বীপটা থেকে মাইলখানেক দূরে, হঠাৎ দমকা হাওয়ার ঝাপটা লাগতে লাগল নৌকোর গায়ে। ফুলে ওঠা পালের কাপড় বেঁকে যাচ্ছে। নৌকো সরে যাচ্ছে ডাইনে!

'হে ভগবান, হে আল্লা বাঁচাও'—চিৎকার করে উঠল মাঝিরা। এই দ্বীপ ফসকালে যে আর নিস্তার নেই। তিলে তিলে অতি নিষ্ঠুর পরিণতি।

পোকো চটপট পালের কাপড়গুলো সামান্য বাঁকিয়ে কী সব কারিকুরি করল। চার মাঝি হাতে তুলে নিল দাঁড়। প্রাণপণে নৌকোর গতি ঘোরাতে চেষ্টা করে।

বেচারা মাঝিরা। বারবার ঠোঁট চাটছে। সেই কখন একটু জল খেয়েছে। শরীরে শক্তি আর বুঝি কিছু অবশিষ্ট নেই। তপন ফের বুকের ভিতর শুকনো জ্বালাটা টের পায়।

ডন ঢুকে গেল ছইয়ের ভিতর। বেরিয়ে এল হাতে একটা ওয়াটার-বটল। তপনের কাছে এসে বলল, 'এক ঢোক খাও।' বোঝা গেল এই শেষ সম্বলটুকু সে বাঁচিয়ে রেখেছিল চরম দুঃসময়ের জন্য।

মাত্র এক ঢোক গলা দিয়ে নামতেই দেহ যেন জুড়িয়ে গেল তপনের। প্রাণ আরও চায় কিন্তু উপায় নেই।

ডন এবার দাঁড়াল দত্তদার সামনে। দত্তদা ইশারায় বোঝালেন, আগে মাঝিদের দাও। মাঝিরাও এক ঢোক করে পেল। আলী আরও চায়। তার চোখে কাতর অনুরোধ। ওকে

দিতে হল আর একটু। ডন কিন্তু নিজে খেল না। দত্তদাও না। অর্থাৎ ফুরিয়ে গেছে জল। বড় লজ্জা হল তপনের। ডন ও দত্তদা নির্বিকার।

ওইটুকু জল যেন নতুন জীবন দিল। ঝপাঝপ দাঁড় পড়ছে। দ্বীপ কাছে এগিয়ে আসছে। শ-দুই হাত এমনি যাওয়ার পর পোকো বলল, 'ব্যস, দাঁড় থামাও। আর খেটে দরকার নেই। ভরা পালই নৌকোকে নিয়ে যাবে ঠিক জায়গায়।'

ছয়

নৌকো স্পর্শ করল মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এর পশ্চিম প্রান্তের একটি দ্বীপ। সমুদ্রগর্ভের কোনো পাহাড়ের চূড়া জলের বাইরে দ্বীপ হয়ে জেগে আছে। চার-পাঁচশো ফুট উঠেছে অন্তত। পাহাড়ের গায়ে উদ্ভিদের আবরণ।

দত্তদা বললেন, 'মাঝিরা বিশ্রাম করুক। এবার আমরা বেরব জল খুঁজতে।'

পোকো কিন্তু ছাড়ল না। সেও সঙ্গে চলল।

দত্তদা তপনকে বললেন, 'তুমি নৌকো থেকে দূরে যেও না। কাছাকাছি খোঁজো। না হয় আমার সঙ্গে চলো।'

তপন একাই খুঁজতে চাইল।

জলের ধারে ধারে খানিক চক্কর দিল তপন। ঝরনা, নদী বা জমে থাকা বৃষ্টির জলের কোনো চিহ্ন নেই। সে পাহাড়ে উঠতে লাগল।

পাহাড়ের গায়ে ছোট-বড় গাছ—ক্যাসুয়ারিনা, স্ক্রু-পাইন, মানুষ-সমান উঁচু ফার্ন। একজাতীয় ডুমুর গাছ। লালচে মাটি ধুয়ে বেরিয়ে পড়েছে খোঁচা খোঁচা পাথর। বার কয়েক তপন হোঁচট খেল। নেহাৎ পুরু চামড়ার জুতো ছিল পায়ে, তাই পা কাটেনি। অনেক পাখি চোখে পড়ছে। কাঠবেড়ালী, বুনো শুয়োরও দেখল। এরা জল খায় কোত্থেকে?

প্রায় নাকের ডগায় লাফ দিয়ে পড়ল একটা প্রকাণ্ড বীভৎস দেখতে মাকড়শা। ছিটকে পিছিয়ে এল তপন। সে শুনেছে, এমনি মাকড়শার কামড়ে ভীষণ বিষ।

উঠতে উঠতে বুকে হাঁপ ধরে। মাটিতে বসে জিরোয় তপন। এবার নামা যাক। আমি ব্যর্থ হলাম, তবে অন্যদের অভিজ্ঞ চোখ ঠিক আবিষ্কার করবে তাদের তৃষ্ণার জল।

নামতে নামতে তপন থমকে দাঁড়াল। একটা গুহা-মুখ যেন? ভিতরটা অন্ধকার। কৌতূহলী হয়ে সে উঁকি দিল। কতটা লম্বা বোঝা গেল না। পিঠের হ্যাভারস্যাক খুলে বের করল টর্চ। আলো ফেলে মনে হল গুহাটা বেশ গভীর। আলো শেষ অবধি পৌঁছচ্ছে না। কেমন বোঁটকা গন্ধ। মেঝেয় আলো ফেলে দেখল, মাটিতে জলের দাগ। দত্তদা শিখিয়েছিলেন যে, জল বয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখলে অনুসরণ করবে। ঝরনার উৎস বা বৃষ্টির জমা জল খুঁজে পেতে পারো।

গুহাটা নিচু দিকে গড়ানো। ভিতরে ঢুকল তপন। যদি বুনো জানোয়ার বা সাপ থাকে? এখানে হিংস্র জন্তু নেই শুনেছে। তবে বিষাক্ত সাপ থাকতে পারে বইকি! কোমরে ঝোলানো মোটা বেঁটে বেতের লাঠিটা এক হাতে, অন্য হাতে টর্চ জ্বেলে তপন পা টিপে টিপে এগোল— জলের ধারার চিহ্ন অনুসরণ করে।

বিকট বোঁটকা গন্ধটা তীব্র হল। মাথার ওপর কীসের নড়াচড়া? ছাদে আলো ফেলে তপন চমকে গেল। সারি সারি বাদুড় ঝুলছে উল্টো মুখে। আঁধারের জীব। আলোর আবির্ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যাক, বাদুড়কে ভয় করার কিছু নেই। এগোল তপন।

বারবার টর্চের জোরাল আলো পড়তে কিছু বাদুড় উড়তে শুরু করল। তারা বাইরে দিনের আলোয় গেল না। গুহার মধ্যেই পাক খেতে থাকে। স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে কাটিয়ে যায় তপনকে। মাঝে মাঝে উড়ন্ত জীবগুলোর ডানার শীতল ছোঁয়া লাগে। গা শিরশির করে ওঠে। আর এগোতে ভরসা পায় না তপন। ডাইনে দরজার মতো একটা ফাটল। গুহার শাখা। তার ভিতরে সে পা বাড়ায়। একঝাঁক বাদুড় ভেসে আসে অন্ধকার ভেদ করে।

তাদের এড়াতে গিয়ে তপন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গড়াতে গড়াতে নেমে চলল পাথুরে ঢালু জমি বেয়ে। তারপর আছড়ে চিৎপাত হয়ে পড়ল কঠিন ভূমিতে।

বোধহয় চার-পাঁচ সেকেন্ড সম্বিত ছিল না তপনের। হুঁশ হতে উঠে বসল। দেহে কয়েক জায়গায় দারুণ ব্যথা। টর্চটা হাত ফসকে গেছে। হাতড়ে হাতড়ে সে টর্চ খোঁজে। ভিজে

ভিজে জমি। তারপরই শিহরণ। জল! কনকনে ঠাণ্ডা জলে হাত পড়েছে। আঁজলা করে একটু জল নিয়ে তপন মুখে দিল। আঃ কী চমৎকার! গলা জিভ জুড়িয়ে গেল। পেট ভরে সে জল খেল। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিল। হাত দিয়ে অনুভব করল একটা জলের কুণ্ড। এগোতে আর সাহস হল না। কত গভীর কুণ্ড কে জানে! ওপরে তাকাল। ক্ষীণ আলোর রেখা ফাটলের মুখে প্রায় হাত কুড়ি ওপরে। চোখ একটু সয়ে যেতে অন্ধকার একটু ফিকে ঠেকল। ওয়াটার বটলটায় জল ভরল। তারপর দেয়াল আঁকড়ে আঁকড়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। ঢালুর ধারে অনেক খাঁজ খাঁজ, তাই ওঠাটা তেমন শক্ত হল না। বাইরে গিয়ে সে সোজা নেমে গেল নৌকোর কাছে। দত্তদারা তখনো ফেরেনি।

নৌকো থেকে ডনের বন্দুকটা নিয়ে তপন দুবার ফায়ার করল। এটা সংকেত। সবাইকে ফিরে আসতে ডাকা হচ্ছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছল ডন। তপনকে দেখে বলল, 'কী ব্যাপার, পড়ে গিছলে নাকি? তোমার কপালটা ফোলা কেন?'

ওসবে ভ্রূক্ষেপ নেই তপনের। জিজ্ঞেস করল, 'জল পেয়েছ?'

'না।' হতাশভাবে ঘাড় নাড়ল ডন।

'আমি পেয়েছি।' তপন সংক্ষেপে জানাল গুহার বিবরণ।

'কই দেখি?'

জলের বোতলটা হাতে পেতেই ডন ঢকঢক করে অনেকখানি জল খেল। বোঝা গেল কতখানি তেষ্টা চাপা ছিল তার বুকে।

মিনিট পাঁচেক বাদে এলেন দত্তদা। ডন জিজ্ঞেস করল তাঁকে—'জল পেয়েছেন?'

'না।'

'আমিও পাইনি। কিন্তু তপন পেয়েছে। চমৎকার জল।'

'সাব্বাস!' সব শুনে দত্তদা তপনের পিঠ চাপড়ে দিলেন। তিনিও জল খেলেন তৃপ্তি ভরে। ডনকে নিয়ে ছুটলেন আরও জল আনতে। তপনের কাছে জেনে নিলেন গুহাটার হদিশ। তপনকে সঙ্গে যেতে দিলেন না। বললেন, 'তুমি রেস্ট নাও।'

'আমার টর্চটা আনবেন।' মনে করিয়ে দিল তপন।

পোকোও ফিরল। সে একটা গর্তে জমা জল পেয়েছে। তবে খুবই সামান্য। জল নিশ্চয় আরও জায়গায় আছে। তবে খুঁজতে সময় লাগবে।

ঠাণ্ডা স্বাদু জল পান করে সবাই ফের তাজা হয়ে উঠল। আলী মেতে উঠল রান্নার তোড়জোড়ে। জালে পড়ল একঝাঁক অতি সুস্বাদু চাঁদা মাছ। তোফা ভাজা হবে। মাঝিরা পাহাড়ের গায়ে পাথরের খাঁজে পেল একগাদা পায়রার ডিম। টগবগিয়ে ভাত ফোটে। রাক্ষসের মতো খেল সবাই। খেয়েই গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ব্যস, ঘুম।

রাতটা সেখানেই কাটল। ভোর রাতে ফের যাত্রা শুরু হল।

মাইল দেড়েক এগিয়েছে নৌকো। জলের বুকে দেখা গেল দু-তিনটে কালো কালো বিন্দু। দত্তদা দূরবিন দিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'ডুবো পাহাড়ের চুড়ো। আরে ওটা কী! নড়ছে। এ যে মানুষ! একটা পাথরের মাথায়। ডাকছে আমাদের হাত নেড়ে। আরে কী আশ্চর্য, এ যে জিয়ান! চালাও চালাও নৌকো ওইখানে—'

তপনদের নৌকো কাছে যেতেই স্পষ্ট দেখা গেল—হাত তিরিশ উঁচু গম্বুজের মতো একখণ্ড নেড়া পাথর জলের বাইরে খাড়া হয়ে আছে, তার মাথায় গিরগিটির মতন লেপটে রয়েছে জিয়ান। নৌকো লক্ষ্য করে প্রাণপণে হাত নাড়ছে।

জিয়ানের কাছ অবধি নৌকো এগোল না। ওই গম্বুজের আশেপাশে আরও ডুবো পাহাড়। কোনোটার ডগা দেখা যাচ্ছে, কোনোটা বা জলের তলায়। জায়গায় জায়গায় জল ঘুরছে, বুজকুড়ি কাটছে ফেনা। বোঝা যায় স্রোত বাধা পাচ্ছে। শুশুকের শিরদাঁড়ার মতো কোথাও জলের ওপরে কালো পাথরের রেখা। একগাছি মোটা দড়ি ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল পোকো। একটা ছোট স্তূপের গায়ে জড়িয়ে গেল দড়ির ফাঁস। থেমে গেল তরী।

জিয়ান হাত তিরিশ দূরে। ওকে ইশারা করা হল—ঝাঁপিয়ে পড়ো। সাঁতরে এসো।

জিয়ান একটু ইতস্তত করে লাফিয়ে পড়ল জলে।

কিন্তু আধাআধি পেরোবার আগেই জিয়ান শ্রান্ত হয়ে পড়ল। হাবুডুবু খাচ্ছে। ক্রমেই ভেসে যাচ্ছে দূরে।

'ও পারছে না। ডুবে যাবে,' বললেন দত্তদা। তিনি ছুটে গিয়ে এক বান্ডিল দড়ি বের করে আনলেন। সরু লম্বা নাইলনের দড়ি। চটপট খুলতে লাগলেন নিজের পোশাক। বোঝা গেল জিয়ানকে বাঁচাতে তিনি স্বয়ং জলে ঝাঁপাতে চান।

'আপনি থাকুন,' বাধা দিল পোকো, 'আব্দুর,' সে চেঁচিয়ে ডাকল।

তৎক্ষণাৎ আব্দুর মাঝি দড়ির এক প্রান্ত কোমরে বেঁধে লাফিয়ে পড়ল জলে। দড়ির অন্য ধার রইল পোকোর হাতে।

মাছের মতো জল কেটে চলল আব্দুর। মিনিট দশেকের মধ্যেই সে ধরে ফেলল জিয়ানকে। জিয়ান দু-মুঠোয় চেপে ধরল দড়ি। নৌকো থেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনা হল দড়ি। নৌকোয় টেনে তোলা হল দুজনকে। হাঁপাতে হাঁপাতে জিয়ান চেতনা হারিয়ে ঢলে পড়ল।

খানিক শুশ্রূষার পর সুস্থ হয়ে উঠলে জিয়ানকে সকলে মিলে প্রশ্ন শুরু করল। 'ওখানে কেন? কীভাবে?'

জিয়ান যা উত্তর দিল তা মোটামুটি এই—

চ্যাং-এর সঙ্গে যাচ্ছিল জিয়ান ডিক্সন দ্বীপের খোঁজে। চ্যাং একজন শাগরেদ এনেছে। নাম তার কিচিল। মালয় ভাষায় কিচিল মানে খুদে। লোকটা কিন্তু বিরাট লম্বা-চওড়া এবং গুণ্ডা প্রকৃতির। যে দ্বীপে পাখির চামড়াটা জিপসিদের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল সেখানে তারা থামে। তারপর জিপসিদের নির্দেশমতো নৌকো চালায়। এই জায়গা দিয়ে যখন যাচ্ছিল জিয়ানরা তখন সন্ধেবেলা। ছইয়ের গা ঘেঁষে বাইরে বসেছিল জিয়ান। ভিতরে ছিল চ্যাং ও কিচিল। তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল জিয়ান। এটা সেটা কথার পর কিচিল বলে ওঠে— 'পাখি পাব তো?'

'মনে তো হয়।' চ্যাং জবাব দেয়।

'যদি না পাই?'

'তাহলে মুশকিল। প্রিন্সের কাছে ধ্যাতানি খেতে হবে। এত খরচপত্তর দিয়েছে। তবে মনে হয় জিয়ানের খবর ঠিক।'

'ওঃ, পেলে কিন্তু দারুণ দাঁও। প্রিন্স আমাদের লক্ষপতি করে দেবে বলেছে। আচ্ছা জিয়ানকে কত দেবে? মানে যদি পাখি পাওয়া যায়?'

খিকখিক করে চ্যাং-এর হাসি শোনা যায় এবং বলে, 'জিয়ান? ফুঃ! একটি পয়সাও নয়। ওর ভাগটা আমরা নেব।'

'না দিলে ছাড়বে কেন? কষ্ট করে নিয়ে এল পথ দেখিয়ে,' বলল কিচিল।

'নেবার জন্যে ও বেটা তখন থাকলে তো?'

'মানে?'

'মানে ওটাকে আগেই সাবড়ে দেব। নতুন জাতের প্যারাডাইস বার্ড-এর ঠিকানা প্রিন্স আর আমরা দুজন ছাড়া আর কারও জানা থাকবে না। এই জন্যেই মাঝিগুলোকে এনেছি দূর থেকে। ওরা এ-পথে আসে না। ওরা বুঝতেও পারবে না পাখিগুলোর দাম কতখানি! তাছাড়া ভয় দেখিয়ে, টাকা দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে দেব—খবরদার কাউকে বলবে না যে এখানে প্যারাডাইস বার্ড পাওয়া গেছে।'

'জিয়ানকে মারবে কেন? ওর মুখও যদি বন্ধ করা যায়?'

'এখন বন্ধ করা যাবে। কিন্তু পরে যদি বেটা ফাঁস করে দেয়। প্রিন্সের বেইজ্জত হবে। না না ওকে রাখা চলবে না। শেষে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

'মাঝিরা যদি বলে ফেলে পরে?'

'ওরা কাকেই বা বলবে? কিন্তু জিয়ান হয়তো বলে দেবে ব্যাংককের সেই প্রফেসরকে।'

'ওকে শেষ করবে কখন?' জিজ্ঞেস করে কিচিল।

চ্যাং বলে ওঠে, 'এখনই করা যায়। মাথায় মোক্ষম এক ঘা মেরে নৌকো থেকে দেব ফেলে। তবে মাঝিরা যেন টের না পায়। ভড়কে যাবে। ঝামেলা করবে। থাক বরং সামনের দ্বীপে যেখানে থামব, সেখানেই ডাঙায় নেমে ওকে লুকিয়ে খতম করে ফেলে দেব জলে। ওকে আর আমাদের দরকার কী?'

চ্যাং-এর এই কথা শুনে জিয়ানের দারুণ ভয় হয়। উঃ, কী শয়তান! আর অপেক্ষা করতে তার সাহস হয়নি। অন্ধকারেই সটান লাফিয়ে পড়েছিল জলে। ইচ্ছে ছিল কাছের দ্বীপটায় গিয়ে উঠবে। কিন্তু পারেনি। স্রোতের টানে যখন সে ক্রমে দূরে ভেসে যেতে থাকে, তখন কাছে পেয়ে আঁকড়ে ধরেছিল এই ডুবো পাহাড়ের গা। তারপর প্রাণের তাগিদে কী করে যে এর ডগায় চড়ে বসল তা সে নিজেই জানে না। এক দিন, এক রাত, সে ওই পাথরটার ওপর বসেছিল। জোয়ারের জল উঠেছিল পায়ের নিচে তিন-চার হাতের মধ্যে। ভাগ্যিস ঝড়-তুফান আসেনি!

'প্রিন্স এই আবিষ্কারটা নিজের নামে চালাতে চায় বুঝি?' দত্তদা জিজ্ঞেস করলেন।

'হুঁ।' ঘাড় নাড়ল জিয়ান।

দত্তদার মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে। তিনি ডনের সঙ্গে একবার অর্থপূর্ণ ভাবে চোখাচোখি করলেন। ভাবখানা যেন, ঠিক যা ভেবেছি।

'চ্যাং টের পেয়েছিল তোমার পালানো?' জানতে চাইলেন দত্তদা।

'হ্যাঁ, জলে শব্দ হতেই বেরিয়ে এসেছিল। মাঝিরা আমায় বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু চ্যাং বারণ করে থামিয়ে দেয়। আমি যে ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়েছি হয়তো তা বোঝেনি। ভেবেছিল, আপদ গেল, বেকায়দায় পড়ে গেছি জলে।'

জিয়ান মাথা নিচু করে বলল, 'লোভে পড়ে আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম, সেই পাপেরই ফল।'

'চ্যাং কোন দিকে গেছে?' দত্তদার প্রশ্ন।

'ওই দিকে,' হাত তুলে দেখাল জিয়ান, 'ওই দিকটাই দেখিয়েছিল জিপসিরা।'

আবার তপনদের নৌকো ছাড়ল। চ্যাংদের অনুসরণ করে যাত্রা শুরু হল।

মিনিট পনেরো কেটেছে, সহসা কানে এল একটা গুমগুম শব্দ। আওয়াজটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। যেন একটা ভারী ট্রেন গড়িয়ে আসছে। ঝড় আসছে নাকি? পোকো চটপট পাল নামিয়ে ফেলল। না, ঝড় নয়। পিছনে অনেক দূরে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। অন্তত সিকি মাইল বিস্তার, মাথায় ফেনার রেখা, ফেঁপে ওঠা বিশাল জলস্রোত হু-হু করে ধেয়ে আসছে। দেখতে দেখতে সেই জলোচ্ছ্বাস ভয়ঙ্কর গর্জনে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। গঙ্গায় কোটালের বানে এমনি ধেয়ে আসা ঢেউ, এমনি জলের গর্জানি দেখেছে তপন। তবে এ আরও বিরাট, আরও প্রচণ্ড ব্যাপার।

'শুয়ে পড়ুন। ধরে থাকুন নৌকো,' চেঁচিয়ে উঠল পোকো। তার কথা শেষ হতে না হতেই নৌকোটা যেন সোজা লাফ দিয়ে উঠল শূন্যে। পলকের জন্য ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বসেই তলিয়ে গেল নিচে। তবে ডুবল না। প্রধান ঢেউটা পেরিয়ে যাওয়ার পর সমুদ্র টগবগ করছিল। নৌকো থরথর করে কাঁপছিল, দুলছিল, নাচছিল। সবাই শক্ত মুঠোয় কাঠ বাঁশ আঁকড়ে ধরেছিল, নইলে ছিটকে পড়ত জলে।

মিনিট দশেকের মধ্যে সমুদ্র শান্ত হয়ে গেল। ডন বলল—'ভূমিকম্প। তারই ফল। এখানে সমুদ্রগর্ভে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়।'

দত্তদা জিয়ানকে বললেন, 'ওই পাথরটার ওপরে থাকলে কী অবস্থা হত বুঝেছ?'

জিয়ান শিউরে উঠল। সবাই দেখেছিল, ফণা তুলে ধেয়ে আসা তরঙ্গটি জিয়ানের আশ্রয়স্থল ডুবো পাহাড়টার মাথাটাকে কেমন সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছিল। ওখানে থাকলে জিয়ান নির্ঘাত মরত।

একটু বাদেই ফের গুমগুম আওয়াজ। আবার সেই রকম তরঙ্গের আবির্ভাব। আবার সেই নাকানি-চোবানি। পরপর আটটি ঢেউ এল ছুটে, ঘণ্টাখানেকের ভিতরে।

নৌকোয় যাত্রীরা সবাই অল্পবিস্তর আঘাত পেল। জিনিসপত্র ছত্রাকার। কিছু ভেঙেও ছিল। ঢেউয়ের দোলায় নৌকো কিন্তু মোটেই এগোয়নি। প্রায় একই জায়গায় ছিল।

সাত

বিকেলে নৌকো নোঙর ফেলল এক দ্বীপে। জোড়া দ্বীপ এখনো নজরে আসেনি। দত্তদা বললেন, 'এখন খানিক বিশ্রাম। এখানে ঝরনা আছে, এটা মস্ত সুবিধে। কাল সকালে ফের রওনা হব।'

একজন মাঝি দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, 'আসাপ্! আসাপ্!'

মালয় ভাষায় আসাপ্ মানে ধোঁয়া। কোথায়? দ্বীপের অন্য ধারে গিয়েছিল লোকটি। সেখান থেকে দেখেছে—দূর সাগরের বুকে ধোঁয়া।

সবাই গেল সেই ধারে। কিছু দূরে এক পাহাড়ি দ্বীপ। তার ওপর ধোঁয়া জমেছে। কারখানার চিমনি দিয়ে যেমন ধোঁয়া বেরোয়, তেমনি দ্বীপের পাহাড়ের নেড়া চুড়োটা থেকে ধোঁয়ার রাশি আকাশে উঠে জমাট বাঁধছে—ছাতার মতো দেখতে যেন একখণ্ড গাঢ় কালো মেঘ।

পোকো বলল, 'আপি পুলো।' অর্থাৎ আগুনে দ্বীপ।

আলী চমকে উঠে বলল, 'বাবা বলেছিল, পাশাপাশি দুটো দ্বীপের একটা আগুনে দ্বীপ। তবে এখন ঠাণ্ডা। মানে জোড়া দ্বীপের একটা, যেখানে গিয়েছিল বাবা ডিক্সন সাহেবের সঙ্গে।'

দত্তদা দূরবিনে দেখে বললেন, 'জোড়া দ্বীপ তো কই দেখছি না। এই অঞ্চলে এমনি অ্যাকটিভ ভলক্যানো কিছু আছে। অনবরত ধোঁয়া বেরোয়। কখনো কখনো বিস্ফোরণও হয়।'

পোকো বলল, 'ধোঁয়া বেরোয় এমন দ্বীপ এখানে আছে কই শুনিনি? হয়তো অল্প কিছু দিন হল বেরোচ্ছে।'

পরদিন দত্তদা বললেন, 'আমি ওই আগ্নেয় দ্বীপটা থেকে একবার ঘুরে আসি। দেখতে চাই ওটার আড়ালে কোনো দ্বীপ আছে কিনা। ওখানেই কি ডিক্সন অ্যাইল্যান্ড? বিকেলের আগেই ফিরে আসব। মাইল তিনেকের বেশি তো দূর নয়।'

তপন বলল, 'বেশ, সবাই মিলে যাই।'

দত্তদা বললেন, 'না। এখুনি ওই দ্বীপে সবাই হাজির হওয়া ঠিক হবে না। দ্বীপটার অবস্থা

সুবিধের নয়। যা ধোঁয়া বেরুচ্ছে! আমি শুধু পোকো, আলী এবং আর একজন মাঝিকে নিয়ে যাব। অন্যরা এখানে বিশ্রাম নিক।'

ডন বলল, 'আমিও যাব।'

দত্তদা বললেন, 'কোনো দরকার নেই।'

ডন বলল, 'ধরুন ওটাই ডিক্সন আইল্যান্ড। এবং চ্যাং ইতিমধ্যে ওখানে আড্ডা গেড়েছে। তখন? অমি তাই সঙ্গে যেতে চাই।'

'হতে পারে,' বললেন দত্তদা, 'তোমাকে এখন সঙ্গে নেব না। তোমার আঙুলে জখম। রেস্ট দরকার। চ্যাং থাকলে আমি গোঁয়ারের মতো ওদের মুখোমুখি হব না নিশ্চয়ই। লুকিয়ে পালিয়ে আসব। তারপর পন্থা স্থির করা যাবে, কীভাবে ওদের উৎখাত করব। তখন তোমার সাহায্য লাগবে বইকি!

দত্তদা একাই নৌকো আর কয়েকজন মাঝিকে নিয়ে সেই ধূমায়িত দ্বীপের উদ্দেশে রওনা হলেন।

সেদিন বিকেল গেল। সন্ধে গেল। রাত্রি নামল। দত্তদারা কিন্তু ফিরলেন না।

সমুদ্রতীরে অপেক্ষা করে ডন ও তপন। তাদের দৃষ্টি জলের দিকে। এখনও কেন ফিরলেন না দত্তদা! দুপুরে ঝোড়ো হাওয়া বয়েছিল খানিকক্ষণ। তাতে কি নৌকো ডুবতে পারে? না, অন্য কোনো বিপদে পড়লেন? দুজন কখনো বসছে, কখনো অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। যদি দত্তদা না ফেরেন? নৌকো ছাড়া তারা যে এই দ্বীপে বন্দী। বেরিয়ে খোঁজখবর করারও উপায় নেই। এই দ্বীপ থেকে মুক্তির উপায় একদিন ঠিকই হবে কিন্তু দত্তদাকে ছাড়া ফিরতে হবে নাকি? এ ঘটনাটি স্বীকার করার কথা মনে এলেই বুক হিম হয়ে যাচ্ছে তপনের। কোন্ মুখে সে বৌদির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ব্যাংককে ফিরে?

মাঝরাত। ফুটফুটে জ্যোৎস্নার আলো। ডন বলল, 'কী যেন একটা আসছে। মনে হচ্ছে নৌকো।'

ঠিক তাই। লাফিয়ে উঠল তপন। নৌকো এসে নোঙর ফেলল তীরে। ছুটে কাছে গেল দুজনে।

নৌকো থেকে নামল পোকো, আলী আর একজন মাঝি। কিন্তু দত্তদা কই? পোকো জানাল যে, আগ্নেয় দ্বীপের ঠিক পিছনে আছে আর একটা দ্বীপ। সেই দ্বীপে যখন তারা পৌঁছয় তখন দুপুর। দ্বীপ থেকে ভেসে আসে কতকগুলো শব্দ। মনে হল কেউ কাঠ কাটছে। দত্তদা বললেন যে, উনি দ্বীপে উঠে একবার উঁকি দিয়ে আসবেন। পোকোরা নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। দত্তদা তীরে উঠে ঢুকে যান ভিতরে।

অল্পক্ষণ বাদে হঠাৎ একটা লোক এসে দাঁড়ায় তীরে। লম্বা-চওড়া এক শ্বেতাঙ্গ। হাতে বন্দুক। সে চিৎকার করে কী জানি বলে। তারপর বন্দুক তাক করে নৌকো লক্ষ্য করে। বেগতিক বুঝে পোকো নোঙর তুলে ফেলে। লোকটা গুলি চালায় একবার। ভাগ্যিস নৌকোর কারোর গায়ে লাগেনি! তখন প্রাণভয়ে দাঁড় টেনে পালায় মাঝিরা। হা-হা অট্টহাসি দেয় লোকটা। বন্দুক তুলে বুঝিয়ে দেয়, কাছে এলেই গুলি করবে।

পোকো নৌকো নিয়ে দূরে সরে গিছল। মতলব ছিল, ঘণ্টাখানেক বাদে আবার ওখানে ফিরে দত্তদাকে তুলে নেবে। কিন্তু ঝোড়ো বাতাস উঠল। নৌকোকে টেনে নিয়ে গেল অনেক তফাতে। যখন ফেরার সুবিধে হল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকারে ওই

বিপজ্জনক দ্বীপের কাছে যেতে ভরসা হয়নি তাদের। কারণ দ্বীপটার ধারে ধারে প্রচুর প্রবাল প্রাচীর। ভয়ে তাদের বুদ্ধিসুদ্ধিও কেমন গুলিয়ে গেছিল। কী করবে ভেবে না পেয়ে আপাতত নিজেদের আস্তানাতেই ফিরে এসেছে।

'চল এখুনি, দত্তদাকে উদ্ধার করে আনি,' তপন উত্তেজিত। ডন খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'এখন নয়। এখন গেলে পৌঁছতে সকাল হয়ে যাবে। ওরা দেখে ফেলতে পারে। আমরা ডাঙায় ওঠার আগেই গুলি চালালে বিপদে পড়ব। যাব কাল রাতে। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। প্রফেসর ঠিকই সব লক্ষ্য রেখেছেন এবং সাবধানে লুকিয়ে থাকবেন। ওটা যে আমাদের নৌকো ওরা বুঝতে পারেনি। ভেবেছে, সাধারণ জেলে-নৌকো। তাই ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চেয়েছে।'

'ওটাই কি ডিক্সন আইল্যান্ড?' তপন জিজ্ঞেস করল।

'তাই মনে হচ্ছে, নইলে চ্যাং ওখানে আড্ডা গাড়বে কেন?' বলল ডন।

রাতে রওনা হল তপনরা।

আগ্নেয়দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে তপনদের নজরে এল ডিক্সন আইল্যান্ড। আগ্নেয়গিরির ধোঁয়ায় সেখানকার আকাশে চাঁদের আলো আড়াল হয়ে গেছে। এক হিসেবে ভালোই হল। সহজে কারো নজরে আসবে না আগুয়ান নৌকোখানি। তীর আর বড়জোর পঞ্চাশ হাত। পোকো বলল, 'সামনে প্রবাল প্রাচীর। আর এগনো বিপজ্জনক।'

এইখানেই নেমেছিলেন দত্তদা। তখন দিনের বেলায় প্রবাল প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে নৌকো তীরের কাছে গিয়েছিল। এখন রাতে কিছু বোঝার উপায় নেই।

'ওই দেখ একটা আলো,' দেখাল আলী।

সমুদ্রতীরে জলের ধারে একটা ছোট্ট বৃত্তাকার আলো। জ্বলছে আর নিভছে। ও আলো টর্চের। কেউ সংকেত জানাচ্ছে। নিশ্চয়ই দত্তদা।

নৌকো থেকে আলোর সংকেত দিতে ভয় হল। যদি চ্যাং-এর দলের কারও চোখে পড়ে যায়? ডন বলল, 'আমি গিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছি প্রফেসরকে। আমাদের জবাব না পেলে নৌকোয় আসতে ভরসা পাচ্ছেন না উনি। এখানে ঢেউ বেশি নেই। পাথরগুলোর পাশ কাটিয়ে সাঁতরে যাব অনায়াসে।'

'আপনি নয়, আমি যাই,' বলল জিয়ান।

'কেন?'

'ধরুন প্রফেসর ওদের হাতে বন্দী। আর ওই আলোর সংকেত হচ্ছে ফাঁদ। চ্যাং-ই আলো দেখাচ্ছে, আমাদের কাছে টেনে এনে বেকায়দায় ফেলে আক্রমণ করার মতলবে। আপনিও বন্দী হলে সর্বনাশ। প্রফেসরকে রক্ষা করার জন্যই আপনার মুক্ত থাকা দরকার। আমি বন্দী হলেই বা ক্ষতি কী? আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। দয়া করে, ঋণটুকু শোধ করার সুযোগ দিন।'

ডন একটু ভেবে বলল, 'বেশ তুমিই যাও। যদি সত্যি ফাঁদ হয়, একটা চিৎকার দিয়ে আমাদের সাবধান করে দিও।'

সেই মিটমিটে জ্বলা-নেভা আলোর দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বলল ডন, 'যদি প্রফেসরের কোনো ক্ষতি করে ওরা, আমি ঠিক ওই দ্বীপে উঠব লুকিয়ে। তারপর পাগলা

কুকুরের মতো গুলি করে মারব সব কটাকে।'

জলে নেমে নিঃশব্দে অদৃশ্য হল জিয়ান।

নৌকোর আরোহীরা প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠ। আলোটা আর জ্বলছে না। দত্তদার দেখা পেল কি জিয়ান? না, চেঁচিয়ে ওঠার আগেই ওকে স্তব্ধ করে দিয়েছে ধূর্ত চ্যাং?

সহসা নৌকোর ধারে ভেসে ওঠে দুটি দেহ।

'ডন—' দত্তদার গলা।

সবাই ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াল। নামিয়ে দেওয়া হল দড়ির সিঁড়ি।

প্রথমে উঠলে দত্তদা। তারপর জিয়ান। ডন জিয়ানের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ওয়েল ডান। থ্যাঙ্ক ইউ।'

একটু জিরিয়ে নিয়ে দত্তদা বললেন, 'দোহাই, আগে কিছু খেতে দাও। পেট জ্বলছে।'

ফ্লাস্ক থেকে ঢালা গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বিস্কুট চিবুতে চিবুতে দত্তদা বললেন তাঁর অভিজ্ঞতা।—হ্যাঁ, ওটা ডিক্সন আইল্যান্ড সন্দেহ নেই। দত্তদা প্যারাডাইস বার্ড-এর ডাক শুনেছেন। ঝোপ ও পাথরের আড়াল থেকে লক্ষ করেছেন চ্যাংদের। চ্যাং-এর দলে চার জন মাঝি। আর রয়েছে চ্যাং ও ঢ্যাঙা কিচিল। ওরা পাখি ধরছে। জালের ফাঁদ নিয়ে যেতে দেখেছেন মাঝিদের। হতভাগারা পাখি মারছেও। চ্যাংকে দেখেছেন দত্তদা, একটি মৃত প্যারাডাইস বার্ড হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে। তবে বার্ড অফ প্যারাডাইসের নতুন স্পিশিস ওরা ধরতে পেরেছে কিনা ঠিক জানেন না। বেশি কাছে যেতেও ভরসা হয়নি।

দত্তদা বললেন, 'কাল রাতেই ডিক্সন আইল্যান্ডে চড়াও হতে হবে। রাতদিন ওরা সমুদ্রে নজর রাখে চ্যাং আর কিচিলকে কাবু করতে পারলেই কেল্লা ফতে। শুধু ওদের দুজনেরই বন্দুক আছে। বার্ড অফ প্যারাডাইস হত্যা বেআইনি। এই অপরাধেই ওদের গ্রেফতার করা যাবে। তারপর আমরা নতুন স্পিশিসটার সন্ধান করব। সাবধান, বিষাক্ত সাপ আছে দ্বীপটায়। ভীষণ বিষাক্ত ডেথ অ্যাডার। আমি দেখেছি নিজের চোখে। হয়তো এই ভয়েই ও দ্বীপে কেউ যায় না।'

দত্তদাকে সঙ্গে নিয়ে সবাই নৌকোয় ফেরে ডিক্সন আইল্যান্ড থেকে।

পরদিন সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

আসন্ন লড়াইয়ের সম্ভাবনায় মাঝিদের কী উৎসাহ! তাদের কথাবার্তা শুনে তপনের ধারণা হল যে, অকারণে তাদের ওপর গুলি ছোঁড়ার জন্য মাঝিরা চ্যাং ও কিচিলের ওপর বেজায় চটে আছে। তারা জিয়ানের মুখে শুনেছে, চ্যাং লোকটা পাক্কা শয়তান। দা, কুঠার, লাঠি, তির, ধনুক ইত্যাদি হাতিয়ার জোগাড় হল। একটাই বন্দুক। সেটা নেবে ডন।

আট

দুপুরে হঠাৎ গুরগুর আওয়াজ শোনা গেল, চাপা মেঘগর্জনের মতো। সবাই সমুদ্রতীরে ছুটে গিয়ে চাইল পাশের দ্বীপে আগ্নেয়গিরিটার দিকে। দেখল, সেই পাহাড়ের চুড়ো দিয়ে ধোঁয়া উঠছে আরও মোটা হয়ে। দ্বীপের মাথায় ধোঁয়ার মেঘ বিশাল হয়ে উঠেছে।

গুরগুর ধ্বনি আর থামে না। কমে, আবার বাড়ে। মাঝে মাঝে পায়ের তলার মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ডন বলল, 'প্রফেসর, আজ আমাদের অভিযান বন্ধ রাখতে হবে। এখন ওই দ্বীপের কাছে ঘেঁষা খুব বিপজ্জনক।'

দত্তদা অস্থির হয়ে বললেন, 'কিন্তু চ্যাং যে সব পাখি শেষ করে দেবে।'

ডন বলল, 'চ্যাং নেহাত গাধা না হলে এখনও ডিক্সন দ্বীপে বসে থাকবে না।'

দত্তদা উত্তেজিতভাবে কী বলতে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই যেন প্রলয় ঘটল। দ্বীপটা এমন কেঁপে উঠল যে সবাই টলে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে কানফাটা আওয়াজ। আকাশ-বাতাস যেন চৌচির হয়ে গেল। সবার নজরে এল, আগ্নেয়গিরির চুড়োর মুখ দিয়ে আগুনের শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে আকাশ ছুঁচ্ছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ফুঁসে উঠছে—বিপুল আকারে আগুনরাঙা কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি। সে দৃশ্য যেমনই সুন্দর, তেমনই ভয়ঙ্কর।

প্রচণ্ড ভারী কী একটা আছড়ে পড়ল শ-খানেক হাত তফাতে ঝোপের ওপর। সবাই দেখল ফুটবলের আকারের একখানা পাথর, জ্বলন্ত কয়লার মতো গনগনে লাল। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপটা জ্বলে উঠল।

ডন চেঁচাল, 'পালাও পালাও। পাথর ছিটকোচ্ছে। আড়ালে চলো।'

দ্বীপের অপর প্রান্তে ছোট এক গুহার মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নিল সবাই। আরও কয়েকখানা পাথর পড়ার শব্দ হল। মাঝে মাঝে ভীষণ জোরে জোরে ছ্যাঁক ছ্যাঁক আওয়াজ। জ্বলন্ত

পাথর এসে পড়ছে সমুদ্রের জলে! হাওয়া তেতে উঠেছে। রীতিমতো গরম লাগছে। ভেসে আসছে গন্ধকের বিশ্রী কটু গন্ধ। এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস বইছে প্রবল বেগে। সাগরে উথাল- পাথাল ঢেউ।

সন্ধ্যার সময় আর একবার বিরাট বিস্ফোরণ ঘটল। থরথর করে কেঁপে উঠল তপনদের দ্বীপ। ফের একদফা জ্বলন্ত পাথর-বৃষ্টি। জ্বলে উঠল অনেক ঝোপ-জঙ্গল। সেই গুরুগুরু ধ্বনি এবং মৃদু মৃদু ভূকম্পন সমানেই হচ্ছিল। উন্মত্ত সাগরের কলরোল এবং বাতাসের হু-হু শব্দে কানে তালা লাগে। ঝড়ের দাপটে গুহার বাইরে বনভূমি যেন ছিন্নভিন্ন হচ্ছে।

দত্তদা তপনের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'কি, ভয় করছে?'

মাথা নাড়ল তপন। বাইরে স্বীকার না করলেও তপন ভাবল, ভয়? হ্যাঁ, তা করছে বইকি! এ কী মহাদুর্যোগ! বিপদের এমন ভয়াল রূপ তার কল্পনার বাইরে। এক-একটা প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন চমকে লাফিয়ে উঠছে তার হৃৎপিণ্ডটা। প্রকৃতির এই তাণ্ডবে নিজেকে মনে হচ্ছে কত তুচ্ছ অসহায়। ভয় ও বিপদের সঙ্গে তাঁর কি কখনো পরিচয় হয়নি? হয়েছে বইকি! কলকাতা শহরের পথেঘাটে কত বিপদ! কত রকম দুর্ঘটনা, খুনোখুনির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু এই বিপদের ধরন আলাদা।

শহুরে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সে হাঁপ ছেড়েছে। একটা বিভীষিকাময় স্মৃতি। ওই বিপদ ও ভয়ের স্মৃতি মুছে ফেলতে চায় মন। কিন্তু আজকের এই বিপদ থেকে যদি সে রক্ষা পায়, এর স্মৃতি তার মনে চিরকাল থাকবে। ইচ্ছে করেই সে বাঁচিয়ে রাখবে এর স্মৃতি। এই বিপদ, এই দুর্যোগের কথা সে মনে রাখবে গর্বের সঙ্গে। এ বিপদ যে সাধ করে ডেকে আনা। এর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ায় বীরত্ব। হাত-জিত দুই-ই গৌরবের।

রাত নামল। ছোট ছোট বিস্ফোরণ বার কয়েক হলেও সৌভাগ্যের বিষয় বড় বিস্ফোরণ আর ঘটল না। আগ্নেয়গিরির গর্জানি এবং ভূমিকম্পের বেগ ক্রমে ক্ষীণ হতে হতে থেমে গেল। সমুদ্র ও বাতাস শান্ত হয়ে এল। তবে রাতে কেউ আর বাইরে বেরোতে সাহস পেল না। বড় পাথর পড়া কমলেও ছোট ছোট জ্বলন্ত নুড়ি এসে পড়ছিল তখনো। এমনি একখানার ঘায়েই ফুটো হয়ে যেতে পারে মাথা।

দিনের আলোয় দেখা গেল আগ্নেয়দ্বীপের চুড়ো দিয়ে তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, তবে সরু হয়ে। তপনদের দ্বীপের গাছপালা পাতার ওপর পুরু একগাদা ছাই জমেছে। দত্তদা ছটফট করছেন। ইচ্ছে, তখুনি ডিক্সন দ্বীপে যাবেন। ডন বারণ করল, 'আজকের দিনটা সবুর করুন। যদি ফের বিস্ফোরণ হয়?'

তপন দত্তদাকে আটকাবার জন্য ডনকে সমর্থন জানিয়ে বলল, 'সত্যি, সামান্য পাখির জন্যে এরকম লাইফ-রিস্ক নেওয়া উচিত নয়।'

খর চোখে তপনের দিকে চেয়ে দত্তদা বললেন, 'সামান্য পাখি, কী বলছ! একটা আশ্চর্য সুন্দর নতুন স্পিশিস। একজন ন্যাচারালিস্টের কাছে এমন একটা আবিষ্কারের মূল্য বোঝো? জানো এরকম কোনো আবিষ্কার তার কাছে কত বড় পুরস্কার? এমনি পুরস্কারের লোভেই ওয়ালেস, বেটস, হামবোল্ট, হার্ডসন, ডারউইন-এর মতো বিখ্যাত ন্যাচারালিস্টরা কত দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরেছেন। যদি কোনো নতুন পশুপাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ আবিষ্কার করা যায়? এমন একটা আবিষ্কারের জন্য প্রাণ তুচ্ছ করা যায়—সে তুমি ঠিক

বুঝবে না তপন, কেবল টাকাকড়ি লাভের মাপকাঠি দিয়ে এসব আবিষ্কারের মূল্য বিচার হয় না। তবে জেনে রাখো, বৈজ্ঞানিক মহলে এমনি একটা আবিষ্কারের বিরাট দাম, বিরাট সম্মান।'

কিন্তু ডন কিছুতেই দত্তদাকে তখন ডিক্সন আইল্যান্ডে যেতে দিল না। বলল, 'যা হবার হয়ে গিয়েছে। একটা দিন আগে গেলে কি আর বেশি লাভ হবে? হয়তো শুধু প্রাণটা খোয়াবেন। এটা স্রেফ গোঁয়ার্তুমি। না, না, আজ আপনার কিছুতেই যাওয়া হবে না।'

বাধ্য হয়ে দত্তদা নিরস্ত হলেন।

পরদিন সকালে নৌকোয় ডিক্সন দ্বীপে চলল সবাই। তখনো আকাশ জুড়ে কালো মেঘের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে আগ্নেয়গিরির ছাই। সূর্যের আলো তাই ম্লান।

তপনদের নৌকো আগ্নেয়গিরিকে অনেকখানি পাশ কাটিয়ে গেল। ওই দ্বীপের চেহারাটা একদম পালটে গেছে। গাছপালা সব পুড়ে খাক। নেড়া পাথর বেরিয়ে পড়েছে। পাহাড়ের গা বেয়ে অনেকগুলো মোটা মোটা লাভার স্রোত নেমেছে। জ্বলন্ত গলিত লাভা অবশ্য তখন আর তরল নেই। জমাট বাঁধছে। তবে তখনো তাদের গা দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

ডিক্সন দ্বীপ দেখে দত্তদার চোখে প্রায় জল এল। ছারখার হয়ে গেছে দ্বীপ। অর্ধেক গাছপালা শেষ। কিছু ঝোপ তখনো জ্বলছে। কত বিশাল বিশাল গাছের ডালপালা নির্মমভাবে মুচড়ে ভেঙে গেছে। কত গাছ ঝলসে কালো হয়ে গেছে। সারা দ্বীপময় নানা প্রাণীর মৃতদেহ ছড়ানো। তবে মৃত পাখি খুব কম। বিপদের আশঙ্কায় তারা নিশ্চয়ই বেশির ভাগই দ্বীপ ছেড়ে উড়ে পালিয়েছে। তবে বেচারা ডাঙার প্রাণীদের সে সুবিধা হয়নি।

'সাবধান'—হেঁচকা টানে ডনকে সরিয়ে আনল পোকো। দেখা গেল, ডনের পায়ের কাছে পাথরের আড়াল থেকে মাথা তুলছে এক ডেথ-অ্যাডার। অনেকটা চন্দ্রবোড়ার মতো দেখতে। আলী বিদ্যুৎবেগে দা-এর কোপ দিল। দুখানা হয়ে গেল সাপটা।

একটি মৃত প্যারাডাইস-বার্ড পাওয়া গেল। দগ্ধ বিকৃত দেহ। দত্তদা পরীক্ষা করে বললেন, 'মনে হচ্ছে কিং বার্ড অফ প্যারাডাইস। অথবা'—তাঁর কথা থমকে গেল। অর্থাৎ কিং বার্ড-এর মতন দেখতে ডিক্সন-সৃষ্ট নতুন স্পিশিসটাও হতে পারে।

সারা দ্বীপ খুঁজে চ্যাং বা তার দলের কারো চিহ্ন মিলল না।

দত্তদা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'চ্যাং পালিয়েছে। নিশ্চয়ই কিছু প্যারাডাইস বার্ড ধরে নিয়ে গেছে। চলো, এখুনি ফিরি। সোরোং থেকে ওয়ারলেসে খবর পাঠাব চারদিকে। যদি পাচার করার আগেই ওদের পাখি সমেত ধরা যায়—'

তপনদের নৌকো ভেসে চলেছিল মেস্‌মন দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়ে, নানা দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে। ইচ্ছে, সন্ধের আগে নোঙর ফেলা হবে না। যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। দত্তদা একবার বিষণ্ণ সুরে বললেন তপনকে, 'ইস্ এক সপ্তাহ আগে যদি ডিক্সন দ্বীপে পৌঁছতে পারতাম। বোকা জিয়ানটা সব ভণ্ডুল করে দিল।'

বিকেলবেলা। সামনেই ছোট্ট এক দ্বীপ। দেখা গেল, দ্বীপের তীরে দাঁড়িয়ে তিন-চারজন লোক প্রাণপণে হাত নেড়ে ইশারা করছে তপনদের নৌকোর উদ্দেশে। দত্তদা চোখে দূরবীন লাগিয়ে তাদের নজর করে জিয়ানকে বললেন, 'দেখ তো।'

জিয়ান দূরবীন দিয়ে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে এ যে কিচিল! আর অন্য লোকগুলো চ্যাং-এর নৌকোর মাঝি।'

'চলো ওই দ্বীপে,' দত্তদা হুকুম দিলেন।

তীরে নৌকো ভিড়ল। ডন বন্দুক বাগিয়ে প্রস্তুত। ধূর্ত চ্যাংকে বিশ্বাস নেই। কোথায় সে? এরা কী করছে এখানে? ডাকছিল কেন?

কাছে গিয়ে লোকগুলোর চেহারা দেখে তপনরা থ। সবার অবস্থাই অতি করুণ। ছিন্ন-ভিন্ন পোশাক, কালিমারা মুখ, উসকো-খুসকো চুল। কিচিলের মাথায় ব্যান্ডেজ জড়ানো, তাতে রক্তের ছোপ। একটা চোখ ফুলে উঠে প্রায় বন্ধ। কিচিল কাতর স্বরে ইংরেজিতে বলল, 'একটু জল। প্লিজ, একটু জল দাও খেতে।'

খাবার জল দেওয়া হল।

কিচিল ও তার মাঝিরা আকণ্ঠ জল পান করল।

'কী ব্যাপার? চ্যাং কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন দত্তদা।

'চ্যাং নেই,' উত্তর দেয় কিচিল।

'নেই মানে!'

'সমুদ্রে ডুবে গেছে।'

'কী করে?'

থেমে থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে যা বলল কিচিল তা এই—আগ্নেয়দ্বীপে ধোঁয়ার বহর দেখে ভয় পেয়ে তারা ডিক্সন দ্বীপ ছাড়ে। মাঝিরা আগেই পালাতে চেয়েছিল কিন্তু চ্যাং শোনেনি। সে তখন প্যারাডাইস-বার্ড ধরতে মত্ত। অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে ডিক্সন দ্বীপ নষ্ট হয়ে যাবে, তাই তার আগেই যে কটা পাখি ধরা যায়। বিশেষত ওই নতুন জাতের প্যারাডাইস-বার্ড। সোনার ওজনেও নাকি ও-পাখির দাম হয় না। চ্যাং ভরসা দিয়েছিল যে এমনি ধোঁয়া অনেক পাহাড়েই বেরোয়, তা বলে চট করে বিস্ফোরণ ঘটে না। গতিক সুবিধের নয় দেখে শেষে মাঝিরা বেঁকে বসলে পর সে বাধ্য হয়ে দ্বীপ ছেড়েছিল। কিন্তু সেজন্য তার কী রাগ, আর মাঝিদের কী গালাগালি!

আসলে চ্যাং-এর মতলব ছিল সবচেয়ে কাছের দ্বীপটায় আশ্রয় নেবে। কিন্তু আগ্নেয় পাহাড়কে পাশ কাটিয়েই দূরবিনে দেখে ওই দ্বীপের সমুদ্রতীরে প্রফেসর দত্তর দলবল দাঁড়িয়ে। ফলে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে তারা অন্য দিকে পাড়ি দেয়। ঘণ্টা দুই সমুদ্রযাত্রার পর হঠাৎ তাদের কানে ভেসে আসে বিস্ফোরণের আওয়াজ। তার একটু বাদেই এল ঝড়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঢেউ ওঠে। সেই দুর্যোগে মাঝিরা যখন নৌকো ও নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া তখন চ্যাং মাঝিদের হুকুম করে, পাখির খাঁচাগুলো নৌকোর খোলের গায়ে শক্ত করে বেঁধে ধরে থাকতে। যাতে সেগুলো ঠোক্কর না খায়। মাঝিরা তার আদেশ মানেনি। তখন চ্যাং তাদের মারতে থাকে। বন্দুক নিয়ে গুলি করার ভয় দেখায়। মাঝিরা তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। সেই ধস্তাধস্তির সময় চ্যাং উল্টে পড়ে যায় জলে। আর তার দেখা পাওয়া যায়নি। নৌকো বেটাল হয়ে ছোটে। শেষে এই দ্বীপের গায়ে সজোরে ধাক্কা খায়। আহত হলেও বাকিরা প্রাণে বেঁচেছে। ওই যে নৌকো—

দেখা গেল চ্যাংদের নৌকোটা দুমড়ে ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দ্বীপের সমুদ্রতটে।

'প্যারাডাইস বার্ড ধরতে পেরেছিলে?' দত্তদা প্রশ্ন করলেন কিচিলকে।

'হ্যাঁ!' জবাব দিল কিচিল।

'কটা? ঠিক করে বলো।' দত্তদা ধমকে উঠলেন।

কিচিল ঢোঁক গিলে বলল, 'চারটে। আমার দোষ নেই স্যার। আমি শুধু সঙ্গে এসেছিলাম। যা করছে সব ওই চ্যাং।'

'নতুন জাতের প্যারাডাইস-বার্ড ধরতে পেরেছিলে?' জিজ্ঞেস করলেন দত্তদা।

'হ্যাঁ। মাত্র একজোড়া। বেশি পাখি ছিল না দ্বীপে। সব উড়ে পালাচ্ছিল ধোঁয়ার ভয়ে।'

'পাখিগুলো কোথায়?'

'চ্যাং জলে পড়ে যাওয়ার পর মাঝিরা খাঁচা খুলে সব পাখি উড়িয়ে দিয়েছে। ওদের ধারণা হয়েছিল, পাখিগুলো অপয়া। ওদের জন্যেই এই বিপদ।'

'পাখি মেরেছ কটা?'

'মাত্র একটা। জ্যান্ত ধরার চেষ্টাতেই ছিল চ্যাং। কারণ জীবন্ত পাখির দাম ঢের বেশি।'

'মৃত পাখিটা আছে?'

'না। মাঝিরা ফেলে দিয়েছে জলে।'

আর কথা না বলে দত্তদা গুম হয়ে রইলেন খানিক। চ্যাং-এর মাঝিরা দত্তদার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে কাতর কণ্ঠে বলতে লাগল, 'দোহাই, আমাদের ফেলে রেখে যাবেন না। এখানে থাকলে আমরা মারা পড়ব। এ-দ্বীপে খাবার জল নেই।'

'ঠিক আছে।' আশ্বাস দিলেন দত্তদা। তারপর পিছনে ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন। তপনও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল।

গভীর নিশ্বাস ফেলে দত্তদা বললেন, 'বুঝলে তপন, চ্যাং উচিত শাস্তিই পেয়েছে। কিন্তু ওর লোভের জন্য দুর্লভ পাখিগুলো হাতছাড়া হল, এ বড় আপশোসের।'

'সত্যি আপনার এত চেষ্টা ব্যর্থ হল।' তপন সান্ত্বনা জানায়।

'না, পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছি বলা যায় না,' ম্লান হেসে বললেন দত্তদা, 'একটা ধূর্ত শয়তানের চক্রান্ত ব্যর্থ করেছি। পাখিগুলো তাকে অধিকার করতে দিইনি। এইটুকু যা লাভ! কাছের দ্বীপটায় আশ্রয় নিতে পারলে ওদের উদ্দেশ্য সফল হত, আমরা গিয়ে পড়তেই তা সম্ভব হয়নি।'

পড়ন্ত বেলায় অস্তরবির আলোয় মলুক্কা সাগরের নীল জল যেন সিঁদুর-গোলা। কিছু দূরে একটা দ্বীপের দিকে খানিকক্ষণ উদাসভাবে চেয়ে থেকে দত্তদা বললেন, 'প্রার্থনা করো তপন, ডিক্সন দ্বীপের পাখিরা যেন নিরাপদে আশ্রয় পায়। বার্ডস অফ প্যারাডাইস-এর ওই নতুন স্পিশিসটি যেন টিকে থাকে! হয়তো ভবিষ্যতে একদিন কোনো পক্ষিবিদের চোখ মেস্‌মন আইল্যান্ডস-এর কোনো দ্বীপে আবিষ্কার করবে এক নতুন ধরনের মানুক-দেওতা। সার্থক হবে জন ডিক্সনের স্বপ্ন।'

তারপরই তিনি হাসিভরা উজ্জ্বল মুখে তপনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি ব্রাদার, অ্যাডভেঞ্চার চেয়েছিলে, সাধ মিটেছে?'

তপন চুপ করে থাকে। ভাবে, সাধ কি সত্যি মিটেছে? বোধ হয় না। একবার এর স্বাদ পেলে তৃষ্ণা যে বেড়ে যায়!

আপাতত ব্যাংকক। তারপর কখনো কলকাতায় ফেরা। শহরের সেই বাঁধাধরা দিন যাপন। কিন্তু মাঝে মাঝে কি সে দত্তদার মতন ছটফটিয়ে উঠবে না? বিচিত্র অজানা দেশের ডাক, অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ এলে কি সে এড়াতে পারবে? তার মন বলছে পারবে না। ঠিক সাড়া দেবে। দিতেই হবে।

ধন্যবাদ দত্তদা। ধন্যবাদ গোবিন্দ সিং। ধন্যবাদ বন্ধু গুরুর দাদা সুনীল ব্যানার্জি। তোমাদের দৌলতেই আমার অতিসাধারণ জীবনটা বদলে গেল। এমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতার স্বাদে ভরপুর হয়ে উঠল।

রক্তচোষা

গ্রীষ্মের ছুটির শেষ দিক। আমি আর সুনন্দ বেড়াতে গেলাম ঘাটশিলায়।

সুনন্দর মামার একটা বাড়ি আছে ঘাটশিলায়। কেউ বড় যায়-টায় না। বন্ধই থাকে বারোমাস। একজন মালি বাড়ি আগলায়। সুতরাং ইচ্ছে ছিল নির্বিঘ্নে আড্ডা মারব। এবং বেড়াব। আমরা দুজনে কলেজে পড়ি। বেজায় বন্ধু। কলকাতার ভিড় আর হট্টগোল ছেড়ে এমন খোলামেলা প্রকৃতিরাজ্যে এসে মন আমাদের উড়তে লাগল।

ঘাটশিলা শহরটি তকতকে পরিষ্কার। বাড়িঘর লোকজনের ঘেঁষাঘেষি নেই। শহরের বাইরে চারপাশে ধু-ধু পাথুরে মাঠ। কোথাও শাল বন। একধারে পরপর কতগুলো জঙ্গলে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়। শহরের পাশ দিয়ে গেছে সুবর্ণরেখা নদী। চওড়া নদীখাতের ভিতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁইয়ের ফাঁকে হু-হু করে জল ছুটে চলেছে। সুবর্ণরেখা ছাড়াও কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়ি নদী আছে ধারে কাছে।

সুনন্দর মামার বাড়িটা শহরের প্রায় বাইরে একটু নির্জন অংশে। ধলভূমগড় যাবার পিচ বাঁধানো চওড়া রাস্তাটা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে গেছে। এই পথ শহর ছাড়িয়ে, প্রান্তর ভেদ করে, শালবনের গা ছুঁয়ে দূর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। তখন একটু একটু বর্ষা নেমেছে। গরম কমেছে। যদিও দিনের বেলা চড়া রোদ ওঠে, আমাদের কিন্তু পরোয়া নেই। দুটো সাইকেল জোগাড় করে দিনের বেলা টো-টো করে ঘুরে বেড়াই। রাতে বিছানায় শুয়ে শুনতে পাই হায়নার খ্যাঁক-খ্যাঁক হাসি। মালির বউ লছমি রান্না করে দেয়। ভাত-ডাল-তরকারি সে মোটামুটি রাঁধে। কিন্তু মাছ-মাংস নিজেরাই বানাই।

ভোরবেলা প্রায়ই হাজির হয় বুধন মাঝি। কোনোদিন সে আনে তাজা ফলমূল, মাছ মুরগি বা ডিম। কোনোদিন মধু। কখনও বা কলসি ভরা টাটকা খেজুর-রস।

বুধন মাঝি সাঁওতাল। মাঝবয়সী। আমাদের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেছে। ও থাকে মাইল তিন-চার দূরে এক গ্রামে। গ্রামের নাম মহুয়াডাঙা। বুধন ঘাটশিলার বাজারে জিনিস বিক্রি করতে যায়। পথে আমাদের বাড়িতে বসে প্রায়ই খানিক গল্প করে নেয়। লোকটি চায়ের ভক্ত। চায়ের সময় এলে আমরা ওকে চা অফার করি। বুধন লাজুক লাজুক মুখে চক্ষু মুদে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

মোটামুটি একই ছাঁদে কাটছিল দিনগুলো। হঠাৎ ঘটনার মোড় গেল ঘুরে।

একদিন বুধন এল ভোরে। কয়েকটা ডিম এনেছে বিক্রি করতে। লক্ষ করলাম, তার মুখ ভারি বিষণ্ণ। সুনন্দ ঠাট্টা করল,—কি বুধন, মুখ ব্যাজার কেন, বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

বুধন মাথা নাড়ল। তারপর কেমন ঝিম মেরে বসে রইল।

বুঝলাম, ব্যাপার কিছু গুরুতর। হয়তো ওর বাড়িতে কারো অসুখ-বিসুখ করেছে। আমি সহানুভূতি দেখাই—বুধন, বলো শুনি হয়েছেটা কী!

বুধন মুখ তুলে করুণ সুরে বলল, বাবু, আমার ভাইটারে মেরে ফেলবে। ঠিক মেরে ফেলবে।

সে কি! বুধনের এক ছোটভাই আছে শুনেছিলাম। তার বেশি কিছু জানতাম না। কিন্তু তাকে মারবে কে? কেন?

একটু একটু করে বুধনের কাছ থেকে উদ্ধার করলাম সমস্ত ঘটনা। এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য কাহিনি। মহুয়াডাঙায় নাকি রক্তচোষার আবির্ভাব ঘটেছে। মানুষের রক্তলোভী কোনো নিশাচর প্রাণী। আর গ্রামের লোকের সন্দেহ, বুধনের ভাই হচ্ছে এই রক্তচোষা।

ঘটনার শুরু চারদিন আগে। মহুয়াডাঙায় এক উৎসব ছিল। রাত করে সবাই নাচ গান করেছে। তারপর যে যেখানে পারে শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ। অনেকে ছুটে আসে। বোকামাঝির বউ জামফুল চেঁচাচ্ছে। কোলে তার চার বছরের ছেলে। সবাই দেখল, বাচ্চাটির গলার পাশ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে রক্ত পড়ছে। গলায় ক্ষতচিহ্ন। এক চিলতে চামড়া যেন গোল করে কেটে নেওয়া হয়েছে। আর তলায় মাংসের মধ্যে ছোট্ট গর্তের মত ফুটো। ক্রমাগত রক্ত বেরিয়ে আসছে ওই ক্ষত থেকে।

জামফুল বলল যে, সে আর তার ছেলে ঘুমোচ্ছিল ঘরের দাওয়ায়। হঠাৎ ছেলের কান্না শুনে উঠে দেখে এই কাণ্ড।

এ কীসের কামড়? সবাই পরামর্শ করল। ইঁদুর? ছুঁচো? সাপ-টাপ? উঁহু, ওসব নয়। অভিজ্ঞ লোকেরা কাটা জায়গা পরীক্ষা করে জানাল। তবে কি কোনো পোকা-মাকড়? কেউ সঠিক বুঝতে পারে না। যাহোক ন্যাকড়াপোড়া চাপা দিতে রক্ত বন্ধ হল।

জামফুল আর একটা খবর দিয়েছিল। সে নাকি ছেলের কান্নায় ঘুম ভেঙেই দেখে বুনো সামনে দিয়ে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে।

সেদিন কেউ বুনোকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি। বুনো সম্বন্ধে গ্রামের লোকের সন্দেহ জাগল আরও দুদিন পরে। অর্থাৎ গত পরশু রাতে।

ঢেঙ্গা মাঝি বুনোর প্রতিবেশী। ঢেঙ্গা ঘুমিয়েছিল তার খড়ের চালার নিচে খাটিয়া পেতে। একসময় ঘুম ভেঙে ঘাড়ে হাত দিয়ে বোঝে চটচটে কী যেন! দেশলাই জ্বেলে দেখে, রক্ত বেরোচ্ছে। গায়েও শুকনো রক্ত লেগে আছে। সেই একই রকম ক্ষতচিহ্ন। রক্ত যেন থামতে চায় না।

গ্রামের লোক আর ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পারল না। কোনো চেনা জীব-জন্তুর দাঁত বা নখের দাগ নয়। তাদের ধারণা হয়েছে এ নিশ্চয়ই কোনো পিশাচ বা দানোর কীর্তি। সে ঘুমন্ত মানুষের দেহ ফুটো করে রক্ত চুষে নিচ্ছে। কে করতে পারে একাজ? একটা বিশেষ কারণে সবার বুনোর ওপর নজর পড়ল।

বুধনের ভাই নামে বুনো, স্বভাবেও বুনো। সে ছোটবেলা থেকে বাউণ্ডুলে। একরোখা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। কতবার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। মাসের পর মাস পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরেছে। কাজকর্ম চাষবাসে মন নেই। যত অদ্ভুত বিদ্যে শেখার ঝোঁক। ওঝাদের কাছে সাকরেদি করে মন্ত্র-তন্ত্র তুকতাক শিখেছে অনেক। অতি বদরাগী। কারোর সঙ্গে সদ্ভাব নেই। বুধনের সঙ্গেও নয়। ঢেঙ্গার সঙ্গে বুনোর কদিন আগে ঝগড়া হয়েছিল। দুজনের বাড়ির সীমানায় একটা কুলগাছের দখল নিয়ে বুনো ঢেঙ্গাকে শাসিয়েছিল। ঢেঙ্গা বলেছে, যখন তার বউ

ঢেঙ্গার ঘাড়ের রক্ত বন্ধ করতে ব্যস্ত, তখন সে দেখেছে, তার উঠোনে বুনো দাঁড়িয়ে। তার বাড়িতে এত রাতে বুনো এসেছিল কী করতে?

গ্রামের লোক আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাদের মতে, রাতের বেলা বুনো নিশ্চয়ই দানো হয়ে মানুষের রক্ত চুষে খায়। গ্রামের মোড়ল বুনোকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে, সে দারুণ চটে যায়। বলে মিছিমিছি সবাই তার পিছনে লাগছে। এ ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই। ঢেঙ্গার চিৎকার শুনে সে দেখতে গিয়েছিল ব্যাপারটা কী। কিন্তু গ্রামের লোকের বিশ্বাস হয়নি বুনোর কথা।

ফুসফাস গুজগাজ আরম্ভ হয়েছে। বুনোই দায়ী। এ বুনোর কাজ। মহুয়াডাঙার মানুষগুলোকে সে এবার মেরে ফেলবে। ও আর মানুষ নেই। দানো হয়ে গেছে। কেউ বলছে, 'তাড়িয়ে দে গাঁ থেকে।' কেউ বলছে মেরে ফেল, পিটিয়ে।'

গল্প শুনে আমরা থ। এমন কাণ্ড সম্ভব!

আমি প্রশ্ন করলাম, সত্যি বুনো এরকম কাজ করতে পারে নাকি? তুই জানিস?

বুধন বলল, আমি আড়ালে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে। বুনো বলেছে, 'আমি করি নি।' মনে হল ও মিছে কথা বলছে না।

সুনন্দ বলল, বুধন তোর ভাইকে কিছু দিনের জন্যে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বল। একবার যখন সন্দেহ ঢুকেছে মাথায়, বারবার এরকম হলে, হয়তো মরিয়া হয়ে গ্রামের লোক বুনোকে খুন করে বসবে।

বুধন হতাশভাবে বলল, বলেছিলাম তাই। বুনো যাবে না।

—কেন?

—ওই মেয়েটার জন্যে।

—কে মেয়ে?

বুধন বলল, বুনো বিয়ে করেছিল। বউ মরে গেছে। কিন্তু পাঁচ বছরের একটি মেয়ে আছে তার। মেয়েটি হতভাগ্য পঙ্গু। বছর দেড়েক আগে পড়ে গিয়ে তার ডান পায়ে চোট লাগে। তারপর পাটা ক্রমশ শুকিয়ে সরু হয়ে যাচ্ছে। জোর নেই পায়ে। প্রায় সব সময় শুয়ে থাকে। বসে-বসে হাতে ভর দিয়ে হিঁচড়ে-হিঁচড়ে কোনোরকমে একটু-আধটু নড়াচড়া করে। ওকে নাইয়ে খাইয়ে দিতে হয়। এক বুড়ি তার দেখাশোনা করে।

মেয়ের ওপর বুনোর প্রচণ্ড টান। মেয়ের জন্যই সে আজকাল বাড়ি ছেড়ে দূরে যায় না। দুনিয়ায় একমাত্র এই মানুষটিকেই সে ভালবাসে। বুনোর ভয়, সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে, তার মেয়েকে মেরে ফেলবে লোকে। বুধনকেও তার বিশ্বাস নেই। আবার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে কোথাও গেলে, খোঁড়া মেয়েকে রাখবে কোথায়? সে সারাদিন মজুরি খাটতে গেলে, মেয়ের যত্ন করবে কে? সুতরাং সে জেদ ধরেছে, গ্রামেই থাকবে। তাতে যা হয় হোক।

আমি ও সুনন্দ মাথা ঘামাতে শুরু করলাম।

বুনো যতই একগুঁয়ে বা রাগী হোক, স্রেফ সন্দেহের শিকার হয়ে, তাকে মারা পড়তে দেওয়া যায় না। ওই অসহায় মেয়েটার ভাগ্যে তখন কী ঘটবে? এ কাজ কার? সত্যি কোনো মানুষ পিশাচের? না কোনো জন্তু জানোয়ারের? গ্রামের অন্য কোনো শয়তান কি এই কীর্তি

করে বুনোর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে? কেউ তো স্বচক্ষে দেখে নি বুনোকে রক্তপান করতে। এখন বুনোকে, তার মেয়েকে, বাঁচাই কী করে! দুই বন্ধু প্রাণপণে বুদ্ধি হাতড়াতে থাকি।

আমি বললাম, পুলিশে খবর দিলে কেমন হয়?

সুনন্দ বলল, কোনো লাভ নেই। গ্রামের ঘরোয়া ব্যাপারে পুলিশ নাক গলাবে না।

বললাম, তবু চেষ্টা করি। যদি যায় পুলিশ, একটু ভয় দেখিয়ে আসে। তাহলে চট করে বুনোর ক্ষতি করতে অন্যেরা হয়তো সাহস পাবে না। ইতিমধ্যে রক্তচোষার ব্যাপারটা থেমে যেতে পারে।

সুনন্দ ঘাড় নাড়ল—যাবে না পুলিশ। স্রেফ গুজব শুনে তিন-চার মাইল পথ ঠেঙিয়ে যেতে রাজী হবে না। উলটে আমাদের ঠাট্টা করবে। হ্যাঁ যাবে, যদি খুনখারাবি কিছু হয়, তারপর।

তখন গিয়ে লাভটা কী হবে ঘোড়ার ডিম!—আমি রেগে বললাম।

তিনজনে চুপচাপ বসে আছি। বুনোকে বাঁচাবার কোনো উপায় আমাদের মাথায় আসছে না। সুনন্দ বলে উঠল, ঠিক আছে, পুলিশ না যাক, আমরা যাব। মাঝেমাঝে ঘুরে আসব ওই গ্রামে। বুনোর খোঁজখবর করব। তাহলে গ্রামের লোক সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু একটা ছুতো চাই। হ্যাঁ, মুরগি। মুরগির খোঁজে যাওয়া যেতে পারে। বুধন, বুনোর মুরগি আছে?

আছে—জানাল বুধন।

—বেশ। আমরা দুজনে কাল মুরগি কিনতে যাব বুনোর কাছে। ওকে বলে রাখিস। আমাদের যেন আবার হাঁকিয়ে না দেয়। ওর ভালোর জন্যেই যাচ্ছি। বাইরের লোক বারবার বুনোর খোঁজে আসছে দেখলে, এখন কেউ ওকে মারবার সাহস পাবে না। কারণ জানে, বুনোর কিছু ঘটলে আমাদের তা নজরে পড়বে এবং ঘটনাটা অস্বাভাবিক মনে হলে পুলিশে খবর যাবে।

আমাদের যুক্তি বুধনের পছন্দ হল। সে খুশিমনে বিদায় নিল।

সুনন্দ মহা উত্তেজিত। এক রহস্যময় রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়ে সে উৎসাহে টগবগ করতে লাগল। আমার মনেও লাগল তার ছোঁয়াচ। আর তার ফল—কী বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা!

দুপুরবেলা। আমি ও সুনন্দ সাইকেলে চেপে মহুয়াডাঙা গ্রামের দিকে চললাম।

আমাদের বাড়ি থেকে শহর ছাড়িয়ে মাইল খানেক গিয়ে ধলভূমগড় যাওয়ার বড় রাস্তা থেকে ডান পাশে এক সরু মেঠো রাস্তা বেরিয়ে গেছে। ওই পথ মাইল দুই দূরে মহুয়াডাঙায় শেষ হয়েছে। পথের দু-পাশে প্রান্তরে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। মাঠে গাছপালা খুব কম। মাঝেমাঝে কয়েকটা শুধু খেজুর তাল বা বাবলা গাছ। আর এক নিঃসঙ্গ প্রাচীন বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। দূর থেকে মহুয়াডাঙা গ্রাম দেখা যায়। গ্রামে অবশ্য বেশ গাছপালা। একটা পুকুর রয়েছে। এমন অসময়ে দুই শহুরে যুবকের আবির্ভাবে গ্রামের লোক অবাক হয়ে গেল।

বুনো মাঝির বাড়ি কোনটা?—জিজ্ঞেস করতেই একজন দেখিয়ে দিল আঙুল বাড়িয়ে। কিন্তু তার চোখের অদ্ভুত চাউনিটা আমাদের নজর এড়াল না।

গ্রামে ঢোকার মুখেই বুনোর বাড়ি। একখানি মাত্র ছোট্ট মাটির ঘর। তাতে খড়ের চাল। তকতকে একফালি উঠোন। একটা প্রকাণ্ড শুয়োর বাড়ির সামনে মাটিতে গড়াচ্ছে। তার

গায়ের ওপর চার-পাঁচটা ছানা। ঘরের বাইরে তেতুঁল গাছের ছায়ায় দড়ির খাটিয়াতে বুনো বসে ছিল। পাশে তার মেয়ে শুয়ে। সাইকেলটা একটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে আমরা কাছে যেতে বুনো উঠে দাঁড়াল। শুয়োরটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পালাল। পিছনে পিছনে ছুটল তার বাচ্চারা।

বুনোকে প্রথম দর্শনে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। কী দুশমনের মতো চেহারা! রীতিমতো লম্বা। গিঁট পাকানো দেহ। মুখে অজস্র ভাঁজ। কাঁধ অবধি কালো কুচকুচে বাবরি চুল। ছোটছোট চোখ দুটো করমচার মতো লালচে। সে ঘাড় কাত করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

আমি বললাম, তোমার নাম বুনো?

—হ।

সুনন্দ বলল, আমাদের বুধন পাঠিয়েছে। আমরা মুরগি কিনতে এসেছি।

মুরগি মাঠে চরছে। এখন ধরা যাবে না।—বুনোর কণ্ঠস্বর ফ্যাঁসফ্যাসে। ওর ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলাম, আমাদের আগমনে মোটেই খুশি হয়নি। নেহাৎ যেন ঠেকায় পড়ে আমাদের উপস্থিতি সহ্য করছে। ওর দাঁতগুলো বড় বড়। চওড়া হাঁ। দেখলেই মনে হয়, লোকটা রাগী বেপরোয়া।

আমি বেশ চটলাম মনে মনে। এমন খুনি চেহারার বেয়াদপ লোকটার নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত হতে ভারি দায় পড়েছে আমাদের। ফিরে যাই। ওর বরাতে যা হবার হোক। আমাদের বয়ে গেছে। কষ্ট করে এলাম এতদূর, এই ঢের। সত্যি কথা বলতে কি, লোকটাকে দেখে অবধি আমার মন বলছিল, এর দ্বারা যে কোনো ভয়ঙ্কর কাজ সম্ভব। হয়তো গ্রামের লোকের ধারণা ঠিকই। বুধন তার ভাই সম্পর্কে দুর্বল। তাই অন্যদের কথা মানতে চাইছে না।

সুনন্দ কিন্তু বুনোর ব্যবহারে দমল না। দিব্যি খোশমেজাজে বলল, বেশ আমরা আবার পরশুদিন আসব। একটা মুরগি ধরে রাখিস। এখন একটু জল খাওয়া দিকি। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

বুনো নিঃশব্দে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। আমাদের দৃষ্টি পড়ল খাটিয়ায় শোওয়া ছোট্ট মেয়েটির দিকে। আহা, মুখখানি কী মিষ্টি! করুণ চোখে অবাক হয়ে দেখছে। একটি পা তার সরু। অক্ষম। শরীরও খুব রোগা। বড় মায়া হল।

সুনন্দ চাপা স্বরে বলল, অসিত, দেখ, অনেকে লক্ষ করছে আমাদের।

কথাটা ঠিক। আড়াল-আবডাল থেকে অনেকে মেয়ে-পুরুষ উকিঝুঁকি মারছিল। তাদের চোখে কৌতূহল।

বুনো জল আনল ঝকঝকে পিতলের ঘটিতে। খেলাম জল। যাবার সময় সুনন্দ চেঁচিয়ে বলে গেল বুনো, আমরা পরশুদিন আবার আসব।

প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ফিরে চলেছি। গ্রাম ছাড়িয়ে খানিক গিয়ে এক দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আসার সময় মহুয়াডাঙা থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড এক বটগাছ দেখেছিলাম। সেই গাছের নীচে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ আকৃতি। পরনে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি ও সাদা পায়জামা। চোখে দূরবিন লাগিয়ে গাছের ডালে না জানি কী দেখছে।

সুনন্দ বলল, প্রতাপ রুদ্র। ঝাউবাংলোতে থাকেন।

আমাদের পাড়ার একেবারে শেষ বাড়িটা হল ঝাউবাংলো। এই নাম স্থানীয় লোকদের দেওয়া। ঝাউবাংলো অন্য বাড়িগুলোর থেকে বেশ খানিক তফাতে। বিরাট কমপাউন্ডওলা বাড়ি। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। ভিতরে প্রচুর গাছপালা। মস্ত লোহার ফটক থেকে বসত বাড়ি অবধি কাঁকর-ফেলা চওড়া রাস্তা। তার দুধারে আছে দুসারি ঝাউগাছ। বোধহয় এই জন্যেই ঝাউবাংলো নামের উৎপত্তি। ও বাড়ির বাসিন্দাদের চিনিনা। শুধু জেনেছি প্রতাপ রুদ্র ওই বাড়ির মালিক। ঘাটশিলার স্থানীয় কাউকে বা কোনো চেঞ্জারকে ঝাউবাংলোয় কখনো বেড়াতে যেতে দেখিনি।

প্রতাপ বাবুকে কয়েকবার মাত্র দেখেছি। খুব ভোরে কালো রঙের থ্যাবড়ামুখো বিশাল এক কুকুর নিয়ে মাঠে বেড়াচ্ছেন। ভদ্রলোকের নিজের চেহারাও চোখে পড়ার মতো। ছ ফুটের ওপর খাড়া শরীর। দোহারা শক্ত গড়ন। রোদে পোড়া ফর্সা রঙ। মাংসহীন লম্বাটে মুখ। চাপা পাতলা ঠোঁট। টিয়া পাখির মতো বাঁকানো নাকের নীচে পাকানো গোঁফ আর চিবুকে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথায় কাঁচা-পাকা ঘন চুল। পরনে থাকে হাঁটু অবধি ঝুলের পাঞ্জাবি ও পায়জামা। তাঁর গম্ভীর ধরন দেখলে নিজে থেকে আলাপ করার উৎসাহ জাগে না। শুনেছি, ভদ্রলোক দু বছর হল বাড়িখানা কিনে এখানে বাস করছেন। তবে ঘাটশিলায় থাকেন না প্রায়ই। ওই বাড়িটা আগে ছিল এক জমিদারের সম্পত্তি।

আরও শুনেছি, বাড়িটায় নাকি ছোটখাটো এক চিড়িয়াখানা আছে। কারণ প্রতাপ রুদ্রের পশু পাখির বেজায় শখ। অনেক বিচিত্র জীবজন্তুর ডাক ভেসে আসে বাড়ির ভেতর থেকে। কিন্তু কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়না ভিতরে। প্রতাপ রুদ্র সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল জেগেছিল। কিন্তু মেটাবার সুযোগ পাইনি।

এখানে কী করছেন ভদ্রলোক?—আমি জানতে চাইলাম।

সুনন্দ বলল, মনে হচ্ছে বার্ড-ওয়াচার। পাখি দেখছে। যাদের এই নেশা থাকে, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় পাখির খোঁজে।

—ভদ্রলোক শুনেছি নানারকম জীবজন্তু পোষেন।

হ্যাঁ।—বলল সুনন্দ—ওর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে আছে। ইন্টারেস্টিং লোক।

প্রতাপ রুদ্র একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন আমাদের, তারপর আবার দূরবিন চোখে লাগালেন।

সাইকেলে পাশাপাশি চলেছি। বললাম, হ্যাঁরে সুনন্দ, বুনো লোকটাকে কেমন লাগল? নিরীহ, মানে সত্যি নির্দোষ, মনে হয় কি?

নিরীহ মোটেই না।—সুনন্দ জবাব দিল—তবে দোষী না নির্দোষ এখুনি বলা শক্ত।

অর্থাৎ বুনোর হাবভাবে সুনন্দরও ধোঁকা লেগেছে।

বিকেলে খরস্রোতা নদী ধরে অনেক দূর বেড়াতে গেলাম দুজনে। ধলভূমগড়ের রাস্তাকে আড়াআড়িভাবে কেটে খরস্রোতা বয়ে চলেছে। রাস্তা গেছে নদীর ওপর সাঁকো দিয়ে।

ক্ষীণকায় নদীর টলটলে জলে বড়জোর হাঁটু ডোবে। স্ফটিক স্বচ্ছ জলের তলায় নুড়ি-পাথর, বালি, ঝিনুক পরিষ্কার দেখা যায়। কখনো নদীর পারে পারে, কখনো বা ঠাণ্ডা জলের স্রোতে পা ডুবিয়ে অনেকটা হাঁটলাম। ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল।

সাঁকোর কাছাকাছি পৌঁছেছি, একটি লোক দ্রুত পায়ে সাঁকো পেরিয়ে চলে গেল। প্রতাপ রুদ্র। আমাদের তিনি দেখতে পেলেন না।

আমরা লক্ষ করলাম, প্রতাপ বাবু কিছুটা এগিয়ে ধলভূমগড়ের রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামলেন। ওই তো মহুয়াডাঙা গ্রামে যাবার পথ। শর ঝোপের আড়াল থেকে দেখলাম সেই দীর্ঘকায় ঋজু দেহ ক্রমে ছোট হয়ে যাচ্ছে। কখনো বা উঁচু ঢিবির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আলো কমে আসায় তাকে বেশি দুর অবধি নজর করতে পারলাম না।

সুনন্দ প্রথমে কথা বলল—কী ব্যাপার! এই সময় ওই দিকে ভদ্রলোক চললেন কোথায়?

ঠাট্টা করলাম—হয়তো নিশাচর পাখির খোঁজে যাচ্ছে। কিংবা সাঁওতাল গ্রামে হাড়িয়া খাবার অভ্যাস আছে।

সাঁকোর রেলিংয়ে আমরা আরও ঘণ্টাখানেক বসে রইলাম। একটার পর একটা গান গাইলাম হেঁড়ে গলায়। শেষে গলা ধরে যেতে চায়ের তাগিদে উঠলাম। প্রতাপ রুদ্র কিন্তু তখনও ফিরলেন না।

পরদিন ভোরে বুধন এল। বুধন জানাল, গতরাতে নাকি আবার রক্তচোষার আবির্ভাব ঘটেছিল মহুয়াডাঙায়। এবার সে হানা দিয়েছে ঘরের মধ্যে। তার শিকার এক যুবক। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে দেখে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে অবিকল ওই রকম ক্ষত। তা থেকে রক্ত ঝরছে।

ঘরের দরজা খোলা ছিল?—সুনন্দ প্রশ্ন করে।

—না।

—আর জানলা?

—হ্যাঁ। একটা জানলা খোলা ছিল বটে।

বুনোকে কেউ দেখেছে নাকি কাছে-পিঠে?—আমি জানতে চাইলাম।

—উহুঁ। তবে ঢেঙা বলছে, বুনো কাল রাত অবধি জেগে বসেছিল তার উঠোনে। গাঁয়ের লোক ওকেই সন্দেহ করছে।

বুধন বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইল। বেচারা ভাইয়ের বিপদের আশঙ্কায় বড় মুষড়ে পড়েছে।

সুনন্দ বুধনকে জিজ্ঞেস করল, ওই যে ঝাউবাংলো, ওর মালিককে চিনিস?

—হুঁ। চিনি। লম্বা পারা মানুষ। কুকুর নিয়ে ঘোরে।

—আচ্ছা, ওই বাবু কাল রাতে তোদের গ্রামে গিয়েছিল?

—কই না তো!

—উনি মহুয়াডাঙায় গিয়েছেন কখনো?

—হ্যাঁ। গেছে অনেকবার।

—কী করতে যায়?

—চোখে নল লাগিয়ে পাখি দেখে।

—রক্তচোষার ব্যাপারে কিছু জানেন নাকি?

—তা তো জানিনা বাবু। তবে একদিন দূর থেকে দেখেছি, ঢেঙামাঝির সঙ্গে কী সব কথা বলছিল।

বুধন চলে যেতে সুনন্দ বলল, প্রতাপ রুদ্র কাল রাতে মহুয়াডাঙার দিকে গিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামে ঢোকেন নি। কোথায় গিয়েছিলেন তবে? আশ্চর্য! লোকটি বেশ রহস্যময়।

আমি উত্তর দিলাম—হয়তো মাঠে মাঠে পায়চারি করেছেন।

হুঁ।—সুনন্দ একটু মাথা নাড়ে।

তখনও রোদের তেজ বাড়েনি। দুজনে বেড়াতে বের হলাম। ঝাউবাংলোর সামনে এসে দেখি, প্রতাপ রুদ্র প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরছেন। হাতে চেনে বাঁধা সেই বিরাট কুকুর।

সুনন্দ সোজা এগিয়ে গেল ভদ্রলোকের দিকে। অমনি বাঘের মতো কুকুরটা গরগর করে উঠে চেনে টান দিল। থমকে দাঁড়াল সুনন্দ। প্রতাপ রুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বলল, নমস্কার, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। আপনাকে প্রায়ই দেখি। এটা কী জাতের কুকুর জিজ্ঞেস করব ভাবি।

রুদ্র স্থির চোখে কয়েক মুহূর্ত সুনন্দের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! আবার একটু কৌতুকের আভাস রয়েছে যেন। সুনন্দর অবস্থা দেখে মজা পেয়েছেন। সুনন্দ কাঠের মতো দাঁড়িয়ে। বারবার আড় চোখে কুকুরটাকে দেখছে।

আপনি কুকুর ভালবাসেন?—ভরাট কণ্ঠস্বর।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এটা ম্যাস্টিফ।

ওঃ, দারুণ কুকুর! আচ্ছা আপনি তো অনেক জন্তু-জানোয়ার পুষেছেন, দেখাবেন আমাদের? সুনন্দ আলাপ জমাবার চেষ্টা করল।

প্রতাপ রুদ্রের মুখে কিন্তু কোনো আগ্রহ ফোটে না। আমাদের আর এক প্রস্থ আপাদমস্তক দেখলেন। তারপর বললেন, দেখাতে পারি এক শর্তে।

—কী?

—মাত্র একবার দেখাব এবং আর কাউকে জুটিয়ে আনা চলবে না। কাউকে এ খবর বলাও চলবে না। লোকজন এলে আমার কাজের ক্ষতি হয়।

বেশ তাই হবে।—সুনন্দ তৎক্ষণাৎ রাজি।

আসুন।—প্রতাপ বাবু আহ্বান জানালেন।

নেপালি দরোয়ান গেট খুলে দিল। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। একজন পরিচারক এসে নীরবে প্রতাপবাবুর কাছ থেকে কুকুরটা নিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল। পরিচারকটি এ দেশীয় নয়। দারুণ যণ্ডামার্কা জোয়ান। কাঁকর-বিছানো পথ ধরে চলতে চলতে রুদ্র জেনে নিলেন আমাদের পরিচয়।

প্রতাপবাবু একটু ঠাট্টার সুরে বললেন, আমাদের কালেকশনে কিন্তু বাঘ-সিংহ নেই। সবই ছোট জীবজন্তু। সাধারণত যে সব পশু-পাখি কেউ পোষে না, আমি তাদের পোষ মানাবার চেষ্টা করি। ওদের চরিত্রের খুঁটিনাটি স্টাডি করি।

আমরা বাগানের ভিতরে চললাম। বাগানের এক জায়গায় পর পর পনেরো-ষোলটা বড় বড় খাঁচা। খাঁচাগুলো তারের জালে ঘেরা। মাথায় খড়ের চাল। কোনোটাতে রয়েছে জন্তু, কোনোটায় পাখি। ঠিক কলকাতা চিড়িয়াখানায় যেমন দেখেছি, তেমনি করে রাখা হয়েছে জীবজন্তু।

প্রতাপ রুদ্র একটার পর একটা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে চিনিয়ে দিতে লাগলেন। লোকটির চেহারা ও কথাবলার ভঙ্গিতে জোরালো ব্যক্তিত্বের ছাপ।

এক ফাঁকে তিনি বললেন, আমি বয়সে অনেক বড়। আশা করি তুমি বললে আপত্তি নেই।

আমরা সরবে জানালাম—না না আপত্তির কী আছে?

প্রতাপ রুদ্র দেখাতে থাকেন, এই এক জোড়া ডিঙ্গো। অস্ট্রেলিয়ার বুনো কুকুর। কিছুতেই পোষ মানে না। তবে আমি কিছুটা বাগ মানাতে পেরেছি।

তিনি পকেট থেকে বিস্কুট বের করে খাঁচার ভিতর ছুঁড়ে দিলেন। অনেকটা আমাদের দেশি কুকুরের মতো চেহারা। মেটে লাল রঙের ডিঙ্গো দুটো বিস্কুট খেয়ে লেজ নাড়তে লাগল। তারপর রুদ্র দেখালেন, এই হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার কোয়ালা।

প্রাণীটি ঠিক যেন ক্ষুদে ভাল্লুক। রুদ্র বললেন, এ ভাল্লুক নয়। ভাল্লুক স্তন্যপায়ী। এরা মারসিউপিয়ান। অর্থাৎ পেটের তলায় থলিতে বাচ্চা বয়ে বেড়ায়। যেমন ক্যাঙ্গারু।

একটা খাঁচার সামনে দাঁড়াতেই কালো-সাদা লোমওলা বেঁজি জাতীয় দুটো জন্তু দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। রুদ্র বললেন, উল্‌ভারিন। উত্তর আমেরিকার বেঁজি। খুব হিংস্র।

এরপর দেখলাম, মাদাগাস্কারের লেমুর ও শ্লথ। আফ্রিকার বনবিড়াল। দক্ষিণ আমেরিকার ধেড়ে ইঁদুর এগুটি ইত্যাদি নানা অদ্ভুত জন্তু।

তারপর পাখি। কতরকম রঙবেরঙের পাখি। বেশির ভাগেরই নাম শুনিনি। কোনোটা ভারি সুন্দর শিস দিচ্ছে। গাছের ছায়ায় দাঁড়ের ওপর সরু চেন পা বাঁধা এক কাকাতুয়া বসে ছিল। তার গায়ের পালক ধবধবে সাদা মাথায় হলদে ঝুঁটি। কালো বাঁকা ঠোঁট। আমরা কাছে যেতে চোখ পাকিয়ে তড়বড় করে পরিষ্কার গলায় বলতে লাগল গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। নমস্কার, নমস্কার।

রুদ্র বললেন, ও তাক বুঝে মানুষের ভাষা ব্যবহার করতে শিখেছে।

রুদ্র হাত নাড়তে কাকাতুয়া বলে উঠল, বাই বাই!

সুনন্দ প্রশ্ন করল, মিস্টার রুদ্র, এসব পশু-পাখি আপনি যোগাড় করেন কীভাবে?

—কিনে আনি নানা দেশ থেকে। দু-একটা নিজেও ধরেছি।

আমাদের মাথার ওপর ছোট্ট অদ্ভুতদর্শন একটা কালো রঙের বাঁদর গাছের ডালে লেজ পাকিয়ে মাথা নিচু করে দোল খাচ্ছিল। তার ভাঁটার মতো চোখ। মস্ত লেজ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোন দেশি বাঁদর?

—বাঁদর নয়। একরকম ভাম। ব্রাজিল থেকে এনেছি। নাম কিংকাজু। এমনি লেজে ঝোলার অভ্যাস একমাত্র সাউথ আমেরিকার প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়।

রুদ্র একবার শিস দিতে কিংকাজুটি তড়াক করে নেমে এসে তাঁর পিঠে চড়ে বসল। পরক্ষণেই লম্বা লাফে গাছে উঠে গেল।

রুদ্র বললেন, আমি দু মাস আগে সাউথ আমেরিকা থেকে ফেরার সময় কতগুলো স্পেসিমেন এনেছিলাম। তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভাল পোষ মেনেছে।

সুনন্দ উসখুস করছিল। এবার কথাটা পাড়ল—মিস্টার রুদ্র, সেদিন আপনাকে মহুয়াডাঙা গ্রামের কাছে দেখলাম; বায়নাকুলার দিয়ে কী যেন দেখছিলেন—

রুদ্র জবাব দিলেন, পাখি দেখছিলাম।

সুনন্দ বলল, জানেন, ওই গ্রামে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে।

কী? রুদ্র ভুরু কোঁচকালেন।

—রাত্তির বেলা ঘুমন্ত লোককে কীসে যেন কামড়াচ্ছে। কী কামড়ায়, কখন কামড়ায়, কেউ টের পায় না ঘুম ভেঙে দেখে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছে। গ্রামের লোক খুব ভয় পেয়ে গেছে।

—কেন?

—ওদের ধারণা অলৌকিক কাণ্ড। মানে কোনো রক্তচোষা পিশাচ বা দানোর কীর্তি।

ও।—সংক্ষিপ্ত উত্তর। প্রতাপ বাবু বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর অন্য কথা শুরু করলেন। অর্থাৎ এ বিষয়ে আর আলোচনা করতে চান না।

সুনন্দ উৎফুল্লভাবে বলল, আপনি বুঝি অনেক দেশ ঘুরেছেন?

—হ্যাঁ, তা ঘুরেছি।

—কোথায় কোথায়?

—ইউরোপের সব জায়গায়। তাছাড়া মিড্‌ল-ইস্ট।

—আপনার কাছে গল্প শুনতে আসব কিন্তু।

সরি, এখন নয়। আপাতত কদিন আমি ব্যস্ত আছি।—অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় প্রতাপ বাবু সুনন্দর আগ্রহকে থামিয়ে দিলেন।

প্রতাপবাবুর ব্যবহার শেষ দিকে বেশ রূঢ় মনে হল। আমাদের বসতেও বললেন না। চিড়িয়াখানা দেখা হয়ে যেতে আবার সোজা গেট অবধি আমাদের এগিয়ে দিলেন।

ফেরার সময় জিজ্ঞেস করলাম, সুনন্দ কী বুঝলি?

—বুঝলাম যে প্রতাপ বাবু মহুয়াডাঙার ঘটনা জানেন। কিন্তু অন্যদের কাছে ফাঁস করতে রাজি নন।

দ্বিতীয়ত উনি এখন ব্যস্ত।—আমি মন্তব্য করলাম।

পরদিন বাজার থেকে এসে সুনন্দ বলল, বুঝলি অসিত, প্রতাপবাবু সম্পর্কে একটু খোঁজ-খবর করলাম। লোকটির অতীত সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। শুধু জানলাম, উনি একজন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ এবং অনেক দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন। এখানকার লোকেদের সঙ্গে পরিচয় সামান্য। বিচিত্র স্বভাব। আগের বছর একদল বেদে এসে আস্তানা গেড়েছিল মাঠে। তারা সাপ খেলা দেখাত। নাচগান করত। জড়িবুটি ওষুধ বিক্রি করত। প্রতাপ বাবুর সঙ্গে তাদের বেশ দহরম মহরম হয়। আবার মাস ছয় আগে এক তান্ত্রিক সাধু এসে শালবনের ভিতর কিছুদিন ছিল। তার কাছেও প্রতাপ বাবুকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। তবে লোকটা নাকি পশু-পাখির বিষয়ে একজন এক্সপার্ট। কলকাতা চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট একবার ওর সঙ্গে কয়েকটা জন্তু নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার ঝোঁকে দেখলাম প্রতাপবাবু ঝাউবাংলো থেকে বেরিয়ে খরস্রোতা নদীর দিকে চলে গেলেন। সঙ্গে কুকুরটা নেই। আমরা নদীর ব্রিজে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। রাত হল। কিন্তু প্রতাপবাবু ফিরলেন না।

সুনন্দ উঠল—চল তো একবার মাঠে।

—প্রতাপ রুদ্রের খোঁজে?

হুঁ।—সুনন্দ মহুয়াডাঙার পথে পা চালাল। কিছুটা গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম দুজনে। জনমানবহীন সেই বিশাল আঁধার মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে কেমন গা ছমছম করতে লাগল। চারদিক নিঝুম। থেকে থেকে কোনো রাতজাগা পাখির ক্ষীণ তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যাচ্ছে। মাথার ওপর অগণিত তারা হিরের কুচির মতো ঝিকমিক করছে। আচমকা কতগুলো শিয়াল সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—হুয়া-হুয়া-হুয়া।

প্রান্তরে কোথাও আলোর চিহ্ন দেখতে পেলাম না। খানিক পরে সুনন্দকে ঠেলা মেরে বললাম, চল ফিরি।

সুনন্দ নীরবে ফিরে চলল।

বুধন এল তিনদিন পরে। মহুয়াডাঙায় গতকাল আবার সেই রক্তলোভী নিশাচরের উপদ্রব ঘটেছে। আবার আক্রমণ হয়েছে ঢেঙা মাঝির ওপর।

ঢেঙা এবার শুয়েছিল ঘরের ভিতর। পাশে ছিল তার বউ। বউ-ই আবিষ্কার করে, ঢেঙার গলায় একটা কাটা জায়গা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। ঢেঙা কিন্তু তখন অঘোরে ঘুমচ্ছে। মেঝেয় অনেক রক্ত পড়ে শুকিয়ে গেছে। বেশ অবসন্ন হয়ে পড়েছে ঢেঙা। রক্তপাতের চেয়ে ভয়েই কাতর হয়েছে বেশি।

বুধন জানাল যে, গ্রামের লোক ক্ষেপে উঠেছে। তাদের মতে, এ নিশ্চয়ই বুনোর প্রতিশোধ। কারণ ঢেঙা ওর নামে মোড়লের কাছে লাগিয়েছিল। বুনোকে খুন করার শলা-পরামর্শ হচ্ছে। বুধন শুনেছে। বুনোর আর নিস্তার নেই।

সুনন্দ জিজ্ঞেস করল, ঝাউবাংলোর বাবু মহুয়াডাঙায় গিয়েছিল নাকি এর মধ্যে?

—হ্যাঁ গিয়েছিল। তবে গাঁয়ে ঢোকেনি। মাঠে ঘুরছিল পাখি দেখতে। পাখি ধরার ফাঁদ পাতছিল গাছে।

—রাতের বেলা গ্রামের ভিতর কোনো বাইরের লোককে দেখা গেছে? সুনন্দ জানতে চাইল।

উহুঁ।—বুধন মাথা নাড়ল।

আমরা দুজনে সেদিন সকালে মহুয়াডাঙায় এক রাউন্ড টহল দিয়ে এলাম। বুনোর হাবভাব আরও অস্বাভাবিক মনে হল। দুর্দান্ত লোকটা কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে। আড়চোখে কেবল তাকাচ্ছে চারধারে। ছটফট করছে। বারবার তার দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে বারন্দায় চাটাইয়ে শোওয়া তার রুগ্‌ণ মেয়ের দিকে। সে মুরগি দিল। পয়সা নিল। কিন্তু কথাবার্তা বলল না। ঠিক যাবার আগে সুনন্দ তাকে বলল, বুনো তোর মেয়েকে হাসপাতালে দে। ও ভালো হয়ে যাবে।

অমনি বুনোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—হবে? বেশ। আজই দিয়ে দি হাসপাতালে। তুই ঠিক করে দে বাবু।

সুনন্দ বলল, এত তাড়াতাড়ি হবে নারে। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে তোকে জানাব।

বুনো যেন দমে গেল। মনে হল, মেয়েকে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে ফেলতে পারলে ও নিশ্চিন্ত হয়।

মহুয়াডাঙা ছেড়ে চলে আসবার সময় সুনন্দ বলল, লক্ষ করলি, বুনো ভয় পেয়েছে?

উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। হয়তো মেয়ের জন্যেই ওর ভাবনা বেশি। কিন্তু লোকটা সত্যি দোষী না নির্দোষ আমি এখনো ঠিক বুঝছি না।

সুনন্দ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে বুনো নিরপরাধ। তবে—

সুনন্দ আর কিছু বলে না।

বিকালে সুনন্দ বলল, মামার চেনা এক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে আসি। স্টেশনের কাছে থাকেন।

আমি গেলাম না। জমাট এক ডিটেকটিভ বই শুরু করেছি। বললাম, আমি মুরগিটা রেঁধে রাখব। তুই ঘুরে আয়।

সুনন্দর ফিরতে রাত আটটা হল।

রাতে খাওয়ার পর বারান্দায় বসে গল্প করতে লাগলাম। শুক্লপক্ষ চলছে। কিন্তু একটু মেঘ জমেছে। তাই চাঁদের আলো তেমন ফোটেনি। কেমন ঘোলাটে ভাব। অনেক দূরে দূরে কয়েকটা বৈদ্যুতিক আলো ঝকঝক করছে। আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে মিটমিটে তারা। এমন নিস্তব্ধ রাত কলকাতায় টের পাওয়া যায় না।

আমি বললাম, জানিস সুনন্দ, মহুয়াডাঙার এই রহস্য নিয়ে আমার মাথায় একটা থিওরি এসেছে।

—কী?

—ড্রাকুলা ফিল্মটা দেখেছিস?

—না।

—গল্পটা শুনেছিস?

—হ্যাঁ, শুনেছিলাম। কিন্তু—

বললাম, আমি ড্রাকুলা ফিল্মটা দেখেছি। বইটাও পড়েছি। মনে আছে, রুমেনিয়ার এক জমিদার কাউন্ট ড্রাকুলা ছিল ভ্যাম্পায়ার। অর্থাৎ মানুষরূপী রক্তশোষক প্রেত। সে ঘুমন্ত মানুষের বা মানুষকে সম্মোহন করে তার রক্ত শুষে খেত। মহুয়াডাঙার কেসটা অনেকটা যেন সেই রকম।

সুনন্দ ঝাঁপিয়ে উঠল, দূর—যতসব বাজে সংস্কার। তাছাড়া ড্রাকুলা-ফ্রাকুলা বিদেশি ব্যাপার। এদেশে ড্রাকুলার কথা কখনো শোনা যায়নি।

আমি বললাম, মনে রাখিস, প্রতাপ রুদ্র বহুদিন বিদেশে কাটিয়েছে। ওর ব্যাক্‌গ্রাউন্ড কেউ জানে না। অবশ্য ওই বুনোও ভ্যাম্পায়ার হতে পারে।

সুনন্দ আমার দিকে তাকিয়ে গলা দিয়ে শুধু শব্দ করল, হুম্‌।

আশ্চর্য ব্যাপার। এর পর সুনন্দর কথাটথা কমে গেল। কিছু জিজ্ঞেস করলে হুঁ-হ্যাঁ করে দায়সারা গোছের জবাব দেয়। অন্যমনস্কভাবে মাথার চুল টানছে কেবল। ও লক্ষণ চিনি। সুনন্দর মস্তিষ্কে কোনো চিন্তা ঘুরঘুর করছে। নিশ্চয়ই আমার ড্রাকুলার আইডিয়াখানা লেগে গেছে। মনে মনে হাসলাম। আমি মোটেই সিরিয়াসলি ড্রাকুলার কথা ভাবিনি। রহস্য করেছিলাম মাত্র।

পরদিন সকালে চা এবং কিঞ্চিৎ টা গলাধঃকরণ করেই সুনন্দ হুট করে কোথায় বেরিয়ে গেল। ফিরে এল, মিনিট পনের বাদে। জানতে চাইলাম, কোথায় গিয়েছিলি?

—ঝাউবাংলোয়?

—কেন?

—প্রতাপ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

—হল দেখা?

—না। দরোয়ান বলল, 'বাবু ব্যস্ত আছেন। এখন দেখা হবে না।'

কী জন্যে গিয়েছিলি?—আমার মনে একটা সন্দেহ উঁকি দেয়।

ছিল দরকার।—সুনন্দ এর বেশি কিছু বলে না।

—হুঁ, বুঝেছি। প্রতাপ রুদ্র সত্যি সত্যি ড্রাকুলা জাতীয় জীব কিনা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলি। ঠিক আছে, একটা বুদ্ধি দিচ্ছি। শোন এরপর যেদিন দেখা হবে, প্রতাপবাবুকে একটা চকলেট বা বিস্কুট অফার করবি। যদি খেয়ে ফেলে, তবে আমাদের থিওরি টিকল না। আর যদি না খায়, তাহলে ও নির্ঘাৎ রক্তচোষা। কারণ কাউন্ট ড্রাকুলা টাটকা রক্ত ছাড়া কিছু খেত না।

আমার রসিকতায় সুনন্দ কিন্তু একটুও হাসল না। গোমড়া মুখে বসে রইল।

দুপুরে খাবার পর সুনন্দ বলল, অসিত, টেনে ঘুমিয়ে নে। আজ রাতে আর ঘুম নেই বরাতে।

কেন?—আমি চমকালাম।

—কারণ আজ রাতে আমরা প্রতাপ রুদ্রকে ফলো করব।

—অর্থাৎ তোর বিশ্বাস, প্রতাপ রুদ্রই হচ্ছে মহুয়াডাঙার নিশাচর আততায়ী। লোকটা পিশাচ। মানুষের রক্ত চুষে খায়। ধেৎ এই বিজ্ঞানের যুগে এসব ধারণা স্রেফ অচল। আমি তখন তামাশা করছিলাম।

সুনন্দ গম্ভীরভাবে বলল, প্রতাপ রুদ্রের আসল পরিচয় আমি জানি না। প্রমাণ না পেয়ে আমি কোনো সিদ্ধান্তে আসব না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহুয়াডাঙার রহস্যের পিছনে ওর হাত আছে। কেন উনি প্রায়ই রাতে গ্রামের দিকে যান?

আমি বললাম, যদি আজ রাতে উনি মহুয়াডাঙার দিকে না যান?

—আজ নয়তো কাল যেদিনই যাবে, আমরা প্রতাপ রুদ্রকে ফলো করার জন্যে তৈরি থাকব।

—অর্থাৎ এখন থেকে আমাদের রাতে ঘুমের দফা গয়া। আমার মেজাজ একদম বিগড়ে গেল। কিন্তু সুনন্দ যখন জেদ ধরেছে, ও ঠিক যাবেই। ও যা একরোখা আর ডানপিটে, আমি যেতে না চাইলে একাই যাবে। অথচ ওকে একা ছেড়ে দেওয়াও চলে না।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। নির্জন নদীতটে কতরকম পাখির কাকলি। ঝিরঝিরে বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ। ভারি আরামদায়ক। আমার ও সুনন্দর কিন্তু এসব উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা নয়। ঝোপের পিছনে লুকিয়ে অস্থির ভাবে অপেক্ষা করছি—কখন আসবে প্রতাপ রুদ্র।

সহসা দেখলাম সেই দীর্ঘ ঋজু দেহ ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে এই পথে। তার গায়ে কালচে রঙের পাঞ্জাবি ও হালকা হলুদ রঙা পায়জামা।

প্রতাপ রুদ্র ব্রিজ ছাড়ালেন। তারপর খানিক এগিয়ে মাঠে নামলেন। অর্থাৎ আজও তাঁর লক্ষ্য মহুয়াডাঙা। নজর করলাম প্রতাপ বাবুর কাঁধে ঝুলছে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

সুনন্দ বলল, এগিয়ে যাক। বেশ দূর থেকে ফলো করব। নইলে দেখে ফেলতে পারে।

প্রতাপ রুদ্রের চলমান মূর্তি ক্রমে মাঠের মধ্য দিয়ে দূরে সরে যায়। তারপর ঢালু জমিতে নেমে চোখের বাইরে চলে গেল। তখন আমরা বেরিয়ে এলাম।

পা টিপে টিপে এগোচ্ছি। কখনও ঢিবি বা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সমস্ত পশ্চিম দিগন্তে সিদুঁর-বরন হয়ে উঠল। অপরূপ সেই দৃশ্য। প্রতাপবাবুকে শেষবারের মতো দেখলাম মাঠের মধ্যে সেই যে বিরাট বটগাছটা, তার নীচে। তারপর অদৃশ্য হলেন।

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। বসে রইলাম পাথরের আড়ালে। আবার দেখলাম প্রতাপবাবু আবির্ভূত হয়েছেন।

গাছের কাছে একটা বড় চ্যাটালো পাথর পড়েছিল। বেদির মতো দেখতে। প্রতাপবাবু তার ওপর বসলেন। তাঁর পিঠ আমাদের দিকে। গাছের দিকে মুখ। স্থিরভাবে বসে আছেন। আমরা খানিক কাছে এগিয়ে গেলাম।

অবাক হয়ে দেখলাম প্রতাপবাবু পাথরের ওপর সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। চুপচাপ শুয়ে রয়েছেন নিথর হয়ে। আমরা আর একটু এগোলাম। প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে একটা পাথরের স্তূপের পিছনে ঘাপটি মেরে বসে খাঁজের ফাঁক দিয়ে লক্ষ রাখলাম প্রতাপ রুদ্রকে।

ক্রমে দিনের আলো একেবারে নিভে গেল। একটির পর একটি তারা জ্বলে উঠল আকাশপটে। ফিকে একটু চাঁদের আলো ফুটল। আবছা দেখা যাচ্ছে চারপাশ। সামনে বটগাছটাকে যেন ঘোর কালো পাথরে তৈরি একটা পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছে। তার গায়ে অজস্র জোনাকি পোকার মিটিমিটে আলো ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। বাঁ পাশে দূরে মহুয়াডাঙা গ্রামখানির গাছপালার সীমারেখা আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে। গ্রামে কোনো আলো নেই। ভেসে আসছে না মাদলের আওয়াজ। মানুষের কণ্ঠধ্বনি বা কুকুরের ডাক। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে এক অজানা বিভীষিকায় গোটা গ্রাম যেন বোবা হয়ে গেছে। পাথরের ওপর শায়িত প্রতাপ রুদ্রকে শুধু অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। ঠিক একই ভাবে তিনি শুয়ে আছেন। রুদ্রের মতলব কী? বোধহয় রাত আরও গভীর হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।

ঝিঁঝির একঘেয়ে রব ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। আমরা দুজনে কাঠের মতো বসে থাকি। প্রবল উত্তেজনায় বুকের ভিতর যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে, এবার কী ঘটবে? কী হবে এবার?

বেশিক্ষণ কাটেনি। হঠাৎ এক চিৎকার শুনলাম। মানুষের গলা। কিন্তু অদ্ভুত আওয়াজ। বুঝি রুদ্ধ আক্রোশ এবং আর্তনাদ মিশে আছে সেই স্বরে। তারপরই চ্যাঁ চ্যাঁ করে এক অপার্থিব টানা তীক্ষ্ণ শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল। মনে হল, আমাদের উলটো দিকে প্রতাপবাবুর কাছ থেকে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে সেই শব্দের উৎপত্তিস্থল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠে শব্দ লক্ষ্য করে বেগে ছুটে গেলেন। সুনন্দ আমার হাত ধরে টানল—আয় কুইক্।

প্রতাপ রুদ্রের হাতের জোরালো টর্চ জ্বলে উঠল। সেই আলোতে দেখলাম, একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে দানবের মতো একটা মূর্তি। কেশরের মতো ফাঁপানো চুলের রাশি তার মুখের অনেকটা ঢেকে ফেলেছে। ধড়াস করে উঠল হৃৎপিণ্ড। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর চিনতে পারলাম—বুনো। তার হাতে একটা বল্লম। বুনো মাটির দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রতাপবাবুও মুহূর্তের জন্য থেমেছিলেন। তারপরই দৌড়ে গিয়ে বুনোর সামনে বসে পড়লেন। আমরাও হোঁচটা খেতে খেতে এগোলাম।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি প্রতাপবাবু মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছেন আর তার ডান হাতের মুঠোয় ছটফট করছে কী একটা জীব। প্রতাপবাবুর বাঁ হাতের টর্চ আর ডান হাতের ওপর আলো ফেলল। আমি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, আরে, এ যে একটা বাদুড়!

বাদুড়টা ছোট্ট। শিয়ালের মুখের মতো দেখতে তার মুখ। দুটো চকচকে ড্যাবড্যাবে চোখ। খাড়া খাড়া কান। ছুঁচোলো কয়েকটা দাঁত হিংস্রভাবে বেরিয়ে আছে।

প্রতাপবাবু তার ডানা দুটো চেপে ধরেছেন। সে ক্রমাগত মুণ্ড ঘুরিয়ে কামড়াবার চেষ্টা করছে। আমাদের দেখে বুনো কর্কশ গলায় বলে উঠল, বাদুড়টো আমার গায়ে বসেছিল।

প্রতাপবাবু চমকে ফিরলেন। তাঁর টর্চের আলো পড়ল আমাদের মুখে—এ কী, তোমরা এখানে!

সুনন্দ উত্তর দিল, হ্যাঁ, আমরা। আশা করি চিনতে পারছেন। একটু অসময়ে দেখা হয়ে গেল।

তারপর প্রতাপবাবুর স্তম্ভিত দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে সুনন্দ বলল, অসিত, এটা কিন্তু সাধারণ বাদুড় নয়, ভ্যাম্‌পায়ার ব্যাট্। মিস্টার রুদ্র এবার আপনি—

সুনন্দ আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল। রুদ্রের চাবুকের মতো প্রশ্ন তাকে থামিয়ে দিল।

—এটা ভ্যাম্‌পায়ার ব্যাট্ তুমি জানলে কী করে? কে বলেছে?

—অনুমান, মিঃ রুদ্র, অনুমান। কাল অসিত আমায় ড্রাকুলার গল্প শোনাল। বলল, ড্রাকুলার মতো কোনো ভ্যাম্‌পায়ার নিশ্চয়ই মহুয়াডাঙার লোকের রক্ত শুষে খাচ্ছে। অমনি একটা সম্ভাবনার উদয় হল আমার মনে। ওসব ভুতুড়ে গল্প আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু একটা নতুন ক্লু মাথায় এল। ভূতপ্রেতপিশাচ নয়—বাদুড়। রক্তপায়ী বাদুড়। ভ্যাম্‌পায়ার ব্যাট্। ভ্যাম্‌পায়ার ব্যাটের রক্ত পানের বর্ণনা আমি একটা বইয়ে পড়েছিলাম। মহুয়াডাঙার ঘটনাগুলোর সঙ্গে তা অদ্ভুতভাবে মিলে গেল। স্রেফ দুইয়ে-দুইয়ে চার।

আমি বললাম যাঃ, এখানে ভ্যাম্‌পায়ার ব্যাট্ আসবে কোথা থেকে? ইম্‌পসিবল্!

সুনন্দ উত্তর দেয়—জানি, ভারতবর্ষে ভ্যাম্‌পায়ার ব্যাট্ নেই। একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনের জঙ্গলে ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তবে প্রতাপবাবু মাত্র দু মাস আগে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কিছু পশু-পাখি নিয়ে এসেছেন। অতএব এ প্রাণীটি নিশ্চয়ই তাঁর আমদানি। কী, ঠিক বলিনি, মিস্টার রুদ্র?

প্রতাপবাবু স্তব্ধ হয়ে সুনন্দর কথা শুনছিলেন। এবার শান্ত কণ্ঠে বললেন, কারেক্ট। তোমার অনুমানের প্রশংসা করি। এর নাম ডেস্‌মোডাস্‌। এক জাতীয় ভ্যাম্‌পায়ার ব্যাট্‌। আমি সাউথ আমেরিকা থেকে আনিয়েছিলাম এদের ধরন-ধারণ রিসার্চ করতে।

এরপর সুনন্দর মুখ থেকে যে কথাগুলি উচ্চারিত হল, তা শুনে আমি হকচকিয়ে গেলাম।

—মিঃ রুদ্র, আপনি কিন্তু ধরা পড়ে গেছেন। এবার আপনার নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ করতে হবে।

খেলা! নিষ্ঠুর! কী বলছ যা তা?—প্রতাপবাবু রীতিমতো ধমকে উঠলেন।

নির্বিকারভাবে সুনন্দ বলল, কেন না বোঝার কী আছে? অতি সরল বাক্য। আপনি আপনার ওই পোষা জীবটিকে রাতের পর রাত মহুয়াডাঙার নিরীহ লোকদের ওপর লেলিয়ে দিয়েছেন তার রক্ত-পিপাসা মেটাতে। খেলাটা নিষ্ঠুর বৈকি!

রুদ্রের ঠোঁটে বক্র হাসি জেগে উঠল। ধীর স্বরে বললেন, এবার তোমার অনুমান ফেল করেছেন সুনন্দবাবু। এ বাদুড় আমার পোষ মানেনি আর আমি একে মহুয়াডাঙার মানুষদের ওপর লেলিয়ে দিইনি।

তাহলে রাতে এখানে আসতেন কেন?—সুনন্দর কণ্ঠে অবিশ্বাস।

—আসতাম এই পলাতক জীবটিকে ধরবার উদ্দেশ্যে। একজোড়া ডেস্‌মোডাস এনেছিলাম। একটা মরে গেল, আর একটা খাঁচা থেকে পালাল। কয়েকদিন পরেই মহুয়াডাঙার ঘটনা কানে এল। বুঝলাম ডেস্‌মোডাসটি এই গ্রামের কাছে আস্তানা গেড়েছে। জায়গাটা পরীক্ষা করে ধারণা হল, এই বটগাছের কোটরে ও আশ্রয় নিয়েছে। গাছের গায়ে জাল খাটালাম। সারা রাত জেগে থাকতাম গাছের কাছে, যদি ফাঁদে পড়ে এই আশায়। অন্য বাদুড়ের মতোই ভ্যাম্‌পায়ার ব্যাট্‌ সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না। দিনের বেলা অন্ধকার গুহায়, ঘন পাতার ছায়ায় বা গাছের কোটরে লুকিয়ে থাকে। কেবল রাতে বেরোয়। চারদিন আগে বুঝলাম আমার ধারণা সঠিক। কারণ সেদিন সন্ধ্যায় আমি যখন ওই পাথরে বসেছিলাম, বাদুড়টা আমার মাথার ওপর দিয়ে কয়েকবার পাক খেয়ে উড়ে গেল। বোধহয় আমার রক্ত পানের মতলবে ছিল। টর্চের আলোয় তাকে চিনতে অসুবিধা হয়নি। তারপর থেকে একটা হাতে-ছোঁড়া জাল আনতাম সঙ্গে। চুপচাপ পাথরের ওপর শুয়ে টোপ ফেলতাম।

প্রতাপবাবু একটু দম নিলেন। আবার গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন, কাল ছুঁড়েছিলাম জাল। একটুর জন্যে ফস্কে গেল। নাউ, আমার মিস্টিরিয়াস মুভমেন্টের কারণ ক্লিয়ার। ওঃ গুডলাক! স্পেসিমেনটা জীবন্ত ধরতে পেরেছি। শুধু একটা ডানা জখম হয়েছে। এই লোকটা কিছু দিয়ে মেরেছে বোধহয়।

প্রতাপবাবু পকেট থেকে একটা ছোট জালের থলি বের করে বাদুড়টাকে তার মধ্যে পুরে বন্দি করে ফেললেন ও থলির মুখ চেন টেনে বন্ধ করে দিলেন।

সুনন্দ অপ্রস্তুত সুরে বলল, সরি, প্রতাপবাবু। কিন্তু এই বাদুড়ের কথা মহুয়াডাঙার লোকদের বলেননি কেন? ওরা কী ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে আছে জানেন!

প্রতাপবাবু বললেন, জানাইনি ভয়ে। জানলে ওরা হয়তো ক্ষেপে গিয়ে হাঙ্গামা বাঁধাত। তার চেয়ে ভয় ছিল, ওরা বাগে পেলে আমার দুর্লভ স্পেসিমেনটিকে মেরে ফেলবে।

দিনের বেলা এই বিরাট বটগাছের অগুণতি কোটর হাতড়ে খুঁজে বাদুড়টা ধরা অসম্ভব ছিল। গর্তে বিষধর সাপ থাকতে পারে। তবে গ্রামের লোক বাদুড়কে মারতে চাইলে কোটরে কোটরে বাইরে থেকে ফুটন্ত গরম জল ঢেলে দিলেই খতম। তাই চেষ্টায় ছিলাম, নিজেই ধরব কৌশলে। ও যখন রাতে বেরোবে তখন।

—প্রতাপবাবু আপনার ওই মহামূল্যবান স্পেসিমেনটির জন্যে গ্রামের একজন লোক যে প্রাণ হারাতে বসেছে, সে খবর রাখেন? আমি বলে ফেললাম।

সে কী! কে? কেন?—প্রতাপবাবুর চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে।

বুনোর দিকে আঙুল দেখায় সুনন্দ—এই লোকটির বিপদ। গ্রামের লোকের সন্দেহ, ও-ই দানো হয়ে রাত্তিরে মানুষের রক্ত শুষে খাচ্ছে। ওকে খুন করার প্ল্যান হচ্ছে।

বুনো এতক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল। উদ্‌গ্রীব হয়ে আমাদের উত্তেজিত কথাবার্তার মর্ম গ্রহণের চেষ্টা করছিল। সে বলে উঠল, বাদুড়টো আমার গায়ে বসেছিল। এক ঝাপ্পড় দিলাম।

আমার মনে এক প্রশ্ন জাগে। জিজ্ঞেস করি, বুনো, এখানে কী করছিলি তুই?

বুনো বলল, পাহারা দিচ্ছিলেম। সেই রক্তখেকো দানোটাকে ধরব বলে। দেখলেম তোরা তিনজনা মাঠের মধ্যে ঘুরছিস। তাই লুকিয়ে নজর রাখছিলেম পাথরের পিছনে শুয়ে।

সুনন্দ বলল, বুনো, দানোটাকে তুই ধরে ফেলেছিস। আসলে দানো পিশাচ নয়। এই বাদুড়টাই আসামি। ও-ই ঘুমন্ত লোকের রক্ত শুষে খায়।

বাদুড় রক্ত খায়?—কথাটা যেন বুনোর বিশ্বাস হল না।

সুনন্দ বলল, দেশি বাদুড় খায় না। এটা বিদেশি বাদুড়। ফল-পাকুড় খায় না। শুধু রক্ত খায়। মানুষ বা পশু-পাখির তাজা রক্ত। মানুষের চামড়া নরম। তাই এরা মানুষের গায়ে দাঁত ফোটাতে বেশি পছন্দ করে।

বুনো বিস্ফারিত নেত্রে কয়েক মুহূর্ত দেখল বন্দি বাদুড়টাকে। তার সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠল। বিকৃত মুখে উন্মত্তের মতো চিৎকার করে ওঠে বুনো, ওটা বাদুড় নয়, শয়তান। শয়তান। ওটাকে আমি মেরে ফেলব। শেষ করে দোব। দে, দে, ওটা দে আমায়।

হাতের বল্লম ফেলে দিয়ে বুনো একলাফে প্রতাপ বাবুর দিকে এগিয়ে গেল। প্রতাপবাবুর ডান হাতে বন্দি বাদুড়। তিনি বাঁ হাতে বুনোকে ঠেকালেন। আমি আর সুনন্দও তৎক্ষণাৎ জাপটে ধরলাম বুনোকে।

উঃ, কী প্রচণ্ড জোর লোকটার গায়ে! ঝট্‌কা দিয়ে আমাদের দুজনকে প্রায় ছাড়িয়ে ফেলে সে বারবার প্রতাপবাবুর হাত থেকে বাদুড়টা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। আমরা দুজন না আটকালে ও নির্ঘাৎ বাদুড়টা কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলত। ধাক্কা খেয়ে প্রতাপবাবুর হাত থেকে টর্চ খসে পড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিলাম টর্চটা।

বুনোর গলা দিয়ে গোঙানির মতো আওয়াজ বের হচ্ছে। অনেকদিনের জমা হওয়া শঙ্কা ও ক্ষোভ যেন ক্রোধের রূপ নিয়ে ফেটে পড়তে চাইছে। আমরা প্রাণপণে বোঝাই—বুনো, শোন শোন, এই বাদুড়টা আর কোনো উৎপাত করবে না। ওকে খাঁচায় আটকে রাখা হবে। ইত্যাদি।...

তবু বুনোর রাগ পড়ে না। সে কেবলই ফুঁসছে। একটা ধস্তাধস্তি চলতে থাকে। সুনন্দ হঠাৎ বলে উঠল, বুনো শোন, ডাক্তারবাবু বলেছেন তোর মেয়ের চিকিৎসা করবেন। তোর মেয়েকে হাতপাতালে ভর্তি করে নেবেন।

বুনোর বজ্র-কঠিন পেশীগুলি অমনি কেমন শিথিল হয়ে গেল। সব ভুলে গভীর আগ্রহে সুনন্দর দিকে চেয়ে সে বলল, আমার মেয়ে ভালো হয়ে যাবে? ডাক্তারবাবু বলেছে?

যাবে বৈকি। নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে।—সুনন্দ আশ্বাস দিল।

কার অসুখ?—প্রতাপবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

—বুনোর মেয়ের। মেয়েটির একটা পা আঘাত লেগে খোঁড়া হয়ে গেছে।

—হুঁ আমি দেখেছি মেয়েটিকে। ভেরি স্যাড কেস।

সুনন্দ বলল, আমার মামার বন্ধু ডাক্তার চ্যাটার্জী বলেছেন, মেয়েটির ট্রিটমেন্ট করবেন। তবে হাসপাতালে রাখতে হবে। তার খরচ আছে। দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়।

রুদ্র বললেন, বুনোর মেয়ের চিকিৎসার সব খরচ আমি দেব। এ আমার ঋণ শোধ। তুমি বুনোকে বলে দাও।

সুনন্দ বুনোকে বলল—শুনলি, বাবু কী বললেন?

বুনো প্রতাপবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। এরপর সে জ্বলন্ত চোখে নিরীক্ষণ করল জালে বদ্ধ বাদুড়টিকে। বিড়বিড় কি যেন বকতে লাগল নিজের মনে। বোঝা গেল ওই বাদুড়ের ওপর তার রাগ ও বিদ্বেষ কিছুমাত্র কমেনি। বাদুড়ের মালিক সম্বন্ধেও তার মন রীতিমতো সন্দিগ্ধ।

আমি বললাম, বুনো, এই রক্তচোষা বাদুড়ের কথা তুই বলিস নি কাউকে। বরং গ্রামের লোককে জানিয়ে দে, তুই মন্ত্রের জোরে দানোটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিস। তোর খুব খাতির হবে গাঁয়ে।

হুঁ।—বুনো তার ঝাঁকড়া চুলো মাথাখানা ঝাঁকালো অর্থাৎ আমার পরামর্শ তার মনে ধরেছে। সে একবার ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল গ্রামের দিকে। বলে উঠল, যাই মেয়েটা একা রইছে।

মাটি থেকে বল্লমটা কুড়িয়ে নিয়ে বুনো সহসা দৌড়তে শুরু করল।

ম্লান জ্যোৎস্নালোকে উন্মুক্ত প্রান্তরের বুক ছুঁয়ে বুনোর সুদীর্ঘ ছায়ামূর্তি যেন উড়ে চলল। ক্রমে সে হারিয়ে গেল দূর অন্ধকারে।

চ্যাঁ-এ! একটা বিশ্রী চেরা আওয়াজে আমাদের চমক ভাঙল। মহুয়াডাঙার রক্তচোষা তার বন্দিদশার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

বাস্তেন দ্বীপে অভিযান

সুনন্দ হঠাৎ খপ্ করে আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, দাঁড়া। সামনে একটা ছিনতাই কেস মনে হচ্ছে। দেখি ব্যাপারটা? দুজনে স্তব্ধ হয়ে যাই। একটু সরে গেলাম পাশে গাছের ছায়ার আড়ালে। চুপচাপ দেখতে থাকি।

কলকাতা শহর। রাত দশটা বাজে প্রায়। আমি আর বন্ধু সুনন্দ গিয়েছিলাম গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে এবং আড্ডা মারতে। ওখানে আরও কয়েকজন বন্ধু প্রায়ই জমা হই সন্ধে থেকে।

হেঁটে ফিরছিলাম রাজভবনের গা ঘেঁষে। এসপ্ল্যানেড অবধি হেঁটে গিয়ে বাস ধরব। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। গরম কমেছে কলকাতায়। তবে শীত পড়েনি তেমন। ভালোই লাগছিল হাঁটতে। ফুটপাতে তখন পথচারীর সংখ্যা বেশ কম। রাস্তায় গাড়ি ছুটছে হু হু করে মাঝে মাঝে। রাজভবনের পাঁচিলের ধারে ধারে গাছগুলোর লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে ফুটপাতে। এক ফালি চাঁদ আবছা আলো ছড়াচ্ছে আকাশে। স্ট্রিট লাইটগুলো অবশ্য জ্বলছে। আলো-আঁধারি মিশেল বেশ রহস্যময় পরিবেশ।

আমাদের আগে ষাট-সত্তর ফুট দূরে একটি লোকও এগোচ্ছিল ওই ফুটপাত ধরে। গঙ্গার কাছ থেকেই সে আমাদের সামনে সামনে যাচ্ছিল। বেঁটেখাটো প্যান্টসার্টপরা মানুষটি ধীরে সুস্থে হাঁটছিল আমাদের মতোই। দেখলাম, হঠাৎ যেন অন্ধকার ফুঁড়ে দুটো লোক সামনে খাটো লোকটির পথ আগলে দাঁড়াল। মনে হয় পাঁচিলের ধারে লোক দুটো গাছের ছায়ায় মিশে ঘাপটি মেরে ছিল শিকারের আশায়।

দুটো লোকের একজন বেঁটে মানুষটিকে মুঠো পাকিয়ে নিচু স্বরে বলছে কিছু। তার ভাবভঙ্গি সুবিধের নয়। দ্বিতীয় জন পাশের দিকে সরে গেল। দেখলাম যে পথ আগলানো আগন্তুক বেঁটে মানুষটির প্যান্টের পকেটে স্রেফ হাত ঢুকিয়ে দিল। হয়তো মানিব্যাগের আশায়।

পথচারী বেঁটে মানুষটি এতক্ষণ কিছু বলছিল মৃদুস্বরে আর কেবলই ঘাড় নাড়ছিল। এবার সে তড়িৎগতিতে হাত চালাল। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনের লোকটি উলটে পড়ল ফুটপাতে। কিন্তু পাশে থাকা দ্বিতীয়জন কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করল বেঁটে পথচারীটিকে। লোকটি বসে পড়ে মাথা চেপে। ভূপতিত ছিনতাইকারী এই সুযোগে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সুনন্দ বলল, ছোট্। আটকাতে হবে।

সুনন্দ দৌড়ল। পিছু পিছু আমি।

যে লোকটা মেরেছিল সে ঝুঁকে তার শিকারের পকেট হাতড়াচ্ছে। দ্বিতীয় ছিনতাইকারীও কাছে এসে দেখছে। আমাদের পায়ের শব্দে লোক দুটো ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে না দেখতেই সুনন্দ ঝুঁকে পড়ার পশ্চাদ্দেশে কষাল ভারী জুতোর প্রচণ্ড এক লাথি।

লোকটা ছিটকে উলটে পড়ল ফুটপাতে। আমি দ্বিতীয় ছিনতাইকারীর মুখে মারলাম এক মোক্ষম ঘুষি। 'আক্' শব্দ করে সে মুখ চেপে টলমলিয়ে পিছিয়ে গেল।

সুনন্দর লাথি খাওয়া লোকটা কিঞ্চিৎ সামলে উঠে দাঁড়াচ্ছে, দেখি তার হাতে একখানা ছুরি। চকচক করে ওঠে স্ট্রিট লাইটের আলোয় ছুরির সরু লম্বা ফলা। কিন্তু সুনন্দ তাকে আক্রমণের সুযোগই দেয় না। ফের এক লাথি কষায় লোকটার ছুরি ধরা হাতে কনুইয়ের কাছে। ছুরি খসে পড়ে হাত থেকে। ব্যথায় কাতরে ওঠে লোকটা। তারপর ঘুরে মারল টেনে দৌড়। তার ছিনতাইয়ের সাধ উবে গেছে। দ্বিতীয় লোকটাও প্রাণপণে অনুসরণ করল সঙ্গীকে। দুজনে রাস্তা পেরিয়ে মিলিয়ে গেল ময়দানের অন্ধকারে।

সুনন্দ ছুরিটা কুড়িয়ে নেয়। ফলাটা আট ইঞ্চি হবে। দারুণ ধার। ইস্, লাভের বদলে ব্যাটাদের লোকসানই হয়ে গেল। আমরা এবার সেই বেঁটে মানুষটির দিকে নজর দিই।

লোকটি তখনো ফুটপাতে বসে। হতভম্ভ দৃষ্টি। এক হাতে চেপে আছে নিজের মাথার এক পাশ। লোকটিকে তুলে ল্যাম্প পোস্টের আলোয় পরীক্ষা করি। নাঃ রক্ত গড়াচ্ছে না। তবে লেগেছে খুব। ওর যন্ত্রণাকাতর মুখ দেখেই মালুম হচ্ছে। লোকটির মাথায় পরা কাউন্টি-ক্যাপ জাতীয় মোটা কাপড়ের টুপি তার মাথাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে এযাত্রা।

পথচারীকে দেখে আমরা অবাক। লোকটি বাঙালি নয়। মনে হল ভারতীয়ই নয়। মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখ। চিনা, বর্মী বা মালয়িদের মতন দেখতে। গড়ন ছোটখাটো হলেও মজবুত। লোকটি খানিক সামলিয়ে বলল, থাঙ্কু মিস্তার। ইউ ছেভ মি। ওঃ। সে নিজের মাথায় হাত বোলায় টুপিটা খুলে।

আমরা দেখলাম, কাটেনি বটে কিন্তু মাথার এক জায়গায় বেশ ফুলে উঠেছে।

কয়েকজন পথচারী ইতিমধ্যে জুটে গেছে চারপাশে। প্রশ্ন হয়—

—কী হয়েছে দাদা?

—কেসটা কী?

—ছিনতাই করছিল। জবাব দেয় সুনন্দ।

—নিয়েছে কিছু?

—মেরেছে বুঝি? লোকটা তো মনে হচ্ছে চিনেম্যান।

—হুঁ বিদেশি। তাই মনে হচ্ছে। জানাই আমি।—তবে নিতে পারেনি কিছু। আমরা কয়েক ঘা লাগাতেই পালাল লোক দুটো। আমরা একটু দূরে পিছনে ছিলাম ভাগ্যিস। তবে মেরেছে মাথায়। দেখি জিজ্ঞেস করে কোথায় যাবে? পরিচয় কী? কিছু একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো বটেই। থানায় নিয়ে যান। ডায়ারি করে দিন। পুলিশই যা করবার করবে।

—সঙ্গে টাকাকড়ি বেশ আছে বোধহয়। তাই ফলো করছিল। এই লোকগুলোও সুবিধের হয় না। থানায় জমা করে দিন।

অন্য পথচারী কেউ কিন্তু ওই লোকটিকে থানায় নিয়ে যেতে সাহায্য করতে এগোল না। তারা সুট্সাট্ কেটে পড়ল উপদেশ ঝেড়ে। ফের আমরা তিনজন। চারপাশ মোটামুটি ফাঁকা।

আক্রান্ত লোকটি এতক্ষণ চুপচাপ অন্যদের কথা শুনছিল। বোধহয় বুঝতে পারছিল। বাকিরা চলে যেতে সে মাথা নেড়ে বলল, নো পুলিশ। নো পুলিশ।

কে জানে, পুলিশে ছুঁলে আঠারো-ঘা আপ্তবাক্যটি এর জানা আছে হয়তো। যাহোক সুনন্দ তাকে ইংরেজিতে আশ্বাস দেয়, ঠিক আছে, পুলিশে রিপোর্ট করা দরকার নেই। তবে তোমার মাথায় লেগেছে বেশ। ফার্স্ট-এড দেওয়া উচিত। হাঁটতে পারবে খানিকটা?

লোকটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

ধীরে ধীরে হেঁটে এস্‌প্ল্যানেডের দিকে যেতে যেতে আমরা লোকটির পরিচয় জানার চেষ্টা করি। ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করি, তুমি করো কী? মানে প্রফেশন?

উত্তর হয়, সেলার।

জাহাজের নাবিক! বাঃ।

—দেশ কোথায়? ইন্ডিয়ান?

—নো। ইন্দোনেশিয়ান।

আমি ও সুনন্দ চোখাচোখি করি। দারুণ ইন্টারেস্টিং লোক। সুনন্দ আমায় ফিসফিসিয়ে বলে বাংলায়, লোকটাকে সহজে ছাড়ছি না। ওর গল্প শুনতে হবে।

বটেই তো। আমারও তাই হচ্ছে। সাত-সমুদ্রে ঘোরা জাহাজের নাবিকদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হয় বিচিত্র। আমরা ডাঙার মানুষরা তার কতটুকু জানি বা দেখেছি। সব বিদ্যে বই পড়ে ঠিক জানা যায় না। এসব মানুষ তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লেখেও কদাচিৎ। তবে আগ্রহ দেখালে বলে শুনেছি।

লোকটি দেখলাম ইংরেজিটা মোটামুটি বলতে ও বুঝতে পারে। কিছু বাংলা হিন্দিও জানে। তবে তেমন সড়গড় নয় কথায়, বোঝে বেশ। আরও নিশ্চয় অনেক ভাষাই কিছুটা জানে। যারা বন্দরে বন্দরে ঘোরে, তারা নানান দেশের ভাষা কাজ চালানোর মতো শিখে ফ্যালে। ইংরেজিতে চিনাদের মতো ট উচ্চারণটা করে ত এবং কিঞ্চিৎ আধো আধো সুরে উচ্চারণ। জানলাম যে লোকটির নাম মিকি। মিকি হরতানো। থাকে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায়। বছর কুড়ি জাহাজে কাজ করছে। ওদের গ্রামের অনেকেই জাহাজি নাবিক। মিকি ধর্মে বৌদ্ধ। মিকি মালবাহী জাহাজের কাজ করে। ভারতবর্ষের নানা বন্দরে এবং কলকাতা বন্দরে কয়েকবার এসেছে আগে। ঘুরেছে কলকাতায়। কলকাতার পথঘাট চেনে কিছুটা। ওর জাহাজ খিদিরপুর ডকে ভিড়ে আছে। মাল খালাস চলছে। দিন তিনেক বাদে ফের যাত্রা করবে। ছেড়ে যাবে কলকাতা। কয়েকদিন মিকি কলকাতাতেই রয়েছে জাহাজি মাল্লাদের এক আস্তানায়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে আস্তানাটা। ওখানে অনেক চেনা জানা মাল্লা জোটে। আড্ডা হয়। আজ গিয়েছিল জাহাজি অফিসে একজন এদেশি লোকের সঙ্গে দেখা করতে। গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেল। হেঁটেই ফিরছিল ওয়েলিংটনে। রাস্তা সে চেনে। হাঁটতে তার খুব ভালো লাগে। জাহাজে তো বন্দি জীবন। কোনো বন্দরে নামলেই তার শখ শহরটা হেঁটে দেখে বেড়ানো। আজকের মতো উটকো ঝামেলায় আগে পড়েনি কলকাতায়। তবে অন্য দেশে পড়েছে কয়েকবার। ভাগ্যিস আজ তার পার্সটা খোয়া যায়নি। অনেক টাকা ছিল। আমাদের সে অনেক ধন্যবাদ জানাল এযাত্রা 'সেভ' করার জন্য। দেশে মিকির পরিবার থাকে। স্ত্রী এবং সাত ও পাঁচ বছরের দুটি ছেলে।

কথা বলতে বলতে এসপ্ল্যানেডে হাজির হলাম। একটা দোকান থেকে বরফ নিয়ে মিকির মাথায় আঘাতের জায়গায় লাগানো হল। বরফ লাগাতে ব্যথা কিছু কমল।

এরপর সুনন্দ অনুরোধ করল মিকিকে, আজ তোমার জাহাজি আস্তানায় না গেলে। বরং চলো আমাদের বাড়িতে রাতটা কাটাবে। তোমার গল্প শুনব। কত দেশে ঘুরেছ। নিশ্চয় কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে।

মিকি ইতস্তত করছে দেখে সুনন্দ জোর দেয়, আমাদের কোনো অসুবিধে নেই। আমাদের বাড়িতে থাকি শুধু আমি আর আমার এক মামা। তিনি সায়ান্টিস্ট প্রফেসর হলেও মাই ডিয়ার মানুষ। তোমার সঙ্গে আলাপ হলে খুশি হবেন। বাড়িতে শোবার জায়গা যথেষ্ট। কী খাবে বলো রাতে। দোকান থেকে কিনে নিয়ে যাই। যা যা তোমার পছন্দ।

—অলরাইত। মিকি রাজি হয়ে যায়।

সুনন্দ বলে, বুঝলে মিকি, শহুরে লোকের সঙ্গে তো একঘেয়ে দিন কাটাই। তোমার মতো ইন্টারেস্টিং লোকের দেখা পাই খুব কম। তুমি গেলে আমাদের সৌভাগ্য। জানো আমরা খুব বেড়াতে ভালোবাসি। অনেক বেড়িয়েছি দেশে বিদেশে। দুর্গম অঞ্চলে। অচেনা দেশ, সমুদ্র, প্রাণী, গাছপালা আমাদের ভীষণ টানে। তাই তোমায় ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

সুনন্দ আমায় বলল, আজ রাতে তুই আমাদের বাড়িতে থাকবি। বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দে।

আমি তো তক্ষুনি রাজি।

এই ঘটনার ফলেই মিকির সঙ্গে সুনন্দর মামাবাবু প্রফেসর প্রাণিবিজ্ঞানী নবগোপাল ঘোষের যোগাযোগ হয়। আর তার ফলেই আমাদের এক নতুন রোমাঞ্চকর অভিযান ও অ্যাডভেঞ্চারের সূত্রপাত। এখন আমাদের নিজেদের পরিচয়টা কিছু জানিয়ে রাখি।

আমি—অসিত রায়। সুনন্দ মানে সুনন্দ বোস আমার বাল্যবন্ধু। সুনন্দর মামাবাবু শুধু প্রাণিবিজ্ঞানী নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর প্রবল আগ্রহ। সুনন্দও প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্র। এম. এস. সি পাস করে এখন রিসার্চ করছে। আপাতত সে কিছু দিন রয়েছে নবগোপালবাবুর বাড়িতে। তার রিসার্চের কাজে মামাবাবুর সাহায্য নিতে।

নবগোপাল ঘোষ বিয়ে থা করেননি। একা থাকেন। সুনন্দকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। সুনন্দর বন্ধু হিসেবে ছোট থেকেই আমি তাঁকে চিনি।

আপাতগম্ভীর দর্শন, মাঝারি স্বাস্থ্য, মাঝারি হাইট, মামাবাবুকে দেখলে আর পাঁচটা সাধারণ ছাপোষা বাঙালি গেরস্থ অধ্যাপকের থেকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু ওই মানুষটি প্রচণ্ড অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেশায় কত দুর্গম অঞ্চলে যে পাড়ি দিয়েছেন। অনেক সময় সুনন্দ এবং কখনো কখনো আমিও তাঁর সঙ্গী হয়েছি।

আমার বিষয় অবশ্য ইতিহাস। এম. এ. পাস করে গবেষণা করছি। তবে সুনন্দ ও মামাবাবুর সঙ্গ পেয়ে বিজ্ঞানেও যথেষ্ট আগ্রহ জন্মেছে। নতুন দেশ দেখার সুযোগ পেলে আমিও ছাড়ি না।

মিকিকে নিয়ে গেলাম মামাবাবুর কাছে, ভবানীপুর অঞ্চলে মামাবাবুর বাড়িতে। মামাবাবু মিকির পরিচয় জেনে খুব খুশি হলেন।

রাতে খাবার আগে ও পরে জমিয়ে গল্প হল। প্রধানত এশিয়া মহাদেশের বন্দরগুলিতেই মিকির যাতায়াত। বন্দরে বন্দরে তার কত আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কাহিনি। কত অজানা দ্বীপ সে দেখেছে। কত অজানা প্রাণী ও মানুষ। গাছপালা। কত বিপদে যে পড়েছে। প্রথমে কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট থাকলেও পরে দেখলাম মিকি দিব্যি হাসিখুশি মানুষ। তার গল্প বলার ঢংও চমৎকার।

ভালো ভালো খাবার একপেট খেয়ে মিকি মহাখুশি। জানাল যে অনেক দিন বাদে এমন খাসা ভোজ জুটল তার কপালে। জাহাজের খাদ্য তো বেজায় নীরস। কলকাতায় তার আস্তানার খাবার অতি বাজে। হোটেল রেস্তরাঁয় বেশি খরচ করে ভালো খাওয়া তার সাধ্যের বাইরে। মাইনে তো বেশি নয়। বাড়িতেও টাকা পাঠাতে হয়।

পরদিন ভোরে উঠেছে মিকি। চা জলখাবার খেয়েছে। খানিক বাদে বিদায় নেবে। মামাবাবু তখন তাঁর বাড়ির বাগানে গাছপালার তদারকি করছেন। মিকি বাগানে গিয়ে দাঁড়ায়। আমরাও সঙ্গ ধরি।

ইদানীং মামাবাবুর এক নতুন শখ হয়েছে বাগান করা। মামাবাবুর বাড়ির পিছনে কাঠা দুই বাগান করার মতন জমি আছে। সেখানেই তাঁর উদ্যানচর্চা। একটা ছোট গ্রিনহাউসও বানিয়েছেন।

প্রথামতো চেনা ফুল-ফলের গাছ করায় মামাবাবুর উৎসাহ নেই। নানান বিচিত্র গাছ লাগাচ্ছেন। নিজের ফর্মুলা অনুযায়ী তাদের সার দিচ্ছেন, যত্ন করছেন। ফলাফলের নোট রাখছেন। অর্থাৎ ওই গাছপালা নিয়ে গবেষণা চলছে। হয়তো সেটাই আসল উদ্দেশ্য। আমরা তাঁর বাগান নিয়ে কিছু মন্তব্য করলে মোটেই আমল দেন না। নিজের তালেই আছেন।

মিকি ঘুরে ঘুরে বাগান দেখতে দেখতে কয়েকটি গাছের সামনে এসে বলল, এই গাছ দেখেছি একটা দ্বীপে। প্রচুর। তবে সাইজে ঢের বড় বড়। আর পাতার ঝাড় অনেক বেশি।

—এগুলো কী গাছ জানো? প্রশ্ন করেন মামাবাবু।

—না। মিকি মাথা নাড়ে।

—এগুলো পোস্ত গাছ। পপি প্ল্যান্ট। যা থেকে আফিং হয়। ওপিয়াম।

—ইজ ইত? মিকি বেশ আগ্রহ দেখায়, আপনি ওপিয়াম তৈরি করেন নাকি?

—না বাবা। মামাবাবু হাসেন, তাহলে পুলিশে ধরবে। কয়েকটা মাত্র গাছ করেছি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে।

—আফিং হয় কী ভাবে? প্রশ্ন মিকির।

—এর ফলের গা চিরে দিলে রস বেরায়। তাই শুকিয়ে আফিং হয়। আর ফলের ভিতরের বিচি হল পোস্ত। বাঙালিদের প্রিয় খাদ্য। আচ্ছা তুমি কোন দ্বীপে এ গাছ প্রচুর দেখেছিলে বড় বড়? দ্বীপের লোক চাষ করে বুঝি?

—ও দ্বীপে লোকই থাকে না কেউ। শুধু বাস্তেন সাহেব ছিল। সেই বোধহয় লাগিয়েছিল।

—দ্বীপটা কোথায়?

—জাভা সি-তে। ছোট্ট দ্বীপ। বনজঙ্গলে ভরা।

—তুমি ওখানে গিছলে কেন?

—গিয়েছিলাম বাধ্য হয়ে. প্রাণ বাঁচাতে। সাধ করে কি ও দ্বীপে যায় কেউ?

—কী রকম? আমরা সবাই কৌতূহলী।

—তাহলে একটা লম্বা গল্প ফাঁদতে হয়, জানায় মিকি। বোঝা গেল যে গল্পটা বলতে তার অনিচ্ছা নেই, তবে আমরা শুনব কিনা বুঝতে পারছে না।

—বলো বলো কী হয়েছিল? আমরা তাড়া লাগাই। বাগানের বেঞ্চিতে আর বেদিতে বসি সবাই।

মিকি বলতে শুরু করে, সে প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা। আমাদের জাহাজ ফিলিপিনস্ সেলিবিস লম্বক মাদুরা হয়ে যাচ্ছিল জাকার্তায়। মাদুরা ছেড়ে যাবার কিছু পরেই হঠাৎ উঠল ঝড়। প্রচণ্ড ঝড়। তখন শীতকাল। তখন ওখানে ঝড় কমই হয়। তবে বৃষ্টি হয় প্রায়ই। ঝড়ের দাপটে ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা লেগে আমাদের জাহাজের তলা ফুটো হয়ে ডুবতে লাগল। সবাই প্রাণ বাঁচাতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল কাছাকাছি কোনো দ্বীপে আশ্রয় নেবার আশায়। একটা লাইফ-বেল্ট জোগাড় করে আমিও ঝাঁপালাম জলে। ওখানে ছোট বড় প্রচুর দ্বীপ। স্রোত আর বাতাসের টানে ভাসতে ভাসতে প্রথমে উঠলাম এক ছোট্ট ন্যাড়া দ্বীপে। সেখানে মানুষজনের বাস তো নেই-ই। গাছপালাও খুব কম। শুধু অজস্র সামুদ্রিক পাখির আস্তানা। পাখির ডিম খেয়ে কোনোমতে সেখানে দুটো দিন কাটালাম। জোর বৃষ্টি পড়ছে থেকে থেকে। কোনোরকমে পাথরের খাঁজের তলায় মাথা গুঁজে রইলাম। বুঝলাম যে এখানে থাকলে স্রেফ না খেয়ে বা ভিজে অসুখ করে মরব। মাইল দুই দূরে আর একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল, একটু যেন বড়। লাইফবেল্ট আঁকড়ে ফের জলে নামলাম। সাঁতরে হাজির হলাম ওই দ্বীপে। ওই দ্বীপেই দেখেছিলাম ওপিয়াম গাছের ঝাড়।

—সে দ্বীপে মানুষ ছিল না?

—না। ছোট্ট দ্বীপ। তবে দ্বীপে গাছপালা প্রচুর। ঝরনা রয়েছে একটা। কয়েকটা ছোট পুকুর। বড্ড উঁচুনিচু। সমতল জায়গা কম। মাঝখানে এক ছোট পাহাড়। গুহাও রয়েছে কয়েকটা। ঘুরে দেখে আমি অবাক। কত রকম যে গাছপালা দ্বীপটায়। দেশি বিদেশি। এমন দ্বীপ জন্মে দেখিনি। রীতিমতো গা ছমছম করতে লাগল। রবার গাছ, তাল আনারস আম জাম কাঁঠাল ডুরিয়ান কফি চা পেয়ারা বাঁশ কলা তেঁতুল, আরও কত কী! কত রকম যে ফুল ফুটেছে। অনেক ফুল চোখেই দেখিনি আগে। সেখানেই এই ওপিয়াম গাছ দেখেছিলাম।

—পাহাড়ের গায়ে একটু সমতল জায়গায় একটা ভাঙাচোরা কাঠের বাড়ি দেখলাম। কাঠ আর বাঁশ দিয়ে তৈরি। বেশ বড়ই ছিল একসময়। বুঝলাম, মানুষের বাস ছিল সেখানে। কিন্তু তখন জনমনিষ্যি নেই।

—তবে খাবার সমস্যাটা মিটল। খাবার মতো প্রচুর ফল গাছে গাছে। মুরগি আর ছাগল চরছে। বুনো। সামুদ্রিক পাখি আর তাদের ডিমও পাওয়া গেল প্রচুর। বড় একটা ডোবায় সাঁতার কাটছে পাতি হাঁস। ওই ডোবার পাশেই দেখি মস্ত মস্ত ওপিয়াম গাছের ঝাড়।

আমার সঙ্গে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা ছিল। ওয়াটার-প্রুফ কেসের মধ্যে রাখা লাইটার। একটা গুহা খুঁজে আশ্রয় নিলাম। আগুন জ্বালালাম। ফল ও ঝলসানো মাংস খেয়ে কাটাতে লাগলাম। নজর রাখছি কোনো নৌকো বা জাহাজের দেখা যদি পাই। চারদিন বাদে দেখি দুটো বড় বড় নৌকো যাচ্ছে দ্বীপের কাছ দিয়ে। কাপড় নাড়িয়ে নানান ইঙ্গিতে ডাকলাম তাদের। ওরা সিঙ্গাপুর যাচ্ছিল। আমার তুলে নিল। নামিয়ে দিল জাকার্তায়। বেঁচে গেলাম সেযাত্রা।

—ওই দ্বীপটা সম্বন্ধে খোঁজখবর করেছিলে? প্রশ্ন করেন মামাবাবু।

—করেছিলাম বইকি। ওখানকার লোক ওই দ্বীপটাকে বলে—বাস্তেন সাহেবের দ্বীপ। বাস্তেন আইল্যান্ড। ফন বাস্তেন নামে এক ডাচ্ ওই দ্বীপটায় ছিল অনেক বছর। প্রায় পনেরো বছর। বাস্তেনই নাকি দ্বীপে অত গাছপালা লাগিয়েছিল। তার আগে দ্বীপটায় তেমন গাছপালা ছিল না। তবে নারকেল গাছ ছিল। আর বুনো ঝোপঝাড়।

—বাস্তেন সাহেব ওখানে কী করত? মামাবাবু জানতে চান।

—অদ্ভুত লোক ছিল নাকি বাস্তেন। খেয়ালি প্রকৃতির। ওখানকার লোকদের মুখে যা শুনেছি। যৌবনে এসেছিল ইন্দোনেশিয়ায়। রবার বাগানে ম্যানেজারি করতে। চার-পাঁচ বছর ছিল আন্দালাস আর জাভায়। এই সময় দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড-ওয়ার বাধল। বাস্তেন কালিমান্তান মানে বোর্নিও গিয়েছিল কাজে। স্টিমারে জাকার্তায় ফিরতে ফিরতে খবর পায় যে জাপানিরা জাভা অধিকার করে নিয়েছে। সাউথ-ইস্ট এশিয়া আক্রমণ করেছে জাপানিরা। হুড়হুড় করে এগোচ্ছে তাদের ফোর্স। জাপদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে বাস্তেন আর জাকার্তায় ফেরে না। জাভা সি-তে ওই একরত্তি জনমানবহীন দ্বীপে নেমে যায়। সেখানে লুকিয়ে থাকে মাসখানেক। এরপর দেশি জেলেদের নৌকায় চেপে ছদ্মবেশে হাজির হয় আন্দালাসের তীরে। তারপর স্রেফ জঙ্গলে গিয়ে লুকোয়। গভীর অরণ্যে।

—আন্দালাস কোথায়? সুনন্দ প্রশ্ন করে।

ইতিহাসের ছাত্র আমি পাণ্ডিত্য ফলাবার সুযোগ হারাই না।

গম্ভীরভাবে জানাই, আমরা যাকে বলি সুমাত্রা, তারই লোকাল নেম।

মামাবাবু ও মিকি মাথা নেড়ে সায় দেয়। বুঝি মিকি সুমাত্রা নামটা জানে।

মিকি বলে চলে, বাস্তেন সাহেব আন্দালাসের পাহাড়-জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল বছর দুই। কী করে যে বেঁচে ছিল কে জানে? জঙ্গল যা ঘন। যা বৃষ্টি। বিষাক্ত সাপখোপ। হিংস্র জানোয়ারও আছে। অবশ্য জঙ্গলের আদিবাসীদের ধরনধারণ ভাষা কিছুটা জানত বাস্তেন।

—যুদ্ধ থেমে গেলে বাস্তেন বেরিয়ে আসে শহরে। জাপানিরা হেরে গেছে তাই ভয় নেই আর। এরপর বাস্তেন চলে যায় নিজের দেশ হলান্ডে। কিন্তু ফিরে আসে আবার। জার্মানির আক্রমণে ওর অনেক নিকট আত্মীয় নাকি মারা গিয়েছিল। দেশে ওর ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দেশে ওর আর মন টিকছিল না।

অনেকক্ষণ কথা বলেছে মিকি। মামাবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এক কাপ কফি খাবে নাকি?

—তা বেশ। মিকি রাজি।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে ফের শুরু করে মিকি, বাস্তেন বছর খানেক নানা কাজ করে ইন্দোনেশিয়ার কয়েক জায়গায়। তারপর নাকি ওই দ্বীপে গিয়ে আস্তানা গাড়ে। চাকরি আর করেনি। বাস্তেনের গাছপালার খুব শখ ছিল। জানতও বেশ গাছপালা সম্বন্ধে। ওই দ্বীপে বাস্তেন খুশিমতো গাছ পুঁততে থাকে। দেশ-বিদেশের গাছের চারা বিচি জোগাড় করে, ফুল ফল অনেক রকম। তাই নিয়েই মেতে থাকত। সমুদ্র পেরিয়ে বড় দ্বীপের শহরে যেত অবশ্য, তবে খুব কম। দরকার না হলে যেত না শহরে।

—স্রেফ একা গিয়েছিল? জিজ্ঞেস করি আমি।

—না। এক মালয়ি যুবককে সঙ্গে নিয়ে যায়। ওর খুব অনুগত ও বিশ্বাসী। দ্বীপে নিজের বাড়ি বানাতে কিছু দেশি মজুরকে নিয়ে গিয়েছিল কয়েকবার অল্প দিনের জন্য। পরেও মজুর নিয়ে গেছে গাছ কাটতে, জমি কোপাতে, এমনি নানা কাজে। তবে তারা বেশিদিন থাকেনি দ্বীপে।

—বাস্তেন জাভায় যাওয়া-আসা করত কীভাবে? মামাবাবু জানতে চান।

—ওদের একটা ছোট মোটর বোট ছিল তাতে। বাস্তেন এবং ওর অনুচর পো দুজনেই বোট চালাতে পারত। কখনো কখনো পো একাই ঘুরে আসত জাভায় সুমাত্রায় বোট চালিয়ে। মাঝে মাঝে জাভা থেকে নৌকা যেত ওই দ্বীপে, দরকারি খাবার-দাবার জিনিসপত্র নিয়ে। বাইরের লোক বেশি আসা পছন্দ করত না বাস্তেন। মাঝিরা যারা যেত দরকারে তাদের মুখেই লোকে শুনত বাস্তেনের নানা কথা। বাস্তেন গাছের চারা আর বীজের খোঁজে যেত জাভা সুমাত্রা আর কাছাকাছি দ্বীপে। অর্ডার দিয়ে আনাত চারা ও বীজ। দ্বীপটা তখন নাকি রীতিমতো রহস্যময় ছিল বাইরের লোকের কাছে।

—পনেরো বছর পর বাস্তেন কোথায় যায়? প্রশ্ন করেন মামাবাবু।

—যায়নি কোথাও। ওখানেই হঠাৎ সে মারা যায় অ্যাকসিডেন্টে। পাহাড় থেকে পিছলে পড়ে মাথায় চোট পায়। তখন কয়েকজন মাঝি গিয়েছিল ওই দ্বীপে,তারাই এসে প্রথম খবরটা দেয় জাকার্তায়। ওই দ্বীপেই বাস্তেনকে কবর দেওয়া হয়। ওর অনুচর পো বেশি দিন আর থাকেনি ওই দ্বীপে। বাস্তেনের মোটরবোট চালিয়ে, বাস্তেনের বন্দুকটা আর কিছু দামি জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায় মালয়। আর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। তারপর থেকেই দ্বীপটা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। মাঝে মাঝে দেশি মাঝিরা গিয়েছে ওই দ্বীপে ফলটলের সন্ধানে। কিন্তু বাস করেনি কেউ স্থায়ীভাবে।

—তুমি বাস্তেন দ্বীপের কথা জানতে না আগে? মামাবাবুর প্রশ্ন।

—না। আসলে আমাদের দেশটা তো অজস্র দ্বীপের রাজত্ব। জাভা সি, ফ্লোরেস সি, বান্দা সি, চায়না সি, সুলু সি—এমনি কত সাগরে হাজার হাজার ছোট বড় দ্বীপ ছড়িয়ে আছে। বড় দ্বীপগুলোর মোটামুটি খবর রাখলেও খুব ছোটগুলো আমাদের প্রায় অচেনা। বিশেষত আমার। আমি যে কটা জাহাজ কোম্পানিতে কাজ করেছি তাদের জাহাজ যায় বেশির ভাগ পশ্চিমে বা উত্তরে। বড় পোর্টগুলোয় জাহাজ থামে। সেগুলো চিনি। বাস্তেন দ্বীপের গল্প করে শুধু জাকার্তার জেলেরা আর নৌকার মাঝিরা। তাদের সঙ্গে আমার তত মেলামেশা নেই। জাকার্তায় গেছি অনেকবার। তবে সেখানে জাহাজি নাবিকদের সঙ্গেই মিশেছি বেশি। তাই আগে জানতেম না বাস্তেন দ্বীপের কথা।

—তুমি অনেক পোর্টে ঘুরেছ তাই না? সুনন্দ বলে।

—ঘুরেছি বইকি। জাকার্তা, সিঙ্গাপুর, পেনাং, রেঙ্গুন, ব্যাংকক, ক্যালকাতা, কলম্বো করাচি কতবার গেছি। এদেন ডার্বানও গেছি। ফিলিপাইনসে ম্যানিলা গেছি। ব্রিসবেন গেছি। কালিমান্তান মানে বোর্নিওতে ম্যাকাসার পোর্টে গেছি অনেকবার। ওই সব পোর্টটাউনে ঘুরেছি। সগর্বে ঘোষণা করে মিকি। বলে, তবে বেকায়দায় পড়ে খুব ছোট বা নির্জন বসতিহীন দ্বীপেও জাহাজ নোঙর ফেলেছে কয়েকবার।

আমরা হাঁ করে শুনি। ওঃ লোকটার জীবন বটে। কত ঘুরেছে। কত কী দেখেছে!

মামাবাবুর পিছু পিছু মিকি বাগানে গ্রিনহাউসে ঢোকে। খড়ের চাল, দরমার দেয়াল, ছোট লম্বাটে ঘরটায় নানান অর্কিড ঝুলছে। ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। তবে রোদ ঢোকে দরমার বেড়া সরিয়ে দিলে। ঘরের মেঝেতে লম্বা লম্বা কয়েকটা টবে কিছু পপি গাছ দেখে মিকি বলল, এই গাছ আমি ওই দ্বীপে দেখেছি। এর চেয়ে অনেক বড় বড় সাইজের।

—এগুলো কী ফুলের গাছ জানো? মামাবাবু প্রশ্ন করেন।

—না।

—এগুলোর নাম ক্যালিফোর্নিয়ান পপি। সত্যি তুমি এই গাছ দেখেছ বাস্তেন দ্বীপে?

মিকি পপি গাছগুলোর পাতায় হাত দিয়ে দেখে বলল, আলবৎ এই গাছ। তবে সাইজে প্রায় ডবল। ফুল ছিল না মোটে। মাত্র দু-একটা ছোট্ট ছোট্ট ফুল ফুটেছিল এইরকম, এই রং-এর। হুঁ এই গাছই। এই পাতা। আমি তো ভেবেছিলাম লম্বা মোটা পাতার ঘাস। কী নাম বলছেন? পপি।

—কোথায় দেখলে? মামাবাবু জানতে চান।

—এক জায়গায় ঝরনার গা থেকে সরু নালা বেরিয়েছে, তার ধারে ধারে ছিল এই পপি গাছ। প্রচুর।

মিকি তার সমুদ্র ভ্রমণের অ্যাডভেঞ্চার আরও বলে। এমন শহুরে শিক্ষিত শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে তার গল্প শুনছে এ অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম।

মামাবাবু কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক। কিছু ভাবছেন যেন? তিনি হঠাৎ বললেন, আচ্ছা মিকি ওই বাস্তেন সাহেবের চলত কীভাবে শুনেছ? মানে দ্বীপে থাকার সময় চাকরি তো করতেন না। খরচাপাতি চালাত কী করে খোঁজ পেয়েছিলে?

মিকি থমকে গিয়ে একটু ভেবে বলে, হুঁ আমিও ভেবেছি ব্যাপারটা। মাঝিদের মুখে শুনে যা মনে হয়েছিল বাস্তেনের অনেক জমানো টাকা ছিল জাকার্তার কোনো ব্যাংকে। মোটা মাইনের চাকরি করেছে তো আগে। হয়তো দেশ থেকে কিছু টাকা নিয়ে এসেছিল। তবে ওই দ্বীপে থাকার সময়েও বাস্তেনের অন্য রোজগারের পথ ছিল। লোকটি নাকি চমৎকার ছবি আঁকতে পারত। হাতের কাজ ছিল দারুণ। চামড়া আর কাগজের মুখোশ, নকশা আঁকা বাঁশের পাত্র, নানান ডিজাইনের বাতিকের কাজ করা কাপড়—এই সব বানিয়ে এনে কয়েক মাস অন্তর অন্তর বিক্রি করত জাভায়। ভালো ডিমান্ড ছিল ওর হাতের কাজের, শিল্প-দ্রব্যের। এই ভাবেই চালাত খরচ, আমার তাই মনে হয়। জাকার্তার মাঝিদেরও তাই ধারণা।

—হুম্। মামাবাবু ফের আনমনা হয়ে ভাবেন কিছু। এরপর একসময় জিজ্ঞেস করেন মিকিকে, তুমি দেশে ফিরছ কবে?

—এই পনেরো-কুড়ি দিন বাদে।

—তারপর থাকবে কিছুদিন দেশে।

—থাকব। অন্তত মাস তিনেক। বাড়িঘর সারানো, চাষবাসের কাজ আছে।

মামাবাবু বললেন, শোনো মিকি, মাসখানেক বাদে আমি সিঙ্গাপুর যাব একটা কাজে। আমরা তিনজনেই যেতে পারি। গেলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। তুমি সুমাত্রা মানে আন্দালাসে থাকো কোথায়?

—সুমাত্রার দক্ষিণ-পুবে পালেমবাং নামে একটা ছোট শহরের কাছে আমার গ্রাম।

—সিঙ্গাপুর থেকে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব কীভাবে? টেলিফোন বা টেলিগ্রাম করলে?

মিকি বলে টেলিফোন তো নেই আমার বাসায়। তবে গ্রামের পোস্ট অফিসে টেলিফোন করে আমায় কোনো খবর দিতে বললে জানিয়ে দেবে আমায়। হ্যাঁ টেলিগ্রাম করলে পাব।

জানতাম যে সিঙ্গাপুরে মামাবাবুর একটা কনফারেন্স আছে ডিসেম্বরের শেষে। সঙ্গে সুনন্দও যাচ্ছে। কথার ভাবে মনে হল আমাকেও হয়তো সঙ্গে নেবেন। মনে মনে আমি পুলকিত। কিন্তু এরপরেই মামাবাবুর কথা শুনে আমি ও সুনন্দ চমকাই।

—বুঝলে মিকি, আমি ওই বাস্তেন দ্বীপে একবার যেতে চাই। দেখব ওখানকার গাছপালা। তুমি পারবে না আমাদের গাইড হয়ে নিয়ে যেতে? সেই ক'দিনের জন্য তোমার যা প্রাপ্য আমি দেব। কিন্তু তোমার হেল্প চাই। আমরা তো চিনি না ওদেশ। তুমিই নৌকা ভাড়ার ব্যবস্থা করবে। খাওয়া থাকা ইত্যাদি সব খরচ আমার। দ্বীপটার গাছপালা আমার দারুণ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। অত কাছে গিয়েও স্বচক্ষে ওই দ্বীপ না দেখে এলে ভারি আপশোস হবে।

সুনন্দ চিড়বিড়িয়ে ওঠে, সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেই যে আপনাকে গোয়ায় যেতে হবে অল ইন্ডিয়া জুওলজিকাল সোসাইটির কনফারেন্সে। একটা সেশনে আপনি প্রিসাইড করবেন কথা দিয়েছেন।

—যাব না গোয়া। ওদের জানিয়ে দেব। মামাবাবু নির্বিকার।

শুনে সুনন্দ থ। আমিও। মামাবাবু তো এমন কথার খেলাপ করেন না। আমার মনে হল যে বাস্তেন আইল্যান্ড যাবার প্ল্যান মোটেই গাছগাছড়া দেখার লোভে নিছক শখের ভ্রমণ নয়। মামাবাবুর স্বভাব জানি। অন্য কোনো গোপন উদ্দেশ্য আছে। এই নিয়ে এখন প্রশ্ন করলে আসল কারণ ভাঙবেন না। পরে হয়তো নিজেই বলবেন কারণটা।

—কি মিকি যাবে নিয়ে? মামাবাবু ফের অনুরোধ করেন সাগ্রহে।

প্রস্তাব শুনে মিকি কেমন মিইয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলে, দশ বছরেরও আগে গিয়েছিলাম ওই দ্বীপে। আর যাইনি ওর কাছ দিয়ে। ওখানকার ছোট দ্বীপগুলো তেমন চিনি না আমি।

মামাবাবু মিকির দ্বিধা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, তা লাগুক সময় খুঁজতে। দু-চার দিন নষ্ট হলে আমার ক্ষতি নেই। দ্বীপটায় পা দিলে চিনতে পারবে?

—তা পারব। দ্বীপের কয়েকটা চিহ্ন মনে আছে।

—ব্যস ব্যস তাহলেই হল।

মিকি বলে, পালেমবাংয়ে আমার চেনা একজনের নৌকা আছে। লামপুং বন্দরে তার নৌকা থাকে। ভাড়া খাটে। তাকে বললে সে ঠিক রাজি হয়ে যাবে তার নৌকা ভাড়া দিতে।

দুই

মাসখানেক পরের কথা।

সিঙ্গাপুর। মালয় রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে এক গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দর। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ মানে অধুনা মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চিন দেশ এবং প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেওয়ার মুখে প্রধান বন্দর বলা যায় সিঙ্গাপুরকে।

মামাবাবু, সুনন্দ, আমি সিঙ্গাপুর এসেছি তিনদিন হল। মামাবাবু ও সুনন্দ তাদের প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ে কনফারেন্স নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকে। আমি এই সুযোগে সিঙ্গাপুর ঘুরে দেখি। মামাবাবু মোহনভাই প্যাটেল নামে তাঁর পূর্বপরিচিত এক যুবককে লাগিয়ে দিয়েছেন আমার গাইড হিসেবে। মোহন আমায় ঘুরিয়ে দেখায়।

সিঙ্গাপুর আসলে একটা দ্বীপ। মেনল্যান্ড থেকে খুব কাছে। চাওড়া বাঁধ দিয়ে যুক্ত। বাঁধের ওপর দিয়ে গেছে রাস্তা ও রেল লাইন।

অটো ট্যাক্সি বা পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরে দেখলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিং, ফোর্ট ক্যানিং ইত্যাদি দ্রষ্টব্য বাড়িগুলি। শহরের এক অংশে রাস্তাঘাট, বেশ চওড়া, পাকা। সেখানের বাড়িঘর আধুনিক প্যাটার্নের। বহুতল বাড়ি প্রচুর। আবার শহরের পুরনো অংশগুলি ঘিঞ্জি। সরু অপরিচ্ছন্ন রাস্তা। বন্দরটা বহু বছর ইংরেজদের অধিকারে ছিল।

কত জাতের মানুষ যে দেখা যায় সিঙ্গাপুরে। নানা দেশের নাবিক মাঝি-মাল্লারা তো রয়েছেই, এছাড়াও এই শহরের স্থায়ী বাসিন্দা মালয়ি, আরবি, ইউরোপিয়ান ইত্যাদি। ভারতীয়রাও সংখ্যায় কম নয়। গুজরাতি, শিখ, বাঙালি, পারশি—এমনি অনেক ভারতীয় নাকি এখানে ব্যবসাবাণিজ্য বা চাকরি সূত্রে দীর্ঘকাল আছে। রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলির নানা জাতি এবং চিনারা। চিনারাই সংখ্যায় শহরে সবচেয়ে বেশি। গিসগিস করছে মানুষ সদা ব্যস্ত শহরটায়।

শহরের পুব দিকে এক-নাতিউচ্চ পাহাড়। বন্দরে ছোট বড় জাহাজ লঞ্চ নৌকা সাম্পান অজস্র। রাতেও কিছু এলাকায় দোকান বাজার খোলা থাকে।

কনফারেন্সের শেষ দিন রাতে মামাবাবু ঘোষণা করলেন, আমরা কাল মিকির সঙ্গে দেখা করতে রওনা দেব। মিকিকে কবর পাঠিয়েছিলাম। উত্তর এসেছে আজ।

পরদিন সকালে আমরা 'ফিঙ্গার পায়ার' নামে জেটি থেকে একটা মাঝারি আকারের লঞ্চ চেপে বাটাম আইল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হলাম। পেরোচ্ছি মালাক্কা প্রণালী। বিকট শব্দ করে প্রচণ্ড গতিতে লঞ্চ ছুটল। তিনতলা লঞ্চ। উপরের দুই তলায় বসার সিটে গদি আছে। তবে নিচের তলাটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও সোফা পাতা। যাত্রীর ভিড় নেই মোটে।

সিট নম্বর নেই। যে যেখানে খুশি বসতে পারে। আমি ও সুনন্দ উঠলাম দোতলায়। মামাবাবু নীচের তলায় বসলেন। সমুদ্রে উদ্দাম ঢেউ। একটু ভয়ই করছিল, লঞ্চ বেসামাল না হয়। তবে স্থানীয় যাত্রীরা দেখলাম নির্বিকার। কেউ খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ বা দিব্যি ঘুম মারছে। ঘণ্টা দুই বাদে লঞ্চ বাটাম দ্বীপে ভিড়ল। এটি ছোট্ট দ্বীপ। সিঙ্গাপুরের দিক থেকে ইন্দোনেশিয়ায় পা দেবার জন্য নিকটতম মাটি।

পর্যটকদের কাছে বোধহয় জায়গাটা তেমন আকর্ষণীয় নয়। সেখানে অল্প কয়েকটি দোকান, হোটেল, অফিস, বাড়ি। দোকানপাট খুব কম। নিরালা জায়গা। ট্যাক্সি ড্রাইভার ও হোটেল রেস্টুরেন্টের দালালরা আমাদের নিয়ে রীতিমতো টানাহ্যাঁচড়া করতে থাকে। ছোট একটা বিমানবন্দর আছে ওখানে।

মামাবাবু কিছু ডলার ভাঙালেন। ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রার নাম রুপিয়া। আমরাও টাকাকে হিন্দিতে বলি রুপিয়া। তবে ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়ার দাম ভারতীয় টাকার চেয়ে ঢের কম।

বেজায় গরম। বিষুবরেখা এই দ্বীপের ওপর দিয়ে গেছে। তাই এখানে সারা বছরই গ্রীষ্মকাল, আর বৃষ্টি পড়ে বছরভোর। একটা মোটামুটি হোটেলে উঠলাম।

পরদিন সকালে বাটাম থেকে বিমানে চড়ে রওনা দিলাম সুমাত্রার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে পালেমবাং। বেশ নিচু দিয়ে যাচ্ছিল বিমান। ফলে আগাগোড়াই জানলার কাচ দিয়ে আকাশ থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম সুমাত্রার গভীর জঙ্গল। শতশত মাইল জুড়ে যেন সবুজ কার্পেট বিছানো। কখনো কখনো দেখলাম জঙ্গলময় পাহাড়। দারুণ লাগছিল দেখতে। তবে মাঝে মাঝেই বৃষ্টির ছাঁটে জানালার কাচ ঝাপসা হয়ে যাওয়ায় বাইরে নজর যাচ্ছিল না।

মামাবাবু যেতে যেতে বললেন, ইন্দোনেশিয়ায় তেরো হাজারের বেশি দ্বীপ আছে। বড় পাঁচটা দ্বীপ, মানে সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সিলিবিস, নিউগিনির মধ্যে তিনটে দ্বীপই জঙ্গল আর পাহাড়ে ভরা। আন্দালাস মানে সুমাত্রার চেয়েও জঙ্গল পাহাড় বেশি কালিমান্তান অর্থাৎ বোর্নিওতে আর ইরিয়ান-জায়া মানে নিউগিনিতে।

হঠাৎ মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ভাষার নাম কী জানো?

নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। আমি আমতা আমতা করি। সুনন্দ তো চুপ।

মামাবাবু বলেন, আমাদের এই দোষ। ইউরোপ-আমেরিকার কত খুঁটিনাটি খবর আমাদের মুখস্থ কিন্তু এত কাছের দেশ ইন্দোনেশিয়া, যাদের সঙ্গে আমাদের রীতিমতো আত্মীয়তা আছে বলা যায়, তাদের খবর তেমন রাখি না। এদের জাতীয় ভাষার নাম বাহাসা। বর্ণলিপি— রোমান। বাহাসা আসলে ভারতীয় শব্দ ভাষা থেকে এসেছে। বদলানো রূপ। তবে এখানে অনেক লোকাল ভাষা আছে। ভারতবর্ষেও তো একই ব্যাপার। বড় দেশ হলে, অনেক জাতি ধর্মের বাস হলে যা হয়। তবে ভারতবর্ষ মোটামুটি একটাই ভূখণ্ড আর ইন্দোনেশিয়া ছাড়া ছাড়া অজস্র দ্বীপ। তাই এক দেশের বা দ্বীপের ভাষা দূর জায়গার লোক অনেক সময় বুঝতেই পারে না। একই জিনিসের এক এক ভাষায় আলাদা আলাদা নাম। উদাহরণ দিচ্ছি—এই যেমন পর্বতকে বাহাসায় বলে গুনুং। সুমাত্রায় বলে বুকিত। ফ্লোরিস দ্বীপে বলে কেলি। বাজো উপভাষায় বলে ডোরো।

সুমাত্রায় জঙ্গলকে বলে হুতান। কিন্তু বোর্নিওতে হুতান বললে স্থানীয় লোক বুঝবে না। ওখানে জঙ্গলকে বলে সুয়াকা। জাকার্তা বলি এমনি জায়গা যেখানে প্রচুর টুরিস্ট যায়,

সেসব জায়গা ছাড়া ইংরেজির চল নেই মোটে। বোঝে না লোকে। তা অবশ্য ভারতেও ইনটেরিওর গ্রামে গিয়ে ইংরিজিতে কথা বললে বুঝবে ক'জন? কয়েকটা শব্দ বুঝবে বড়জোর।

বুঝলাম যে মামাবাবু ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে এসেছেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও নিশ্চয় ভ্রমণকারীদের বিবরণ পড়েছেন। নইলে উনি তো আগে আসেননি ইন্দোনেশিয়ায়। আর আমি ইতিহাসে এম. এ. করেও কতটুকু জানি এই দেশের ভিতরের খবর?

পালেমবাং বিমান-বন্দরে নামলাম। মিকি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল এয়ারপোর্টে। মোটামুটি একটা ভালো হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলল আমাদের।

বেশ বড় শহর পালেমবাং। অনেক পর্যটক আসে শহরে। হোটেল ম্যানেজার বলেছিল যে এখান থেকে বাসা বা গাড়িতে চেপে এক রাতের জার্নি করে যাওয়া যায় লুবুকলিংগার্ড নামে এক ছোট্ট শহরে। সেখান থেকে জিপে চড়ে ঢুকতে হয় সুমাত্রার বিখ্যাত অরণ্য অঞ্চলে। এক ধারে কেরেন্সি, আর এক পাশে সেব্লাট পর্বতমালা। মাঝখানে উপত্যকাগুলিতে আদিম ঘন অরণ্য। সেই অরণ্যে আছে বিরল দুই শিংওলা গণ্ডার, আছে এক জাতের কোলাব্যাং, যাদের ওজন পনেরো-কুড়ি কেজি অবধি হয়। আছে বিশাল এক জাতের সারস পাখি।

খুব লোভ হচ্ছিল শুনে। কিন্তু মামাবাবু আগ্রহ দেখাননি জঙ্গলে ঘোরায়। বরং তাঁর মন চিন্তিত অন্য কারণে।

দেখা হতে মিকি বলেছিল যে তার পরিচিত রহিম, যার নৌকার সে ভরসা করেছিল, সেই নৌকাগুলি মাল নিয়ে ভাড়া খাটতে চলে গেছে দূরে। মামাবাবুর টেলিগ্রাম পেয়ে সে খোঁজ করে রহিমের কাছে। দিন পনেরোর আগে ফিরবে না নৌকা। কিন্তু অতদিন অপেক্ষা করা যে মামাবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মিকি চলে গেছে জাকার্তায় নৌকার খোঁজে। বাস্তেন দ্বীপও জাকার্তা থেকে অনেক কাছে হয়।

মিকি একটা দুঃসংবাদ দিয়েছিল যে নৌকা ভাড়া পেতে একটু মুশকিল হতে পারে।

—কেন? আমরা জানতে চাই।

—কারণ ভূতের ভয়। বাস্তেনের অপঘাত মৃত্যু হয় ওই দ্বীপে। এখানে অনেক মাঝির বিশ্বাস বাস্তেন সাহেবের প্রেতাত্মা ওই দ্বীপ ছাড়তে পারেনি। অন্য লোকের থাকা সে পছন্দ করবে না। তাই ওই দ্বীপে পরে কেউ বাস করতে সাহস পায়নি। ফলটলের লোভে সাহসী কেউ কেউ ওই দ্বীপে যায় বটে। তবে দিনের বেলায়। রাতে থাকে না। ভয় পায়। মিকির পরিচিত রহিমই তাকে এসব খবর দিয়েছে। রহিম বলেছে যে বাস্তেন দ্বীপে যেতে হবে শুনলে বেশির ভাগ নৌকোই রাজি হবে না যেতে। কারণ ওটা ভুতুড়ে দ্বীপ বলে কুখ্যাত। যদি বা রাজি হয় টাকার লোভে, রাতে থাকতে চাইবে না কিছুতেই। সেই বুঝে যাও—

হুম্। মামাবাবু খানিক গুম মেরে থেকে বলেছিলেন মিকিকে, তোমারও কি ভূতের ভয় আছে?

—না। দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়েছিল মিকি।

—ঠিক আছে। তাহলেই হল।

মামাবাবু মিকিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আমাদের আসল লক্ষ্য যে বাস্তেন আইল্যান্ড সেটা জাকার্তায় মাঝিদের কাছে ভেঙো না। বলবে, ওই জায়গার দ্বীপগুলো ঘুরে ঘুরে গাছপালা জীবজন্তুর নমুনা দেখাই আমার উদ্দেশ্য। স্রেফ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। ঘুরতে ঘুরতে বাস্তেন দ্বীপে হাজির হলে তখন একটা মতলব ভাঁজা যাবে।

বিকেলে আমরা তিনজন পালেমবাং শহর দেখতে বেরোলাম। একটা চৌমাথায় দাঁড়িয়ে মামাবাবু চারপাশে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, বহু শতাব্দী আগে ভারত থেকে এসে কিছু ভারতীয় এখানে এক হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করেছিল। কী নাম ছিল সে রাজত্বের জানো?

—শ্রীবিজয়। গর্বিত কণ্ঠে আমি জবাব দিয়ে আড়চোখে দেখি হেরে যাওয়া সুনন্দর থমথমে মুখ।

—করেক্ট। মামাবাবু খুশি। বললেন, তখন এই পালেমবাং ছিল শ্রীবিজয় রাজত্বের রাজধানী। পালেমবাংকেই বলত শ্রীবিজয়। পরে শ্রীবিজয় রাজ্যের রাজারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। রাজ্যের ক্ষমতা এবং সীমা অনেক বাড়ে। চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ থেকে আট-নশো বছর শ্রীবিজয় রাজবংশ সুমাত্রায় প্রভুত্ব করে। প্রথমে হিন্দু পরে বৌদ্ধ সংস্কৃতি এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নজর করে দেখ এখানকার বাড়িঘরে হিন্দু আর বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ। এখানকার নাচ-গান নাটক লোকজনের নামেও এই দুই সংস্কৃতি আর ধর্মের ছাপ পাবে। তবে সুমাত্রার চেয়ে জাভায় বৌদ্ধ প্রভাব বেশি। জাভাতেও দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ থেকে তেরো খ্রিস্টাব্দ অবধি ভারতীয়রা এসে রাজত্ব করে। ওই দেশের রাজারা প্রথমে ছিল হিন্দু, পরে হয় বৌদ্ধ। এরপর অবশ্য ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমান ধর্ম বেশি ছড়ায়। তবে হিন্দু আর বৌদ্ধ প্রভাব থেকে গেছে যথেষ্ট।

—এই যেমন ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল এয়ারলাইনসের নাম গারুদা। ওটা আসলে রামায়ণের গরুড় পক্ষীর বিকৃত রূপ। রামায়ণের নানা ঘটনা নিয়ে এখানে নাটক হয়। তবে সীতাকে বলে সিন্‌তা। আর ব্রহ্মাকে বলে ব্রোমো। নাটকে পাত্রপাত্রীদের পোশাকে হিন্দু বৌদ্ধ চিনা সবধর্মের ছাপ পাবে। পাঁচমেশালি ব্যাপার।

সত্যি ভাবতে গর্ব হচ্ছিল যে এদেশে এককালে ভারতীয়রা এসেছিল এবং রাজত্ব করেছে দাপটে।

সুনন্দ এতক্ষণ কথা বলার সুযোগ পায়নি। এবার দুম্‌ করে প্রশ্ন করে, আচ্ছা সুমাত্রা জাভার লোক ভারতীয় ভাষা কিছু বোঝে? ভারতীয়রা রাজত্ব করেছিল যখন?

—না। মামাবাবু ঘাড় নাড়েন। কিছু সংস্কৃত বা অন্য ভারতীয় ভাষার শব্দ এদের ভাষায় ভেঙেচুরে ঢুকে পড়েছে বটে, কিন্তু হিন্দি, বাংলা বা খাঁটি সংস্কৃত চালালে, এখানে কেউ বুঝবে না। তবে ভারতীয় যারা দু-এক পুরুষ আগে এসেছে তারা বুঝবে। তারপর সান্ত্বনার সুরে বলেন, দুঃখের কিছু নেই, সুমাত্রা জাভায় ডাচ্‌রা দেড়শো বছর ধরে বাণিজ্য করছে। রবার বাগান করেছে। কিন্তু এখানে ডাচ্‌ ভাষা বোঝে খুব কম লোক।

—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ আর আমেরিকানরা এখানে ব্যবসা বাড়িয়েছে ডাচ্‌দের হাটিয়ে দিয়ে কিন্তু ইংরিজিরও তেমন চল হয়নি। ওই দু-চারটে ইংরেজি শব্দ বোঝে মাত্র। তবে চিনা ভাষা জানলে সুবিধে হবে। চিনারা ভারতীয়দের ঢের আগে থেকে ইন্দোনেশিয়ায়

আসছে। শহরে, গ্রামে-গঞ্জে বাসা বেঁধেছে। তবে অসুবিধার কিছু নেই। মিকি হবে আমাদের ইন্টারপ্রেটর। ওর মাধ্যমেই কথাবার্তা কাজকর্ম চালিয়ে যাব। নাবিকদের অনেক ভাষা শিখতে হয় মোটামুটি।

পালেমবাংয়ের রাস্তায় ঝালমুড়ি বিক্রি হচ্ছে দেখে আমরা চমৎকৃত। এক ঠোঙা করে কিনে খেলামও আমি আর সুনন্দ। কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের ধারে ঝালমুড়ি খাওয়ার স্মৃতিতে মন উতলা হয়। তবে দেশের মতন স্বাদ ভালো নয়। কী না কী মিশিয়েছে কে জানে?

মিকি জাকার্তা থেকে ফিরল পরদিন। খবর ভালো। নৌকা ভাড়া পাওয়া গেছে। আমাদের ভ্রমণের আসল উদ্দেশ্য সে ফাঁস করেনি। মামাবাবুর শেখানো মতো বলেছে যে কতগুলো দ্বীপে ঘুরে গাছপালা মাটি পাথর ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহই আমাদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। আমরা জাকার্তা পৌঁছলেই সমুদ্রযাত্রা করা যাবে।

তিন

জাকার্তা। জাকার্তা জাভা দ্বীপে। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী। বিশাল শহর।

পালেমবাং থেকে মিকি সহ আমরা তিনজনে এয়ারোপ্লেনে চেপে গেলাম জাকার্তা। বাসে করেও যাওয়া যায়। বাসে চড়ে শহরতলি ও ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লামপুং বন্দর। সেখান থেকে গোটা বাস যাত্রীসমেত উঠে যায় একটা জাহাজে। জাহাজ পার হয় মুন্ডা প্রণালী ঘণ্টা তিনেকে। পৌঁছয় জাভার মোরোকক্ জেটিতে। বাস ডাঙায় নেমে ফের চলে। মোরোকক্ থেকে জাকার্তা শহর প্রায় দশ ঘণ্টার জার্নি। এই সুন্ডা প্রণালীতেই মাথা তুলে আছে বিখ্যাত ক্রাকাতাউ আগ্নেয়গিরি। ১৮৮৩ সালে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল এই আগ্নেয়গিরিতে।

বাসে জাকার্তা গেলে বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হত বটে কিন্তু মামাবাবু অত সময় নষ্ট করতে চাইলেন না।

জাকার্তায় একটা হোটেলে উঠলাম চারজন।

মিকি যে নৌকাটা ঠিক করেছে তার সর্দার মাঝিকে নিয়ে এল দেখা করাতে। বেশ লম্বা পোক্ত চেহারা লোকটির। মাঝবয়সি। নাম—হামিদ আলি।

হামিদ একটু গম্ভীর প্রকৃতির। অল্প কথায় আমাদের ঘোরার ব্যাপারটা ঝালিয়ে নিল! তাদের পাওনাগণ্ডা সম্বন্ধে কথা বলল। কী কী সঙ্গে নিতে হবে তার একটা ফিরিস্তি দিল। ঘাটে গিয়ে আমরা একবার দেখে এলাম নৌকোটা।

বেশ বড় পালতোলা নৌকো। ছই আছে। হাদিম ছাড়াও আরও দুজন মাঝি নৌকো বাইবে। আর একটি লোককে জুটিয়েছিল মিকি। তার নাম ফকির। বছর চল্লিশ বয়স হবে। খুব হাসিখুশি স্বভাব। সে নৌকো বাইতে জানে। আবার আমাদের টুকিটাকি কাজে সাহায্যও করবে। ফকিরের আর একটা গুণ, সে ইংরেজি কিছু বলতে পারে ও বোঝে। অল্প বয়সে সে নাকি সিঙ্গাপুরে এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর কাছে কাজ করেছিল, তখনই ইংরেজি শেখে।

রাতে মামাবাবু আপশোস করেন, ইস্ জাভায় এলাম অথচ বরোবুদর দেখা হবে না।

বরোবুদরের কথা আমি তো জানিই, সুনন্দও জানে। সে সুযোগটা ছাড়ল না। পণ্ডিতি ঢঙে বলল, জানি বরোবুদর বিখ্যাত এক বৌদ্ধ স্তূপ। সেটা কি কাছাকাছি?

—না খুব কাছে নয়, বলেন মামাবাবু, যোগজাকার্তায়। যেতে আসতে দেখতে অন্তত তিন দিন লাগবে। এযাত্রা সময় নেই। দেশ বিদেশ থেকে কত লোক যায় বরোবুদর দেখতে। ছবিতে যা দেখেছি, বর্ণনা যা পড়েছি, অবাক হয়ে গেছি।

সুনন্দ বেঁফাস বলে ফ্যালে, সাঁচির চেয়েও বড়?

মামাবাবু হাসেন নিঃশব্দে। সুনন্দর অল্পবিদ্যার বহর ধরে ফেলেছেন। ক্লাস লেকচারের ঢঙে বলেন, ঢের ঢের বড়। পৃথিবীর সব চাইতে বড় বৌদ্ধ স্তূপ। প্রায় হাজার বছরের পুরনো। গোটাটা পাথরে তৈরি। গোল গম্বুজ আকৃতির। নয়টি ধাপ। একটু একটু উপরে সরু হয়ে উঠেছে। স্তূপের নিচের দিকে পাথরের দেয়ালে গৌতম বুদ্ধের জীবনকাহিনি নিয়ে অজস্র ঘটনা খোদাই করা আছে। চারপাশে বিরাট পাথরে বাঁধানো চত্বর। সেখানে প্রচুর পাথরের মূর্তি। জাভানিস এবং ভারতীয় শিল্প কর্মের মিলন ঘটেছে। অপূর্ব। ইস্ স্বচক্ষে দেখা হবে না এবার। যাক্‌গে।

সকালে কিছু কেনাকাটা করলাম আর জাকার্তা শহরটা একটু ঘুরে দেখে নিলাম। জাকার্তা অনেকটা কলকাতার মতো। একধারে প্রচুর বহুতল, আধুনিক অট্টালিকা। আবার কিছু জায়গায় বহু পুরনো ঘরবাড়ি, বস্তি। নোংরা সরু রাস্তা।

শুনলাম যে দশম থেকে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া অবধি এই শহর ছিল হিন্দু রাজাদের অধীনে। তখন নাম ছিল শুন্ডা কেলাপা। এরপর প্রায় একশো বছর ছিল মুসলমানদের অধীনে। তারা শহরের নাম দেয় জায়াকার্তা বা জাকার্তা। এরপর জাকার্তা অধিকার করে ডাচরা। তারা নাম দেয় বাটাভিয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই শহর কিছুকাল জাপানিরা দখল করে। তারা ফের জাকার্তা নামটা চালু করে।

জাকার্তায় দেখলাম মারডেকা স্কোয়ার, জাদুঘর, ন্যাশনাল মনুমেন্ট ইত্যাদি কিছু দ্রষ্টব্য স্থান। জাদুঘরে সব চেয়ে মনে ধরে ইন্দোনেশিয়ার নানা দ্বীপের পুতুল, মুখোশ, কাপড় ইত্যাদি শিল্পদ্রব্য।

আমাদের নৌকো ছাড়ল সকালবেলা।

জাভা সাগর দিয়ে চললাম পুবমুখো। তটভূমি থেকে ক্রমে সরে গভীর সাগরে চলে গেলাম। বার দুই আচমকা বৃষ্টি নামল। তখন ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ি। মাঝিদের মাথায় তাল বা খেজুর জাতীয় পাতার চওড়া কানাওলা টোকা। পরনে লুঙ্গি সার্ট বা ফুলপ্যান্ট হাফসার্ট। রোদ খুব চড়ে। তখন গরমে ছইয়ের বাইরে থাকা কষ্টকর। হেড মাঝি হামিদ ধরেছে হাল।

সাগরের অথই জলে নৌকো যেন মোচার খোলা। ডাঙার প্রাণী আমি, বেশ অসহায় লাগে। তবে মামাবাবু ও সুনন্দর সঙ্গে এমন নৌকোয় দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা আছে আমার। ডাঙা থেকে জলের রাজ্যে এসে দৃশ্যপট একেবারে বদলে যায়। মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য। চারপাশে গাঢ় নীল অতল জলরাশি। বাতাসের বেগ বাড়ালে ঢেউ ওঠে বেশি, নৌকোর ওঠানামা বাড়ে। মাঝিদের অবশ্য তাতে হেলদোল নেই।

নৌকোর পাশে পাশে হঠাৎ হঠাৎ উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক জল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে খানিকক্ষণ বাতাসে ভেসে ফের ডুব মারে জলে। ধারে কাছে কখনো দেখি হাঙরের লেজের তিনকোনা ডগা জলের ওপর। সচল। দুটো বড় বড় পালতোলা নৌকো পেরিয়ে যায় অনেক দূর দিয়ে। আমাদের মাঝিদের সঙ্গে ওই নৌকোগুলোর মাঝিদের ইশারায় বার্তা বিনিময় হয় হাত ও কাপড় নেড়ে। একটা স্টিমার চলে যায় দূর দিয়ে।

নৌকোর ছইয়ে দুটো ভাগ। এক অংশে আমরা থাকি তিনজন—আমি, সুনন্দ, মামাবাবু। অন্য অংশে বিশ্রাম নেয় বাকিরা। সেখানেই রান্নার ব্যবস্থা কেরোসিন বা উনুন জ্বালিয়ে। ছইয়ের ওই অংশ জিনিসপত্রর স্টোররুমও বটে।

মামাবাবু দেখছি মিকির সঙ্গে নিচু গলায় কী সব কথা বলেন। ফকির লোকটি খাসা। চা পানের ইচ্ছে প্রকাশ করলেই সে ঝটপট চা বানিয়ে সামনে ধরে। অন্য মাঝিদেরও চা বানিয়ে খাওয়ায়। যে কারও হুকুম তালিম করতে সে সদাই হাসিমুখে প্রস্তুত।

দুপুরে আমরা তিনজনে শুকনো খাবার খেয়ে নিলাম। বাকিরা রান্না করে ভাত ও মাছের তরকারি খেল। সুনন্দ রন্ধনবিদ্যায় ওস্তাদ। সে মাঝিদের রান্না চেখে জানাল যে ভাতটা চলতে পারে কিন্তু মাছটা অখাদ্য। ওটা নিজেদের জন্যে আমাকেই রাঁধতে হবে। বিকেলে আমাদের নৌকো একটা ছোট দ্বীপের কূলে নোঙর ফেলল।

এ দ্বীপে মানুষের বসতি আছে। তবে মাত্র তিরিশ-চল্লিশ ঘর। দু-তিনটে কামরা নিয়ে থাকে একটা পরিবার। আমরা দ্বীপটা ঘুরে দেখি। মামাবাবু গাছপালা এবং সমুদ্রতীরে পড়ে থাকা প্রাণী নজর করেন। কিছু স্যাম্পল নেন। দ্বীপের বাসিন্দারা কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিশতে আগ্রহ দেখায় না। তাদের ভাষাও আমরা তিনজন বুঝি না। মাঝিরা একটা ফাঁকা ঘর চেয়ে নিয়ে সেখানে বিশ্রাম করে, রান্নার জোগাড় করে।

দ্বীপের বাড়িগুলি সুমাত্রা জাভার গ্রামের বাড়ির মতনই। বাঁশের কঞ্চির চাটাই দিয়ে তৈরি দেয়াল। মাথায় পাতার ছাউনি। মোটা কাঠের তক্তা বা বাঁশের ফ্রেমের ওপর ঘর, মাটি থেকে দু-তিন হাত উঁচুতে। এখানে প্রবল বৃষ্টি হয় সারা বছর। বৃষ্টির জল যাতে ঘর বাড়ির নিচ দিয়ে গড়িয়ে যেতে পারে তাই এইরকম ব্যবস্থা।

লক্ষ করি দ্বীপে সমর্থ জোয়ান পুরুষের সংখ্যা খুব কম। কারণটা জানায় মিকি। সে ইতিমধ্যে ওদের সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে নিয়েছে। এই দ্বীপে নাকি চাষবাস হয় সামান্য। কিছু ফলের গাছ আছে মাত্র। ফলে লোকের পেট ভরে না। তাই দ্বীপের সমর্থ পুরুষরা বেশির ভাগই বাইরে চলে যায় রোজগারের আশায়। দ্বীপে ফেরে কয়েক মাস বাদে বাদে, কিছু টাকা জমিয়ে কেনাকাটি করে। কিছু দিন দ্বীপে কাটিয়ে ফের বেরোয় দ্বীপ ছেড়ে পেটের ধান্দায়।

মামাবাবু আমাদের বললেন, মিকিকে লাগিয়েছি দ্বীপের লোকের কাছ থেকে বাস্তেন আইল্যান্ডের ডিরেকশন জানতে। মামাবাবু, সুনন্দ ও আমি রাতে থাকব তাঁবু ফেলে।

মিকি রাতে এসে বলল, প্রফেসর ভেরি সরি। এ দ্বীপের লোক মাত্র একজন বাদে বাস্তেন দ্বীপের নামই কেউ শোনেনি। শুধু এক বৃদ্ধ বলল যে হুঁ অমন একটা দ্বীপের কথা শুনেছি বটে বহু বছর আগে। তখন আমি জোয়ান পুরুষ। এখান থেকে উত্তর-পুবে অনেকটা গেলে কয়েকটা খুব ছোট ছোট জনহীন দ্বীপ আছে। তেমনি একটা জংলা দ্বীপে

এক সাহেব বাস করত। একা। শুধু একজন এদেশি সঙ্গী নিয়ে। সেই সময় আমাদের দ্বীপের দু'জন জেলে ওই দ্বীপে একবার নৌকো ভিড়িয়েছিল। ঘুরেছিল দ্বীপটায় কয়েকঘণ্টা। দেখেছিল সেই সাহেবকে। সাহেব তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেনি মোটে। ওদের ধারণা হয়েছিল যে সাহেবের মাথায় ছিট আছে। নইলে অমন দ্বীপে কেউ বাস করে? ওই দ্বীপে এখন কেউ থাকে কিনা জানি না।

পরে শুনেছিলাম সেই সাহেব মারা গেছে।

পরের দিন ফের আমাদের নৌকো জলে ভাসল।

চার

একটা দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল আমাদের নৌকো। দ্বীপে যে মানুষের বসতি আছে বোঝা গেল তীরে কয়েকজন লোকের ঘোরাফেরা দেখে। মামাবাবু ওই দ্বীপে না থামার নির্দেশ দিলেন।

মামাবাবু চোখে দূরবিন লাগিয়ে লক্ষ করছিলেন। একবার বললেন, পিছনে একটা নৌকো আসছে আমাদের পথে।

হামিদ বলল, এদিকের কোনো দ্বীপে আসছে। অনেক দ্বীপেই লোক বাস করে।

দুপুরে হঠাৎ মেঘ করল। বাতাসের জোরও বাড়ছে। হামিদ বলল, কোথাও নৌকো ভেড়ানো উচিত। বেশিক্ষণ বৃষ্টি চললে চারপাশ ভালো দেখা যায় না। নৌকো কোন্ দিকে কত দূর ভেসে যাবে কে জানে?

সত্যিই একটু বাদে তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। তবে ঝড় ওঠেনি রক্ষে। সৌভাগ্যের বিষয় একটা দ্বীপের তটরেখা দেখা গেল কাছেই। পাল নামিয়ে ফেলে প্রাণপণে দাঁড় টেনে মাঝিরা কোনোরকমে ওই দ্বীপের কূলে নোঙর ফেলল।

দুজন মাঝি বারিধারার মাঝেই ডাঙায় উঠে গেল আশ্রয়ের সন্ধানে। ছইয়ের ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে দেখি চারপাশ লেপেপুঁছে গেছে ছাঁটে। এদেশে এই এক অসুবিধা। যখন তখন বৃষ্টি নামে। কখনো কখনো প্রবল বর্ষণ। নিরক্ষরেখার খুব কাছে বলেই হয়তো এই ব্যাপার ঘটে। তবে এখানকার লোক এই আবহাওয়ায় অভ্যস্ত।

আধঘণ্টাটাক বাদে মাঝি দুজন ফিরে এসে বলল যে দ্বীপের এধারে কোনো ঘরবাড়ি মানুষের দেখা পায়নি। নেহাতই ছোট দ্বীপ। গাছপালা প্রচুর। কয়েকটা পাথরের টিলা আর ছোট ছোট গুহা দেখেছে। তার মধ্যে আশ্রয় নেওয়া যায়।

বৃষ্টি অবশ্য বেশিক্ষণ চলেনি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে থেমে গেল। আমরা তখন পাড়ে নামলাম। গুহাগুলোয় আর পাথরের ছাদের মতো আড়ালে আশ্রয় নিলাম। মাঝিরা রান্নার আয়োজনে লাগল। গল্পগুজবে মেতে গেল তারা।

—এক প্রস্থ চা হবে নাকি? ফকির জানতে চাইতেই আমরা মহা খুশি। লোকটি বোঝদার বটে।

সন্ধে নেমে গেল। আকাশে বাঁকা চাঁদ দেখা দেয় দূরে দিগন্তবিস্তারী সাগরজলের ওপরে। সেদিন আর বাইরে বেরুনোর চেষ্টা করিনা।

পরদিন দ্বীপটা দেখতে বেরোলাম।

মাঝিরা ঠিকই আন্দাজ করেছিল। নেহাতই ছোট ভূখণ্ড। মানুষের বসতি নেই। দ্বীপের অপর পাশে বেশ উঁচু একটা পাথরের চাতাল। চাতালে বিছানো রয়েছে অজস্র ছোটবড় পাথরের টুকরো। আর নুড়ি। সেখানে গিজগিজ করছে অজস্র সামুদ্রিক পাখি। তাদের কলতানে মুখর জায়গাটা। ছোট ছোট পাখিগুলো সাদা-কালো মেশানো রং। আমাদের আবির্ভাবে পাখিরা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হল বটে তবে ভয় পেয়ে পালাল না উঠে। বুঝলাম মানুষের সংস্পর্শে এরা এত কম আসে যে মানুষ সুবিধের প্রাণী নয় এই বোধটাই তাদের নেই।

মামাবাবু মন্তব্য করলেন, এই দ্বীপটা কিন্তু খুব দামি।

—কেন? দামি তো কিছু দেখছি না। কিছু জংলি গাছ আছে শুধু।

—কারণ গুয়ানো। দ্বীপে এত সামুদ্রিক পাখির আস্তানা। এদের শুকনো মল জমে শক্ত হয়ে তৈরি হয় ফসফেট সমৃদ্ধ অতি দামি চাষের সার গুয়ানো। যা চেঁচে তুলে নিয়ে বিক্রি করতে চাইলে খদ্দেরের অভাব হবে না। তবে এখানে বৃষ্টির জলে কেবলই ধুয়ে যাবার ফলে গুয়ানো সার বেশি জমবে বলে মনে হয় না।

দ্বীপটায় একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম।

দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় খানিক উঁচুতে অনেকটা সমতলভূমি ছিল। সেখানে দেখি একটা পাথরে বাঁধানো চত্বর। কে বানাল? চত্বরটা বড় নয় বেশি। চত্বরের মাঝে প্রচুর চৌকো ছোট আকারের পাথরের টুকরো পড়ে আছে এলোমেলো ভাবে। মনে হল যে পাথরের দেয়ালে তৈরি একটা ঘর ছিল সেখানে। ভেঙে গেছে। পনেরো-ষোলোফুট লম্বা। এবং দশ ফুট মতন চওড়া ঘরের চিহ্ন বোঝা যায়। তার মাঝখানে পড়ে আছে একটা চারকোনা ইঞ্চি ছয়েক পুরু পাথরের খণ্ড। আয়তাকার। লম্বায় তিনফুট, চওড়ায় দু-ফুট মতন।

আমিই প্রথম নজর করলাম যে ওই পাথরটার মসৃণ গায়ে খোদাই করে কী জানি সব লেখা। কিছু লেখা মুছে গেছে, চটে গেছে। মামাবাবুকে ডেকে দেখালাম। উনি তীক্ষ্ণ চোখে পাথরটা দেখে উলটো দিকে গিয়ে লক্ষ করে বলে উঠলেন, আরে এতো সংস্কৃত অক্ষর। কী লিখেছে ধরতে পারছি না? শিলালিপি জাতীয় কিছু। কয়েকটা সংস্কৃত অক্ষর চিনতে পারছি।

সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি এখানে? আমি ও সুনন্দ তাজ্জব।

মামাবাবু বলেন, অসম্ভব কেন? এক সময়ে এই অঞ্চলে ভারতীয়রা প্রচুর ঘুরেছে। রাজত্ব করেছে। তারাই কেউ হয়তো এখানে পাথরের ঘর বানিয়ে শিলালিপিটা রেখেছিল। কী লেখা আছে আমি উদ্ধার করতে পারছি না। সুনন্দ ক্যামেরাটা বের করো। ফোটো তুলে নিই। যারা দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া আর শিলালিপি নিয়ে রিসার্চ করেন তাদের দেখাব। মনে হচ্ছে চার লাইন লেখা ছিল।

মামাবাবু অনেকগুলো ফোটো তুললেন, পাথরের চত্বর, ভাঙা ঘর, শিলালিপি ইত্যাদির। নোটবই বের করে নোটও লিখলেন কিছু।

লেখাটা কী হতে পারে? আমি ও সুনন্দ উত্তেজিত। হতে পারে দারুণ একটা আবিষ্কার।

সেদিন মাঝিরা পুরোপুরি বিশ্রাম নিল। আগের দিন তাদের ধকল কম হয়নি। ফকির ও মিকি বেশির ভাগ সময় মাঝিদের সঙ্গে কাটাল।

মামাবাবু সুনন্দ ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বীপের গাছপালা পাথর জমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। স্যাম্পলও নিলেন কিছু।

ফকির একটা মস্ত সামুদ্রিক কাঁকড়া ধরে এনে দিল আমাদের। সুনন্দ খাঁড়ির মধ্যে ছিপ ফেলে ধরল দুটো পেল্লাই সাইজের সামুদ্রিক চিংড়ি। চিংড়ি ধরার কায়দাটা মজার। শক্ত লম্বা সুতোর মাথায় বঁড়শিতে টোপ গেঁথে ও সোজা নামিয়ে দিল জলের ভিতর পাথরের খাঁজে। বাঁশের হাতলটা হাত দুই মাত্র। ফাতনা ডুবতেই সুনন্দ অতি ধীরে সুতো গুটোয়। জল ছেড়ে বঁড়শি বেরিয়ে আসতেই দেখি একটা বিরাট চিংড়ি প্রাণপণে আঁকড়ে আছে বড়শি ও সুতো, খাচ্ছে টোপ। যখন সে সুনন্দর খপ্পরে পৌঁছে গেল তখনও হুঁশ নেই, খেয়ে যাচ্ছে টোপ। সুনন্দ বলল, চিংড়ি এমন আঁকড়ে ধরে বঁড়শি সুতো যে চট করে ছাড়াতে পারে না নিজেকে।

সেদিন সুনন্দ রাঁধল কাঁকড়ার রোস্ট আর বাগদা চিংড়ির কালিয়া। রান্নার প্রয়োজনীয় মশলা সে সঙ্গে এনেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মশলার অভাব নেই। এখানে অনেক দ্বীপকে বলে মশলা দ্বীপ। গরম মশলা, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ ইত্যাদি নানা মশলার গাছ এখানে প্রচুর।

গরম ভাতের সঙ্গে চিংড়ি কাঁকড়া যা জমল। বেশ গুরুভোজন হয়ে গেল।

ফকিরের এক নতুন বিদ্যের কথা জানালাম। ও নাকি আতসবাজি বানাতে ওস্তাদ। একটা উঁচু জায়গায় নিজে হাতে তৈরি একটা তুবড়ি জ্বালল সন্ধের সময়। আর একটা হাউই ছাড়ল। দুটোই দারুণ। প্রশংসা করতে লজ্জিতভাবে জানাল যে, দেশে কাজকর্ম না জুটলে সে বাজি তৈরি করে দুপয়সা রোজগার করে। নিজের হাতে তৈরি কটা বাজি সে সঙ্গে এনেছে। কোনো দ্বীপে বেকায়দায় আটকে গেলে তুবড়ি জ্বেলে বা হাউই ছুঁড়ে সংকেত পাঠানো যায়। আমরা খুব তারিফ করলাম ওর বুদ্ধির। তখন কি ছাই জানি ওর এই বাজির কারসাজি কেন?

রাতে মামাবাবু একবার জিজ্ঞেস করলেন সুনন্দ ও আমাকে, তোমরা কি কেউ আমার কিট-ব্যাগ ঘেঁটেছিলে?

—না তো। আমরা জবাব দিই।

—টেন্টে ফিরে মনে হল আমার ব্যাগ কেউ ঘেঁটেছে। কাগজপত্রগুলো উলটোপালটা ভাবে রয়েছে। তবে টাকা কিছু খোয়া যায়নি। মানিব্যাগ তো আমার সঙ্গেই ছিল। যাহোক টাকাকড়ি টেন্টে রেখে বেরিও না। মাঝিদের বা মিকি ফকিরের হাতটানের অভ্যেস থাকতে পারে। অভাবী মানুষ এরা। সাবধান হওয়াই উচিত।

পরদিন সকালে ওই দ্বীপ ছেড়ে ফের আমাদের নৌকো ভাসল সাগরে।

পাঁচ

ঘণ্টাখানেক নৌকো যাত্রার পরেই একটা দ্বীপের রেখা দেখা দিল সমুদ্রের বুকে। কাছে এগোতেই দ্বীপটা মাথা উঁচু করে, স্পষ্ট হয়। দ্বীপটা নেড়া নয়। ঘন গাছগাছালির দেখা পাওয়া যায়।

এ দ্বীপে থামা হবে, না পাশ কাটিয়ে যাব মামাবাবু ঠিক করবেন। মিকি একদৃষ্টে দেখছিল দ্বীপটা। সে হঠাৎ মামাবাবুকে ফিসফিসিয়ে বলল, প্রফেসর আমার সন্দেহ হচ্ছে যেন চেনা চেনা। হতে পারে বাস্তেন আইল্যান্ড। কতগুলো চিহ্ন মনে পড়ছে।

মামাবাবু তৎক্ষণাৎ মাঝিদের নির্দেশ দিলেন, এই দ্বীপে নৌকো লাগাও। দেখব দ্বীপটা।

দ্বীপে নামলাম। মামাবাবু হামিদকে বললেন, তোমরা বিশ্রাম করো। রান্নার আয়োজন করো। আমরা দ্বীপটা ঘুরে আসছি। দেখি, নতুন কিছু গাছপালা প্রাণী চোখে পড়ে কিনা।

এত তাড়াতাড়ি বিশ্রাম পেয়ে মাঝিরা তো খুশি।

মামাবাবু, সুনন্দ, আমি, মিকি ঢালু পাড় বেয়ে উঠি। ধীরে ধীরে দ্বীপের ভিতরে ঢুকি। ফকিরও সঙ্গে আসতে চাইছিল। কিন্তু মামাবাবু তাকে বারণ করলেন। বললেন, তুমি বরং টেন্ট আর আমাদের ব্যাগগুলো এনে পাড়ে রাখো। কিছু তেমন না পেলেও একটা দিন তো লাগবে ঘুরে দেখতে। একটা রাত অন্তত কাটাতে হবে।

দ্বীপের মাঝখানটা উঁচু। নাতি উচ্চ পাহাড় যেন। ওই উঁচু জায়গা থেকে চারধারে ঢাল নেমেছে। চলতে চলতেই দেখতে পাচ্ছিলাম। মিকি মাঝে মাঝে থামে। দেখে চারপাশে। সে বুঝি কিছু চিহ্ন খুঁজছে। সহসা একটা বাঁক নিয়ে মিকি থমকে যায়। দেখি যে পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝরনা নামছে। ক্ষীণ স্রোতোধারা। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ঝরনার কিছু অংশ দেখতে পাই।

মিকি ঝরনাটা দেখতে দেখতে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, প্রফেসর এটাই বাস্তেন আইল্যান্ড। আমি নিশ্চিত। সেবারও এই ঝরনাটাকে ঠিক এই অ্যাঙ্গেলে প্রথমবার দেখেছিলাম উঠতে উঠতে। চলুন ওপরে, বাস্তেন সাহেবের ঘরবাড়িরর চিহ্ন কী কী আছে দেখতে পাবেন।

মামাবাবুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন, থ্যাংক ইউ মিকি। তোমার আশা পূরণ হোক। যাক বেশি ঘুরতে হল না খুঁজতে।

আঁকা বাঁকা সরু পথ ধরে উঠি। খুব খাড়া নয় পথ। মামাবাবু যেতে যেতে আশেপাশের গাছপালা নজর করতে করতে বললেন, এখানকার গাছপালা দেখছ? অভিনব কিছু চোখে পড়ছে? এ দ্বীপে লোক বাস করত তার প্রমাণ রয়েছে। দেখ, মাঝেমাঝে পাহাড়ের গা কেটে সমতল করা হয়েছে। আর এখানকার গাছগুলো দেখ।

তা একটু মনে হচ্ছিল আমারও। এবার খুঁটিয়ে নজর করি। সহসা একটা মস্ত ঝাঁকড়া গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে মামাবাবু বললেন, কী গাছ চিনতে পারো?

আমি দেখেই বলি, তেঁতুল না?

—হুঁ। করেক্ট। মামাবাবু মিকিকে বললেন, তুমি এ গাছটা দেখেছিলে আগেরবার?

—দেখেছিলাম। তবে অনেক ছোট ছিল। এই ছোট দ্বীপগুলোয় তেঁতুলগাছ বড় একটা দেখা যায় না। এ গাছ প্রচুর আছে সুমাত্রা জাভা মালয়ের জঙ্গলে। তেঁতুল বিচি তো পাখিতে

খায় না। ফলে দূরে সাগর দ্বীপে তেঁতুল গাছ পাখিরা বিচি ছড়ায় না। তেঁতুল গাছ সাধারণত মানুষই আনে। এ দ্বীপে বাস্তেন ছাড়া আর কেউ ছিল বলে শুনিনি। বাস্তেনই তেঁতুলের চারা বা বিচি পুঁতেছিল।

দেখা গেল এক জায়গায় পাথর কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। ক্ষয়ে গেলেও এখনো ওঠা যায় সিঁড়ি বেয়ে। খানিক সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দেখা গেল মস্ত সমতল এক চত্বর। পাথর ও মাটি কেটে বানানো। সেখানে একদা মনুষ্য বসতির ছাপ স্পষ্ট। আমরা থমকে গিয়ে দেখি।

মিকি বলে ওঠে খুশিতে, এইখানেই ছিল বাস্তেন সাহেবের বাড়ি। আগেরবার যা দেখেছি তা নেই। বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। তবু বোঝা যায়। ওই দেখুন—

চত্বরের মাঝে অনেকগুলো সরু লম্বা হাত দুই উঁচু পাথরের বেদি। চৌকো ইটের মতন পাথর মাটি দিয়ে গেঁথে তৈরি। তবে বেদিগুলো ভেঙে গেছে অনেক জায়গায়। মাটি ও পাথর স্তূপ হয়ে রয়েছে জায়গায় জায়গায়। দেখে মনে হল যে ওই পাথরের বেদিগুলোর ওপর তৈরি হয়েছিল বাস্তেনের বাড়ি। ঘরগুলো হয়তো ছিল বাঁশ ও কাঠের। কয়েকটা ছোট বেদি মনে হল বসার জন্য ব্যবহার হত, যেগুলো কিছু দূরে দূরে।

অবাক কাণ্ড একটা ছোট ঘর তখনো টিকে আছে। চত্বরের এক কোণে ঘরটা। ঘরটার দেয়াল পাথরে তৈরি আর ছাদ টিনের। ছাদে টিনের পাত অবশ্য এখন রংচটা এবং ফুটো ফুটো। হয়তো ওটা গুদামঘর জাতীয় কিছু ছিল। ঘরটার দরজা জানলার পাল্লা নষ্ট হয়ে গেছে। ভিতরে আগাছার জঙ্গল। বাইরে কয়েকটা মুরগি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

সুনন্দ ওই ঘরের হাঁ-করা দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিতেই মিকি তাকে সাবধান করে, ভিতরে ঢুকো না। বিষাক্ত সাপ থাকতে পারে।

সুনন্দ সভয়ে পিছিয়ে বলে, এখানে সাপ আছে নাকি?

—থাকতেই পারে। আন্দালাস আর মালয় জঙ্গলে বিষাক্ত সাপ প্রচুর। জাভাতেও আছে। সেগুলো জলে ভেসে বা নৌকো আর জাহাজের খোলে ঢুকে লুকিয়ে এই সব ছোট দ্বীপে হাজির হয়। বান্দা সাগরে একটা ছোট দ্বীপে লোকে তো কিং কোবরার ভয়ে মোটে পা দেয় না। আগে ছিল না ওখানে। কী করে যে এসে ওই দ্বীপে আস্তানা গেড়েছে। দ্বীপটায় প্রচুর এলাচ হয়। কয়েক ঘর লোক বাস করত দ্বীপটায়। তারা সবাই কিং-কোবরার ভয়ে পালিয়েছে দ্বীপ ছেড়ে। সাপগুলো মারার চেষ্টা হচ্ছে সরকার থেকে।

মামাবাবু বললেন, তা বটে। সুমাত্রা আর মালয় জঙ্গলে কিং-কোবরা মানে শঙ্খচূড় সাপ সাইজে পৃথিবীর সেরা। বারো-চোদ্দ ফুট অবধি লম্বা হয়। ওদের সব প্রাণী ভয় পায়। যা সাংঘাতিক বিষ আর তেড়িয়া মেজাজ। তবে এখানে কিং কোবরা নেই। তাহলে কি আর মুরগিগুলো নিশ্চিন্তে মাটিতে চড়ে বেড়ায়।

মিকি বলল, শুধু মুরগি কেন, এখানে ছাগল আর পাতিহাঁস আছে। আমি আগেরবার দেখেছি। নিশ্চয় বাস্তেন সাহেবের আমদানি। এখন বুনো হয়ে গেছে।

নারকেল গাছের কথা ধরছি না। গোটা ইন্দোনেশিয়ায় সর্বত্র নারকেল গাছের ছড়াছড়ি। আপনি জন্মায়। বাড়ে। নারকেলের খোলা ছোবড়া দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় নানান শিল্পবস্তু বা কাজের জিনিস তৈরি হয়। নারকেল তেল হয়। শাঁস খায়। যেমন ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে।

এ দ্বীপেও নারকেল গাছ প্রচুর। তবে আমাদের লক্ষ্য অন্য বিশেষ ধরনের গাছপালা কী আছে এ দ্বীপে।

চত্বরের একধারে একটা গাছ দেখে আমরা চমৎকৃত। আমগাছ।

মিকি বলল, ম্যাংগো ট্রি এই দ্বীপে আরও আছে। তবে ইন্ডিয়ান ম্যাংগোর মতন খেতে ভালো নয়। আমি খেয়ে দেখেছি আগের বার। এ গাছও হয়তো বাস্তেন লাগিয়েছিল জাভা সুমাত্রা থেকে এনে।

চত্বরে তখনো কিছু লোহা টিন অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতুর ভাঙা রড পাত্র ছড়িয়ে পড়ে ছিল। সব ধাতুই মরচে ধরা। গাছের ডালে তখনো ঝুলছে কিছু ছেঁড়া দড়ি আর ক্যানভাসের টুকরো। তখনো কয়েকটা মোটা কাঠের গুঁড়ি মাটিতে শুয়ে বা বেদির গায়ে হেলান দেওয়া অবস্থায় রয়েছে, তাদের গায়ে পুরু শ্যাওলার আস্তরণ। এসব চিহ্ন সুদূর অতীতের স্মৃতিকে জাগায়, বিষণ্ণ করে মন। এই কারণেই এই দ্বীপে এলে বাইরের লোকের ভীষণ ভাবে বাস্তেনকে মনে পড়ে। এ যে তার অতি প্রিয় বাসভূমি ছিল। ফলে মনে জাগে বাস্তেনের অলৌকিক উপস্থিতির গা ছমছমে অনুভূতি। সাদা বাংলায় বাস্তেনের প্রেতাত্মার ভয়।

চত্বরের একধারে কয়েকটা ফুল গাছ দেখে আমরা অবাক। পাঁচটা পরপর বেলফুলের গাছ আর একটা গন্ধরাজ। বেলফুলের গাছগুলো মস্ত ঝাঁকড়া হয়েছে আর গন্ধরাজটাও বিরাট। প্রচুর জল পাওয়া ফল। ফুলে ফুলে ভরে গেছে সব গাছ। কাছে যেতেই পাই বাতাসে ভেসে আসে সুবাস। বাঃ ফন বাস্তেন পুষ্পবিলাসীও ছিলেন।

মামাবাবু কিন্তু বাস্তেনের পোড়ো ভিটে দেখতে আধঘণ্টাও কাটাতে চাইলেন না। মিকিকে তাড়া লাগালেন, সেই ওপিয়াম গাছগুলো কোথায় দেখেছিলে? নিয়ে চলো। দেখব।

ঝরনার ধারে ধারে নামলাম কিছুটা। মূল ঝরনা থেকে একটা সরু শাখা ডান ধারে বেরিয়ে গেছে এক জায়গায়। মিকি এবার ওই শাখা স্রোত অনুসরণ করল। পিছু পিছু আমরা। ঝরনা স্রোতে মাটি ধুয়ে পাথর বেরিয়ে পড়েছে। হলদে এবং লালচে কালো রং-এর পাথর। স্রোতোধারার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিল অজস্র পাথুরে নুড়ি।

শাখা স্রোতটি খানিক গিয়ে পড়েছে গোল কড়াইয়ের আকারের এক নিচু জায়গায়। সেখানে ছোট এক ডোবা সৃষ্টি হয়েছে। ডোবা থেকে বাড়তি জল উপচিয়ে ফের ক্ষীণ স্রোতোধারায় নেমে গেছে আর এক দিকে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে। ওই ডোবার চারধারেই দেখলাম পোস্ত গাছের ঘন ঝোপ। মানে যা থেকে হয় আফিম বা ওপিয়াম। মামাবাবুর বাগানে এই জাতীয় গাছই দেখেছি। তবে এখানকার পোস্ত গাছ অনেক বেশি সতেজ, বড় ও ঝাঁকড়া। গাছগুলোয় কিছু হলুদ ফুল ফুটে আছে।

মামাবাবু অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে গাছগুলো নজর করলেন। তারপর ব্যাগ থেকে সরু বেঁটে শাবল বের করে ওখানকার মাটি খুঁড়ে তুলে দুটো ছোট প্লাস্টিকের কৌটোয় ভরলেন। ওখান থেকে কিছু নুড়ি পাথরও নিলেন স্যাম্পল হিসেবে। শিশিতে নিলেন ঝরনার জলের স্যাম্পল। সব স্যাম্পল ব্যাগে ভরলেন। তারপর মিকিকে বললেন ক্যালিফোর্নিয়ান পপি কোথায় দেখেছিলে? এখানে তো দেখছি না?

—ছিল। দেখেছি আমি। এখান থেকে খানিক দূরে যেতে হবে। তবে এতদিনে বেঁচে আছে কিনা জানি না? জানায় মিকি।

কখনো গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে সরু পথ ধরে, কখনো খোলা আকাশে মাথার ওপর গনগনে সূর্য দেখতে দেখতে, ফের কটা বড় গাছের ঘন ছায়ায় এসে মিকি বলল, এইখানে দেখেছিলাম সেই গাছ। সেখানে ওপরে ঠাস পাতার আচ্ছাদন থাকায় নিচে রোদের তাত খুব কম। দিব্যি ঠাণ্ডা জায়গাটি।

মামাবাবু তীক্ষ্ণ নজরে খুঁজতে থাকেন। মিকিও। মিকিই দেখতে পায় প্রথমে, ওই তো।

তাই বটে। বড় বড় পুরু পাতা ঘাসের মতন এক টুকরো জায়গায় ওই ধরনের পপি গাছ কার্পেটের মতো বিছিয়ে আছে। দু-চারটে গোলাপি ফুল ধরেছে লম্বা বোঁটার ডগায়।

মামাবাবু ভালো ভাবে পরীক্ষা করে বললেন, হুঁ। ক্যালিফোর্নিয়ান পপিই বটে। তবে ঠাণ্ডা দেশের উদ্ভিদ তাই ছড়ায়নি তেমন, ফুলও ফোটেনি। তবে গাছগুলো বেশ পুরুষ্ট।

ওই পপি গাছ এবং সেখানকার মাটি স্যাম্পল হিসেবে সংগ্রহ করে ব্যাগে পুরলেন মামাবাবু। বললেন, আপাতত ফেরা যাক। তোমাদের খিদে পায়নি?

পেয়েছে বইকি। সঙ্গে খাবারও আছে। মামাবাবুর ভয়ে কথাটা তুলতে সাহস পাইনি এতক্ষণ। এখন উনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আমরাই গা করিনি।

নৌকোর কাছাকাছি গাছের ছায়ায় আমরা খেতে বসলাম। মামাবাবু মিকিকে বললেন, আমরা শুকনো খাবার খাব। তুমি কী খাবে? আমাদেরটা? না মাঝিদের রান্না ভাত মাছ? মিকি সলজ্জভাবে জানায়, ভাত মাছ।

—বেশ। আমরা এখানে খাচ্ছি। তুমি মাঝিদের সঙ্গে খেতে যাও। খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে যাচ্ছি। তারপর তাঁবু খাটাব।

মিকি চলে যায়।

আমরা খাচ্ছি স্যান্ডুইচ, পাকা কলা, সিদ্ধ ডিম। হঠাৎ হন হন করে হাজির হল মিকি। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, মুশকিল হয়ে গেছে।

—কী ব্যাপার?

মিকি বলল, মাঝিরা টের পেয়ে গেছে এটা বাস্তেন আইল্যান্ড। ওরা আর এখানে থাকতে চাইছে না।

—কী করে বুঝল? আমরা জানতে চাই।

—দুজন মাঝি গিয়েছিল দ্বীপের ভিতর খাবার জল আর রান্নার কাঠকুঠো জোগাড় করতে। ওরা ঘুরতে ঘুরতে দেখে ফ্যালে বাস্তেন সাহেবের পোড়ো ভিটে। ওদের একজন আগে এসেছিল একবার এই দ্বীপে। জানত এটা বাস্তেন আইল্যান্ড। অন্য মাঝিরা চিনত না। তারা আসেনি আগে। তবে এই দ্বীপের দুর্নাম শুনেছে। শুনেছে, এটা নাকি ভুতুড়ে দ্বীপ। যে এসেছিল তার কাছে শুনে অন্য মাঝিরাও ভয় পেয়ে গেছে। থাকবে না বলছে।

মামাবাবু বললেন, কিন্তু আমার যে এ দ্বীপে কয়েক দিন থাকতেই হবে। ওরা যদি আমাদের ফেলে নৌকো নিয়ে পালায় ওদের পাওনা আমি দেব না, বলে দিও।

একটু ভেবে মামাবাবু বললেন, বাস্তেন দ্বীপে রাতে থাকতেই তো ভয় এদের?

—হ্যাঁ তাই।

—তবে একটা প্রস্তাব দাও মাঝিদের। দিনের বেলা ওরা কাটাক এখানে। অন্ধকার হবার আগেই চলে যেতে পারে কাছে কোনো দ্বীপে রাত কাটাতে। পরদিন সূর্য উঠলে আসুক এখানে। বাস্তেনের ভিটের কাছে যাবার দরকার নেই ওদের। সমুদ্র তীরেই কাটাক। আমাদের যতটুকু পারে সাহায্য করবে এখানে। আবহাওয়া খারাপের জন্য কোনো কোনো দিন এখানে না এলেও আমার আপত্তি নেই। মোট কথা আমাদের ফেলে রেখে দেশে পালানো চলবে না। এই দ্বীপের গাছপালা এবং আরও কিছু কিছু জিনিস আমি খুঁটিয়ে দেখব। এতদূর কষ্ট করে আসা কি বৃথা যাবে? আচ্ছা তুমি কী করবে?

মিকি বলল, আমি এখানেই থাকব। বলেছি তো আমার ভূতের ভয় নেই।

—ভেরি গুড। যাও। চটপট জানাও মাঝিরা কী ঠিক করল। বলো যে তাদের এই বাড়তি খাটুনি আমি পুষিয়ে দেব বেশি টাকা দিয়ে।

মিকি চলে যায় চিন্তিত মুখে। আমি ও সুনন্দও চিন্তিত। আমাদের এখানে ফেলে রেখে মাঝিরা নৌকো নিয়ে চম্পট দিলেই গেছি। কীভাবে উদ্ধার পাব তাহলে? প্রাণের চেয়ে কি টাকার লোভ বেশি? অথচ মামাবাবু যা জেদি নিজের ইচ্ছে থেকে এক চুলও সরবেন না। তাতে যা বিপদই ঘটুক। মাঝিরা পালাতে চাইলে মিকি কি আর থাকবে আমাদের সঙ্গে? সেও পালাবে ঠিক। দুশ্চিন্তায় চুমুক দিতে ভুলে গিয়ে কফি ঠাণ্ডা করে ফেলি।

মিকি ফিরে আসে ঘণ্টাখানেক বাদে। মুখে খুশি।—হ্যাঁ মাঝিরা রাজি হয়েছে মামাবাবুর শর্তে। কাছে যে দ্বীপ থেকে আমরা এখানে এসেছি সেখানে তারা ফিরে যাবে সন্ধের আগে। আমাদের সাহায্য করবে দিনের বেলা।

শুনে আমরা উৎফুল্ল। হাঁপ ছাড়ি। মামাবাবু বললেন, ওদের এ দ্বীপে বেশি ঘোরাঘুরির দরকার নেই। আমাদের রান্না করে দিলেই চলবে। আচ্ছা ফকির কী করতে চায়?

মিকি জানাল, ফকির আমাদের সঙ্গে বাস্তেন দ্বীপেই থাকবে বলেছে। মানে রাতেও।

—ওর বুঝি ভূতের ভয় নেই?

একেবারে নেই তা নয়। তবে ও আমার সঙ্গে থাকতে চায়। আসলে আমায় খুশি করতে চায়।

—কেন?

মাইনে দিচ্ছি আমি।

মামাবাবু অবাক।

—হাঁ আপনি ওর বস্ ঠিক কথা। কিন্তু আমি যে ওকে চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছি। সেই কৃতজ্ঞতায়—

—একটু খোলসা করে বলো। মামাবাবু ভুরু কোঁচকান।

বারকয়েক চোখ পিটপিট করে ইতস্তত ভাবে মিকি জানায় রহস্যটা।

জাকার্তায় কয়েকটা নৌকোর মাঝিদের সঙ্গে কথা বলার পর মিকি হামিদের সঙ্গে কথা পাকা করে। কোথায় কোথায় যেতে হবে, কী কী করতে হবে ইত্যাদি জানানোর পর দরাদরি করে ভাড়া পাওনাগণ্ডা ঠিক হয়। হামিদের কাছ থেকে চলে আসছে মিকি তখন হঠাৎ ফকির মিকিকে পাকড়াও করে। মিকি আগে চিনত না ফকিরকে। ফকির মিকিকে করুণ কণ্ঠে জানায় যে তার একটা চাকরির খুব দরকার। যে নৌকোয় ফকির কাজ পেয়েছিল, গ্রাম

থেকে ফিরতে দেরি হওয়ায় সেই নৌকো ফকিরের জন্য অপেক্ষা না করে ছেড়ে চলে গেছে। অতএব ফকির এখন বেকার। বাড়িতে তার সংসার আছে। গরিব মানুষ সে। বেশি দিন কাজ না করে কি তার চলে? মিকি যদি তাকে একটা কাজ জুটিয়ে দেয় এই নৌকো যাত্রায় সে বড় কৃতজ্ঞ হবে। মিকিরা বেরুচ্ছে শিগগিরি সে জেনেছে। ফকিরের পুরোনো চেনা নৌকোয় ফিরতে অন্তর মাসখানেক লাগবে। এখনো সে কোনো কাজ জোটাতে পারেনি। মাইনে সে বেশি চাইবে না। সবরকম কাজই সে জানে—

মিকির দয়া হয়। সে হামিদকে অনুরোধ করে ফকিরকে ওর নৌকোয় কাজ দিতে। হামিদ প্রথমে মোটেই রাজি ছিল না ফকিরকে নিতে। মিকি ধরাধরি করতে বলে যে বেশ চলুক সঙ্গে তবে ওর মাইনে আমি দিতে পারব না, শুধু খাওয়া দেব। মিকি তখন চালাকি করে ফকিরের মাইনের টাকাটা হামিদের নৌকো ভাড়ার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মোট ভাড়া কত লাগবে জানায় মামাবাবুকে। পুরো ব্যাপারটা আর ভাঙেনি মামাবাবুর কাছে। এই জন্যেই আমায় একটু স্পেশাল খাতির করে। এই আর কি— মিকি সলজ্জ ভাবে জানায়।

—হুম্। ফকিরের আসল বস্ তাহলে তুমি। আমি নয়। মামাবাবু টিপ্পুনি কাটেন। মিকি অপ্রতিভ। বলে, তা লোকটা সত্যি কাজের। তাই না?

মামাবাবু বললেন, বেশ চাইলে থাকুক ফকির। তোমার সঙ্গে থাকবে ছোট তাঁবুটায়। আমরা থাকব বড় দুটো তাঁবুতে। আমাদের শোবার ক্যাম্প খাট আছে। তোমরা বাঁশের মাচা করে তার ওপর বিছানা পেত। এখানে তো মাটিতে শোয়া যাবে না। যা বৃষ্টি।

মিকি মহা খুশি হয়ে দৌড়াল ফকিরকে খবর দিতে।

তাঁবু খাটাতে, জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে সেই দিনটা কেটে গেল। সূর্য ডোবার ঢের আগেই হামিদ তার দুই সঙ্গীসহ নৌকো নিয়ে চলে গেল কাছের দ্বীপে— যেখানে শিলালিপি পাওয়া গেছে, সেই দ্বীপটায়।

ছয়

পরদিন সকালে মামাবাবু মোটেই বেরুলেন না নিজের তাঁবু ছেড়ে। সকালে টিফিন খেয়ে আমাদের বললেন, আমার কিছু কাছ আছে। বেরুব না। তোমরা দুজন মিকিকে নিয়ে ঘুরে এসো দ্বীপে। ফকির থাক এখানে। রান্নাবান্না করবে। মাঝে মাঝে আমার চা করে দেবে। দুপুরে খাবার আগে আমায় একদম ডিসটার্ব করবে না।

মামাবাবুর এই ধরনের আচরণের কারণ জানি। গভীর কোনো চিন্তায় ডুবে থাকলে তিনি একা থাকতে চান। তখন অন্য কারও সঙ্গে কথাবার্তা পছন্দ করেন না।

আমি ও সুনন্দ খুশি হয়েই মিকিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার আগে দেখি মামাবাবু তাঁর সেই বাক্সটা ঝাড়পোঁছ করছেন।

মামাবাবু একটা হালকা অথচ মজবুত মাঝারি আকারের বাক্স এনেছিলেন। তাতে ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি, মালমশলা।

দ্বীপটা বেরিয়ে দেখতে দেখতে আমাদের বিস্ময় বাড়ে। কত রকম যে গাছ সেখানে। কত রকম ফল ফুলের গাছ। দেশি বুনো ঝোপঝাড় তো রয়েছেই। তার মধ্যে মিশে আছে

নানান দেশের ভালো ভালো গাছ। বোঝা যায় ওসব গাছপালা এখানে আপনা আপনি জন্মায়নি। কেউ এনে লাগিয়েছে। কে আর হবে ফন বাস্তেন ছাড়া?

একটা গাছ দেখে থমকে যাই। কাঁঠাল। কচি কচি এঁচোড় ঝুলছে ডালে। মস্ত গাছ।

মিকি বিজ্ঞের মতন বলে, জ্যাক ফ্রুত। আন্দালাসে আমরা বলি নাংকো।

—আন্দালাস মানে সুমাত্রায় কাঁঠাল গাছ আছে বুঝি? আমি জানতে চাই।

—আছে। তবে বেশি নেই। ডুরিয়ানই বেশি হয়।

—ডুরিয়ান কী রকম ফল?

—এই তোমাদের জ্যাক ফ্রুতের জাত। তবে একটু অন্য রকম। ফুটবলের মতো গোল। গায়ে বড় বড় খোঁটা খোঁচা কাঁটা। স্বাদ ইন্দিয়ান কাঁঠালের মতো ভালো নয়। বেশি মিষ্টি। আমি ইন্দিয়ান জ্যাকফ্রুত খেতে বেশি ভালোবাসি।

সুনন্দ বলল, ফাসক্লাস। গাছপাঁঠার কালিয়া রাঁধব। মিকি পাড়োতো ভাই ওই তিনটে এঁচোড়। এই গাছের তলায় রেখে যাই। বোঁটা থেকে আঠা ঝরে যাক। ফেরার পথে তুলে নেব।

ঘুরতে ঘুরতে সহসা তীব্র মিষ্ট সুগন্ধ পাই। এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে চোখে পড়ে কিছুটা ফাঁকায় বিরাট এক মুচকুন্দ ফুলের গাছ। ফুলে ফুলে ভরা। গাছের নীচে পড়ে আছে অজস্র আধশুকনা বা শুকনো ফুল। কিছু টাটকা ফুল পেড়ে পকেটে পুরলাম। তাঁবুতে জল ছিটিয়ে পাত্রে রাখলে চমৎকার গন্ধ ছড়াবে।

গাছতলায় বসে এক রাউন্ড চা খাওয়া হল ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে। ঝরনার জলে আরাম করে স্নান করলাম। একটু বাদে তাঁবুতে ফিরি।

তাঁবুতে পৌঁছে উঁকি দিয়ে দেখলাম মামাবাবু তাঁর তাঁবুর ভিতরে একটা ফোল্ডিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। টেবিল ভর্তি টেস্টটিউব, বার্নার, নানান সাইজের বাটি প্লেট ইত্যাদি সরঞ্জাম। নিবিষ্ট চিত্তে মামাবাবু একটা টেস্ট-টিউবের মধ্যে তরল পদার্থ দেখছেন। আমাদের আগমন বুঝি টেরই পেলেন না। আমরাও ডাকি না তাঁকে।

মাঝিরা যখন আমাদের দুপুরের খাওয়া পরিবেশনের উদ্যোগ শুরু করেছে মামাবাবু তখন তাঁর তাঁবু থেকে নিজেই বেরিয়ে এলেন, বেশ প্রফুল্ল বদনে। আমরা যা যা দেখেছি রিপোর্ট করলাম মামাবাবুকে।

খাওয়ার পর মামাবাবু আবার ঢুকে গেলেন নিজের তাঁবুতে। বিকেল অবধি ব্যস্ত থাকলেন কী সব গবেষণায়। আমি ও সুনন্দ থাকতাম অন্য একটা তাঁবুতে। তোফা ঘুম দিলাম দুপুরে। বিকেলে সমুদ্রের ধারে বসে আড্ডা মারলাম দুজনে। ফকির লোকটির নজর খুব। না চাইতেই দুবার আমাদের সামনে গরম চা ধরে দিল।

পরদিন মামাবাবুও আমাদের সঙ্গে দ্বীপটা ঘুরতে বেরোলেন। মিকিও চলল সঙ্গে। মাঝিরা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে বাস্তেন আইল্যান্ডে। ফকির গল্প জুড়েছে ওদের সঙ্গে।

আমরা বেরোবার আধঘণ্টার মধ্যেই আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। বৃষ্টি নামতে পারে যে কোনো সময়। সুনন্দ বলল আমায়, চ, তাঁবু থেকে আমাদের বর্ষাতি আর ছাতাগুলো নিয়ে আসি। বেশি জোরে বৃষ্টি নামলে কোনো আড়ালে দাঁড়িয়ে যাব। সাধারণত সকালের দিকে বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না। গোটা সকাল তাঁবুতে কাটানো ভারি একঘেয়ে

ব্যাপার। মামাবাবু এবং মিকিরও তাই মত। দুজনে জোরে পা চালিয়ে তাঁবুর দিকে হন্টন দিলাম।

মামাবাবুর তাঁবুতে যাই প্রথমে। পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি মেরেই আমরা থ। কে একটা লোক মাটিতে বসে। তার সামনে মামাবাবুর ব্যাগ থেকে বের করা কাগজপত্র ছড়ানো। আমাদের আসার শব্দে লোকটা মুখ ফেরায়। লোকটা বেঁটে। মোঙ্গোলিয়ান বা চিনা জাতীয়। ফুলপ্যান্ট ও হলুদ স্পোর্টস গেঞ্জি পরনে। সে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁবুর অন্য ধার দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না—সুনন্দ বডি থ্রো দিয়ে ওর কোমর ধরে ওকে সুদ্ধু নিয়ে মাটিতে পড়ল। লোকটা অতি তৎপর। সে গা মুচড়ে পাঁকাল মাছের মতো সুনন্দর হাত ছাড়িয়ে উঠে বসে, তারপর তার পোশাকের আড়ালে লুকানো লম্বা একটা ছুরি ঝট্ করে বের করে উঁচিয়ে ধরে সুনন্দকে তাক করে। হয়তো মেরেই বসত ছুরি কিংবা ভয় দেখিয়ে পালাত। আমি আর রিস্ক নিই না। একটা টিনের ভারী পাত্র ছুঁড়লাম লোকটার হাত লক্ষ্য করে। ঘা খেয়ে ছুরি ছিটকে গেল লোকটার হাত থেকে। সে কঁকিয়ে ওঠে ব্যথায়। এই সুযোগে আমি ডাইভ দিয়ে পাকড়ে লোকটাকে পেড়ে ফেলি মাটিতে। সুনন্দও তাকে চেপে ধরে।

দড়ি দিয়ে লোকটার হাত পা শক্ত করে বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখি। সুনন্দ ছুটল মামাবাবুকে খবর দিতে।

মামাবাবু ও মিকি এসে লোকটাকে দেখে অবাক। কে এ? কী উদ্দেশ্যে আমাদের জিনিস হাতড়াচ্ছিল? এই নির্জন দ্বীপে চোর! এখানে যে আর কেউ বাস করে তার কোনো চিহ্ন তো চোখে পড়েনি!

মামাবাবু মাঝিদের ডাকলেন। ফকিরও আসে। হামিদ লোকটাকে দেখেই বলে ওঠে, আরে এতো খ্যাপা চিয়াং! ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলোয় গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়। কুখ্যাত জলদস্যু তাই-চুংয়ের গুপ্তধনরত্নের ভাণ্ডার, বহু বছর খুঁজছে চিয়াং। এই ওর নেশা মানে পাগলামি বলতে পারেন।

হামিদের মুখে শুনি তাই-চুং বৃত্তান্ত—

প্রায় দেড়শো বছর আগের জলদস্যু তাই-চুং। দাপিয়ে বেড়াত ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রগুলিতে। সে সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জলদস্যুদের ভীষণ উপদ্রব ছিল। চিনা পর্তুগিজ মালয়ি-বর্মি ইত্যাদি নানা দেশের বোম্বেটের উৎপাত। দামি মশলার লোভে এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করতে এখানের সাগরগুলি দিয়ে যাতায়াত করত কত দেশের বাণিজ্যপোত। ধনী সওদাগরদের বড় বড় নৌকো বা জাহাজ। জলদস্যুরা ওঁৎ পেতে থাকত সেই সব বাণিজ্যপোত লুঠ করতে। বণিকদের সঙ্গে যদিও আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র সৈনিকরা থাকত তবু অনেক সময় তারা বাঁচাতে পারত না নিজেদের মাল ও প্রাণ।

প্রবাদ আছে তাই-চুং ইন্দোনেশিয়ার কোনো এক জনহীন ছোট্ট সাগর দ্বীপে তার লুণ্ঠন করা ধনরত্ন লুকিয়ে রাখত। চুং নিজে এবং তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সাগরেদ ছাড়া কেউ জানত না সেই দ্বীপের হদিস বা কোথায় কীভাবে লুকনো আছে চুংয়ের গুপ্তধন। একবার আচমকা এক ডাচ যুদ্ধজাহাদের সামনে পড়ে যায় চুংয়ের জাহাজ। ডাচ সামরিক জাহাজের গোলার আঘাতে ডুবে যায় চুংয়ের জাহাজ। বোম্বেটে জাহাজের কেউ প্রাণে বাঁচেনি। চুং

এবং তার যে ক-জন সহচর জানত ওই গুপ্তধনের ঠিকানা তারা সবাই মারা পড়ে সেবার। ফলে চুংয়ের গুপ্তধনের হদিস লুপ্ত হয়ে যায়। তবু খোঁজ চলে। প্রবাদ আছে চুংয়ের গুপ্তধন নাকি বিপুল। কেউ খুঁজে পায়নি আজও। সামান্য দু-চারটে ক্লু বা কিংবদন্তি নির্ভর করে খোঁজা। সবাই এখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে শুধু এই চিয়াং ছাড়া।

চিয়াং দক্ষ মাল্লা। বছরে কয়েক মাস কাজ করে। আর বাকি সময় খুঁজে বেড়ায় চুংয়ের গুপ্তধন। এ তার এক উদ্ভট নেশা। পাগলামি। লোকে এই নিয়ে খ্যাপায় তাকে, হাসিঠাট্টা করে। ভুলভাল খবর দিয়ে হয়রানি করিয়ে মজা দেখে। তবু চিয়াংয়ের চৈতন্য হয় না। মাঝিমাল্লা মহলে এখানে তাই ওর নাম হয়ে গেছে খ্যাপাটে চিয়াং।

—হ্যাঁ, মাঝিরা অনেকে দেখেছে যে মিকি যখন জাকার্তায় নৌকো ভাড়ার খোঁজখবর করছিল তখন এই চিয়াং ঘুরঘুর করছিল মিকির কাছাকাছি। মিকি ওকে চিনত না। ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে ভাবেনি বন্দরের মাঝিরা। চিয়াংয়ের নিশ্চয় ধারণা হয়েছিল যে এই বিদেশি চুংয়ের গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছে। নইলে ওই সব অখাদ্য দ্বীপে কেউ ঘোরে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ভান মাত্র। হয়তো কেউ মজা করে চিয়াংয়ের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল ধারণাটা।

চিয়াং ছুরি বের করেছিল শুনে মাঝিরা বেজায় চটে গেল। প্রচণ্ড বকাবকি করল চিয়াংকে। সবচেয়ে বেশি তড়পাল ফকির। সে চিয়াংকে কয়েক ঘা উত্তমমধ্যম না দিয়েই ছাড়বে না। মামাবাবু অনেক কষ্টে ঠেকালেন ফকিরকে।

চিয়াং আধবোজা চোখে জুলজুল করে তাকিয়ে সব বকুনি-গালাগালি হজম করল। তারপর সহসা ফেটে পড়ল রাগে। চিনা ভাষায় উত্তেজিত স্বরে কী সব বলতে লাগল। মিকির সঙ্গে ওর এক প্রস্থ কথাবার্তা হয়। মাঝিরাও ওকে কিছু বলে।

—কী বলছে চিয়াং? মামাবাবু জানতে চাইলেন।

মিকি মুচকি হেসে যা বলে তার সারমর্ম এই—ও বলছে ওর ম্যাপটা চাই। জলদস্যু চুং নাকি ওর পূর্বপুরুষ। অতএব ওই ম্যাপে শুধু তারই অধিকার।

—কীসের ম্যাপ? মামাবাবু অবাক।

—গুপ্তধনের ম্যাপ। যে ম্যাপ দেখে আপনি হদিস পেয়েছেন কোন্ দ্বীপে, কীভাবে চুংয়ের গুপ্তধন লুকানো আছে।

—মানে বাস্তেন আইল্যান্ড?

—না। বাস্তেন আইল্যান্ডের ইতিহাস ও জানে। ও বলছে আগের দ্বীপটার কথা। যেখানে পাথরে খোদাই শিলালিপি পাওয়া গেছে। ওর ধারণা শিলালিপিটা আসলে সাংকেতিক ভাষা। যা উদ্ধার করলেই বোঝা যাবে গুপ্তধন ওই দ্বীপে কীভাবে লুকানো আছে। ম্যাপে আর কী কী আছে ও জানতে চায়। তাই আপনার ব্যাগ ঘাঁটছিল ম্যাপটা পেতে।

—যাচ্চলে। আচ্ছা পাগল! মামাবাবু বলেন, ওকে বুঝিয়ে দাও মিকি আমরা কোনো গুপ্তধনের ম্যাপটাপ পাইনি। ওই শিলালিপি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয় ভাষা। গুপ্তধনের হদিস নিশ্চয় চিনা ভাষায় থাকবে।

মিকি চিয়াংয়ের সঙ্গে ফের কথাবার্তা চালায়। চিয়াংয়ের মুখে বাক্যের তুবড়ি ছোটে।

মিকি মামাবাবুকে বলে, আপনার কথা ও বিশ্বাস করছে না।

হতাশ মামাবাবু বলেন, তা আর কী করা যাবে? ও পাথরে খোদাই সংকেত উদ্ধার করুক। গুপ্তধন পাক। আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তবে অমন কোনো ম্যাপ আমার কাছে নেই।

সুনন্দ ও আমি হাসছি শুনে। মাঝিরা ভ্যাবাচাকা। হামিদ কী জানি নির্দেশ দিতে অন্য দুই মাঝি বেরিয়ে গেল। মামাবাবু ভুরু কুচকে বলেন, আচ্ছা ও শিলালিপির ব্যাপারটা জানল কীভাবে?

মিকি ও হামিদ বলল, বোঝাই যাচ্ছে যে চিয়াং জাকার্তা থেকে আমাদের ফলো করে এসেছে। সব দ্বীপে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছে আপনার কার্যকলাপ। আপনি বৈজ্ঞানিক। গাছপালা খুঁজছেন। এসব ওর মাথায় ঢোকেনি। এখানে অজানা দ্বীপে কেউ গেলেই চিয়াং ভাবে সে গুপ্তধন খুঁজছে। চুংয়ের গুপ্তধন।

—ও একা একা নৌকো বেয়ে এসেছে সাগরে? আমরা স্তম্ভিত।

—না একা নয়। ওর নিশ্চয় সঙ্গী মাঝি আছে। ওর নৌকো লুকানো আছে দ্বীপে কোথাও। সেই নৌকো খুঁজতে লোক পাঠিয়েছি।

বন্দিকে তাঁবুতে রেখে আমরা বাইরে আলোচনা করি, যে এখন এই লোকটাকে নিয়ে কী করা যায়? মামাবাবু বিব্রত।

মিকি ও হামিদ নিজেদের মধ্যে কী সব পরামর্শ করে। সুনন্দ ফকিরকে বলে, এক রাউন্ড চা খাওয়াও ভাই। বেড়ানো তো ভেস্তে গেল।

ফকির একটু অনিচ্ছায় চা বানাতে যায়। বোধহয় এমন জমাটি কাণ্ডটার কোনো কিছুই বাদ দিতে চায় না।

খানিক পরে হামিদের সহচর দুই মাঝি ফিরে এসে জানায় যে চিয়াংয়ের নৌকো খুঁজে পেয়েছে তারা। এক সঙ্গী নিয়ে এসেছে চিয়াং। একটা খাঁড়ির মধ্যে নৌকোটা লুকানো ছিল। সঙ্গীটি সেখানে ছিল চিয়াংয়ের অপেক্ষায়। গুপ্তধনের ভাগ দেবে আশা দেখিয়ে তাকে জুটিয়েছে চিয়াং। তবে সাগরে দুজনে নৌকো চালিয়ে আসা খুবই বিপজ্জনক। অবশ্য গুপ্তধনের লোভে ওদের প্রাণের মায়াও তুচ্ছ। চিয়াংয়ের সঙ্গীকে শক্ত করে বেঁধে রেখে এসেছে। হামিদের মাঝিরা।

মামাবাবু মিকিকে বলেন, এই খ্যাপাটে লোকটাকে রেখে কী লাভ? ওদের বরং ছেড়ে দাও। জাভায় ফিরে যাক।

মিকি বলল, ও ব্যাটা এখন ফিরবে না মোটেই। আমাদের জ্বালাবে শুধু।

হামিদ জানায়, আমরা রাতে আর দিনের অনেকটা সময় ওই পাথরে খোদাই লেখা দ্বীপে মানে চিয়াংয়ের গুপ্তধনের দ্বীপে থাকায় ও এখনো তেমন গুপ্তধন খোঁজাখুঁজি করতে পারেনি। আমরা গেলেই পুরো দমে লাগবে।

—তা খুঁজুক। সুনন্দ মিচকে হেসে বলে, সারা জীবন খুঁজুক ওখানে।

হামিদ বলল, ভাবছি, আমরা শিলালিপি দ্বীপে ফেরার সময় চিয়াংদের নৌকোসুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে যাব। অন্য কোনো দ্বীপে চলে যেতে বলব ওদের। কড়কে দেব যে ফের আমাদের

চোখের সামনে এলে স্রেফ খুন করে ফেলব ওদের। তাহলে হয়তো ভয়ে এখন আর জ্বালাবে না আমাদের।

হামিদের প্রস্তাব মেনে নিলাম আমরা।

হামিদ বলল, আপাতত চিয়াংকে শাসিয়ে রাখি, তোমার ব্যবস্থা হচ্ছে। হাত পা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেব? না কোনো নির্জন দ্বীপে নির্বাসন দেব? দেখি ভেবে। ছুরি মারতে গিয়েছিলে এত বড় আস্পর্ধা! থাকুক ভয়ে ভয়ে।

আমি সুনন্দ কাছাকাছি একটু ঘোরাঘুরি করি। রোদ বাড়তে নিজেদের তাঁবুতে ঢুকলাম। মামাবাবু নিজের তাঁবুতে কী সব করছেন। বন্দি চিয়াংকে রাখা হয়েছে মিকিদের তাঁবুতে। ফকিরকে বলা হয়েছে যে বন্দি লোকটা চাইলে জল খেতে দিতে।

মিকি গিয়ে মাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়ল। মাঝিরা একটা গুহার ভিতর রান্না করছে। মাঝিরা খেয়েদেয়ে ফিরে যাবে শিলালিপি দ্বীপে। তখন নিয়ে যাবে বন্দি চিয়াং আর তার সঙ্গীকে।

দুপুরের খাওয়া হল। আমার ও সুনন্দর তাঁবুতে ফোল্ডিং টেবিল ও টুল পেতে খাই সাধারণত। মামাবাবুও আসেন খেতে।

ফকির আমাদের খাবার সাজিয়ে দিয়ে বলল যে সে মাঝিদের কাছে যাচ্ছে খেতে। যাবার আগে ফকির ইতস্তত করে বলে, বন্দি চিয়াংকে কিছু খেতে দেব কি?

—হ্যাঁ দিও। মামাবাবু উদার, তবে সাবধান। ওর কোমরে দড়ি বেঁধে দড়ির অন্য প্রান্ত বেঁধে তবে ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলবে। হাতে একটা লাঠি নিয়ে তুমি পাহারায় থাকবে খাবার সময়। ওর খাওয়া শেষ হলে ফের হাত-পা বেঁধে দেবে।

ফকির চলে গেল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে।

আমরা খাওয়া শেষ করার পর খাবার জল আনতে মাঝিদের কাছে গিয়ে দেখি তিন মাঝি ও মিকি খাচ্ছে। কিন্তু ফকির সেখানে নেই। সে নাকি আসেনি খেতে। লোকটা গেল কোথায়?

মিকির তাঁবুতে গিয়ে দেখি যে বন্দি চিয়াং উধাও। তাঁবু ফাঁকা। ডাকাডাকি করেও ফকিরের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। লক্ষ করলাম যে তাঁবুতে ফকিরের ব্যাগ দুটোও নেই।

একটা ঘোর সন্দেহ জাগে সবার মনে।

মাঝিরা ছুটল চিয়াংয়ের নৌকোর খোঁজে। তারা ফিরে এসে বলল যে নৌকো নেই। চিয়াংয়ের সঙ্গীটিও নেই। অর্থাৎ ওরা পালিয়েছে। ওরা দুজন বাঁধন খুলল কী করে? তবে কি?

মামাবাবু মৃদু হেসে বললেন, এতো দিব্যি বোঝা যাচ্ছে। শ্রীমান ফকির আসলে চিয়াংয়ের লোক। কৌশল করে ওকে আমাদের দলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল চিয়াং। বাঃ চিয়াংয়ের বুদ্ধি আছে। আর ফকির লোকটার অ্যাকটিং দারুণ। কিস্সুটি বুঝতে দেয়নি ওর মতলব। হয়তো ওর নাম ঠিকানা সবই ভুয়ো। আগের দ্বীপে ফকির বা চিয়াংই আমার ব্যাগ হাতড়েছিল। ম্যাপ খুঁজেছে। আমরা যে যে দ্বীপে গিয়েছি চিয়াং ফলো করে সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থেকেছে। আমাদের গতিবিধির রিপোর্ট পেয়েছে ফকির মারফত। হয়তো আমাদের

খাবারের ভাগও পেয়েছে। সুনন্দর গাছপাঁঠার কালিয়াও হয়তো চেখে দেখেছে চিয়াং। ওই জন্যেই ফকির মিকির ভক্ত সেজে পারতপক্ষে আমাদের চোখে আড়াল করত না। ভুতুড়ে বাস্তেন দ্বীপে অবধি থেকে গেছে। ফকিরই চিয়াংদের বাঁধন খুলে দিয়েছে, তারপর ওদের সঙ্গে পালিয়েছে দ্বীপ ছেড়ে।

আমি প্রশ্ন করি, চিয়াং এই দ্বীপে এল কখন? দিনের বেলা এলে নিশ্চয় আমাদের কারও চোখে পড়ত।

—এসেছে রাতে বা সন্ধের পর। মাঝিরা চলে যাবার পর। যারা গুপ্তধন খোঁজে তাদের ভূতের ভয় থাকলে চলে না। ফকির হয়তো আকাশে হাউই ছুঁড়ে সংকেত জানিয়েছে আসার জন্য। চিয়াং এখানে রাতে কোথাও লুকিয়ে থাকত আর দিনের বেলা আমাদের নজরে রাখত লুকিয়ে। আগের দ্বীপগুলোতেও তাই করেছে। হামিদ ওকে যা ভয় দেখিয়েছে, আর থাকতে সাহস পায়নি। পাছে ফকিরের কীর্তি জেনে ফেলি তাই সেও আর রিস্ক নেয়নি।

যাক্‌গে ভালোই হয়েছে। আপদ বিদায় হয়েছে। থাকলেই আমাদের বিপদ বাড়ত।

কিন্তু ওরা না থাকলেও আমাদের বিপদ যে কতদূর গড়িয়েছে তা টের পাওয়া যায় খানিক বাদে।

হামিদের এক মাঝি এসে উদ্বিগ্ন স্বরে জানাল যে তাদের নৌকোর দাঁড়গুলো নেই। একটাও নেই। চুরি গেছে। আর পালের দড়িগুলো অনেক জায়গায় কাটা। তবে পালের কাপড় কাটেনি। চিয়াংদের কীর্তি সন্দেহ নেই।

শুনে মাঝিদের মাথায় হাত। এই দ্বীপ ছেড়ে এখন যাবে কেমন করে? হামিদ গর্জে ওঠে, এবার ও ব্যাটাদের হাতে পেলে সত্যি খুন করব।

বোঝা গেল যে পাছে হামিদরা ওদের পিছু নিয়ে ধরে ফ্যালে সেই ভয়ে চিয়াং-হামিদের নৌকোটা অকেজো করে গেছে।

ব্যাপার শুনেই মামাবাবু দূরবিন নিয়ে উঠলেন একটা উঁচু জায়গায়। সমুদ্রের নানা দিকে দেখতে দেখতে বললেন, হুঁ একটা নৌকো দেখছি অনেক দূরে। তিনটে মাথা দেখছি নৌকোয়। সাঁতরে বোধহয় ধরা যাবে না আর।

আমি ফুট কাটি, সুনন্দ ঠিক পারবে। ও কলেজ লাইফে সুইমিং চ্যাম্পিয়ান ছিল। সুনন্দ ট্রাই কর।

সুনন্দ অগ্নিদৃষ্টি হেনে জবাব দেয়, সরি এটা সমুদ্র। সুইমিং-পুল নয়।

মামাবাবু দেখতে দেখতে বলেন, ওরা কিন্তু শিলালিপি দ্বীপ মানে যেখানে গুপ্তধন আছে মনে করছে সেদিকে যাচ্ছে না। হয়তো ভয় পেয়েছে, হামিদ মাঝিরা কোনোরকমে যদি ওই দ্বীপে হাজির হয় তাহলে রক্ষে নেই ওদের। তবে আমরা সবাই জাভায় ফিরে গেলে চিয়াং ঠিক ওই দ্বীপে ফের আসবে গুপ্তধন খুঁজতে।

মামাবাবু তার তাঁবুতে ঢুকে একটা ব্যাগ খুলেই চমকে বললেন, দ্যাখো কাণ্ড। আমার এই ব্যাগ কেউ হাতড়েছে। কাগজপত্র সরিয়েছে। নির্ঘাৎ চিয়াং বা ফকিরের কীর্তি। আমরা যখন খাচ্ছিলাম তোমাদের টেন্টে তখন নিশ্চয় সরিয়েছে। টাকাকড়ি কিন্তু খোয়া যায়নি।

ব্যাগের কাগজপত্রর হিসেব মেলাতে মেলাতে মামাবাবু বললেন, গ্যাছে একটা এই

বছরের বাংলা পাঁজি। শিলালিপি দ্বীপের একটা স্কেচ করেছিলাম সেটা। একটা মিনি সাইজের সংস্কৃত এবং পাশে বাংলায় লেখা শ্রীভাগবত গীতা। একটা জুলজির পেপার আধখানা লিখেছিলাম, তাতে কিছু হাতে আঁকা ছবি ছিল, সেটাও নেই। বুঝেচ ব্যাপার? ম্যাপ ভেবে নিয়ে গেছে। যদি কোনোটা কাজে লাগে? ইস্ পাঁজিটা রেঙ্গুনের এক বাঙালি ভদ্রলোকের মায়ের জন্যে এনেছিলাম। অনুরোধ করেছিলেন আনতে। ফেরার পথে দিতাম। গেল। দেশে ফিরে বাইপোস্ট পাঠাতে হবে আর একখানা পাঁজি কিনে।

মাঝিদের সঙ্গে হাতুড়ি-করাত-কাটারি জাতীয় কিছু যন্ত্রপাতি আছে। তাই দিয়ে মোটামুটি কাজ চালানোর মতো দাঁড় তারা তৈরি করে নিতে পারত। কিন্তু সেই সব হাতিয়ার তো রয়েছে শিলালিপি দ্বীপে। আমাদের কাছেও হাতুড়ি-পেরেক-কাটারি ইত্যাদি কিছু যন্ত্রপাতি আছে বটে। তবে সেগুলো ছোট মাপের। নিরুপায় মাঝিরা তাই দিয়েই লেগে গেল কাঠ জোগাড় করে দাঁড় বানাতে। অন্তত কাজ চালানোর মতো। কিছুটা পথ যাবার মতো। পালের কাটা দড়ি জোড়া দেবার কাজও চলে। কিন্তু দেরি হয়ে গেল। অন্ধকার নামার আগে তাদের কাজ শেষ হয় না। এমন আধাখেঁচড়া পাল ও দাঁড় নিয়ে রাতে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া রীতিমতো বিপজ্জনক। সুতরাং সে রাতটা মাঝিরা বাস্তেন দ্বীপে কাটাতে বাধ্য হল।

হামিদ আর তার দুই সঙ্গী মাঝির যে কী ভীষণ ভূতের ভয় টের পেলাম সেদিন। গোটা রাত তারা গুহার মধ্যে আগুন জেলে জেগে কাটাল। চিৎকার করে কী জানি বলছিল দেশি ভাষায়। মিকি জানাল, ওগুলো ভূত তাড়াবার মন্ত্র।

ভোরবেলা দেখি একটা পুরোনো দাঁড় পড়ে আছে বেলাভূমিতে। অর্থাৎ দাঁড়গুলো চিয়াং সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল। তারই একটা ভেসে ফিরে এসেছে। কিছুটা সুবিধা হল দাঁড়টা পেয়ে।

হেডমাঝি হামিদ চিন্তিতভাবে জানাল মামাবাবুকে, আপনাদের নিয়ে জাকার্তায় ফেরা সমস্যা হবে। মানে এই অবস্থায়। আপনাদের প্রচুর লটবহর। লোকও বাড়বে। এমনি জোড়াতালি দেওয়া দাঁড় আর পাল নিয়ে টাল সামলানো মুশকিল হবে। জোর বাতাস বইলে নৌকো ডুববে। আমরা নিজেরা যাহোক করে জাকার্তায় ফিরে যাব। সামলে নেব নৌকো। জলে ছিটকে পড়লেও উঠে পড়ব নৌকোয়। আপনারা পারবেন না।

—কী ভাবছ তুমি? মামাবাবু জানতে চান।

—আমি ভাবছি। হামিদ ইতস্তত করে।

মামাবাবু বলেন, একটা কাজ করতে পারো। তোমরা আপাতত চলে যাও জাকার্তায়। ওখানে গিয়ে পাল আর দাঁড় ঠিকঠাক করে আবার চলে আসবে এই দ্বীপে। আমরা এখানে থেকে যাব ততদিন। তাড়াতাড়ি যেতে-আসতে কতদিন লাগবে তোমাদের?

—অন্তত চার-পাঁচ দিন।

—ভেরিগুড। আমার এই দ্বীপে আরও ক'দিন থাকা দরকার। আমাদের নিয়ে ভেবো না। রসদ দরকার মতো সবই মজুত আছে। চার-পাঁচ দিন দিব্যি চলে যাবে।

হামিদ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। বুঝি এই প্রস্তাবটাই সে দিতে যাচ্ছিল।

—মিকির কী ইচ্ছে? মামাবাবুর প্রশ্ন।

মিকি বলল, আপনারা থাকলে আমিও থাকব।

—বেশ বেশ। মামাবাবু খুশি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হামিদ তার দুই সহচর নিয়ে নৌকো ভাসাল সাগরে।

হামিদরা চলে যেতে মামাবাবুর মেজাজ যেন ভারি শরিফ হয়ে গেল। আমাদের বললেন, চলো হে সবাই আজ সকালে একবার দ্বীপটা চক্কর দিয়ে আসি। দেখি ফন বাস্তেন কেমন বোটানিকাল গার্ডেন বানিয়েছিল।

সত্যি কতরকম অভিনব গাছগাছালি যে ছড়িয়ে আছে দ্বীপটায় যা এমন দ্বীপে একসঙ্গে থাকা অসম্ভব। যদি না কেউ বাইরে থেকে এনে লাগায়। কিছু উদ্ভিদের উল্লেখ আগে করেছি আরও কিছু উল্লেখযোগ্য গাছের কথা জানাচ্ছি। সব এখন মনে নেই। কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ হয়তো আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। দেখেছি যে স্থানীয় দেশি জংলা অতি সাধারণ গাছগাছড়া ঝোপঝাড়ের সঙ্গে মিশে আছে অনেক বিশিষ্ট গাছপালা। যেগুলি অবশ্যই বাস্তেনের আমদানি নানা দেশ থেকে।

গোটা দুই বাস্কেটবল কোর্টের আয়তন সমান মোটামুটি সমতল একখণ্ড জমিতে অনেকগুলো বড় গাছ মাথা তুলে রয়েছে এক জায়গায়। শন শন শব্দ হচ্ছে পাতার ফাঁক দিয়ে হাওয়া বইতে। মামাবাবু গাছগুলো দেখিয়ে বললেন, দেখেচ ঝাউগাছ। মিকি তোমরা কী বলো ঝাউকে?

—আরু। জবাব দেয় মিকি।

—আর ঝাউয়ের ফাঁকে ফাঁকে ছোট গাছগুলো কী?

আমি ও সুনন্দ মাথা চুলকোই। মিকি মিটিমিটি হাসে।

—মিকি তুমি চেনো? প্রশ্ন মামাবাবুর।

—হাঁ স্যার রবার গাছ।

ইস্ রবার গাছ দেখেছি আগে। মনে পড়ল না এখন। ভারি আপশোস হয় আমার।

দুদিন ধরে ঘুরে ঘুরে চোখে পড়েছে—ডুমুর গাছ, সয়াবিন লতা, সুপারি গাছ, তামাক পাতার গাছ, নয়নতারার ঝোপ। বাঁশ ঝাড়। জল জমা নিচু জায়গায় লম্বা লম্বা বেত গাছ। যত্রতত্র আনারস গাছ। দিব্যি বড় বড় আনারস ফলে রয়েছে। আম কাঁঠাল তেঁতুল গাছ দেখেছি প্রচুর। ছোট ছোট জুঁই ফুলের ঝাড়। সুগন্ধে ম ম করছে চারপাশ। সমুদ্র তীরে লম্বা লম্বা নারকেল গাছ অবশ্য এখানকার দ্বীপগুলিতে অতি পরিচিত দৃশ্য। প্রবল সমুদ্রের হাওয়ায় নারকেলের পাতাগুলি সদাই দুলছে।

বড়গাছের নিচে ছায়ায় একটা ফুল দেখে আমরা থ। মাটি থেকে একটু উঁচুতে গোড়ার ওপর পাঁচটি প্রকাণ্ড মোটামোটা পাপড়ি গোল হয়ে মাটির প্রায় সমান্তরালভাবে ছড়িয়ে আছে। পাপড়িগুলো মিলেছে যেখানে সেখানটা মস্ত গোল ডাব্বার মতো। সেটা বোঁটা বা কাণ্ড হবে। ফুলটার ব্যাস অন্তত আড়াই-তিনফুট। পাপড়িগুলো মেটে রঙের। বাকি অংশের রংও প্রায় তাই। বাপ্‌রে এ কী ফুল! শুধুই ফুল। উদ্ভিদের আর কোনো ডালপালা যে দেখছি না।

মামাবাবু খুঁটিয়ে দেখে বললেন, জানো এটা কী ফুল?

আমরা মাথা নাড়ি—না।

আমি বুঝেছি। ছবি দেখেছি এই ফুলের। র‍্যাফলসিয়া আরনল্‌দি। বিশ্বের বৃহত্তম ফুল। এর পাতা নেই। পাতার মতো দেখতে অংশগুলো আসলে শিকড় বা কাণ্ড। শুধুমাত্র সুমাত্রার জঙ্গলে এই ফুল পাওয়া যায়। মিকি তুমি এই ফুল দেখেছ আগে?

—না। মিকি ঘাড় নাড়ে। বলে, তবে শুনেছি এর কথা।

মামাবাবু বললেন, এই ফুলের গাছ আসলে প্যারাসাইট। অর্থাৎ পরজীবী। এর কাণ্ড থেকে সরু সুতোর মতন শিকড় বেরোয়। ওই শিকড়গুলি অন্য গাছের গায়ে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই গাছের রস নিজের খাদ্য হিসেবে টেনে নিয়ে এরা বাঁচে। সত্যি বাস্তেন আশ্চর্য উদ্ভিদপ্রেমী ছিল। এ ফুলের গাছ জোগাড় করা সহজ ব্যাপার নয়।

দ্বীপটায় নানান ফল-ফুলের গাছ জন্মানোয় প্রচুর পাখি এসে জুটেছে। প্রজাপতি উড়ছে রং-বেরঙের। কাঠবেড়ালিও চোখে পড়ল। ঝোপঝাড়ের ভিতর সড়সড় আওয়াজ জানান দেয় আরও কিছু ছোট জীবের চলাফেরা। তবে বিষাক্ত সাপের ভয়ে আমরা সতর্ক থাকি লাঠি বাগিয়ে। ঘন ঝোপের মধ্যে যাই না। কানে আসে পাখির কলকাকলি ও মধুর শিস।

মামাবাবু যেতে যেতে মন্তব্য করেন, বাস্তেন আইল্যান্ড ভুতুড়ে থাকাই মঙ্গল।

—কেন? আমি অবাক।

—কারণ তা নইলে মানুষ এখানে এসে বসতি করবে। ঘরবাড়ি বানাবে। গাছ কাটবে। এখানকার জীবজন্তুদের মারবে বা তাড়িয়ে ছাড়বে। বাস্তেনের গড়া সাধের দ্বীপ ধ্বংস করবে। দুঃখের কথা কী জানো, মানুষ ভাবে যে এই পৃথিবীটা বুঝি শুধু তাদেরই জন্যে। অন্য জীবজন্তুর অধিকার নেই এখানে। মানুষ নিজের স্বার্থে কত যে গাছপালা ধ্বংস করেছে, কত জীবজন্তুকে নিঃশেষ করে দিয়েছে পৃথিবী থেকে।

—মিকি তুমি ফিরে গিয়ে লোককে বলবে, বাস্তেন দ্বীপটায় সত্যি সত্যি ভুতুড়ে। দিনের বেলা তবু কাটানো যায় কিন্তু রাতে ভয়ংকর। বিকট সব আওয়াজ হয়। অশরীরী ছায়ামূর্তি ঘুর বেড়ায়। রাতে তাঁবুর বাইরে দুম্‌দাম্‌ ঢিল পাথর পড়ত। বাস্তেন সাহেবের প্রেতাত্মার ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যেত। শাসাত, দ্বীপ ছেড়ে চেলে যাও নইলে বিপদে পড়বে ভীষণ। মাঝে মাঝে রাতে ঝোড়ো দীর্ঘশ্বাসের মতো গা-হিম করা আওয়াজ করে হাওয়া বয় দ্বীপে। বৃষ্টিঝরা রাতে কান্নার আওয়াজ গুমরে গুমরে ওঠে। ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। হামিদরা তো বাস্তেন দ্বীপে কিছুতেই থাকেনি রাতে। নেহাতই ইন্ডিয়ান প্রফেসর ভূত ঠেকাবার মন্ত্র জানত তাই রক্ষে পেয়েছি এ-যাত্রা।

—হ্যাঁ আর একটা ভয় যোগ করতে পারো। বলবে, দ্বীপটায় কিং-কোবরা আছে। তুমি দেখেছ সচক্ষে। তাতেই অর্ধেক কাজ হাসিল হবে। কেউ এই দ্বীপে থাকতে চাইবে না। পা দিতেই চাইবে না অনেকে শঙ্খচূড়ের ভয়ে। নিশ্চিন্তে শ্রীবৃদ্ধি পাবে বাস্তেনের বোটানিকাল গার্ডেন। এই দ্বীপে কী কী গাছ আছে বলবে না কাউকে।

মিকি ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায় মামাবাবুর কথায়।

ফেরার পথে আমরা বাস্তেনের পোড়ো ভিটে হয়ে আসি। ছড়িয়ে থাকা ভাঙাচোরা জিনিসগুলো মামাবাবুরা ঘুরে ঘুরে দেখেন। কিছু জিনিস হাতে নিয়ে পরীক্ষা করেন।

সেদিন দুপুরে তিনি একা বেরিয়ে গেলেন ছাতা মাথায়। বুঝলাম কোনো কারণে আমাদের সঙ্গে নেবার ইচ্ছে নেই। আমি সুনন্দ ঘুম মারলাম দুপুরে। পরদিন সকালেও

মামাবাবু একা বেরুলেন। আমাদের ডাকলেন না। বললেন, আমি ঝরনাটার ধারে কাছে ঘুরব। তোমরা অন্য দিকে যাও।

আমি ও সুনন্দ শুধু দুজনে ঘুরলে জমে বেশি। বেড়ানো আড্ডা দুই হয়। মামাবাবু সঙ্গে থাকলে কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট থাকি। যদিও শিখতে পারি অনেক কিছু।

ঘুরতে ঘুরতে সুনন্দ আশঙ্কা প্রকাশ করে, হামিদরা ঠিকঠাক ফিরবে তো?

—জরুর ফিরবে। পাওনা বাকি। আমি নিশ্চিত।

—না। মানে যদি জাকার্তায় পৌঁছতে না পারে ঠিকমতো? নৌকোর যা অবস্থা ছিল।

—তা বটে। আমি সায় দিই।

—আমাদের খাবারের স্টকে আরও চার-পাঁচ দিন চলে যাবে। তারপর?

—কী আর হবে? ডুমুর সিদ্ধ, কাঁঠাল, এঁচোড় সিদ্ধ। সিদ্ধ মাছ। ডিম সিদ্ধ।—এই সব খেয়ে কাটাব। আমি নির্বিকার।

—আটকে গেলে এ দ্বীপ থেকে কবে যে উদ্ধার পাব? এ দিকে নৌকো জাহাজ চলে খুব কম। চিন্তিত সুনন্দ বিড়বিড় করে।

সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর মামাবাবু নিজের তাঁবুতে কাটালেন কী সব করে। আমি ও সুনন্দ সমুদ্রের বেলাভূমিতে আড্ডা মেরে কাটালাম বিকেলটা।

মিকি একটা বন্য ছাগল শিকার করেছিল। রাতের খাবার সুনন্দ রাঁধল মাংসের পোলাও। দারুণ। মামাবাবু অবধি চেটেপুটে খেলেন। খাবার পর মামাবাবু আমাকে ও সুনন্দকে বললেন, কাল সকালে টিফিনের পর আমার তাঁবুতে চলে এসো। দরকারি কথা আছে।

কী কথা? প্রচণ্ড কৌতূহল হয়। মামাবাবু যে শুধুমাত্র বাস্তেন দ্বীপে গাছপালার সংগ্রহ দেখতে এত দূরে, এত খরচ করে আসেননি তা আন্দাজ করেছিলাম প্রথম থেকে। অন্য কোনো গূঢ় কারণ। এবার কি তার হদিস পাব?

সে রাতে টানা বৃষ্টি হল ঘণ্টা দুই। শনশন হাওয়া বয়। উথালপাথাল ঢেউয়ের শব্দ। এমন রাতে এমনি নিরালা দ্বীপে কেমন গা ছমছম করে।

পরদিন সকালে আকাশ দিব্যি পরিষ্কার। আমি ও সুনন্দ মামাবাবুর তাঁবুতে গিয়ে জুটলাম। মিকি চা দিয়ে গেল। মামাবাবুর সামনে বসি। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে মামাবাবু ধীর কণ্ঠে শুরু করলেন বলতে, আচ্ছা এই যে আমি এত দূরে দ্বীপটায়, এত সময় কাটাচ্ছি কেন, তাই নিয়ে তোমাদের মনে কি কোনো প্রশ্ন জেগেছে?

আমি চুপ। সুনন্দ ফস্ করে বলে বসে, আমি বুঝেচি।

—কী বুঝেচ? মামাবাবু যেন রীতিমতো বিস্মিত।

—ফন বাস্তেন বোটানিকাল গার্ডেন তৈরির ভান করে আসলে আফিম তৈরি করত কিনা, তাই জানতে। কলকাতায় আপনার বাগানে পোস্ত গাছ দেখে মিকি যেই বলল এই দ্বীপে ওই গাছ সে দেখেছে অমনি তারপর থেকে আপনি খুব তো ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়লেন কেসটা নিয়ে।

—ঘোড়ার ডিম বুঝেচ। মামাবাবু তর্জন করেন, বাস্তেন আফিম বিক্রি করলে লোকে ঠিক জেনে ফেলত। তার সে বদনাম নেই। প্রমাণ পেয়েছি যে সে জাভায় এসে বিক্রি করত তার শিল্পকর্ম এবং খুব সম্ভবত আরও একটি জিনিস।

যাক্‌গে আমি তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার এখানে আসা ও দেখার উদ্দেশ্য ছিল অন্য। বাস্তেনের লাগানো পোস্ত গাছের ঝাড় কেন অত বড় বড়? কেনই বা এখানে ক্যালিফোর্নিয়ান পপির পাতা এত বড় বড় আর মোটা হয়েছে? যে কারণ আমি কলকাতায় বসে সন্দেহ করেছিলাম তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহই আমার এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য। বাস্তেনের বিচিত্র বোটানিকাল গার্ডেন দেখাটা বাড়তি লাভ।

আমরা উভয়েই বাক্যহারা।

একটু দম নিয়ে মামাবাবু বলেন, কলকাতায় আমি যে ইদানীং বাগান করা নিয়ে মেতেছি তা কিন্তু স্রেফ ফুল ফোটানো নয়। পাতাবাহার বা ক্যাকটাসের একজিবিশন করা নয়। পাড়ার ঘোষবাবুদের মতো চন্দ্রমল্লিকা গোলাপ ইত্যাদি ফুটিয়ে পাড়ার লোককে দেখিয়ে ক্রেডিট নেওয়া নয়। আমার বাগান করা শৌখিন উদ্যানচর্চা নয়। এর উদ্দেশ্য আলাদা।

আমরা উদগ্রীব হয়ে শুনি।

মামাবাবু বলেন, জিওবোটানি বিষয়টা কী জানো? মানে জিওলজি এবং বোটানির মিশ্রণ। বাংলায় বললে, ভূ-উদ্ভিদ বিদ্যা।

—নামটা শুনেছি। সুনন্দ ইতস্তত করে বলে।—উদ্ভিদ আর ভূ-বিদ্যা মানে জিওলজির সম্পর্ক নিয়ে রিসার্চ।

—কী ধরনের রিসার্চ? মামাবাবুর প্রশ্ন।

—তা ঠিক জানি না। সুনন্দ তোতলায়।—নামটা পড়েছি একটা জার্নালে। আর্টিকেলটা পড়ার সময় পাইনি।

—পড়া উচিত ছিল। নতুন বিষয় দেখলেই পড়বে। যাক্‌গে, বুঝছি তোমরা কিস্‌সু জানো না এ বিষয়ে। দু-চার কথায় সহজ করে ব্যাখ্যা করি ব্যাপারটা। এই নিয়ে গবেষণার কারণেই আমার এখানে আসা।

—তোমরা হয়তো জানো যে পরজীবী বাদে অন্য গাছগাছড়া—বড় গাছ, ছোট গাছ, ঘাস ঝোপঝাড় সবাই মাটিতে শিকড় ঢুকিয়ে তার বাঁচার প্রয়োজনে জমি থেকে খাদ্য আর জল টেনে নেয়। মাটি বা জমিতে অনেক কিছু মিশে থাকে। ধাতু বা খনিজপদার্থও থাকে নানারকম। কোনোটা বেশি,কোনোটা কম। গাছের শিকড় মাটি থেকে সব কিছু নেয় তার দেহে। তার কাণ্ডে ও শাখা-প্রশাখায়। এই ভাবে নানা ধাতু ঢোকে উদ্ভিদ দেহে। এর ফলাফল হয় নানারকম। হয়তো কোনো ধাতু কোনো উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী। গাছের খাদ্যে সেই ধাতু বেশি থাকলে ওই উদ্ভিদের বাড় বেশি হয়, ফল ফুল বেশি হয়। আবার একই উদ্ভিদের পক্ষে অন্য। কোনো ধাতু হয়তো ক্ষতিকর। সেই ধাতু খাদ্যের সঙ্গে বেশি পরিমাণে ওই উদ্ভিদের শরীরে ঢুকলে গাছের বাড় কম হয়। পাতা বা ফুলও কম হয়। পাতা ও ফুলের রং ও আকার বদলে যায়। বদলে যায় উদ্ভিদটির গড়ন। কখনো কখনো জমিতে ওই খনিজ দ্রব্য বেশি পরিমাণে থাকলে সেখানে ওই গাছের বীজ থেকে অঙ্কুরই জন্মাতে চায় না। আবার একই ধাতু অন্য এক উদ্ভিদ দেহে কোনো প্রভাবই ফেলতে পারে না। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি—

বেসিয়াম অবোভেটাম-এর একটি প্রজাতির সাহায্যে আফ্রিকা মহাদেশে জিম্বাবোয়ে রাজ্যে খনিজ তামা আবিষ্কার করা গেছে। এ একরকম জংলা ছোট গাছ। সূর্যমুখী ধরনের

ফুল পাতা। এক গ্রাম মাটিতে অন্তত পঁচিশ মিলিগ্রাম তামা না থাকলে সেই মাটিতে এই গাছের বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্‌গম হয় না। তাই এই প্রজাতির গাছ বা ঝোপ যেখানে বেশি ঘন দেখা যায়, জিওলজিস্টরা সেখানকার মাটি খুঁড়ে স্যাম্পল নিয়ে, সেখানকার পাথর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন তামা আছে কি না এবং থাকলে পরিমাণে কেমন? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে তামা মিলেছে।

আবার বেসিয়াম অবোভেটামের আর এক প্রজাতি আফ্রিকায় কঙ্গো রাজ্যে এবং কাছাকাছি অঞ্চলের জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে তামা থাকার লক্ষণ জানান দেয়।

—হিউমেনিয়া কাতাঙ্গানিস এবং হিউমেনিয়া রবার্টি প্রজাতির উদ্ভিদ আফ্রিকার জাইরে রাজ্যে তামা আবিষ্কারের এক প্রধান সূত্র বলা যায়। এরা স্থানীয় জংলা ছোট গাছ। জাইরেতে বহু আগে অনেক তামার খনি ছিল। কিন্তু নানা কারণে খনিগুলিতে তামা তোলা বন্ধ হয়ে যায়। খনিগুলি পরিত্যক্ত হয়। খনি ঘিরে ঘরবাড়ি বসতির চিহ্ন লোপ পায় কালে কালে। কিন্তু ওইসব খনি এলাকার জমিতে প্রচুর পরিমাণে তামা থাকার ফলে পরিত্যক্ত বুজে যাওয়া খনিগুলির ওপর এবং কাছাকাছি জায়গায় ওই দুরকম উদ্ভিদের ঘন ঝোপ গজিয়ে ওঠে। পরে এখন ভূ-উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা জাইরেতে ওই দুরকম গাছের ঘন ঝোপ দেখলেই মাটি খুঁড়ে দেখেছেন সেখানে খনিজ তামা আছে কি না? পেয়েও গেছেন এইভাবে কয়েকটি পরিত্যক্ত তামাসমৃদ্ধ খনির হদিস। যে খনিগুলিতে এখনো যথেষ্ট পরিমাণে তামার আকর রয়েছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে একটু থেমে মামাবাবু বললেন, আমি গাছপালা উদ্ভিদগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম করছি। এদের স্থানীয় নাম জানি না। কিছু জেনেছিলাম, ভুলে গেছি। শুধু ভারতের কিছু মিনারেল ইন্ডিকেটর প্ল্যান্টের দেশি নাম মনে আছে। তোমাদের আগ্রহ থাকলে দেশি বিদেশি মিনারেল-ইন্ডিকেটর প্ল্যান্টের স্থানীয় নাম খুঁজে পেতে জেনে নিও।

—হ্যাঁ, আরও কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন আরমেরিয়া ভাল্‌গারিস। প্রধানত শীতের দেশের গাছ। ছোট ঝোপ। জংলি বলা যায়। জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ খনিজ তামা থাকলে এই উদ্ভিদের বাড় বেশি হয়, প্রচুর জন্মায় ঘন হয়ে। ওয়েলস-এ এই উদ্ভিদের বাড় ও ঘন ঝোপ লক্ষ করে বিজ্ঞানীরা কয়েক জায়গায় খনিজ তামাসমৃদ্ধ জলাভূমি আবিষ্কার করেছেন। মজার কথা কী জানো। হাইড্রানাজয়া ম্যাক্রোফাইল্লা নামে এক উদ্ভিদ-প্রজাতি যেখানে জন্মায় সেই জমিতে প্রচুর পরিমাণে খনিজ অ্যালুমিনিয়াম থাকলে এই গাছের ফুলের রং হয় নীলচে। কিন্তু জমিতে অ্যালুমিনিয়াম না থাকলে কিংবা খুব সামান্য পরিমাণে থাকলে এর ফুলের রং হয় গোলাপি। সুতরাং ফুলের রং দেখে ধরা যায়, ওই গাছ যেখানে জন্মেছে সেই জমিতে খনিজ অ্যালুমিনিয়াম বেশি আছে কি না?

মামাবাবু ঝপ্‌ করে চুপ মেরে গেলেন। তারপর বললেন, নাঃ বড্ড বকছি। তোমাদের বোর করছি।

—না না বলুন। দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে। আমি ও সুনন্দ সরবে জানাই।

মামাবাবু খুশি মুখে বললেন, বেশ, তবে আরও কয়েকটা উদাহরণ দিই। এই ধরো যে মাটিতে বেশি পরিমাণে জিংক অর্থাৎ দস্তা আছে সেখানে ভায়োলেট ফুলের গাছ খুব তেজি

হয়, প্রচুর হয়। জমিতে বেশি পরিমাণে দস্তা থাকলে ভায়োলেট ফুলের গাছের পাতা সবুজের বদলে হলদে হয়ে যায়। ইউরোপে বেলজিয়াম এবং আরও কয়েকটি দেশে ভায়োলেট গাছের পাতার রং লক্ষ করে সেখানে দস্তার খনি আবিষ্কার হয়েছে।

—জিপ্‌সাম-এরও ইন্ডিকেটর প্ল্যান্ট আছে। রাজস্থানে দেখা গেছে ক্যালোট্রোপিস প্রোসেরা, আরভা পারসিকা এবং আরভা সিউডো-টোমেন্টোসা—এই তিন প্রজাতির গাছ এক জায়গায় প্রচুর জন্মালে সেখানকার মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জিপসাম আছে ধরা যায়। এই গাছগুলি জংলা টাইপের। সরু চার-পাঁচ ফুট লম্বা, গাঁটে গাঁটে দুটি একটি পাতা থাকে।

—জানো কি, তামিলনাড়ুর সমুদ্রতটের বালিতে কোথাও কোথাও তেজস্ক্রিয় ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রধানত সেরিয়াম এবং থোরিয়াম। ওই বালুময় জমিতে ক্যাথারেন্‌থাস রোসেয়াস, যার আর এক নাম মাগাস্কার পেরিউইংকিল জন্মালে গাছের গঠনে বিশেষ কিছু বিকৃতি লক্ষ করা গেছে। বৈজ্ঞানিক নামগুলো শুনে ঘাবড়িও না হে, এই গাছটির ফুলকে আমরা সাদা বাংলায় বলি নয়নতারা।

—জমিতে বা জমির নিচে শিলাস্তরে বেশি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় ধাতু থাকলে ওই জমিতে জন্মানো অনেক উদ্ভিদের গড়ন বিকৃত হয়। উদ্ভিদের বাড় নষ্ট হয়, ফুল পাতার স্বাভাবিক রং বদলে যায়। এই যেমন কানাডায় গ্রেট বিয়ার হ্রদের কাছে জলাভূমিতে মাটির নিচে ইউরেনিয়াম আবিষ্কার হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। ওই জলাভূমিতে পানিফলের মতো একরকম ফল জন্মায়। যে গাছের বৈজ্ঞানিক নাম এপিলোবিয়াম অগাস্টিফোলিয়াম। জলার মাটির তলায় প্রচুর ইউরেনিয়াম থাকার ফলে পানিফল জাতীয় ওই জলার গাছের ফুলের রং সবজের বদলে হয় সাদাটে।

মাটিতে বা মাটির তলায় শিলাস্তরে বেশি ইউরেনিয়াম থাকলে সেই জমিতে জন্মানো ছোট ঝোপঝাড়ের বাড় খুব কম হয়। এই সব জংলা ঝোপ সাধারণত মাটি থেকে খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ সেলেনিয়াম শোষণ করে। ফলে তাদের ডালপালা পাতা বিষাক্ত হয়ে যায়। গোরু ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশু ওই সব গাছের ডাল-পাতা খেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। যেহেতু সেলেনিয়াম ইউরেনিয়ামের সঙ্গে প্রায়ই এক জায়গায় মিশে থাকে, এমনি বিষাক্ত ঝোপঝাড় নজরে এলে ভূ-উদ্ভিদ-বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সেখানের মাটিতে বা মাটির তলায় সেলেনিয়াম এবং তার সঙ্গে ইউরেনিয়াম থাকতে পারে বলে আন্দাজ করে। মাটি খুঁড়ে খোঁজে। উত্তর আমেরিকায় এই লক্ষণ বিচার করে কয়েকটা ইউরেনিয়ামের খনি আবিষ্কারও হয়েছে।

—কখনো কখনো দেখা গেছে, ঘন জঙ্গলে বা প্রচুর গাছপালার মধ্যে হঠাৎ একখণ্ড অনুর্বর প্রায় ন্যাড়া উদ্ভিদহীন ভূখণ্ড। এই দৃশ্য দেখলে ভূ-উদ্ভিদ বিজ্ঞানী তখুনি সেখানের জমিতে এবং জমির নিচে যথেষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকার সম্ভাবনা আশা করেন। ইউ. এস. এ. তে এই লক্ষণ বিচার করে আবিষ্কার হয়েছে কয়েকটি থোরিয়ামের আকর। আরও কিছু কিছু ইন্টারেস্টিং কেসের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু গলাটা যে ধরে গেছে বকে বকে। বাবা সুনন্দ এক রাউন্ড চা খাওয়াও তো। মিকিকে ডাকার দরকার নেই। আমার তাঁবুতে স্টোভ, চা পাতা, চিনি কাপ—সব মজুদ আছে।

গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে মামাবাবু ফের শুরু করেন—জানো, কোথাও মাটিতে বা মাটির নিচে শিলাস্তরে যথেষ্ট পরিমাণ সোনা রূপা এমনকি হিরের ভাণ্ডার আছে কি না সেখানে জন্মানো কিছু গাছগাছড়ার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দেখে জিওবটানিস্টরা এখন আন্দাজ করতে পারেন মোটামুটি। যেমন ভেলোজিয়া ক্যানডিডা নামে এক জাতের উদ্ভিদ ব্রাজিলে হিরের ভাণ্ডারের সন্ধান দিয়েছে।

—বিরাট দেশ, যার অনেকটাই অজানা কিংবা মাহাসাগরে অজানা দ্বীপ যেমন এই বাস্তেন আইল্যান্ড, এইসব জায়গায় কিছু উদ্ভিদের রূপ ও লক্ষণ বিচার করে হঠাৎ কোনো খনিজ ভাণ্ডারের ক্লু পাওয়া যায়। অন্য উপায়ে প্রসপেক্টিং-এর চেয়ে জিওবোটানি পদ্ধতির খরচ খুবই কম। কোন কোন উদ্ভিদের কী কী লক্ষণ সেখানে কোন কোন ধাতুর সম্ভাবনা প্রকাশ করছে তা জানা থাকলে সায়ান্টিস্টের মনে চট করে সন্দেহ জাগাবে। পরে অবশ্য যথারীতি মেনে খোঁজ ও খোঁড়াখুঁড়ি চালাতে হবে ডিপোজিট মানে আকরের পরিমাণ বুঝতে জানতে। তবে বৈজ্ঞানিকের মনে এমন সম্ভাবনা বা সন্দেহের উদয় হওয়াটাই একটা মস্ত লাভ।

—শুধু খনিজ ধাতু আবিষ্কার নয় জলহীন, প্রায় উদ্ভিদবিহীন রুক্ষ প্রান্তরে অ্যাকাসিয়া গ্ল্যান্ডুলিফেরা নামে বাবলা জাতীয় গাছ হঠাৎ হঠাৎ কোথাও থাকলে ওই বিশেষ গাছ দেখে বোঝা যায় যে ওই গাছের কাছে মাটির তলায় জল আছে। সেখানে কুয়ো খুঁড়ে বা টিউবয়েল বসিয়ে জল পেতে পারো।

আফ্রিকা মহাদেশের আদিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকে জলহীন শুষ্ক প্রান্তরে কোথাও এই বাবলা গাছ অ্যাকাসিয়া গ্ল্যান্ডুলিফেরা জন্মেছে দেখলে বোঝে যে সেখানে মাটির নিচে জলের ভাণ্ডার আছে। সুনন্দ বলে ওঠে, কিন্তু আপনি মিকির মুখের পোস্ত গাছের বর্ণনা শুনে এখানে ছুটে এলেন কেন, তা তো বললেন না?

—বলছি এবার। আগে ভূমিকাটা করে নিলাম। প্যাপাভেরাসিয়া সংক্ষেপে প্যাপাভের ফ্যামিলির কিছু উদ্ভিদ জমি থেকে তাদের খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ তামা শোষণ করলে তাদের বৃদ্ধি বেশি হয়। প্যাপাভের হচ্ছে পপি জাতীয় গাছ। পোস্ত আর ক্যালিফোর্নিয়ান পপি প্যাপাভের গোত্রের উদ্ভিদ। মিকির মুখে যেই শুনলাম যে বাস্তেন দ্বীপে পোস্ত গাছের ঝাড় মস্ত বড়, ক্যালিফোর্নিয়ান পপি গাছগুলো আমার বাগানের চেয়ে অনেক বড় আর পুষ্ট, তখুনি সন্দেহ হয় যে ওই দ্বীপের মাটিতে বেশি পরিমাণ তামা থাকতে পারে। আমার বাগানের পপি গাছগুলোয় অন্য সার এবং অন্য খনিজ ধাতু দিয়েছিলাম কিন্তু তামা দিয়ে কখনো এক্সপেরিমেন্ট করিনি। তবে এটা যে ঘটে তা জানতাম। আর একটা কিন্তু ছিল। বাস্তেন দ্বীপের মাটিতে বা জলে কি ফসফেট বেশি? ফসফেট বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলেও পপি গাছের বাড় বেশি হতে পারে। তাই নিজের চোখে ব্যাপারটা যাচাই করতে এতদূর এসেছি এবং এখনকার মাটিতে আর পাথরে খনিজ তামা যে প্রচুর পরিমাণে আছে তার প্রমাণও পেয়েছি।

—প্রমাণ কীভাবে পেলে? চোখে দেখে বুঝলে? সুনন্দর কণ্ঠে দ্বিধা।

—দূর বোকা, মামাবাবু হাসেন, চোখে দেখে কি তা বোঝা যায়? রীতিমতো কেমিকাল টেস্ট করে বলছি। রাসায়নিক পরীক্ষা। কালরিমেট্রিক টেস্ট।

—সেটা কী? আমি প্রশ্ন করি।

—খুব সোজা ব্যাপার। সামান্য জিনিসপত্র লাগে। আমার ওই বাক্সটাতেই সব আছে।

—কী রকম ভাবে করেন টেস্ট?

—অলরাইট। দু-চার কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরো, কোনো জমিতে বিশেষ কোনো খনিজ ধাতু আছে কি না জানতে প্রথমে সেখানকার অল্প একটু মাটি নাও অথবা সেখান থেকে ছোট পাথরের টুকরো নিয়ে মিহি গুঁড়ো করো। এরপর ওই মাটি বা গুঁড়ো পাথর টেস্ট-টিউবে বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো তরলে ফেলো। এবার টেস্ট-টিউবটা ঝাঁকাও। টেস্ট-টিউবের তরলের কী রং হয় লক্ষ করো। ওই রং দেখেই বুঝতে পারবে যে ওখানকার মাটিতে বা পাথরে যে ধাতু আছে ভাবছ তা সত্যি সত্যি আছে কি না? যদি থাকে, তরলের রং-এর ঘনত্ব বুঝিয়ে দেবে ওই ধাতু কী পরিমাণে আছে। বেশি না কম?

—ব্লো-পাইপ টেস্ট করেও অবশ্য এটা বোঝা যায়।

—সেটা কী?

—অতি সোজা পদ্ধতি। টেস্ট-টিউবে স্যাম্পল নিয়ে তাতে বিশেষ কেমিকাল মিশিয়ে বার্নারের ওপরে ধরে ব্লো-পাইপ দিয়ে ফু দিলে ওই মিশ্র স্যাম্পলের যে রং হয় তাই দেখে। রং দেখে বুঝতে পারা যায় স্যাম্পেলে প্রধানত কী ধাতু আছে এবং কেমন পরিমাণে। যাক্‌গে আর সময় নষ্ট করব না আপাতত। তোমাদের আগ্রহ থাকলে দেশে ফিরে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখো।

সুনন্দ খুশি হয়ে বলে, যাক কপার তাহলে পেয়েছ। আমাদের এখানে আসা সার্থক হয়েছে।

—পেয়েছি বইকি। মামাবাবু সায় দেন দীপ্ত কণ্ঠে, শুধু কি তামা আরও দামি ধাতুও—বলতে বলতে তিনি যেন কথা গিলে ফেলেন। বুঝলাম যে কিছু চেপে গেলেন।

সুনন্দ বলে, ইন্দোনেশিয়ায় কি আর কোথাও তামা পাওয়া গেছে?

—গেছে বইকি। বোর্নিও সেলেবিস টাইমর-এর কয়েক জায়গায় কম বেশি তামার আকর আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই এখানে পাওয়াটা মেটেই দৈবাৎ ব্যাপার নয়। জানো, বহু কোটি বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়া অবধি ডাঙার যোগাযোগ ছিল। টানা ভূখণ্ড। পরে ভূমিকম্প ইত্যাদি ভূ-প্রকৃতির আলোড়নে কিছু জায়গা জলের নিচে তলিয়ে যায়। সৃষ্টি হয় এখনকার দ্বীপময় ইন্দোনেশিয়া। ফের ভূকম্পে কিছু ডাঙা জলের ওপর মাথা তোলে। প্রচুর ছোট ছোট দ্বীপ সৃষ্টি হয়। তাই এখানে কাছাকাছি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি এবং শিলাস্তরের গঠনে খুব মিল আছে। হয়তো কখনো জাভা, সুমাত্রা, নিউগিনিতেও তামা আবিষ্কার হবে। নাঃ অনেক বকেছি, আর নয়।

মামাবাবু ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করলেন। আমি ও সুনন্দ তাঁর তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসি অগত্যা।

সাত

আমাদের ভাগ্য ভালো। হামিদ মাঝি নৌকো সমেত ফিরতে দেরি করেনি।

এবার ফেরার পালা। আমরা গোছগাছ শুরু করি। হামিদ আর তার দুই মাঝি অবশ্যই সেই রাতে বাস্তেন দ্বীপে কাটাল না। রাত কাটাতে চলে গেল তাদের পুরোনো আস্তানায় শিলালিপি দ্বীপে।

সে রাতে বৃষ্টি হল খুব। অঝোর ধারায় ঘণ্টা তিনেক।

পরদিন সকালে অবশ্য আকাশ দিব্যি মেঘমুক্ত। হামিদরা বাস্তেন দ্বীপে ফিরে এল সকাল সকাল। খানিক বাদেই আমরা রওনা হলাম নৌকোয়। জাকার্তায় কয়েক দিন কাটিয়ে ফিরে যাব দেশে।

আমাদের ফেরার আগে থেকেই মিকি সুনন্দকে পাকড়েছিল—কয়েকটা মাছের রান্না আর সেই মাংসের পোলাও আপনি যেমন রেঁধেছিলেন ফর্মুলাটা আমায় ভালো করে শিখিয়ে দিন। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে শেখাব রান্নাগুলো। ওঃ দারুণ খেতে।

মুশকিল। সুনন্দর রান্না খেয়ে মিকির স্বাদবোধ পালটে গেছে। ঘরের রান্না আর বুঝি পছন্দ হচ্ছে না।

সুনন্দর অবশ্য আপত্তি নেই শেখাতে। তার মশলার স্টক এখনো কিছু বাকি। নৌকোয় যেতে যেতে সে মিকিকে হাতে কলমে রান্না শেখায়।

জাকার্তা হোটেলে বসে কথা বলছি আমি, সুনন্দ, মামাবাবু। মামাবাবু হঠাৎ বললেন, সেদিন ভাঙিনি ব্যাপারটা, আজ বলছি। জানো, বাস্তেন আইল্যান্ডে আমি সোনার খোঁজ পেয়েছি।

—অ্যাঁ সোনা! আমি ও সুনন্দ চমকাই। কোথায়?

—ঠিক কোথায় আছে ডিপোজিট বলতে পারব না, তবে নির্ঘাৎ আছে কোথাও ঝরনার কাছাকাছি মাটির তলায়। ঝরনার দুধারে মাটিতে বালিতে আর ঝরনাটা যেখানে সমুদ্রতটে পড়েছে সেখানের বালিতে সোনা পেয়েছি।

—সোনা চিনলেন কীভাবে? সুনন্দর প্রশ্নে যেন অবিশ্বাস।

—বালি মাটি প্যানিং করে। ঝরনার ধারে ধারে ছড়ানো নুড়ি পাথরের গুঁড়ো প্যানিং করে। সোনা খুঁজতে প্যানিং পদ্ধতিটা জানো?

—না। ঠিক জানি না। তবে নাম শুনেছি। আমরা উভয়ে আমতা আমতা করি।

—সোজা ব্যাপার। একটা বড় কানা উঁচু সস্‌প্যানের মতো গোল পাত্র চাই। যার নিচটা সমান আর ওপরের ফাঁক প্যানের তলার চেয়ে বড়। ময়লা মেশানো বালিমাটি বা পাথরের গুঁড়ো প্যানে ফেলে অনেকখানি জল মেশাও। আস্তে আস্তে ঝাঁকাও, নাড়ো, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। স্যাম্পল-এ মেশা ভারীধাতু যেমন, সোনা লোহা নিচে প্যানের তলায় থিতিয়ে জড়ো হবে। বাজে ময়লা জলে গুলে যাবে বা ভাসবে। আস্তে আস্তে ওপরের ঘোলা ময়লা জল ফেলে দাও। নিচে জমা সোনা থাকলে তার হলুদ রং দিব্যি চোখে পড়বে। সেই অতি ক্ষুদ্র কণার মতো সোনার গুঁড়ো বা টুকরো আরও ছেঁকে ছেঁকে বের করতে হয়।

ডিটেলস-এ যাচ্ছি না এখন। জেনো, এই কায়দাতেই সুবর্ণরেখা নদীর দুধারের বালি ছেঁকে স্থানীয় লোক সোনার গুঁড়ো বা টুকরো জোগাড় করে।

—এরপরেও আছে অ্যামালগ্যামেশন পদ্ধতি। প্যানের তলায় থিতিয়ে-পড়া সোনার রেণু অন্য ধাতু থেকে আলাদা করতে। সোনার এমন কিছু গুণ আছে যাতে মাটি, বালি বা পাথরের গুঁড়ো থেকে সোনাকে আলাদা করা যায় সহজেই। মানে ক্যাম্পে বসে আমার সামান্য সরঞ্জামের সাহায্যেই। যুগে যুগে স্বর্ণসন্ধানীরা পৃথিবীর নানান জায়গায় নদী বা ঝরনার তীরে এমনি সহজ উপায়েই সোনা খুঁজেছে। আজও খোঁজে।

—সোনার আকরের ওপর দিয়ে ঝরনা বা নদীর জল আসার সময় অতি ক্ষুদ্র সোনার টুকরো বা কণা বয়ে নিয়ে আসে আরও সব খনিজ পদার্থ ধুলো ময়লার সঙ্গে। সেই সোনা ঝরনা বা নদীর গতিপথের দু পাশে মাটিতে বালিতে মেশে। এছাড়া জলের স্রোত বয়ে আনে সোনা মেশানো পাথরের নুড়ি।

—তুমি বুঝলে কীভাবে ঝরনার ধারে সোনা আছে? আগে জানতে? প্রশ্ন করে সুনন্দ।

—মোটেই নয়। সন্দেহটা জাগে বাস্তেনের পোড়ো ভিটে দেখতে গিয়ে। সেখানে কয়েকটা ভাঙা মরচেধরা প্যান দেখি। সোনা খুঁজতে প্রস্‌পেকটররা ঠিক এমনি প্যান ব্যবহার করে। তাতেই হয় সন্দেহ। কী কাজে লাগত প্যানগুলো? যে পাত্রগুলো আমরা সঙ্গে এনেছি তাই থেকে একটা কানা উঁচু পাত্র জোগাড় করি গোল্ড প্যানিং-এর কাজ চালাতে।

—তামা সোনা সব রয়েছে একই জায়গায়? সুনন্দ খুঁতখুঁত করে।

—থাকতেই পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়, বলেন মামাবাবু, ইন্দোনেশিয়ার অনেক জায়গাতেই তামা সোনা একই সঙ্গে পাওয়া গেছে।

এমনকি কোথাও কোথাও এদের সঙ্গে রুপোও মিলেছে। সব মিলেমিশে আছে। তবে সব ধাতুই বেশি পরিমাণে নাও থাকতে পারে।

—সোনা বের করে বাস্তেন করত কী? নিশ্চয় বিক্রি করত? আমি মুখ খুলি।

মামাবাবু বলেন, আমারও তাই সন্দেহ। জাকার্তায় তো যেত মাঝে মাঝেই। শিল্পকর্ম বিক্রি এবং তার সঙ্গে গোপনে সোনা বিক্রি দুটোই হয়তো তার রোজগারের উপায় ছিল। তবে মনে হয় ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট পো সোনার ব্যাপারটা জানত না। তাহলে সে কি আর ওই দ্বীপ ছেড়ে চলে যায় বাস্তেন মারা যাবার পর?

সুনন্দ বলল, সোনার খোঁজটা মিকিকে জানাবে না? বেচারা একদিন দুঃখ করছিল, বয়স হয়েছে, ঘর-সংসার ফেলে বছরে সাত-আট মাস সমুদ্রে ঘুরতে আর ভালো লাগে না। বাস্তেন দ্বীপের সোনা পেলে ওর খানিক সুবিধা হয়।

—জানি মিকির এই সমস্যা। কিন্তু সরি ওকে এই সোনার খোঁজ দেওয়া যাবে না।

—কেন?

—কারণ তাহলে খবরটা ঠিক ফাঁস হয়ে যাবে। তখন গাদা গাদা লোক ওখানে ছুটবে সোনার লোভে। মিকির ভাগ্যে আর কতটুকু সোনা জুটবে। মাঝ থেকে বাস্তেন দ্বীপ ছারখার হয়ে যাবে লোভী মানুষের ভিড়ে। পুরো দ্বীপটা ইজারা নিয়ে নিজের দখলে রাখা মিকির সাধ্যি নয়।

আমাদের দুঃখী মুখ দেখে মামাবাবু সান্ত্বনা দেন, মিকি আমাদের জন্যে অনেক করেছে সত্যি। ওকে আমি পুরস্কার হিসেবে মোটা টাকা দিয়ে যাব। তাই দিয়ে করুক ব্যবসা। জমি জায়গাও কিনতে পারে। তবে আমার মনে হয় ইচ্ছে থাকলেও ও বেশি দিন ঘরে টিকতে পারবে না।

—কেন? কেন? প্রশ্ন আমাদের।

—এটা জাহাজি নাবিকদের স্বভাব। জলে ঘুরে ঘুরে এমন অভ্যেস হয়ে যায় যে বেশি দিন স্থির ভাবে ডাঙায় কাটালে তাদের হাঁপ ধরে। এমন কেস আমি অনেক শুনেছি। রিটায়ার না করা পর্যন্ত অর্থাৎ ক্ষমতায় যদ্দিন কুলোয় তারা জলে জলে ঘোরে। মিকি দেখুক চেষ্টা করে—

সেই রাতেই আমাদের প্লেন ছাড়বে। ফিরব কলকাতায়। বাস্তেন দ্বীপে অভিযান সাঙ্গ হল। রোমাঞ্চকর স্মৃতি নিয়ে ফিরছি। এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

মিকিকে ছেড়ে যেতে আমাদের ভারি কষ্ট হচ্ছিল। মিকিরও তাই। মিকি আমাদের চমৎকার নকশাওলা বাতিকের কাজ করা লম্বা এক খণ্ড কাপড় উপহার দিল। ঘরে সাজিয়ে রাখব কলকাতায়।

মিকি বলল, ক্যালকাটা পোর্টে গেলে নিশ্চয় যাব তোমাদের বাড়ি। ব্রাদার সুনন্দর হাতের রান্না খাব। রাইসে মিত মিশিয়ে কি জানি নাম রেঁধেছিলে? হাঁ পোলাও। ওঃ দারুণ খেতে। ওইটে খাওয়াতে হবে। যাবার আগে মামাবাবু ফের সাবধান করে দিলেন মিকিকে—মনে রেখো, অন্য লোককে বলবে বাস্তেন দ্বীপ সাংঘাতিক ভুতুড়ে। খুব বেঁচে গেছ প্রাণে। ইন্ডিয়ান মন্ত্র না খাটলে ঠিক মরতে। হ্যাঁ, এখানকার আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে শিলালিপিটার খবর জানিয়েছি। ওরা বলেছে, কয়েক দিনের মধ্যেই শিলালিপিটা নিয়ে আসবে। পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করবে। খ্যাপাটে চিয়াং যদি ওই দ্বীপে গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়—খুঁজুক। যদি চিয়াং তোমায় পাকড়াও করে বলবে যে ওই ইন্ডিয়ানগুলো ফিরে গেছে দেশে। আমায় গুপ্তধনের হদিস কিছু দেয়নি। কত ধরাধরি করলাম বলল না কিছুতেই। লোকগুলো অতি বাজে স্বার্থপর। তবে ওরাও গুপ্তধন পায়নি এযাত্রা। তাহলে আমি ঠিক টের পেতাম।

শুনে মিকি ঘাড় নেড়ে একগাল হেসে বলল—অলরাইত।

গোসাইপুর
সরগরম
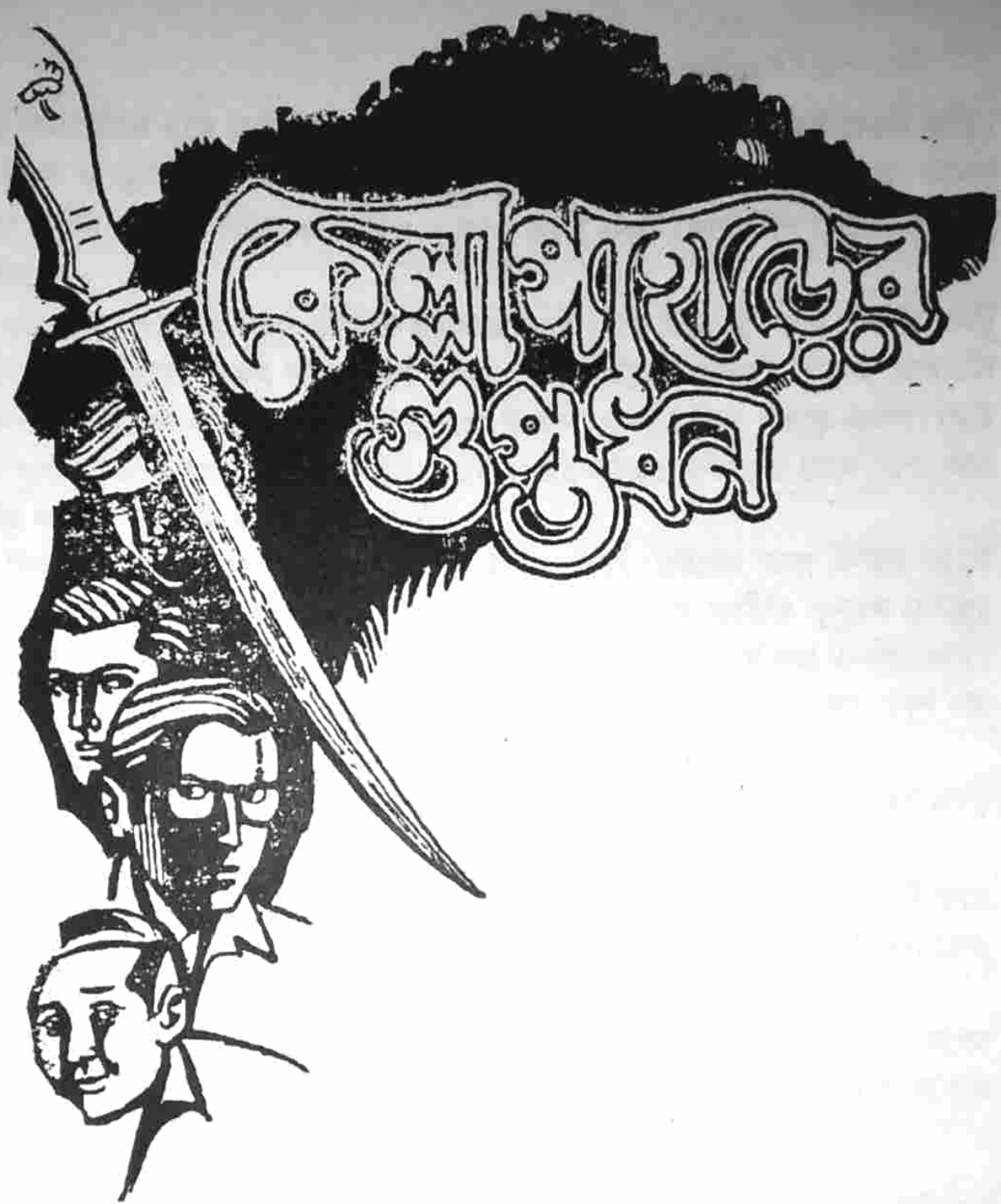
এক

চৈত্র মাস। রতন এসে প্রস্তাব দিল, 'চল, কেওঞ্ঝরগড় বেড়িয়ে আসি। ছোটকাকার বাড়ি।'

রতন ও আমি ছেলেবেলার বন্ধু। ও ভূতত্ত্বের ছাত্র, আপাতত গবেষণা করছে। আমার বিষয় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস। আমিও গবেষণা করছি একটি ফেলোশিপ পেয়ে—প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে।

কেওঞ্ঝর উড়িষ্যার শহর এইটুকুই জানতাম, তার বেশি কিচ্ছু না। তাই প্রথমটা একটু গাঁইগুঁই করছিলাম। রতন তাড়া দিয়ে বলল, 'চ চ, প্রাগৈতিহাসিক! শুনেছি জায়গাটা দারুণ। যাসনি তো কখনও। দুজনেরই খোরাক মিলবে। ওখানে প্রচুর পাহাড়-জঙ্গল। ছোট বড় পুরনো মন্দির আর মূর্তির ছড়াছড়ি। আমিও ধারে-কাছের খনিগুলো দেখে নেব। আর কাকা কাকিমা দুজনেই গ্র্যান্ড লোক, বুঝলি।'

দিন কয়েকের মধ্যেই কেওঞ্ঝরগড় গিয়ে হাজির হলাম। রতনের কাকা মিস্টার দত্তকে দেখে প্রথমে একটু ঘাবড়েছিলাম। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর, লম্বা ভারিক্কি সুপুরুষ চেহারা, রঙ টকটকে ফরসা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, খুব কম কথা বলেন। নাম করা এনজিনিয়ার।

প্রথম দিন পরিচয় হবার পর আমায় বলেছিলেন, 'প্রতাপাদিত্য চৌধুরী। বাঃ, বেশ নাম তো তোমার।'

'কেমন ইতিহাসের গন্ধ আছে, তাই না?' রতন পাশ থেকে টিপ্পনী কাটে। মিঃ দত্ত একটু হাসেন। ব্যস, আর কথাবার্তা হয়নি তাঁর সঙ্গে। খুব ব্যস্ত মানুষ, তবে সাদাসিধে।

কাকিমা অবশ্য ভারি আমুদে। আমাদের পেয়ে মহা হৈ-চৈ জুড়ে দিলেন। চট করে জেনে নিলেন, আমি কী কী খেতে ভালবাসি। তিনি খানিক আমাদের সঙ্গে আড্ডা দেন, আর খানিক রান্নাঘরে ঢোকেন। এই চলল তাঁর রুটিন।

আসলে রতনকে এঁরা ভীষণ ভালবাসেন। এঁদের ছেলেপুলে নেই। রতনকে দেখেন ছেলের মতন। রতন সুযোগ পেলেই কাকার কাছে বেড়াতে আসে। তবে এবার এসেছে অনেক দিন পরে। তাই খাতির-যত্নটা কিঞ্চিৎ বেশি।

কেওঞ্ঝরগড় আসার পর দ্বিতীয় দিন সকালে কাকাবাবুর কোয়ার্টারের সামনে লনে পায়চারি করছি আমি ও রতন, এমন সময় হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন সামনে। শ্যামবর্ণ, নাদুসনুদুস মাঝারি হাইট। গোলগাল হাসি হাসি মুখ, মাথার সামনের দিকে একটু টাক। নীল সার্ট ও সাদা ফুলপ্যান্ট পরা। ঝুঁকে পড়ে রতনের হাত আঁকড়ে ঝাঁকিয়ে বললেন—'গ্ল্যাড টু মিট ইউ।' এরপরই আমার সঙ্গে একদফা হ্যান্ডশেক।

—'বস্ মানে দত্ত সাহেব বললেন, আপনাদের একটু ঘুরিয়ে-টুরিয়ে দেখাতে, হেল্প করতে।' তারপর রতনের মুখের পানে তাকিয়ে—'আপনি বুঝি দত্ত সাহেবের ভাইপো? হুঁ, ঠিক। চেহারায় ভারি মিল।'

এমন হুড়মুড়িয়ে কথা বলছিলেন ভদ্রলোক যে রতন থতমত খেয়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?

''আমি? আমি নন্দদুলাল বোস।'

ভদ্রলোক আমাদের তীক্ষ্নদৃষ্টিতে জরিপ করতে করতে বেশ সজোরে বিড়বিড় করে চললেন—'হুঁ, পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি নয়...এ্যাট লিস্ট দশ বছরের সিনিয়ার হব...অতএব ব্রাদার এবং তুমি! কি, আপত্তি আছে?'

খানিকক্ষণ সময় লাগল হেঁয়ালি বোধগম্য হতে। তারপর বলে উঠলাম, 'না, না, আপত্তির কি? নিশ্চয় তুমি বলবেন।' ভদ্রলোক খুশিতে উজ্জ্বল হন। রতন মিটমিটিয়ে দুষ্টু হেসে বলল, 'আর আমরা যদি ডাকি বোসদা, আপত্তি আছে?'

'সার্টেনলি নট।'

বোসদার সঙ্গে দারুণ জমে গেল। পরে জেনেছিলাম উনি কেওঞ্ঝরগড়ে এসেছেন মাত্র দু-বছর। বিয়ে করেছেন বছর তিনেক, তবে ফ্যামিলি, মানে স্ত্রী, থাকেন দেশের বাড়ি বর্ধমানে। বোসদা এখানে থাকেন একা।

জায়গাটা সত্যি সুন্দর। পুরনো আমলের ছোট্ট শহর। দেশীয় রাজার রাজধানী ছিল। শহরের চারপাশ পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা। কলকাতা থেকে এসে ভারি আরাম লাগে।

মিস্টার দত্তর গল্প করার ধাত নয়, তবে নজর ঠিক আছে। একদিন চা খাচ্ছি, এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর কেমন বেড়াচ্ছ? বোস সব দেখাচ্ছে তো?'

বললাম, 'নতুন আর পুরনো দুটো রাজপ্রাসাদ দেখেছি। এবার জগন্নাথ মন্দির দেখতে যাব। ধারে-কাছে নাকি অনেক প্রাচীন মন্দির আছে?'

মিস্টার দত্ত বললেন, 'আছে বৈকি। উড়িষ্যা হচ্ছে মন্দির আর মূর্তির দেশ। পুরী, কোনারক, ভুবনেশ্বরের কথা ছেড়ে দিলেও আমি ঘুরতে ঘুরতে দেখেছি কত অজানা ছোট্ট গ্রামে কী সুন্দর মন্দির আর বিগ্রহ। মাঠে-ঘাটে পাওয়া যায় কত মূর্তি। বিশেষ করে পাথরে তৈরি! সামান্য দামে লোকে সে সব বেচে দেয়। আমার ড্রইংরুমে যে পাথরের যক্ষমূর্তিটা রয়েছে ওটা এক ওভারসিয়ার আমায় প্রেজেন্ট করেছে। কী সুন্দর না?'

সেই দিনই গেলাম জগন্নাথ মন্দির দেখতে। কে জানত সেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে এক চমক।

আমি ও রতন মন্দির দেখছি। দেওয়ালের গায়ে মূর্তি দেখতে দেখতে ঊর্ধ্ব মুখে মন্দিরকে পাক দিচ্ছি। ঠিক একই ভাবে আর একজন ঘাড় উঁচু করে এলো উলটো দিক থেকে। তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। রঙ কালো। বেশ লম্বা। কোঁকড়া চুল, সার্ট ও ফুলপ্যান্ট পরনে, জোয়ান চেহারা।

সে মুখ ফেরাতেই চমকে রতনকে খোঁচা মারলাম—'দেখ, ডাকু।'

আগন্তুকের কানে আমার কথা গিয়েছিল। সে পিটপিটিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে দেখল কয়েক সেকেন্ড। তারপর লাফাতে লাফাতে এসে—'অ্যাঁ, তোরা?' বলে জাপটে ধরল দুজনকে।

উঃ কী গায়ে জোর। দম বন্ধ হবার যোগাড়। বলি—'ছাড় ছাড়। তুই এখানে কোত্থেকে?'

ডাকুর সঙ্গে এমন যোগাযোগ হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। ওর সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার আশাই মুছে গিয়েছিল মন থেকে। ও ছিল ইস্কুলে একটানা পাঁচ বছর ধরে আমাদের দুজনের সহপাঠী। পড়াশুনায় মাঝারি, কিন্তু দারুণ ফুটবল খেলত, আর ডানপিটেমিতে ছিল এক নম্বর ওস্তাদ। ক্লাস নাইনে পড়তে পড়তে ও স্কুল ছেড়ে দেয়। কারণ ওর বাবার আকস্মিক মৃত্যু। তখন ডাকুরা সব ভাইবোন মা-র সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে ওদের দেশের বাড়ি মেদিনীপুরে চলে যায়। আর দেখা হয়নি। প্রথমে কয়েকবার চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে। ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

রতন বলল, 'হ্যাঁ রে তুই আছিস কেমন? এখানে কী করছিস?'

ডাকু ম্লানমুখে বলল, 'আছি এক রকম। টিকে আছি। এখানে এসেছি চাকরি করতে।'

'কী চাকরি? ক'দিন হল?'

'সামান্য চাকরি ভাই। কেরানিগিরি। দু'মাস কেওঞ্ঝরগড়ে এসেছি। উড়িষ্যায় আছি পাঁচ বছর। আগে ছিলাম জাজপুরে। এখানে কোম্পানি একটা নতুন ব্রাঞ্চ খুলেছে, তাই ট্রান্সফার হয়ে এসেছি। বুঝলি, স্কুল ফাইনালের পর আর তো লেখাপড়া এগুল না। আমার গাঁয়ের কাছে কলেজ নেই। শহরে হোস্টেলে থেকে পড়া সম্ভব নয়। তাই দেশেই ছিলাম। যা সামান্য জমিজায়গা আছে, চাষ-বাস দেখতাম। কিন্তু তাতে কি সংসার চলে? তখন আমার এক আত্মীয় এই চাকরিটা জুটিয়ে দিল। মাইনে কম বলে দুঃখ নেই, কিন্তু বসে বসে একঘেয়ে হিসেব কষতে অসহ্য লাগে। ছোটবেলায় ভাবতাম বড় ফুটবলার হব, হল না ভাগ্যে। স্কুল ফাইনাল পাস করে নেভিতে ঢুকতে চাইলাম, বাড়িতে কান্নাকাটি করে দিলে আটকে। এখন এই করছি।'—

বড় কষ্ট হল। জানি তো কী ছটফটে প্রাণশক্তি ভরা দুরন্ত ছেলে ছিল ডাকু। বেচারা!

ডাকু একটু হেসে বলল, 'তবে একদম ঘেঁতিয়ে যাইনি। সুযোগ পেলেই শিকার করি। বাবার বন্দুকটা আছে। কয়েকটা বড় জানোয়ারও মেরেছি।'

তিনজনে ফিরলাম। বোসদা ডাকুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, 'ব্রাদার ইটি কে?'

রতন বলল, 'শ্রীযুক্ত শান্তসুবোধ শাসমল ওরফে ডাকু। আমাদের ইস্কুলের বন্ধু। এখানে চাকরি করে।'

'ডাকু কেন?' বোসদা জানতে চাইল।

'অসম্ভব ডানপিটে ছিল কিনা, তাই স্কুলে ওই খেতাব পায়।' বলল রতন।

বোসদা ডাকুর দিকে চেয়ে বললেন, 'হুঁ, চেহারাটা কিঞ্চিৎ গুণ্ডো গুণ্ডো বটে। কিন্তু ব্রাদার, এ ব্যক্তি লোক খারাপ নয়। হাসিটি ভারি মিষ্টি।'

আরও দুটো দিন ডাকু আমি আর রতন প্রাণভরে আড্ডা দিলাম। মাঝে মাঝে বোসদাও যোগ দেন। পুরনো দিনের কত গল্প হয়। কত মজার ঘটনা, দুষ্টুমির কথা। কাছাকাছি কী কী দেখতে যাব প্ল্যান করি। এমনি করেই হয়ত আমাদের বাকি দিনকটা কেটে যেত, যদি না রতনের কাকা দেব-বাড়ির মিউজিয়ামের কথা শোনাতেন। কারণ সেই মিউজিয়াম দেখতে গিয়েই আবিষ্কার হল এক রহস্যের সূত্র, যার ফলে জড়িয়ে পড়লাম এক দারুণ রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারে।

জাজপুরের কাছে দেবদের প্যালেস। লোকে বলে রাজবাড়ি, তবে ঠিক রাজা নয়—খুব বড় জমিদার, আর খুব পুরনো ফ্যামিলি। এই বাড়িতে দুটো দেখবার জিনিস আছে। এক হল অষ্টধাতুর বিগ্রহ, আরেক হল অস্ত্রশস্ত্রের এক বিরাট সংগ্রহশালা। ছোটকাকা দেবমশাইকে খবর দেওয়াতে তিনি আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। বলা বাহুল্য, ডাকুকেও আমরা সঙ্গে নিলাম। বোসদারও ইচ্ছে ছিল মিউজিয়াম দেখার, কিন্তু গাড়িতে জায়গা কম; তাছাড়া বস্-এর সঙ্গে যাওয়াটাও একটু অস্বস্তিকর, তাই তিনি চেপে গেলেন।

খুব ভোরে আমরা রওনা হলাম।

জাজপুর-কেওঞ্ঝর রোড রাস্তাটি ভারি সুন্দর। পিচ বাঁধানো প্রশস্ত সড়ক। আমাদের মোটর চলেছে হু-হু করে। পথের দুপাশে কখনো বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কখনো ঝোপঝাড়, হালকা জঙ্গল, কখনও বা উঁচু-নিচু বনময় পাহাড়।

ডাকু এ পথে যাতায়াত করেছে। চিনিয়ে দিল—'ডানদিকে দূরে ওই যে উঁচু পাহাড়, ওর নাম টোমকা। এরপরে আসবে মহাগিরি রেঞ্জ।'

মাঝে মাঝে গ্রাম বা ছোট লোকালয় চোখে পড়ে। পথে রামচন্দ্রপুরে একবার থেমেছিলাম আড়মোড়া ভাঙতে। রামচন্দ্রপুর নাকি পুলিশ স্টেশন। কিন্তু ছোট্ট লোকালয়। দেব-বাড়ি পৌঁছলাম বেলা দশটা নাগাদ।

জাজপুর-কেওঞ্ঝর স্টেশন রোড ছাড়িয়ে, পিচ রাস্তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া একটা চওড়া মেঠো রাস্তা ধরে মাইল দুই ঢুকে এক গ্রামে পৌঁছলাম। দেখে মনে হয় এককালে বেশ বর্ধিষ্ণু ছিল এই গ্রাম। গাছপালার আড়াল থেকে সহসা জেগে উঠল উঁচু পাঁচিলে ঘেরা এক প্রকাণ্ড দোতলা অট্টালিকা। লক্ষ করলাম, অট্টালিকার কয়েকটি অংশ খুবই জীর্ণ। বাড়ির চার পাশে পরিখা কাটা ছিল, এখন বুজে গেছে।

ভিতরে খবর পাঠানো হল।

বাবু খগেশ্বর দেব মহাশয় স্বয়ং বেরিয়ে এলেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। সৌম্যকান্তি দীর্ঘকায় বৃদ্ধ। গায়ের রঙ টক্‌টকে, মাথা জোড়া টাক, নাকটি টিয়াপাখির মতন। বয়সের ভারে শরীর সামান্য নুইয়ে পড়েছে সামনে।

কাকাবাবু বললেন 'একদম সময় পাই না বলে আসা হয়নি অ্যাদ্দিন। তবে মিউজিয়াম দেখার ইচ্ছে ছিল খুবই। এবার এরা ধরল, তাই এসে পড়লাম।'

কাকাবাবু আমাদের পরিচয় দিলেন। বৃদ্ধ হাসিমুখে বললেন, 'আপনারা এসেছেন, আমার সৌভাগ্য। চলুন ভিতরে।'

বৈঠকখানায় বসে একপ্রস্থ চা-জলখাবার হল। তারপর আমরা খগেশ্বর বাবুর পিছনে পিছনে চললাম মিউজিয়াম দেখতে। আমাদের পিছনে আসছে একজন ভৃত্য। তার হাতে একটা জ্বলন্ত পেট্রোম্যাক্স আলো। দেবমশাইয়ের হাতে এক পেল্লায় চাবি।

বারান্দার প্রান্তে এক দরজার সামনে থামলেন খগেশ্বরবাবু। দরজায় বিশাল এক তালা ঝুলছে। ঝনাৎ করে তালা খুললেন দেবমশাই তারপর ধাক্কা মেরে দরজা ফাঁক করে দিলেন। এবার তিনি পেট্রোম্যাক্সটা চাকরের কাছ থেকে নিজের হাতে নিয়ে ধীর পায়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। পিছনে আমরা চারজন। ভৃত্যটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

লম্বা হলঘর, উঁচু ছাদ, ভিতরে ভ্যাপসা অন্ধকার। বোধহয় অনেক দিন খোলা হয়নি ঘর। পেট্রোম্যাক্সের তীব্র আলোয় চমকে গিয়ে কয়েকটা চামচিকে আমাদের মাথার ওপর ঘুরপাক খেতে লাগল।

চতুর্দিকে দেওয়াল জুড়ে টাঙানো অজস্র অস্ত্র আর অস্ত্র। দেওয়াল ঘেঁষে লম্বা লম্বা কাঠের টেবিল পাতা। টেবিলগুলোর ওপরেও সাজানো বিচিত্র অস্ত্রের সম্ভার। ছুরি, ছোরা,

তরবারি, ঢাল, বর্শা, বল্লম, টাঙ্গি, দাও, কুঠার, গদা, তীর-ধনুক, শিরস্ত্রাণ, বর্ম...। কত কী। ধাতু, কাঠ, হাড় প্রভৃতিতে তৈরি। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট কামান মুখ উঁচু করে বসানো।

এ সবই পুরনো আমলের অস্ত্রশস্ত্র। এমন বিপুল সংগ্রহ দেখব ভাবতে পারিনি। আলো পড়ে ধাতুর অংশগুলি চকচক করে উঠল।

খগেশ্বরবাবু একটা টুলের ওপর আলোটা রাখলেন। বৃদ্ধের শরীর টান টান হয়ে উঠল। চক্ষু উজ্জ্বল। গম্ভীরস্বরে বললেন, আমার পূর্বপুরুষ ক্ষাত্রধর্মের চর্চা করতেন। যুদ্ধ ও শিকার। বাহুবলের সাহায্যে তাঁরা ধনসম্পত্তি উপার্জন করেছিলেন। এই সব অস্ত্রের অধিকাংশই আমাদের বংশের কেউ না কেউ ব্যবহার করেছেন। সবই কিন্তু সেই অতীতে। বহু স্মৃতি ও ইতিহাস জড়িয়ে আছে এই অস্ত্রগুলির সঙ্গে। দেব বংশে অস্ত্রচর্চা আর হয় না, জমিদারিও আর নেই। আমার ছেলে নাতিরা বন্দুক টন্দুক বিশেষ পছন্দ করেন না। আসেও খুব কম। আমি বুড়ো মানুষ এই শূন্যপুরী আগলাচ্ছি। জানি না আমার পরে এ বাড়ির কী হাল হবে।'

তাঁর কণ্ঠে সাময়িকভাবে একটা বিষণ্ণতার সুর ধরা পড়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার স্বাভাবিক সুর ফিরে আসে, আর উৎসাহ ভরে তিনি আমাদের সব কিছু দেখাতে থাকেন।

চমৎকার বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা ভদ্রলোকের। আমরা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি, কখনো বা কোনো জিনিস হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখি।

হঠাৎ ডাকু একটা ছুরি তুলে নিয়ে মন দিয়ে দেখতে লাগল। ব্যাপারটা খগেশ্বরবাবু লক্ষ করেছিলেন। বললেন, 'ওটা হানটিং নাইফ। দেশি কারিগরের তৈরি। খুব মজবুত জিনিস।'

'এটা কতদিন আছে এখানে?' ডাকু প্রশ্ন করল।

'তা অনেক দিন। আমার বাবা ছোটবেলা থেকে এটা দেখেছেন। কে এটা এনেছিল জানি না।'

'এই পদ্মফুলটা কেন খোদাই করেছে বাঁটে?' জিজ্ঞেস করল ডাকু।

'কি পদ্মফুল?' আমি ও রতন এবার কাছে গিয়ে ছুরিটা দেখি।

বাঁটসুদ্ধ প্রায় এক ফুট লম্বা ছুরিখানা। চওড়া ফলা। হাতির দাঁতের বাঁট। বাঁটের ওপর একটা সুন্দর ছোট পদ্মফুলের নকশা খোদাই করা।

দেবমশাই ডাকুর হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে কারুকার্যটি দেখলেন। তারপর বললেন, 'খেয়াল-খুশিমতো নকশা করেছে হয়তো। কিংবা কারিগরের নিজস্ব ছাপ হতে পারে, মানে ট্রেডমার্ক।'

'ও।' ডাকু ছুরি রেখে দিল একটু অন্যমনস্কভাবে।

ওই সামান্য ছুরি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কত বড় বড় অদ্ভুত আকৃতির অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, সেগুলোর ওপরই আমাদের বেশি নজর।

ঘণ্টা দুই পর আমাদের মিউজিয়াম দেখা শেষ হল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় কাকাবাবু বললেন, 'দেবমশাই আপনাদের মন্দিরের বিগ্রহটি একবার দেখাবেন? খুব নাম শুনেছি।'

দেবমশাই থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ বিমর্ষ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বললেন, 'খবরটা বোধহয় আপনাদের ওদিকে পৌঁছায়নি এখনো। সমস্ত অলংকার সমেত আমাদের বিগ্রহটি চুরি গেছে।'

'সে কী? কবে?' কাকা বলে উঠলেন। আমরাও অবাক।

'মাত্র দু-দিন আগে। চুরি নয়, ডাকাতি। চার-পাঁচজন লোক এসেছিল রাতে। মন্দিরের প্রহরীকে অতর্কিতে আঘাত করে বেঁধে ফেলে, মন্দিরের দরজা ভেঙে ঢুকে ভিতরের যাবতীয় দামি জিনিস লুট করেছে। গৃহ-দেবতা বিগ্রহ হারিয়েই বেশি কষ্ট পেয়েছি। পুলিশ অনুসন্ধান করছে। তিন হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছি শুধু বিগ্রহের জন্যে। এখন ভাগ্য।'

'তিন হাজার টাকা, শুধু বিগ্রহের জন্যে?' ডাকু চোখ বড় বড় করে বলে।

'হ্যাঁ। যদি কেউ উদ্ধার করে দেয়। গৃহ-দেবতাকে ফিরে পাওয়াই আমার সবচেয়ে বড় কামনা।'

আমরা মনে মনে লজ্জিত হলাম। সত্যি, ভদ্রলোক একবারও বুঝতে দেননি যে এত মন খারাপ। দিব্যি হাসিমুখে সব দেখালেন।

মিস্টার দত্ত বললেন, 'ছি ছি, এখন আপনাকে বিরক্ত করা উচিত হয়নি। জানতাম না কিছু।'

ভদ্রলোক যদিও কথাটা উড়িয়ে দিলেন, আমরা তাঁর মনের আসল ভাবটা আন্দাজ করে তাঁকে আর বিরক্ত না করে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

দুই

শহরে পৌঁছে আমরা ডাকুর বাড়িতে নামলাম, কাকাবাবু গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। খিদেটা পেয়েছিল বেশ চনচনে, তাই দোকান থেকে চা আর গরম আলুর চপ আনিয়ে জমিয়ে বসলাম।

একটা বড় বাড়ির একতলায় একটা মাঝারি সাইজের ঘর নিয়ে ডাকু থাকে। আমরা দুজন সতরঞ্চি বিছানো তক্তপোশে বসেছি, ডাকু একটা হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ারে। গরম চপে একটা বেপরোয়া কামড় দিয়ে মুখটাকে একটু বিকৃত করে ডাকু হঠাৎ বলল, 'কোনো মানে হয় না।'

'কীসের কোনো মানে হয় না?' রতন জিজ্ঞেস করল।

'তিন হাজার টাকা। পুলিশ তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। তারা যদি বামাল সমেত চোর ধরে ফেলে তাহলে তো টাকাটা মাঠে মারা যাবে।'

আমি বললাম, 'তাই বলে তুই পুলিশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তদন্ত শুরু করবার তাল করছিস নাকি? তিন হাজার টাকা কি সকলের কপালে থাকে রে? তাও যদি বা কোনো ক্লু থাকত।'

'আমার ইচ্ছে ছিল যেখানে বিগ্রহটা ছিল সে জায়গাটা একবার দেখে আসি। তোরা এমন তাড়াহুড়ো করে চলে এলি!'

'ভালো কথা',—রতন বলে উঠল—'তোর হঠাৎ ওই ছুরিটার ওপর চোখ গেল কেন?'

'ঠিক ও-রকম একটা ছুরি একবার আমার প্রায় হাতে এসে গেস্‌ল, তাই।'

ডাকু বেপরোয়া ডানপিটে হতে পারে, কিন্তু বাজে গুল মারার অভ্যাস নেই সেটা

আমরা জানি। কাজেই কথাটা শুনে আমরা দুজনেই বেশ অবাক। বললাম, 'কী ব্যাপার একটু খুলে বল্‌তো।'

ডাকুর কথা থেকে যা বেরোল তা মোটামুটি এই—

বছর দুয়েক আগে বর্ষার মুখটাতে ডাকু একা মহাগিরি রেঞ্জে শিকার করতে গিয়েছিল। শিকার শেষে পাহাড় থেকে হেঁটে ফিরছিল রামচন্দ্রপুরে বাস ধরবে বলে। পথে বৃষ্টি নামে, ডাকু দৌড়ে গিয়ে কাছের একটা গ্রামে এক বুড়োর ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সে বুড়ো নাকি কামার, এবং ভারি ভাল লোক! সেই বুড়োর ঘরের দেয়ালে ঝোলানো একটা ছুরির ওপর ডাকুর চোখ যায়। দেবদের অস্ত্রাগারে দেখা পদ্মমার্কা ছুরির প্রায় ডুপ্লিকেট। সেই রকম সাইজ, সেই রকম ফলা কেবল হাতির দাঁতের বদলে কাঠের হাতল। কিন্তু হাতলে অবিকল সেই রকম পদ্মচিহ্ন। ডাকু নাকি ছোরাটা অনেক করে কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু বুড়ো কামার রাজি হয়নি। সে বলেছিল যে এই ছুরির ফলার ইস্পাত লোহার সঙ্গে এক রকম বিশেষ ধাতু মিশিয়ে তৈরি করেছে, এবং এই মেশাবার কায়দা নাকি ওই বুড়ো কামারেরই এক পূর্বপুরুষ দৈবাৎ আবিষ্কার করে। এই সব ইস্পাতের জিনিস আগে বুড়োর পূর্বপুরুষরা বানাত, রাজা জমিদার, সেনাপতি—এই সব বড়লোকদের জন্য। এখন এ সবের কদর নেই, চাহিদা নেই, তাই বানানো প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। ওই একটি ছুরি তাই অতি যত্নে রেখে দিয়েছে কামার।

ডাকুর এই বর্ণনা আমাদের দুজনেরই কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল—অবিশ্যি সেটা দুটো আলাদা কারণে। ডাকু থামলে পর আমিই প্রথম প্রশ্ন করলাম।

'গ্রামের নামটা মনে আছে তোর?'

'বাঃ, মনে থাকবে না?' ডাকু বেশ জোরের সঙ্গেই বলে উঠল কথাটা—'জগন্নাথপুর। কেন, তোর কি যাবার শখ হয়েছে? ও ছুরি দেবে না বুড়ো।'

আমি ডাকুর কথা অগ্রাহ্য করে আরেকটা প্রশ্ন করলাম—'আর বুড়ো কামারের নাম?'

'বংশীধর পাত্র। আরো কিছু জানতে চাস?'

'না, জানতে চাই না। যেতে চাই জগন্নাথপুর। তবে ছুরি হাত করতে নয়। ছুরিটা কীভাবে বানিয়েছিল বংশীধর পাত্র, সেটা জানতে। ভারতীয় ইস্পাত একদিন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। শুধু তাই নয়—ইস্পাত তৈরির কৌশল প্রথমে ভারতেই আবিষ্কার হয়। অনেকে বলেন, ভারতীয় ইস্পাতের সাহায্যেই প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের কঠিন পাথরের মন্দিরের গায়ে চিত্রলিপি ও মূর্তি খোদাই করেছিল। প্রাচীন যুগের কথা ছেড়ে দিলেও—ধর, এই একশো বছর আগেও সিপাই বিদ্রোহের পর সিপাইদের কাছ থেকে যে সব ছুরি, তলোয়ার ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো পরীক্ষা করে ইংরেজরা অবাক হয়ে যায়। শেষে কলকারখানার যুগ আরম্ভ হওয়ায় এই সব কামাররা মার খেয়ে যায়। কিন্তু এই সব কামারদের মধ্যে একজনেরও যদি সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহলে তার কাছ থেকে ইস্পাত তৈরির আশ্চর্য সব তথ্য পাওয়া যেতে পারে। বল ডাকু—জগন্নাথপুর নিয়ে যাবি?'

এবার রতন আমার প্রস্তাবে যোগ দিল। সে বলল, 'আমারও যাওয়া দরকার, কারণ আমারও বংশী কামারের সঙ্গে দরকার আছে। প্রতাপের কৌতূহল ঐতিহাসিক হিসাবে,

আমার কৌতূহলটা জিওলজিস্টের। আমি জানতে চাই বংশী লোহার সঙ্গে কী ধাতু মিশিয়ে ইস্পাত তৈরি করে, এবং কোত্থেকে সে এই ধাতু পায়।'

ডাকু ভেবে বলল, 'বেশ, পরশু চল জগন্নাথপুর। কীসে যাবি? বাসে, না প্রাইভেট গাড়িতে?'

'বাসে নয়', বলল রতন, 'কাকার গাড়িটা আমি ম্যানেজ করব।'

রামচন্দ্রপুর ছাড়িয়ে কিছুটা গিয়ে বাঁ-ধারে মাইলখানেক দূরে জগন্নাথপুর গ্রাম। পিচ রাস্তা থেকে একটা গোরুর গাড়ি চলার মেঠো রাস্তা চলে গেছে গ্রামের দিকে। ওপথে মোটর যাবে না। তাই ঠিক হল, ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে বড় রাস্তার ধারে অপেক্ষা করুক।

আমরা পায়ে হেঁটে চললাম গ্রামে।

গ্রামের সীমানায় আমাদের অভ্যর্থনা জানাল এক দঙ্গল ছোট ছেলেমেয়ে। সর্বাঙ্গে ধুলো। বিস্ফারিত দৃষ্টি। নির্বাক অভ্যর্থনা।

ডাকু বলল, 'সোজা চল, একটা বড় বটগাছের ধারে বংশীর ঘর।'

রাস্তার পাশে এক বাড়ির দাওয়ায় কয়েকজন লোক বসে ছিল। তারা হাঁ করে আমাদের দেখতে লাগল। বটগাছ দেখলাম! সত্যি বিরাট। ডাল থেকে প্রচুর ঝুরি নেমেছে মাটিতে। যেন জটাজূটধারী মুনি একজন। গাছের ধারে ধারে কয়েকটি কুটির। ডাকু দেখাল, 'ওইটে বংশীর বাড়ি।'

দুঃখের বিষয়, বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। বুঝলাম বংশী কোথাও বেরিয়েছে। এদিক সেদিক চাইতে দেখি পাশের বাড়ির দরজা দিয়ে একটা মুখ উঁকি মারছে। ডাকু ডাকল তাকে—'শুনুন।' লোকটি যেন ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এল। অস্থিচর্মসার ছোটখাটো মানুষটি। বয়স বোঝা ভার। ডাকু জিজ্ঞেস করল, 'বংশী নেই দেখছি। কখন আসবে বলতে পারেন?'

লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের লক্ষ করছিল। এবার সে যে প্রশ্নটি ছাড়ল, তার জন্য আমরা একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না। তীব্র খ্যানখ্যানে গলায়—'আজ্ঞে আপনারা কি পুলিশের লোক?'

সে কি! আমাদের পুলিশ ঠাওরাবার কারণ?

রতন বলল, 'না আমরা পুলিশ নই। বংশীর কাছে এসেছি একটা কাজে। একটা লোহার জিনিস গড়াব, তাই।'

'ও।' লোকটি যেন হাঁফ ছাড়ল। সে কাছে এগিয়ে এল।

'তা আপনারা আসছেন কোত্থেকে?'

ডাকু বলল, 'কেওঞ্ঝরগড়। আমি ওখানেই থাকি। এঁরা দুজন কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন। বংশীর খুব প্রশংসা শুনেছেন, তাই তার কাজ দেখতে চান।'

'অ্যাঁ কলিকাতার লোক?' লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'আজ্ঞে আমিও কলিকাতা ছিলাম চার বছর। হোটেলে কাজ করতাম। অসুখে ভুগলাম খুব তাই দেশে চলে এসেছি ছয় মাস হল।' লোকটি এতক্ষণ ওড়িয়ায় কথা বলছিল। এবার সে বাংলা-ওড়িয়ার

জগাখিচুড়ি ছাড়ে। বলল, "আজ্ঞে আমার নাম কার্তিকচন্দ্র পণ্ডা। তা বংশীদাকে খোঁজ করছিলেন কিনা তাই ভাবিলাম আবার বুঝি পুলিশ এসেছে।'

ডাকু বলল, 'বংশীর কাছে বুঝি পুলিশ এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আর বলবেন না মশাই। গতকাল পুলিশ এসেছিল পঞ্চার খোঁজে! বংশীদাকে কি হয়রানিটাই না করল।'

'পঞ্চা কে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'বংশীদার ছেলে। ইস্ অমন ভালো মানুষটা! ছেলের জন্যে মান-ইজ্জত সব গেল।'

ডাকু বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ—বংশীর এক ছেলে আছে, বলেছিল সেদিন। তা পঞ্চা কী করেছে?'

'ডাকাতি মশায়!' কার্তিক গলার স্বর একটু নামায়। 'দেব-বাড়ির ডাকাতির কেসে পুলিশ ওকে খুঁজছে। এ নাকি ওর দলের কাজ। দেব-বাড়ির মন্দির ভেঙে ভীষণ ডাকাতি হয়েছে। সাংঘাতিক ছেলে মশাই পঞ্চা। গুণ্ডা বদমাশ। আগে একবার মাস দুই জেলও খেটেছে। এবার ধরা পড়ে সারাজীবন জেলের ঘানি টানুক। শিক্ষে হোক বেটার।'

দেব-বাড়ির ডাকাতি ও বংশীর ছেলে!—এ তো অদ্ভুত যোগাযোগ। আমি বললাম, 'বংশীর ছেলে বুঝি লোহার কাজ করত না?'

'কেন করবে না,' বলল কার্তিক, 'আগে করত। বেশ কাজ শিখেছিল। তারপর কুসঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। বংশীদা ওকে কত বুঝিয়েছে। বকেছে! কিন্তু ও ছেলে কি শোনার পাত্র। নেহাত মা-মরা একমাত্র ছেলে, নইলে বাড়িতেই ঢুকতে দিত না বংশীদা। এখন আট-দশ দিন পঞ্চা হাওয়া। তারপর কাল এল পুলিশ।'

পঞ্চার কথা শুনতে আমার উৎসাহ হচ্ছিল না। 'বংশী কখন আসবে?' কার্তিক জানাল, 'ভোর থেকেই দেখছি বংশীদার ঘরে তালা মারা। কোথায় গেছে, কখন আসবে হয়তো পেল্লাদ বলতে পারে।'

'কে পেল্লাদ?'

'আজ্ঞে বংশীদার অ্যাসিস্টান্ট। ভারি ভাল ছেলে।'

'পেল্লাদের সঙ্গে একবার দেখা করা যাবে?' বললাম আমি।

'নিশ্চয়। পেল্লাদ এ গাঁয়েই থাকে।—ওরে এই ছোঁড়া। যা তো পেল্লাদকে ডেকে নিয়ে আয়। বল কলিকাতার বাবুরা ডাকছেন।' কার্তিক একটা ছোট ছেলেকে পাঠিয়ে দিল।

আমি লক্ষ করেছিলাম বটতলায় অনেকগুলো উনুন। ওগুলো লোহা গালাবার চুল্লি। সবই ভাঙা। শুধু একটা আস্ত আছে। চুল্লি শক্ত মাটিতে তৈরি। তলাটা গোল। প্রায় তিন ফুট ব্যাস। তলা থেকে ওপরে গম্বুজের মতো সরু হয়ে গেছে। চুল্লির তলায় দুটো ফুটো! মাথাতেও ফুটো। রতনকে দেখিয়ে বললাম—

'এই হচ্ছে দেশি কামারদের আদিম চুল্লি। অবশ্য এর চেয়ে ছোট বা বড়ও হয়। তলার একটা ফুটো দিয়ে গলানো লোহার খাদ বেরিয়ে যায়। অন্য ফুটোটা দিয়ে চামড়ার হাপর

চালিয়ে পাম্প করে হাওয়া ঢোকানো হয়, আগুনের তাত তোলার জন্য। আর মাথার ফুটো দিয়ে লোহার আকর এবং কাঠকয়লা ফেলা হয় চুল্লির ভিতর জ্বলন্ত কাঠের ওপর। কয়েক ঘণ্টা প্রচণ্ড আঁচে লোহা-পাথর গলে যায়। তখন ভারী ধাতু লোহা নিচে জমা হয় এবং ওই পাথরে মেশা অন্য ধাতু বা খাদ ওপরে ভাসতে থাকে। সেগুলো বেরিয়ে যায় ফুটো দিয়ে। তারপর গলিত লৌহপিণ্ড বের করে হাতুড়ি দিয়ে বেশ করে পেটালে বাকি খাদ ঝরে গিয়ে থাকে প্রায় বিশুদ্ধ লৌহপিণ্ড। আর ইস্পাত বানাতে হলে ওই রকম খাঁটি লোহাকে আবার গলিয়ে তার সঙ্গে মেশানো হয় গুঁড়ো কাঠকয়লা অর্থাৎ কার্বন, তৈরি হয় কার্বন-স্টিল।'

মনের আনন্দে লেকচার দিচ্ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল, রতন শুনছে না। সে ডাকুকে লক্ষ করছে। ডাকু দেখি কার্তিকের সঙ্গে বংশীর উঠানে বেড়াচ্ছে। একবার কানে এল পঞ্চার নাম। ওর মাথায় দেব-বাড়ির ডাকাতি ঘুরছে নাকি?

'এই যে পেল্লাদ এসেছে।' কার্তিক ডাকল, 'আয় আয়।'

কার্তিক কুড়ি বাইশ বছরের একটি যুবককে আমাদের সামনে হাজির করল। যুবকের স্বাস্থ্য ভালো। শান্ত মুখশ্রী। কাঁচুমাচু ভাবে এসে দাঁড়াল প্রহ্লাদ।

আমি বললাম, 'তুমি বংশীর সঙ্গে কাজ করো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আমি এবার প্রহ্লাদকে বললাম, 'বংশীর লোহার কাজের খুব নাম শুনেছি, তাই এসেছিলাম দেখতে। কিছু জিনিস গড়াতে। তা বংশী গেছে কোথায়, জানো?'

প্রহ্লাদ আমতা আমতা করে বলল, 'এখনও ফেরেনি বংশীজ্যাঠা। হয়তো কেল্লাপাহাড়ে গেছে। তবে তো ফিরতে দেরি হবে।'

ডাকু বলল, 'কেল্লাপাহাড়? সে কোথায়?'

'ওই দিকে একটা ছোট পাহাড় আছে।' প্রহ্লাদ পশ্চিমে মহাগিরি রেঞ্জের দিকে দেখায়। 'সেই পাহাড়ের মাথায় আছে একটা পুরনো ভাঙা কেল্লা। ওই পাহাড়কে আমরা বলি কেল্লাপাহাড়। এখান থেকে তিনক্রোশ পথ। পলাশবুনি গাঁয়ের পাশ দিয়ে যেতে হয়। বংশীজ্যাঠ্যা মাঝে মাঝে যায় ওই পাহাড়ে।'

'কেন?'

'জ্যাঠা বলে ওই পাহাড়ে নাকি তার পূর্বপুরুষ থাকত, তাই দেখতে যায়। আর'—প্রহ্লাদ হঠাৎ চুপ করে গেল।

'আর কী?' জিজ্ঞেস করলাম।

প্রহ্লাদ একটু ইতস্তত করে বলল, 'আর বংশীজ্যাঠা পাহাড় থেকে এক রকম পাথর আনে।'

রতন বলল, 'পাথর? কী পাথর?'

'সে পাথর আমি চিনি না। একবার মাত্র দেখেছি।'

'লোহা-পাথর?'

'না।' প্রহ্লাদ ঘাড় নাড়ে।

'ওই পাথর দিয়ে কী করে বংশী?' বলল রতন।

'ঠিক জানি না। তবে মনে হয় লোহার সঙ্গে মেশায়। তবে কীভাবে মেশায় দেখায়নি কখনো।' প্রহ্লাদ উত্তর দেয়।

'তুমি গেছো কখনো ওই পাহাড়ে পাথর আনতে?' রতন জানতে চায়।

'না। আমি কখনো যাইনি কেল্লাপাহাড়ে।' বলল প্রহ্লাদ।

'বংশীর ছেলে গেছে?' এবার ডাকুর প্রশ্ন।

'হ্যাঁ তা গেছে। আমি যাইনি।'

'সেই পাথর আছে এখানে? দেখাতে পারো।' রতন বলে।

এত প্রশ্নের মুখে প্রহ্লাদ কেমন ঘাবড়ে যায়। আড়ষ্টভাবে বলে, 'না নেই। কাজ হয়ে গেলে বংশীজ্যাঠা ওই পাথরের টুকরো দূরে ফেলে দিত। বেশি পাথর তো আনত না।

শেষবার এনেছিল বছরখানেক আগে। আর যায়নি।' প্রহ্লাদ জানাল, 'কেল্লাপাহাড়ে গেলে বংশীজ্যাঠার ফিরতে রাত হয়ে যায়।'

আরও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলাম। নাঃ, বংশী এখন ফিরবে না। অগত্যা আর একদিন আসব বলে বাড়িমুখো রওনা দিলাম। মন খারাপ। আজকের অভিযান ব্যর্থ হল! ডাকু রতনও চুপচাপ।

মাত্র মাইল দুই গেছি। হঠাৎ দুম! মোটরের টায়ার ফাটল।

কী ঝামেলা। বাড়তি টায়ার অবশ্য আছে সঙ্গে। আমরা নামলাম। ড্রাইভার নতুন টায়ার লাগানোর তোড়জোড় করে। জায়গাটার বাঁ-পাশে পথের ধারেই এক ছোট পাহাড়।

ডাকু বলল, 'চ, ততক্ষণ পাহাড়ে বেড়িয়ে আসি।'

উত্তম প্রস্তাব। ডাকু বন্দুক নেয়—যদি বনমোরগ পাওয়া যায় শিকার করব।

পাহাড়ে উঠছি। এদিক সেদিক ঘুরছি। এক জায়গায় পাহাড়ের ঢাল খাড়া নেমে গেছে অনেকখানি। আমি কিনারে গিয়ে নিচে তাকাতেই চমকে উঠলাম।

সোজা নিচে পাহাড়ের ওপর একটি মানুষের দেহ পড়ে আছে চিৎ হয়ে। কয়েক সেকেণ্ড, লক্ষ করে বুঝলাম—নিশ্চল। তার দেহের অদ্ভুত-ভঙ্গি দেখে সন্দেহ হল মরে গেছে নাকি?

রতন ও ডাকুকে দেখালাম। তারপর তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম ঘুরে। কাছাকাছি গিয়েই ডাকু প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে—'একি, এ যে বংশী!'

তিন

বংশী মারা গেছে সন্দেহ নেই। মাথার চুলে চাপ চাপ রক্ত জমাট বাঁধা। খুলির এক জায়গা হাঁ হয়ে গেছে। আর কোনো আঘাতের চিহ্নই নেই দেহে। বোঝা যায় বংশীর মৃত্যু হয়েছে অনেকক্ষণ।

কিন্তু মরলো কী করে?

ডাকু বলল, 'খাদের ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া আর তো কোনো কারণ মনে হচ্ছে না। কিন্তু পড়ল কেন? এরা পাহাড়ে চড়তে অভ্যস্ত। সহজে তো পা ফসকায় না। তবে মদ খেয়ে মাতাল হলে বেসামাল হতে পারে। হয়তো খাদের ধারে ধারে যাচ্ছিল কিংবা ঢালের গায়ে ওই মহুয়া গাছটায় চড়েছিল পাকা মহুয়ার লোভে, তারপর বেটাল হয়ে পড়ে গেছে। ইস্, কী স্যাড্ ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত বংশীর সঙ্গে এভাবে দেখা হবে, কে জানত।'

বংশীর মৃতদেহের পাশেই একটি ছোট ঝুলি পড়েছিল। রতন সেটা তুলে দেখল। ভিতরে একটা হাতুড়ি। মাটিতে ছেনি বাটালি ইত্যাদি কয়েকটা জিনিস ছড়িয়ে পড়ে আছে। রতন সহসা কী একটা কুড়িয়ে নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'ডাকু এই দেখ।'

রতনের হাতে একটা ছুরি। কাঠের খাপে পোরা। কাঠের হাতলে খোদাই করা পদ্ম। ঠিক মিউজিয়ামের ছুরির মতো।

ডাকু খাপ থেকে ছুরি টেনে বার করল। ছুরির ফলা একটু বাঁকানো। বলল, 'এই সেই ছুরি। দু-বছর আগে এটাই আমি দেখেছিলাম বংশীর কাছে। বংশী ছুরিটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল আজ।'

রতন ছুরিটা চেয়ে নিল ডাকুর কাছ থেকে। তারপর গম্ভীরভাবে বলে, 'এ ছুরি আমি নিলাম।'

'সে কি!' আমরা অবাক।

রতন বলল, 'হ্যাঁ। কারণ এ ছুরিতে বংশীর আর কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার আছে। বংশী কী ধাতু মেশাত এই ইস্পাত বানাতে তা বংশীর মুখে থেকে আর কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। তাই ছুরিটা নিচ্ছি; অ্যানালিসিস্ করে দেখতে চাই, কী কী আছে এতে।'

রতন এমন দৃঢ়স্বরে বলল কথাগুলো যে আমরা আর প্রতিবাদ করতে পারলাম না। রতন বলল, 'ডাকু, এদিকে মৃতদেহের ব্যবস্থা করা দরকার। বংশীর গ্রামে খবর দিতে হবে। আমি আর তুই জগন্নাথপুর চলে যা। গাড়ির টায়ার নিশ্চয় এতক্ষণে বদলানো হয়ে গেছে। আমি আর প্রতাপ থাকছি এখানে।'

ডাকু চলে গেল। একটু পরেই মোটরের ইন্‌জিনের আওয়াজ পেলাম।

ডাকু প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এল, সঙ্গে ছ-সাত জন গ্রামের লোক। কার্তিকও এসেছে। কার্তিক তো হাউমাউ করে একচোট কান্না জুড়ে দিল প্রাণহীন বংশীকে দেখে। যাহোক ওরা চটপট গাছের ডাল দিয়ে একটা মাচা বানিয়ে তার ওপর বংশীর দেহ চাপিয়ে নিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেল। আমরাও ফিরলাম কেওঞ্ঝরগড়।

কেওঞ্ঝরগড়ে পৌঁছবার পরদিনই রতন ছুরিটা পাঠিয়ে দিয়েছিল ধাতুবিদ্ ডক্টর ত্রিপাঠীর কাছে অ্যানালিসিসের জন্যে। পাঁচদিন পরে ডক্টর ত্রিপাঠী রতনকে ফোন করলেন।

'অ্যানালিসিস্ হয়ে গেছে। বিকেলে আসুন।'

আমি ও রতন গেলাম।

ডক্টর ত্রিপাঠী সাহেবি কেতার মানুষ। ছোটখাটো শীর্ণকায়, ফরসা। মুখে সর্বদা পাইপ। আমরা বসতেই কফির অর্ডার দিয়ে বললেন, 'এ ছুরি কোত্থেকে পেয়েছেন?'

রতন বলল, 'একজন দেশি কামারের কাছ থেকে।'

'স্ট্রেঞ্জ।' ত্রিপাঠী বিস্ময় প্রকাশ করেন। 'আমি জানতাম দেশি কামার বড়জোর কার্বনস্টিল তৈরি করতে পারে। কিন্তু লোহার সঙ্গে অন্য ধাতু মেশায়, এই প্রথম জানলাম।'

'কেন, কী কী পেয়েছেন?' রতন উত্তেজিত।

'পেয়েছি অনেক কিছু। খুব ভালো কোয়ালিটির স্টিল। এতে আছে প্রায় টেন পারসেন্ট ক্রোম, ওয়ান পারসেন্ট নিকেল, সামান্য ম্যাঙ্গানিজ। কার্বন, সিলিকন ইত্যাদি। এবং বাকিটা আয়রন।'

'ক্রোম, নিকেল!' ত্রিপাঠীর কথা শেষ না হতেই রতন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। 'তার মানে বংশী ক্রোম আর নিকেল মেশাত লোহার সঙ্গে।'

'কে বংশী?' ত্রিপাঠী জিজ্ঞেস করলেন।

'ওই কামারের নাম, যে ছুরি তৈরি করেছে।' বলল রতন।

'সে কোথায় থাকে?'

'রামচন্দ্রপুরের কাছে এক গ্রামে। কিন্তু সে নেই। মারা গেছে।'

'বংশী ক্রোম আর নিকেল পেত কোত্থেকে? জানেন আপনি?'

ত্রিপাঠী ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেন।

'সঠিক জানি না। আন্দাজ করছি।' রতন থতমত খেয়ে বলে, 'খবর পেয়েছি, বংশী মহাগিরি রেঞ্জের এক পাহাড় থেকে কিছু ধাতু পাথর আনত গোপনে। সেই পাথর লোহার সঙ্গে মেশাত। আমার ধারণা ওই পাহাড়ে ক্রোম আর নিকেলের ডিপোজিট আছে। হয়তো একই জায়গায়। কাছাকাছি। বংশী নিশ্চয় এই দু-রকম পাথরই আনত। এই রকম ইস্পাত বানাবার কায়দা ওর এক পূর্বপুরুষ নাকি আবিষ্কার করেছিল। অবশ্য কোন্ ধাতুর কী গুণ আলাদা করে নিশ্চয় তারা বুঝত না। আপনি কী বলেন?'

বুঝলাম রতন ত্রিপাঠীর কাছে কেল্লাপাহাড় বা জগন্নাথপুরের নাম চেপে যেতে চায়।

ত্রিপাঠী কয়েক সেকেণ্ড ভেবে বললেন, 'হয়তো ক্রোম আনত—কিন্তু নিকেল? ইমপসিবল্। উড়িষ্যায় নিকেল কোথাও নেই।'

'তাহলে নিকেল এলো কী করে?' রতন জানতে চাইল।

'খুব সোজা। উল্কাপিণ্ড থেকে। উল্কাপিণ্ডে লোহার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ নিকেল থাকে। দেশি কামার অনেক সময় পাহাড়-জঙ্গলে পড়ে থাকা উল্কাপিণ্ড ভেঙে নিয়ে আসে লোহার প্রয়োজনে। অনেক প্রাচীন জিনিসে নিকেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই নিকেল এসেছে উল্কাপিণ্ডের লোহার সঙ্গে।'

রতন বলল, 'তা হতে পারে। কিন্তু উড়িষ্যায় নিকেল যে নেই, তার প্রমাণ কী?'

ত্রিপাঠীর মুখে বক্রহাসি ফুটে ওঠে। বলেন—'প্রমাণ হচ্ছে, এখনও কেউ তার সন্ধান পায়নি। থাকলে নিশ্চয় পেত। দেখুন, আপনার অনুসন্ধিৎসু মনের প্রশংসা করি। কিন্তু এসব হচ্ছে, অল্প বয়সের রোমান্টিক কল্পনা।'

রতন তেতে ওঠে। বলে—'আমার ধারণা একেবারে উড়িয়ে দেবার কারণ নেই। আগে তো অনেকে ভাবতেন, উড়িষ্যায় ক্রোম নেই। কিন্তু পরে তো পাওয়া গেছে। তেমনি নিকেলও থাকতে পারে।'

ত্রিপাঠীর মুখ লাল হয়ে উঠল। বললেন, 'বেশ তো, দেখুন না খুঁজে। যদি নিকেল পেয়ে যান তাহলে তো ইউ উইল বি এ হিরো।'

তাঁর কণ্ঠের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আমাদের কান এড়ালো না।

বাড়ি এসে রতন অনেকক্ষণ গুম মেরে বসে রইল।

তারপর হঠাৎ আমাকে বলল, 'জানিস প্রতাপ ছোটকাকার বন্ধু জিওলজিস্ট মিস্টার পট্টনায়ক একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন—উড়িষ্যার এই অঞ্চলে, এই পাহাড় বনরাজ্যে কত প্রাকৃতিক গুপ্তধন, কত খনিজ পদার্থ লুকিয়ে আছে। তাদের সামান্যই আবিষ্কার হয়েছে। আমরা যে কিছু খুঁজে পাব না তা কেউ বলতে পারে?'

আমি বললাম, 'তোর কী মতলব বলতো?'

রতন আর ভণিতা করল না।

'কেল্লাপাহাড়ে যাব—নিকেল খুঁজতে। বাড়িতে বলব কেল্লা সার্ভে করতে যাচ্ছি, তাহলে কাকা আপত্তি করবে না। নিকেল খুঁজতে যাচ্ছি বললে কাকা আবার ত্রিপাঠীকে ফোন করে বসবে, তখন ও লোকটা বাগড়া দিয়ে সব ভণ্ডুল করে দেবে।'

'একা যাবি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

রতন বলল, 'কেন—তুই তো আর্কিওলজির লোক। তোর পুরনো কেল্লায় কোনো ইন্টারেস্ট নেই বলতে চাস?'

'একশোবার আছে। আর ডাকু? ডাকু যাবে না?'

'আলবৎ। ডাকু হবে আমাদের গাইড।'

বিকেলে গেলাম ডাকুর ঘরে। গিয়ে দেখি শ্রীমান বন্দুক পরিষ্কার করছে। বলল, 'ভাবছি শিকারে যাব দু-একদিনের জন্য।'

রতন বলল, 'শিকার-টিকার বাদ দে। তোকে কেল্লাপাহাড়ে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।'

'হঠাৎ?'

রতন আসল কারণটাই বলে ফেলল। ডাকু বলল, 'ভালোই হল। আমিও ওদিকটায় যাবার প্ল্যান করছিলাম। যদি কিছু পাওয়া নাও যায়, একটা অ্যাডভেঞ্চার তো হবে।'

রতনের কাকা সহজেই অনুমতি দিলেন। তবে এটাও বললেন যে আমরা যেন খুব বেশি কিছু আশা না করি। 'যা শুনেছি, দুর্গটা খুব সাধারণ। আসলে ওটা ছিল এক সামন্ত রাজার জেলখানা। কিছু সৈন্যও থাকত। রাজা যুদ্ধে হেরে গেলে ওটা শত্রুরা ধ্বংস করে দেয়। তবে সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গ নাকি আছে।'

এটাও বলে দিলেন রতনের কাকা যে আমরা যেন তিন চার দিনের বেশি না থাকি, আর সঙ্গে যেন বন্দুক অবশ্যই থাকে।

অবাক করলেন বোসদা।

আড্ডা দিতে এসে শুনলেন আমাদের অভিযানের সংকল্প, আর ধাঁ করে বলে বসলেন, 'ব্রাদার, আমিও যাব।' এই আবদারের পিছনে কারণটাও অবিশ্যি তখনই বলে দিলেন।

'বুঝলে কিনা ব্রাদার, ছোটবেলা থেকে আমি অ্যাডভেঞ্চারের ভক্ত। প্রচুর বই পড়েছি অ্যাডভেঞ্চারের। কল্পনা করেছি গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুর পাশে রাতে আগুন জ্বেলে বসে আছি, যেমন থাকত 'চাঁদের পাহাড়'-এর শঙ্কর। কিন্তু লাক্ খারাপ। কোনো সত্যি অ্যাডভেঞ্চার জোটেনি ভাগ্যে। এবার সুযোগ যখন পেয়েছি ছাড়ছি না কিছুতেই।'

বললাম, 'আপনার কষ্ট হবে।'

'আরে কষ্ট করতেই তো যাব। কষ্ট পাব, ভয় পাব, তবে তো! বুঝলে ব্রাদার, তোমাদের বউদি বড় খোঁচা দেয় আমায়। বলে, তুমি বেজায় কুনো। বসে বসে কেবল বই পড়ো। জঙ্গলে থেকেছ কখনও এক রাত্তির? এবার তার মুখ বন্ধ করে দেব।' আমাদের ইতস্তত করতে দেখে বোসদা বললেন, 'আমি তোমাদের ভার হব না ব্রাদার। আমি নেব তোমাদের কিচেনের ভার। জানো, অফিসের পিকনিকে সব রান্না এই শর্মা এক হাতে সামলায়।'

রতন অগত্যা বলল, 'ঠিক আছে, চলুন।'

বোসদা চলে যেতে রতন বলল, 'উনি গেলে ভালোই হবে। তবে আমাদের অভিযানের আসল উদ্দেশ্য মানে নিকেলের ব্যাপারটা, ওঁকে জানানো চলবে না। যদি খালি হাতে ফিরি, লোকে ওর কাছেই জানবে আমরা শুধু দুর্গ দেখতে গিয়েছিলাম। তাছাড়া রান্নার হ্যাঙ্গামা নেবেন বলছেন। আমরা বেশি সময় পাব খুঁজতে।'

রতনের কাকিমা বোসদা যাবেন শুনে খুব খুশি। কাকা নিজেই বোসদার ছুটির ব্যবস্থা করে দিলেন। বোধহয় ভাবলেন, ভালোই একজন গার্জেন রইল সঙ্গে।

যাবার দিন ডাকু বলল, 'জানিস ওই পাহাড়টার একটু বদনাম আছে শুনলাম।'

—'মানে ভূত-টুত নাকি?' জিজ্ঞেস করি।

—'হ্যাঁ ওই আর কি। যুদ্ধ হয়েছে। অনেক লোক মরেছে ওখানে, তাই! স্থানীয় লোক নাকি কেউ ও পাহাড়ে রাতে থাকে না।'

বললাম, 'এ খবর বোসদাকে দিস্‌নি। শেষে ভয় পাবেন অনর্থক।'

আবার সেই কেওঞ্ঝর-জাজপুর রোড। ভোরের আলো সবে ফুটছে। মোটর চলেছে হু-হু করে। বোসদা সমানে কথা বলছেন—'বাঃ, কী দৃশ্য দু-পাশের! আচ্ছা ডাকু, পাহাড়টা কত উঁচু হবে? পাহাড়ে খুব জঙ্গল নাকি?'...

আনন্দপুরে এক চায়ের দোকানে থামলাম আমরা। চা খাচ্ছি, এমন সময় আর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল কাছে। আরোহী একা চালক, মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। লম্বা, ফরসা, রোদে পোড়া চেহারা। পরনে কালো ফুলপ্যান্ট ও হলুদ বুশ্ সার্ট। হাতে জ্বলন্ত চুরুট। আগন্তুক

কৌতূহলভরে আমাদের লক্ষ করে গাড়ির মাথায় বাঁধা মোটঘাট দেখে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, 'শিকারে চলেছেন বুঝি?'

রতন বলল, 'শিকার না। যাচ্ছি একটা পুরনো কেল্লা সার্ভে করতে।'

'পুরনো কেল্লা? কোথায়?'

'একটা পাহাড়ের ওপরে। এখানে পাহাড়টাকে বলে কেল্লাপাহাড়।'

'বুঝেছি।' ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বলেন, 'তা আপনারা কি আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেন্টের লোক?'

রতন উত্তর দিল।—'না। আমাদের মধ্যে এই প্রতাপ অবশ্য আর্কিওলজিস্ট। বাকি আমরা যাচ্ছি শখ করে। একটা আউটিং বলতে পারেন। আপনি?'

'ও হো, দেখুন দিকি নিজের পরিচয় দিতে ভুলে গেছি। আর প্রশ্ন করে চলেছি। মাপ করবেন, বন-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বুনো হয়ে গেছি! আমার নাম চন্দ্রজিৎ সিং। উড়িষ্যায় ব্যবসা করি। কেল্লাপাহাড় আমি চিনি। ওই দিক থেকেই আসছি। ও জায়গায় যাওয়া কিন্তু এখন সেফ্ নয়।'

'কেন?' প্রশ্নটা একই সঙ্গে আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

'কারণ একটা হাতি। হাতিটার মেজাজ বিগড়েছে। আর কেল্লাপাহাড়ের কাছেই ঘোরাফেরা করছে। জানেন তো, নিঃসঙ্গ খ্যাপা হাতি কী ভয়ংকর জীব। কেল্লাপাহাড়ের কাছে এক পাহাড়ে আমি কাঠ কাটার ইজারা নিয়েছি। সেই কাজে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যেতে পারিনি। ফিরে এলাম।'

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। দলে শিকারী বলতে তো একমাত্র ডাকু। সে দেখি ভুরু কুঁচকে চুপ করে আছে। এমন সময় রতন বলে উঠল, 'বেরিয়েছি যখন, যাই। তেমন বিপদ বুঝলে ফিরে আসব। কি রে ডাকু?'

ডাকু মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল—'হুঁ।'

'আচ্ছা। গুডলাক্।' চন্দ্রজিৎ সিং আমাদের হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে লম্বা পা ফেলে একটা দোকানের দিকে চলে গেলেন।

আমি বললাম, 'রতন, তোর কথা ভদ্রলোকের পছন্দ হয়নি। হয়তো ভাবলেন—ছেলেগুলো অতিরিক্ত ঠ্যাঁটা'

রতন বলল, 'ভাবুক গে।'

আমরা আবার রওনা দিলাম। হাতির কথায় মনে একটু ভাবনা ঢুকিয়ে দিল যাহোক।

জগন্নাথপুরের কাছে গিয়ে গাড়ি জাজপুর রোড ছেড়ে ডান দিকে এক পাহাড়ি রাস্তা ধরল। প্রায় শুকনো নালার পাশে পাশে পাথুরে রাস্তা। এ জায়গা টোমকা এবং মহাগিরি পর্বতমালার মধ্যবর্তী অংশে। ডানদিকে দূরে দেখা যাচ্ছে ঢেউয়ের মতো পর্বতপুঞ্জ। নীলাভ অস্পষ্ট। বাঁ-দিকে কাছেই অল্প উঁচু এক পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে উদ্ভিদের ঘন সবুজ প্রলেপ।

ডাকু বলল, 'ওই বোধহয় কেল্লাপাহাড়।'

প্রায় মাইল চার যাবার পর একটি গ্রাম পেলাম। ছোট্ট আদিবাসী গ্রাম। গ্রামের নাম পলাশবুনি। গ্রামে খোঁজ করে জানলাম—হ্যাঁ এই বাঁ-পাশের পাহাড়ই হচ্ছে কেল্লাপাহাড়।

তবে পাহাড় অবধি গাড়ি যাবে না। মাইল খানেক হাঁটতে হবে পাহাড়ে পৌঁছতে। অতএব গাড়ি ছেড়ে দিয়ে মোটঘাট কাঁধে তুলে আমরা পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম কেল্লাপাহাড় লক্ষ্য করে।

চার

ক্রমে চড়াইয়ে উঠি। পাহাড়ের পাদদেশে ঘন বাঁশ বন আর বাবলা গাছ। বড় বড় পাথরের খণ্ড ছড়িয়ে পড়ে আছে। কয়েকটা তেঁতুল আর বুনো আমগাছ দেখলাম।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই একটা সিঁড়ি পড়ল। যেটা পাহাড়ের পায়ের কাছ থেকে শুরু হয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। ডাকু বলল এটাই নাকি কেল্লার সিঁড়ি। আমরা উঠতে শুরু করলাম সিঁড়ি দিয়ে।

আমাদের ঘিরে ঘনবদ্ধ জঙ্গল। মোটা মোটা লতা দুলছে বিশাল বনস্পতিকে আঁকড়ে ধরে। শাল, কেন্দু, মহুয়া, নিম, জাম, আরও কত কী গাছ। পাতা ও শাখার আবরণে যেন চন্দ্রাতপ সৃষ্টি হয়েছে মাথার ওপরে।

যেতে যেতে চোখে পড়ল ময়ূর, বনমোরগ, আরও রকমারি পাখি। নানা অজানা গন্ধ পাই তরুলতার। এক জায়গায় কয়েকটা শিমুলগাছ দেখলাম। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ফুলের সমারোহে গাছ যেন অগ্নিশিখা। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর সামনে দেখলাম প্রাচীর। অর্থাৎ কেল্লায় পৌঁছেছি।

অন্তত দশ ফুট উঁচু পাথরের চওড়া প্রাচীর পাহাড়ের অনেকখানি জায়গা ঘিরে রয়েছে। সিঁড়ি শেষ হল প্রাচীরের গায়ে, এক ভাঙা তোরণের সামনে। সামনেই দেখলাম কেল্লা।

ভিতরের জমি মোটামুটি সমতল। প্রাচীর-ঘেরা অংশ প্রায় দুশো ফুট চওড়া। লম্বা কতটা বোঝা যাচ্ছিল না। প্রাচীর অদৃশ্য হয়েছে গাছপালার ভিতরে। আমাদের মুখোমুখি পাঁচিল-ঘেরা একটি একতলা বাড়ি। ঝোপ ও আগাছা পাথরের ঘরগুলিকে গ্রাস করেছে। ভিতরে ঢোকে না বোধহয় কেউ। কেল্লার উঠোন পাথরে বাঁধানো। কোথাও পাথর সরে মাটি বেরিয়ে পড়েছে. সেখানে জন্মেছে উদ্ভিদ। তবে কেল্লার ভিতরের অংশে বড় গাছ বেশি নেই।

সামনের পাঁচিল-ঘেরা বাড়িটা দেখে মনে হল এটা ছিল বন্দিশালা। উঁকি মেরে দেখলাম—ভিতরে ছোট ছোট অনেক ঘর। জানলা নেই। শুধু ঘুলঘুলি। কপাটহীন ফটক ও দরজাগুলি হাঁ করে আছে। একটা অশ্বত্থগাছ লম্বা শিকড় ও ডালপালা বিস্তার করে বাড়িটার ঘাড়ে চেপে বসেছে।

ভিতরে বুনোজন্তু বা সাপ থাকতে পারে, তাই ঢুকলাম না ঘরের মধ্যে।

দক্ষিণদিকে একটু ঢালু। প্রায় একশো গজ লম্বা প্রাচীরের সীমানা ক্রমে বেঁকে গেছে। এই অংশেও একটা বাড়ি। লম্বা লম্বা পাঁচটি ঘর। সঙ্গে কয়েকটি ছোট ঘরও রয়েছে। এটা বোধহয় সৈন্যাবাস ছিল। দুর্গের কোথাও কোনো কারুকার্য নেই। চৌকো চৌকো প্রস্তরখণ্ডে তৈরি।

কাছেই এক ঝরনা। এক কুণ্ড থেকে স্বচ্ছ ক্ষীণ জলধারা উপচে পড়ে বয়ে চলেছে অগভীর পাথুরে খাতের মধ্য দিয়ে। তারপর পশ্চিম প্রাচীরের গায়ে এক ফুটোর ভিতর দিয়ে গিয়ে কেল্লার বাইরে পাহাড়ের ঢালে নেমেছে। ঝরনার কাছে এক মস্ত শালগাছ। সেখানেই তাঁবু ফেলা স্থির হল।

বোসদা তখুনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁবু টাঙাতে। আমরাও হাত লাগালাম। ঝোপ কাটা, খুঁটি পোতা, তাঁবু খাটানো, জিনিস গোছ-গাছ করা ইত্যাদি করতে ঘণ্টা দুই সময় লাগল। এরপর ঝরনার জলে চান করলাম সবাই। চমৎকার ঠাণ্ডা জলে সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল যেন। দুপুরের খাওয়া সঙ্গেই এনেছিলাম, পাঁউরুটি ও মাংস। তাঁবুর সামনে সতরঞ্চি পেতে সবাই খাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি বোসদা বিস্ফারিত চোখে ওপর দিকে চেয়ে আছেন।

পরমুহূর্তেই শুকনো কাঁপা কাঁপা গলায় কথা এল, 'ব্রাদার, এ তো ডেন্‌জারেস জায়গা। এখানে তাঁবু ফেলা কি ঠিক হল?'

আমরাও সকলে বোসদার দৃষ্টি অনুসরণ করে ওপর দিকে চাইতে, ব্যাপারটা বুঝলাম। শালগাছের গায়ে এক বিরাট মৌমাছির চাক।

ডাকু অভয় দিল—'বিরক্ত না করলে কিছু বলবে না ওরা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে উনুনটা দূরে করুন।'

ভরসা পেয়ে খাওয়া সেরে বোসদা কাঠ-কুটো সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন। রাতের রান্নার জন্য উনুন জ্বালাতে হবে।

ডাকু বলল, 'আমি বেরোচ্ছি। দেখি যদি ছোটখাটো শিকার পাই খাবার মতো।'

রতন বলল, 'মনে আছে তো ক্রোম-পাথর চিনিয়ে দিয়েছি। ওই রকম পাথর কোথাও দেখলেই স্যাম্পল নিয়ে আসবি। নিকেল মেশানো পাথর তো বাইরে থেকে চেনা যায় না। অ্যানালিসিস্ করে তবে জানা যায়, নিকেল আছে। কিন্তু আমার ধারণা ক্রোম পেলেই তার কাছে নিকেল থাকবে, মানে ক্রোম যদি পাই, তার ধারে-কাছের পাথর নিয়ে পরীক্ষা করলে হয়তো নিকেলের সন্ধান পাব। তাই ক্রোমের ওপর লক্ষ রাখব সবাই। তাছাড়াও যদি দেখি কোথাও পাথর খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন, সেখান থেকে স্যাম্পল নিয়ে যাব।'

ডাকু বন্দুক ঘাড়ে চলে গেল।

বোসদা বললেন, 'আমি ভাই আজ টায়ার্ড। কাল বেরোব। রান্নাটা করে ফেলব। তোমরা দুজনে ঘুরে এসো। তবে তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু—সন্ধ্যার আগেই।' তিনি সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমি রতনকে বললাম, 'পনেরো মিনিট অপেক্ষা কর। কেল্লাটা একটু ঘুরে দেখে নিই। হাজার হোক, সার্ভে করব বলে এসেছি যখন। তারপর তোর সঙ্গে যাব ক্রোমের খোঁজে।'

অল্প সময়ে যতটুকু পারি দেখলাম কেল্লা। কেল্লার দুটি অংশ। দুর্গ প্রাচীরের পিছনে পাহাড়ের ঢাল খাড়াই নেমেছে অন্তত কুড়ি হাত। কোথাও স্বাভাবিক পাহাড়ের ঢাল। কোথাও বা পাথর কেটে ঢাল বানানো হয়েছে, কেউ যাতে সহজে উঠে আসতে না পারে। পুব-পশ্চিমে দুটি সিঁড়ি নেমে গেছে কেল্লা থেকে। সিঁড়ির মুখে ভাঙা তোরণ। সত্যি এ দুর্গের কোনো বিশেষত্ব নেই। নেহাত সাধারণ। শত্রুর আক্রমণ ঠেকাবার পক্ষেও মোটেই

সুরক্ষিত নয়। ঝোপ-ঝাড় ভেদ করে দুর্গের ঘরগুলির ভিতরে ঢোকার আর উৎসাহ হল না।

পশ্চিম দিকে সিঁড়ি বেয়ে আমি ও রতন সোজা পাহাড়ের তলায় নেমে এলাম। পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা নদী গেছে। মরা নদী। জল প্রায় নেই এখন।

রতন বলল, 'অনেক সময় বর্ষার জলে ধুয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে নানারকম পাথর এসে পড়ে নদীতে। নদী-খাতে লক্ষ রাখ। ক্রোম-পাথর দেখতে পেলে কোনখান থেকে নেমেছে পাথরটা, আন্দাজ করে খুঁজব।'

স্রোত ধরে ধরে চললাম, সন্দেহ মতো কয়েকটা পাথর তুলে দেখালাম রতনকে। নাঃ, ক্রোম নয়। কতকগুলো হরিণ দেখলাম—ঘাস খাচ্ছে। খয়েরি গায়ে সাদা গোল গোল ছোপ্। আমাদের দিকে উৎকর্ণভাবে তাকাল একটুক্ষণ। তারপরই ঠ্যাং তুলে লাফাতে লাফাতে দে দৌড়।

ঘণ্টাখানেক পর আমরা পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হলাম।

দক্ষিণদিকে পাহাড় ক্রমশ সরু হয়ে অন্য একটা পাহাড়ের গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে খাদ। এখন খাদে ঢোকা উচিত হবে না মনে করে একটা পায়ে চলা পথ ধরে পাহাড়ে চড়তে লাগলাম। মতলব পাহাড়ের ওপর থেকে খাদের ভিতরে দেখব একবার। কয়েক পা যেতেই হঠাৎ রতনের ভয়ার্ত চাপা স্বরে আমাকে থামতে হল।

'প্রতাপ দাঁড়া। নড়িস নি একদম।'

তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি পাশের দিকে গাছের ওপরে একটা পাখিকে লক্ষ করছিলাম, দাঁড়িয়ে পড়ে সামনে চাইতেই দেখি সাক্ষাৎ যম।

মাটি থেকে প্রায় চারফুট খাড়া হয়ে ফণা ধরে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আছে এক বিশাল সাপ। মাত্র পাঁচ ছয় হাত দূরে। অল্প অল্প দুলছে। তীব্র ক্রূর দৃষ্টি তার।

আমার সঙ্গে বন্দুক আছে, কিন্তু সেটা কাঁধে ঝুলছে। সেটা কাঁধ থেকে নামিয়ে গুলি করবার সময় নেই। আমি পাথরের মতো স্থির। জানি বিন্দুমাত্র

নড়াচড়া করলে আক্রমণ করবে সাপ। সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকি ওর চোখে চোখে। শরীর কেমন অবশ হয়ে আসে। হঠাৎ—গুড়ুম! এবং সেই মুহূর্তে ম্যাজিকের মতো সাপ অদৃশ্য।

পিছনে তাকিয়ে দেখলাম কিছু দূরে উঁচু পাথরের ওপর ডাকু দাঁড়িয়ে। তার বন্দুকের নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সাপটাকে পাওয়া গেল কাছেই। ছিন্নভিন্ন ফণা, অবশ্যই মৃত। তবে তখনও দেহটা পাকসাট খাচ্ছে।

ডাকু রেগে বলল, 'শুধু হাঁ করে প্রকৃতির সৌন্দর্য গিললেই হয় না। জঙ্গলের বিপদের কথাও খেয়াল রাখতে হয়।'

সাপটা অন্তত আট ফুট লম্বা। সাদার ওপর সারা গায়ে কালো কালো ডোরা কাটা।

—'কী সাপ?' জিজ্ঞেস করলাম।

ডাকু বলল, 'শঙ্খচূড়। কিং কোবরা। সাপের রাজা। সাংঘাতিক বিষাক্ত।'

আমরা সাপটার দেহ কাঠ-পাতা জ্বেলে পুড়িয়ে দিলাম।

বেলা আর বেশি নেই। রোদ পড়ে আসছে। খাদে ঢুকতে আর ভরসা হল না। সবাই ফিরে চললাম তাঁবুতে। একটু পরেই পেলাম সেই পরিচিত সিঁড়ি।

কেল্লার প্রাচীরের কাছে হাজির হয়েছি, ভাঙা তোরণ দিয়ে ঢুকব, এমন সময় কেমন একটা আওয়াজ এল কানে। বোঁ বোঁ বোঁ—কোনো এরোপ্লেন নাকি? তাকালাম। কই, না তো!

ডাকু পা টিপে টিপে উঠে প্রাচীরের পাশ থেকে একবার উঁকি মেরেই চট করে সরে এল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'মৌমাছি! চারধারে উড়ছে। তাঁবুর ওপরেও। অন্ধকার হয়ে গেছে জায়গাটা।'

সর্বনাশ! বোসদা যে রয়েছেন ওইখানেই!

বেশ কিছুক্ষণ পরে বোঁ বোঁ আওয়াজ কমল। ডাকু আবার উঁকি দিয়ে এসে বলল, 'চল এখন। ওগুলো চাকে বসেছে আবার। তাছাড়া সন্ধে হয়ে গেছে। আর উড়বে না।'

সাবধানে তাঁবুর কাছে গেলাম। দুটো তাঁবু খাটানো হয়েছে। একটায় থাকবে রতন ও ডাকু, অন্যটায় আমি আর বোসদা। বাইরে রান্নার জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে। এক হাঁড়ি ঢাকা দেওয়া খিচুড়ি। উনুনের আগুন নিবুনিবু। কিন্তু বোসদা কই?

আরো এগিয়ে আমাদের তাঁবুর ভিতর উঁকি দিতেই দেখি বোসদা আপাদমস্তক কম্বল মুড়ে শুয়ে রয়েছেন।

আমাদের গলা শুনে তিনি ফ্যাকাসে মুখ করে বেরিয়ে এলেন। 'উঃ ব্রাদার, কী ডেন্‌জারেস কাণ্ড! খুব বেঁচে গেছি প্রাণে। তাঁবুতে ঢুকে পেট্রোম্যাক্সে তেল ভরছি, হঠাৎ বাইরে কেমন অদ্ভুত শব্দ পেলাম। মুখ বের করে দেখে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। বাপরে!' বোসদার কাঁপুনি তখনও থামেনি। বললেন, 'এখান থেকে সরে পড়ো ব্রাদার, প্লিজ! ওপাশে বরং তাঁবু খাটাব কালকে।'

—'ঠিক আছে, তাই হবে।' আমরা বোসদাকে আশ্বস্ত করি।

ডাকু ইতিমধ্যে মৌচাকের নিচে গিয়ে দেখছিল। বলল, 'কেউ ঢিল মেরেছে বা খোঁচা

দিয়েছে চাকে। অনেকখানি দেখছি ভেঙে ঝুলে পড়েছে। কিংবা শুকনো ডাল ছিটকেও লাগতে পারে। কিন্তু নাঃ, তেমন কোনো ডাল তো পড়ে নেই তলায়। কিন্তু কে ভাঙল চাক? কেন?'

আমি বললাম, 'হয়তো কেউ আমাদের তাড়াতে চায় এখান থেকে। তাই বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে।'

ডাকু বলল, 'হুঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন?'

রতন দৃঢ়স্বরে বলল, 'ডাকু জেনে রাখ, এ কীর্তি যারই হোক, তাড়াতে চাইলেই অত সহজে আমরা পালাচ্ছি না।'

ডাকু বলল, 'রাইট।'

ঝপ্ করে অন্ধকার নামল। পেট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোর গণ্ডির ওপারে গাছপালা, কেল্লা বাড়ি সব কেমন ভুতুড়ে ঠেকে। চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার। যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। রাতে অরণ্যময় পর্বত মুখর হয়ে ওঠে। কত রকম আওয়াজ শুনি।

বোসদা চোখ বড় বড় করে বললেন, 'টেরিফিক্। উঃ—একে বলে রিয়েল জঙ্গলে ক্যাম্প-লাইফ! নিজেকে কার মতো লাগছে জানো ব্রাদার—লিভিংস্টোন।'

পরিশ্রান্ত সবাই। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। খিচুড়ি, আলুর দম ও আচার। বোসদার রান্নার হাত সত্যি খাসা। সবাই চেয়ে চেয়ে খেলাম। খাওয়ার পরই শোয়া। ক্যাম্পখাটে শুতে না শুতেই ঘুমের রাজ্যে ঢলে পড়ি।

'ব্রাদার! ও প্রতাপ!' বোসদার গলা!

কী ব্যাপার! উঠে বসলাম।

বোসদা বললেন, 'শোনো কীসের আওয়াজ। ওই দিক থেকে আসছে।'

বোসদার মুখ ফ্যাকাসে। তিনি কেল্লা-বাড়ির দিকে দেখান।

সত্যি—বিচিত্র একটা শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে। যেন কান্নার আওয়াজ। আর্তনাদ। খুব ক্ষীণ।

এ কীসের শব্দ?

তাঁবুর বাইরে উঁকি দিলাম। তাঁবুর সামনে কাঠ জ্বেলে রাখা হয়েছে যাতে বুনোজন্তু না আসে কাছে। সেই আগুনের স্বল্প আভার পিছনে গাঢ় আঁধার।

একটু গা শিরশির করছিল। মনে পড়ল এ পাহাড় ভালো নয়। রাতে কেউ থাকে না এখানে। বহু বন্দী যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু-বরণ করেছে কারাগারে। একি কোনো জীবন্ত প্রাণীর আর্তনাদ? না কোনো অতৃপ্ত আত্মার ক্রন্দনধ্বনি?

মনের ভয় মুখে প্রকাশ করলাম না। বললাম, 'ও কিছু না। বোধহয় কোনো পাখির বাচ্চা কাঁদছে। কাল জিজ্ঞেস করব ডাকুকে। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ুন।'

একটু পরেই বোসদার নাসিকা গর্জন শুনতে পেলাম। আমার কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুম এল না চোখে।

পাঁচ

পরদিন সকালে উঠে আমি আর রতন ঠিক করলাম যে আজ আমরা ক্রোম-পাথরের সন্ধানে কেল্লাপাহাড়ের পুবদিকে ঘুরে দক্ষিণে গিয়ে খাদের ওদিকটা দেখব। ডাকুর পাথরে ইনটারেস্ট নেই। সে বলল একাই বেরোবে।

বোসদা বললেন, 'একটা বন্দুক আমার জন্যে রেখে যেও ব্রাদার। আমিও যদি পারি অন্তত কেল্লাটা একবার ঘুরে দেখে নেব।'

সবে কফি বিস্কুট সহযোগে প্রাতরাশ শেষ করেছি এমন সময় সিঁড়ির মুখে এক মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। শ্যাম চিক্কণ দশাসই চেহারা, পরনে খাকি হাফপ্যান্ট ও শার্ট। কোমরে বেল্ট, মাথায় টুপি। নিঃসন্দেহে পুলিশ অফিসার।

পিছনে আরও দুটি লোককে আবার দেখা গেল—তারা বোধহয় কনস্টেবল।

অফিসারটি সোজা আমাদের দিকে এগিয়ে এসে হেঁড়ে গলায় বললেন, 'আমি রামচন্দ্রপুর থানার ও.সি শ্রীবলরাম দাস। মিস্টার দত্ত আপনাদের খোঁজ করতে বললেন।'

'কী ব্যাপার?' রতন প্রশ্ন করল।

বলরাম দাস পকেট থেকে ডিবা বের করে খুলে দুটি পান নিয়ে মুখে পুরে একগাল হেসে বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে আপনারা দিব্যি আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনাদের আর এখানে থাকা হবে না।'

'থাকা হবে না? রতন অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করল।

'আজ্ঞে না। আপনাদের গাড়ি আসবে পলাশবুনি গ্রামে দুপুর দুটো নাগাদ। আপনারা দয়া করে সেই গাড়িতে ফিরে যাবেন। মিস্টার দত্তর হুকুম।'

'কিন্তু কেন?' আমি আর রতন প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

'জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়।' বলরামবাবু পান চিবোতে চিবোতে বললেন।

'আপনি কি পাগলা হাতির কথা বলছেন?'

প্রশ্নটা এল ডাকুর কাছ থেকে। হাতির কথাটা আমারও কাল থেকেই অনেকবার মনে হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেটার কোনো লক্ষণ দেখিনি বলে ও নিয়ে আর ভাবছিলাম না।

বলরামবাবু প্রশ্নটা শুনে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'পাগলা হাতি? কই না তো। পাগলা হাতির কথা কে বলল আপনাদের?'

চন্দ্রজিৎ সিং-এর নাম শুনে ভদ্রলোক একটা অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক ভাব করে বললেন, 'ও লোকটাকে মোটেই পাত্তা দেবেন না। খুব সন্দেহজনক চরিত্র। অঢেল পয়সা; কিন্তু কীভাবে করেছে তার কোনো হদিস পাওয়া যায় না।...না, পাগলা হাতি নয়। আমি মানুষের কথা বলছি। আপনারা তো বংশীর মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিলেন? সেটা খুব সম্ভব অ্যাকসিডেন্ট নয়, খুন। আর বংশী খুন হয়েছে তার নিজেরই ছেলে পঞ্চার হাতে।'

নিজের ছেলের হাতে বংশীর মৃত্যু হয়েছিল? কী ভয়ংকর ব্যাপার!

বললামবাবু বলে চললেন, 'দেব-বাড়ির বিগ্রহ চুরির কথা নিশ্চয় শুনেছেন। যারা চুরি করেছিল সেই গ্যাঙের দুজন ধরা পড়েছে। তারা বলেছে যে তাদের লিডার পঞ্চা বিগ্রহ নিয়ে নাকি এই দিকেই পালিয়ে এসেছে। বংশী যেদিন মারা যায় সেই দিনই সকালে পলাশবুনির একজন লোক ওই পাহাড়ে পঞ্চাকে দেখেছিল বংশীর সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে। বংশী কী জানি বোঝাবার চেষ্টা করছিল, আর পঞ্চা ক্রমেই খেপে উঠছিল। যে লোকটি ঘটনাটা দেখেছিল সে জানত পঞ্চা অতি বেপরোয়া গুণ্ডা। তাই সে বেশিক্ষণ সেখানে থাকেনি। আমার ধারণা বংশী পঞ্চাকে বিগ্রহ ফিরিয়ে দিতে বলছিল এবং পঞ্চা তাতে রাজি হচ্ছিল না। সেই থেকেই কথা কাটাকাটি এবং তারই ফলে সম্ভবত ছেলের হাতে বংশীর মৃত্যু। পঞ্চা বোধহয় তাকে উঁচু থেকে ফেলে দিয়ে মেরেছে। ওই পাহাড়ের এক গুহায় পঞ্চার গ্যাঙের একটা আস্তানা আবিষ্কার হয়েছে। বংশী নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছিল পঞ্চা ডাকাতি করে এসে ওখানে লুকিয়েছে। তাই দেখা করতে গিয়েছিল। যাই হোক, পঞ্চা এখন এ তল্লাটেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে। আমরা তার অনুসন্ধান চালাচ্ছি, কিন্তু আপনারা দয়া করে আর এখানে থাকবেন না।'

'কেন?' ডাকু প্রশ্ন করল।

'কারণ যদি পঞ্চা ভাবে আপনারা তার পিছু নিয়েছেন তাহলে বিপদে পড়বেন।'

রতন গোমড়া মুখে বলল, 'পঞ্চার খবর কাকাকে কে দিল? আপনি বুঝি?'

বলরাম দাস হেসে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল কেওঞ্ঝরগড়ে মিস্টার দত্তর সঙ্গে দেখা হল। উনি বললেন, আপনারা কেল্লাপাহাড়ে গিয়েছেন। তখন বললাম পঞ্চার কথা।'

দারোগা তো চলে গেলেন কনস্টেবল সমেত, কিন্তু আমাদের সকলেরই উৎসাহে বেশ

খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে গেলেন। রতন হতাশার সুরে বলল, 'আমাদের ভাগ্যটাই খারাপ। ব্যাটা পঞ্চার জন্যে আমাদের অভিযানটা ভণ্ডুল হয়ে গেল। যাক, হাতে আর মাত্র ঘণ্টা চারেক সময় আছে। এর মধ্যে যতটা পারি ঘুরে দেখে নিই।'

আমি আর রতন আগে বেরিয়ে পড়লাম। দুজনেরই মনটা খারাপ হয়েছিল, কারণ আমার পক্ষে কেল্লাপাহাড়ের বিশেষত্বের অভাব বেশ হতাশজনক। আর রতনও মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছে। এক ডাকু যদি এর মধ্যে কোনো শিকার জোটাতে পারে তবে তার দিক থেকে হয়তো অভিযানটি একেবারে মাঠে মারা যাবে না।

পুবদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে জানোয়ার চলার পথ ধরে খানিক এগিয়ে যেতে বনরাজ্যের শোভা দেখতে দেখতে মন কিছুটা ভালো হয়ে গেল। এদিকের জঙ্গল পশ্চিম দিকের চেয়ে বেশি ঘন। কিন্তু আধ ঘণ্টা চলার পরও একপাল বাঁদর ছাড়া আর কোনো জানোয়ার চোখে পড়ল না। পাখি আর পোকামাকড় ছাড়া আর কেউই দর্শন দেবে না এমন একটা ধারণা যখন মনে দানা বেঁধে এসেছে, এমন সময় আমাদের সামনে কিছুদূরে হলদে রঙের কী একটা জিনিসকে নড়তে দেখে দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কোনাকুনিভাবে বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে এগিয়ে চলেছে জিনিসটা। আমরা দুজনে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। একটা লাল গাছের গুঁড়ি ছাড়িয়ে কয়েক পা এগোতেই হাত পঞ্চাশ দূরে প্রাণীটিকে দেখতে পেলাম। ও হরি, জানোয়ার নয় মানুষ। শুধু তাই নয়, এ মানুষ আমাদের চেনা। ইনি মিস্টার চন্দ্রজিৎ সিং। এই হলদে রঙের শার্টপরা অবস্থাতেই আমরা কাল এঁকে দেখেছিলাম।

'ওকে ফলো করব।'—ফিসফিস করে বলল রতন, 'দেখি লোকটা কোথায় যায়।'

শুকনো পাতা বাঁচিয়ে পা ফেলে আমরা দুজনে মিস্টার সিং-এর পিছনে ধাওয়া করলাম।

সামনের গাছপালার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে ওদিকের পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছি। আরো কিছুদূর গেলেই কালকের সেই খাদের কাছে পৌঁছে যাব। একবার মনে হল মিস্টার সিং থামলেন। পিছন পিরে দেখলেন কি? ঠিক বোঝা গেল না।

একটা লাল ফুলে ভরা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ পেরোতেই আমাদের থেমে যেতে হল।

চন্দ্রজিৎ সিং উধাও।

হয় মোড় নিয়েছে, না হয় ঢালে নেমেছে, নয় গর্তে পড়েছে। মোটকথা তাকে আর দেখা দেখা যাচ্ছে না। সিং যে মতলবেই এসে থাকুন, তার পিছনে আর সময় দেওয়া যায় না ভেবে আমরা দুজনে আবার এগোতে লাগলাম।

ঢালে মিনিট খানেক নামার পর হঠাৎ একটা ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ পেয়ে ঘুরে উপরে চাইতেই এক মুহূর্তের জন্য আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। কেল্লাপাহাড়ের গা বেয়ে একটা প্রকাণ্ড পাথর গড়াতে গড়াতে আমাদের দিকে ধাওয়া করে আসছে। রতন আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিতেই পাথরখানা আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে নিচের দিকে নেমে চলে গেল। পরমুহূর্তে ধড়াম করে আছড়ে পড়ল তলায়। বন্ধ করা নিশ্বাসটা ছেড়ে রতনের দিকে ফিরে বললাম, 'ব্যাপার কী বলতো? এটা কি প্রকৃতির কীর্তি, না মানুষের?'

একটা কান ফাটানো বন্দুকের গর্জনে রতনের উত্তর চাপা পড়ে গেল। পর পর এতগুলো অস্বাভাবিক ঘটনায় দুজনেই বেশ ঘাবড়ে গেলাম। কোত্থেকে এল এ বন্দুকের শব্দ? ডাকু কোনো জানোয়ারকে ধরাশায়ী করল নাকি? রতন হঠাৎ আমার আস্তিনটা খামচে ধরে বলল, 'ওই দেখ।'

দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখি পাহাড়ের গা দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে নেমে আমাদের উলটো দিকে ছুটে চলেছেন স্বয়ং চন্দ্রজিৎ সিং।

দেখতে দেখতে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল! আশ্চর্য, ওঁর মুখে এমন আতঙ্কের ভাব দেখলাম কেন! বন্দুকই বা ছুড়ল কে?

'এই যে ব্রাদার।'

বোসদার গলা। তিনিও পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে আসছেন, এবং দ্রুত নামার চেষ্টায় মাঝে মাঝে পা হড়কে রীতিমতো বেসামাল হয়ে পড়ছেন। মাথার ওপরে তোলা তাঁর ডান হাতে বন্দুক আঁকড়ে ধরা রয়েছে।

'কী ব্যাপার বোসদা?' আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

বোসদা আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ব্রাদার টাইগার! জলজ্যান্ত টাইগার! গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলাম তার হলদে রঙ রোদে ঝলমল করছে। ইস্—একটুর জন্যে মিস্ হয়ে গেল।'

'সব্বনাশ।' রতন বলল।—'আপনি যে মানুষ খুনের দায়ে পড়তেন। ওটা বাঘ নয়, মিস্টার চন্দ্রজিৎ সিং।'

'অ্যাঁ।' বোসদার চোখ কপালে। 'বলো কী। ভাগ্যিস নার্ভাস হয়ে গিছলুম, তাই গুলিটা ওপর দিয়ে চলে গেল।'

'দিন,—ওটা আমাকে দিন।'

রতন বোসদার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে নিল। তারপর তার নিজের লাঠিটা বোসদাকে দিয়ে বলল, 'সাপ মারতে—লাঠিই যথেষ্ট।'

এবার আমরা তিনজনে এগোতে শুরু করলাম।

মিনিট পাঁচেক যেতেই আমরা খাদের ধারে পৌঁছে গেলাম।

'ওরা কারা হে রতন? পঞ্জার গ্যাঙের লোক নয়তো?'

বোসদা সামনের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন। খাদের ওপারে দক্ষিণের পাহাড়ের গায়ে খানিকটা সমতল জায়গা, তার মধ্যে ছোট বড় পাথর সাজানো রয়েছে। তারই মধ্যে দুটো বড় পাথরের মাঝখানে ফাঁকে দুটো লোক দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ করছে।

কে, ওরা!

রতন বন্দুকটা বাগিয়ে ধরল। আমরা তিনজনে ওদিকে চললাম।

'আদিবাসী বলে মনে হচ্ছে।' রতন চাপা গলায় বলল। সেটা আমারও মনে হয়েছিল, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল কী কারণে তা বুঝতে পারছিলাম না।

'ভারি থ্রীলড লাগছে ব্রাদার।' বোসদা ফিসফিসিয়ে তাঁর চাপা উত্তেজনা প্রকাশ করলেন, 'একেবারে পুরোপুরি জাঙ্গল অ্যাডভেঞ্চার।'

আরো খানিক এগোতেই লোক দুটো পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। কী ব্যাপার! সবাই কি এভাবে দূরে থেকে দেখা দিয়ে চলে যাবে? নাকি যেখানে রহস্য নেই সেখানেও রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রতন চোখে দূরবিন লাগিয়ে খুঁজতে লাগল লোক দুটোকে। হঠাৎ সে দূরবিন নামিয়ে কেমন উত্তেজিতভাবে বলল—'চল ওপারে।'

আড়চোখে চেয়ে দেখি তার চোয়াল শক্ত, চাহনি গম্ভীর। তার দৃষ্টি রয়েছে সোজা পাথরগুলোর দিকে, যেদিকে আমরা এখন চলেছি।

খাদ পেরিয়ে ওপারে সমতল জায়গাটায় পৌঁছুলাম। আর ক-ঘণ্টা মেয়াদ আমাদের। ঘড়িতে দেখি প্রায় এগারোটা বাজে।

'প্রতাপ।'

রতন আমার হাত চেপে ধরেছে। আমরা এখন একটা খোলা চত্বরের মতো জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। চারদিকে কালচে পাথরের স্তর।

'এগুলোই কি ক্রোম পাথর?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'নিঃসন্দেহে। কিন্তু এটা কী?'

কালচে ক্রোমের গায়ে গায়ে আর এক রকম পাথর। হালকা ছাই রঙের। রতন সেই পাথরের কয়েকটা টুকরো তুলে নিল।

'এটাতে নিকেল আছে নাকি?' আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার তাই বিশ্বাস।'

আমি বললাম, 'তা-হলে তো কেল্লাফতে। আর যদি নিকেল নাই বা থাকে অন্তত ক্রোম তো আবিষ্কার করা গেছে। তাই বা কম কী।'

'বটে ব্রাদার, এই মতলবে আসা হয়েছে তোমাদের? আর আমার কাছে সব চেপে যাওয়া হয়েছিল?'

বোসদার গলা শুনে চমকাই। কখন যে তিনি আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাইনি। একটু অপ্রস্তুত হই। তারপর স্বীকার করি—'হ্যাঁ এটাই আমাদের অভিযানের আসল উদ্দেশ্য। তবে কথাটা গোপন রেখেছিলাম বাধ্য হয়ে।'

বোসদা রাগ দেখিয়ে বললেন, 'কেন, আমি জানলে কি তোমাদের গোপন কথা ফাঁস করে দিতাম। না ভয় ছিল আবিষ্কারটা আগে করে ফেলে ক্রেডিট নিয়ে নেব?'

আমরা লজ্জিতভাবে মাথা চুলকোই।

যাক বোসদা সত্যি মোটেই রাগেননি। বরং খুশিতে উজ্জ্বল তাঁর মুখ। জায়গাটা ভালো করে দেখছি, হঠাৎ বোসদা বললেন 'কিন্তু এতেও কি নিকেল আছে ব্রাদার?'

বোসদা কী যেন একটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছেন। তিনি সেটা দু-আঙুলে তুলে ধরলেন। একটা আধপোড়া চুরুট।'

রতন একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, 'যিনি পথের কাঁটা তদারক করতে এসেছিলেন, তিনিই ওটা ফেলে গেছেন।'

এখান থেকে যে পাথর কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বড় বড় এবড়ো-খেবড়ো গর্ত আর ইতস্তত ছড়ানো নুড়ি-পাথর।

আমি বললাম, 'একটা বেআইনি কারবারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না রে রতন?'

রতন মাথা নেড়ে সায় দিল। 'আমি বাজি ফেলতে পারি মিস্টার সিং বিনা লাইসেন্সে এখাম থেকে ক্রোম পাথর সরাচ্ছেন। আজ গোপনে এসেছিলেন তাঁর সাকরেদদের কাছে। বোধহয় আমরা কী করছি, তার খবর নিতে।'

'তাই সিং আমাদের তাড়াতে চাইছিল।'

'ন্যাচারেলি। পাগলা হাতির গল্পে কাজ হল না তাই লোক লাগিয়ে মৌচাকে ঢিল মেরেছিল। ওই বোধহয় ওপর থেকে পাথরটা গড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের খতম করার মতলবে।'

'ইস্স্!' বোসদা আক্ষেপ করে উঠলেন। 'সব শুনে-টুনে মনে হচ্ছে গুলিটা যদি অন্তত লোকটার ঠ্যাঙে-ট্যাঙে লাগতো তাহলে মন্দ হত না।'

আমরা তিনজনে ফেরার পথ ধরলাম।

এবার খাদের কাছে এসে আবিষ্কার করলাম দিব্যি একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামছি। এমন সময় হঠাৎ কানে এল এক অদ্ভুত শব্দ। বোসদা থমকে থেমে ধরা গলায় বললেন, 'ভাই প্রতাপ—এ কান্না কাল রাতেও শুনেছি আমরা!'

আমিও তাই ভাবছিলাম। ঠিক সেই একই অমানুষিক বীভৎস কান্নার শব্দ! কিন্তু এবার অনেক স্পষ্ট।

আমরা তিনজনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পাথরের আড়াল থেকে রুদ্ধশ্বাসে খাদের দিকে চেয়ে রইলাম।

ছয়

মনে হল কান্নার রব আসছে খাদের ওপারে কেল্লাপাহাড়ের গায়ে কোনো গুহার ভিতর থেকে। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট গভীর খাদ দুই পাহাড়ের মাঝখানে। এই খাদের ওপরের দিকে কেল্লাপাহাড়ের গায়ে দু-তিনটে পাশাপাশি বড় বড় গুহা। গুহাগুলির সামনে খানিকটা বারান্দার মতো জায়গা। তারপরই খাদের ঢাল নেমেছে খাড়াই। সবিস্ময়ে দেখলাম, একটা গুহার ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে গলগল করে, আর সেই সঙ্গে কান্নার স্বর আরো বেড়ে গেল।

এবার হতভম্ব হয়ে দেখলাম, যে-গুহা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল, সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এল এক কালো ভাল্লুক, আর তার পিছনে পিছনে দুটো ছানা। বাচ্চা দুটো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। কী আশ্চর্য—এদের কান্নাই শোনাচ্ছে মানুষের মতো!

ভাল্লুক ফ্যামিলি আস্তে আস্তে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেল।

এবার ধোঁয়া একটু কমে এল। পরক্ষণেই সেই গুহার মুখে বন্দুক হাতে ডাকুর আবির্ভাব ঘটল। যেন ভোজবাজি। আমরা থ। ডাকু আমাদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকল—‘চলে আয়, কোনো ভয় নেই। ভাল্লুক পালিয়েছে।’

সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে ঠিক অমনি আর একটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডাকুর কাছে পৌঁছলাম।

রতন বলল, ‘কী ব্যাপার। এ সব কী?’

ডাকু বলল, ‘ব্যাপার অনেক। ভিতরে আয়, দেখতে পাবি।’

‘এই গুহার ভিতর?’

‘হ্যাঁ, তবে এটা সাধারণ গুহা নয়,সুড়ঙ্গ।’

আমরা চারজনে সেই প্রায় অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকলাম।

ঢুকে বুঝলাম গভীর গহ্বর। গুহার মুখে কতগুলো বড় বড় পাথর একটার ওপর একটা সাজানো। কিছু পাথর মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ডাকু টর্চ জ্বালল। তারপর একটু এগিয়ে গিয়েই বলল, ‘সাবধান। সামনে দেখ।’ তার টর্চের আলো মাটিতে শায়িত এক মনুষ্যদেহের ওপর পড়ল।

এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ।

ডাকু বলল—‘এই হচ্ছে পঞ্চা। মরেছে ভাল্লুকের হাতে।’

বোসদা আমার গায়ে ঘেঁষে দাঁড়ালেন।

‘পঞ্চা গুহায় ঢুকেছিল কেন?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘এই গুহামুখ দিয়ে ঢোকেনি পঞ্চা। বলেছি তো এটা সুড়ঙ্গ। পঞ্চা সুড়ঙ্গের অন্য মুখ দিয়ে এসেছিল। সেই মুখটা হল আমাদের তাঁবুর সামনে, দুর্গ-বাড়ির ভিতরে।’

'তুই বুঝেছিলি পঞ্চা এর মধ্যে ঢুকেছে?' রতন বলল।

'পঞ্চা কেল্লাপাহাড়ে এসেছে সেটা সন্দেহ করেছিলাম। তাই প্রাণপণে খুঁজছিলাম পাহাড়ের গোপন জায়গাগুলি। তারপর বোসদাই আমাকে আসল ক্লু-টা দিলেন!'

'আমি!'—বোসদা বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। 'বলছ কী ব্রাদার!'
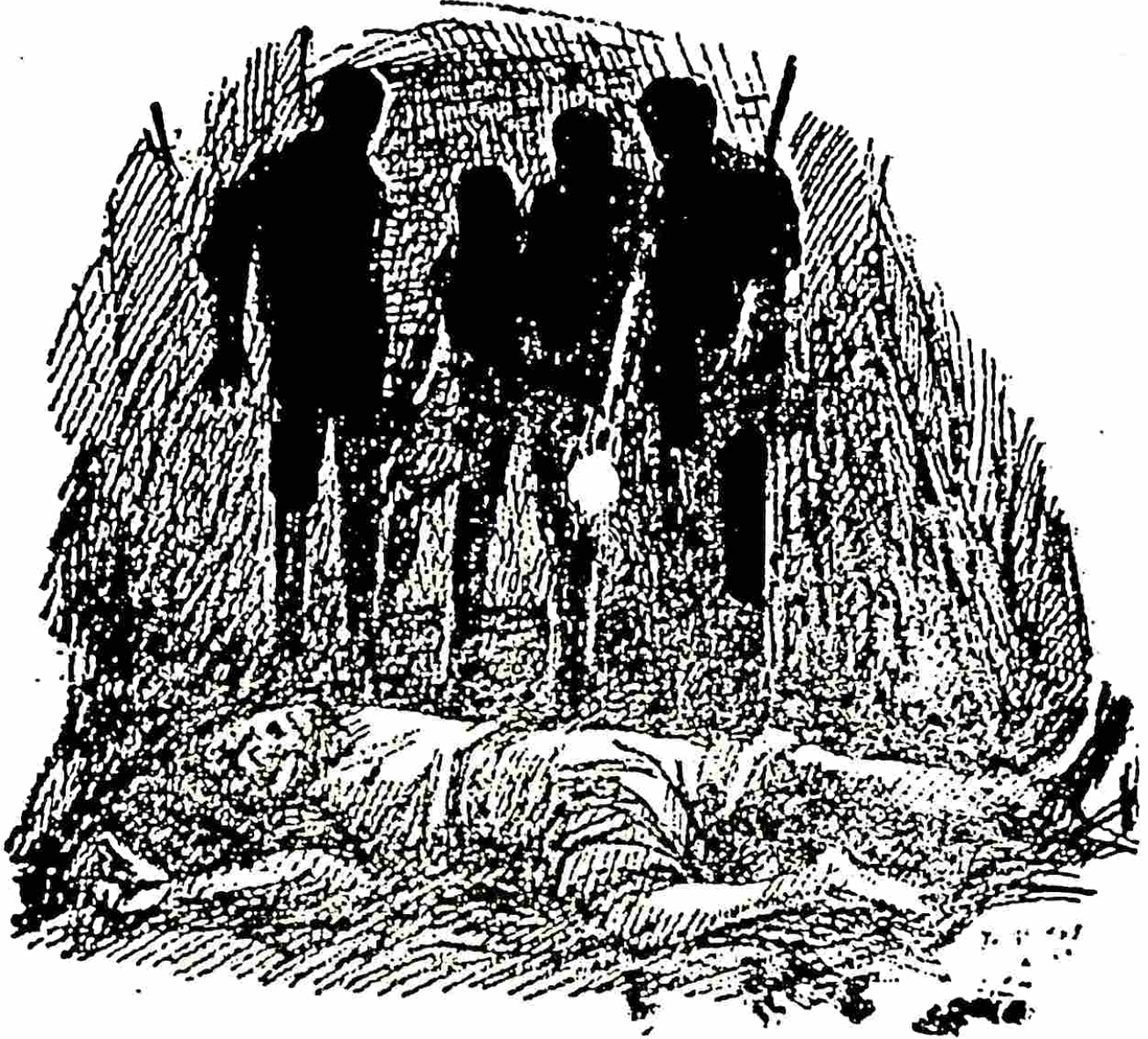
'আরো বলছি', ডাকু বলে চলল, 'জগন্নাথপুরেই প্রহ্লাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম যে পঞ্চা হয়তো কেল্লাপাহাড়ে যেতে পারে লুকোতে। বংশীর সূত্রে এ কেল্লার অন্ধিসন্ধি পঞ্চার চেনা, সুতরাং লুকোবার পক্ষে আইডিয়াল জায়গা। তারপর কাল এই পাহাড়ে এসে পেলাম একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট, ওই ব্রান্ডের প্যাকেট পড়ে থাকতে দেখেছি বংশীর বাড়ির উঠোনে। জেনেছিলাম পঞ্চার ওই সিগারেট। অতএব আমার ধারণা আরো দৃঢ় হল। আজ সকালে বোসদা বললেন তিনি রাত্তিরে অদ্ভুত কান্নার মতো শব্দ শুনেছেন দুর্গর মধ্যে থেকে। তোরা চলে যেতেই কৌতূহলী হয়ে ঢুকলাম ওই ঘরগুলোর ভেতর। খানিক সন্ধান করতেই চোখে পড়ে গেল খোলা সুড়ঙ্গ-মুখ। ইনস্পেক্টরও বলেছেন পঞ্চা এদিকে এসেছে। অতএব প্রস্তুত হয়েই ঢুকলাম সুড়ঙ্গে। কান্নাটা ছিল ভাল্লুকের, সেটা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। খোলা সুড়ঙ্গ দিয়ে ভেসে এসেছিল আওয়াজ। সুড়ঙ্গের ভিতর আবিষ্কার করলাম ভাল্লুকের কীর্তি। তারপর ধোঁয়া দিয়ে ভাল্লুক তাড়ালাম।'

আমাদের দৃষ্টি আবার চলে গেল পঞ্চার মৃতদেহের দিকে। 'কী ভয়ংকর!' বলে উঠলেন বোসদা।

'ভয়ংকর ছাড়াও অবিশ্যি এর আরেকটা দিক আছে।'

ডাকুর কথাটা শুনে তার দিকে চাইতেই সে একটু হেসে পঞ্চার দেহ পাশ কাটিয়ে গুহার ভিতর খানিকটা ঢুকে গেল। তারপর একটা ফাটলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একটা মূর্তি। রতন আর আমার মুখ দিয়ে একসঙ্গে একটা কথা বেরিয়ে পড়ল—

'দেববাড়ির বিগ্রহ!'

ডাকু মাথা নাড়ল। 'পঞ্চা এটাই লুকোতে চেয়েছিল সুড়ঙ্গে। সে বোধহয় সুড়ঙ্গের এই মুখটা পাথর সাজিয়ে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। ভাল্লুক তখন ছিল না গুহাতে। তারপর বাসায় ফিরে ভাল্লুক অতর্কিতে পঞ্চাকে আক্রমণ করে। এই মূর্তি পেয়েছি অনেক ভিতর দিকে—সুড়ঙ্গের এক কুলুঙ্গিতে।'

বিগ্রহ হাতে নিয়ে অবাক হয়ে পরীক্ষা করলাম আমরা। কিছু অলঙ্কার জোর করে খুলে নেওয়া হয়েছে বটে, তাতে মূর্তির কোনো ক্ষতি হয়নি। এই প্রাচীন কারুশিল্পের নমুনার দিকে অবাক হয়ে দেখছি, এমন সময় খেয়াল হল ডাকু বিড়বিড় করে কথা বলছে—

'ব্যবসা করব। একজন আমায় পার্টনার করবে বলেছে। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে চালান দেবার ব্যবসা...আর মনের সুখে জঙ্গলে ঘুরব।'

সত্যিই তো! ডাকু যে তিন হাজার টাকা পাচ্ছে সেটা খেয়াল হয়নি। আশ্চর্যভাবে ডাকুর একটা হিল্লে হয়ে গেল।

'এবার তোমার ক্রোম আবিষ্কারের কথাটা ডাকুকে বলে দাও', বোসদা রতনকে বললেন।

'তুই ক্রোম পেয়েছিস? ডাকু উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল। 'চল, বাইরে গিয়ে সব শুনব। এই অন্ধকারে আর ভালো লাগছে না।'

'শুধু তাই নয়', বোসদা বলে উঠলেন, 'বারোটা বাজে। মনে আছে, দুটোর মধ্যে পলাশবুনি পৌঁছবার কথা আমাদের?'

ডাকু আবার টর্চটা জ্বালল আমাদের পথ দেখাবার জন্য। আলো দেয়ালে পড়তেই আমার দৃষ্টি একটা জায়গায় আটকে গেল। কয়েকটা লাল রঙের রেখা।

ডাকুর হাত থেকে টর্চ নিয়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলাম।

পাথর মসৃণ করা হয়েছে। তার উপর—সাধারণ রেখা নয়, রেখাচিত্র। এ তো আদিম মানবের হাতে আঁকা ছবি! ছবিগুলি ভালো বোঝা যাচ্ছিল না। বেশির ভাগই মুছে গেছে। একটিকে মনে হল মানুষ।

রতনরা অবাক হয়ে আমায় লক্ষ করছিল। ডাকু বলল—'কী ব্যাপার?'

বললাম, 'মনে হচ্ছে এ সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের আঁকা ছবি। এ গুহা নিশ্চয় খুব প্রাচীন। আদিম যুগে মানুষের বাস ছিল এ গুহায়।'

ডাকু বলল, 'হতে পারে। এ অংশটা ন্যাচারাল কেভ্। প্রাচীন গুহা। তবে কিছুদূর গিয়ে গুহাটা মানুষের তৈরি এক সুড়ঙ্গে পরিণত হয়েছে। কেল্লা থেকে গোপনে বেরিয়ে আসার জন্যে এই সুড়ঙ্গের সৃষ্টি।'

আমি বেরিয়ে পাশের গুহাতে ঢুকলাম। হ্যাঁ ঠিক যা ভেবেছি। এ গুহার দেওয়ালেও

অনেক রেখাচিত্র। লাল রঙে আঁকা। আঁচড় কেটে আঁকা। দুটো মানুষ এবং একটা শিংওলা পশুর ছবি। আর সন্দেহ নেই। এ সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহা-মানুষের শিল্পচর্চার নিদর্শন।

এরপর আমি খাদে নামলাম। ডাকু বন্দুক হাতে পাহারায় রইল ভাল্লুকের আশঙ্কায়। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে জানি, কিন্তু তাতে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। আবিষ্কারের নেশায় তখন আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

বেশিক্ষণ খুঁজতে হয়নি। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমার প্রত্নতাত্ত্বিকের চোখ আবিষ্কার করল তিনটি বিচিত্র প্রস্তরখণ্ড, পাথরগুলির সামনের দিক ছুঁচলো পিছন দিক হাতলের মতো। যেন বড় ছোরা বা কুঠারের ফলা। এ বস্তু স্বাভাবিকভাবে হয়নি। মানুষের হাতে গড়া পাথুরে অস্ত্র। বৃষ্টির জলে ধুয়ে গুহা থেকে নিচে পড়েছে।

পাথুরে অস্ত্রগুলি হাতে নিয়ে উঠে এলাম। রতনকে বললাম, 'এই অস্ত্র বা গুহাটি পরীক্ষা করলে অভিজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাদের সময় স্থির করতে পারবেন। তবে আমার মনে হচ্ছে প্যালিওলিথিক যুগের শেষ ভাগ, অর্থাৎ প্রায় দশ থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগেকার মানবগোষ্ঠীর চিহ্ন এগুলি। ভারতের অনেক জায়গায় এমনি অতি প্রাচীন গুহা-মানবের চিহ্ন আবিষ্কার হয়েছে। এই গুহাগুলোর মেঝে খুঁড়লে আরও বহু চিহ্ন পাওয়া যাবে।'

আশ্চর্য হালকা ও উৎফুল্ল মন নিয়ে আমরা তাঁবুর দিকে রওনা দিলাম। অভিযান সার্থক। বিদায় কেল্লাপাহাড়! আর কখনো এখানে আসা হবে কিনা জানি না। যদিও আসার ইচ্ছে রইল। আসন্ন গ্রীষ্মের ছোঁয়াতে ডালে ডালে নবীন পাতার আবির্ভাব ঘটেছে। আবার বসন্তের রেশটুকুতে প্রকৃতি কী মধুর। এত কাণ্ড যে ঘটে, প্রকৃতি-রাজ্যে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই যেন। কে বলবে এই পাহাড়-জঙ্গলে মানব ইতিহাসের বিচিত্র সব পর্ব অভিনীত হয়েছে যুগ যুগান্তর ধরে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা লোভ লালসায় প্রকৃতি সর্বদাই বুঝি এমনিই নির্বিকার, উদাসীন!

পরদিন বিকেল। মিস্টার দত্তর বৈঠকখানায় চারজন জমায়েত হয়েছি। গতকাল ফিরে এসে প্রথমে এক চোট ধমকের পর আমাদের খবর শুনে যে ধরনের অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম, তা অন্তত আমার ভাগ্যে আর কখনো জোটেনি। রতনের কাকা কাকিমা আমাদের অভিযানের সমস্ত বিবরণ খুঁটিয়ে শুনলেন। মিস্টার দত্ত দুর্গ ও সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন। কাকিমার আগ্রহ দেখলাম সব চেয়ে বেশি সেই ভয়ংকর শঙ্খচূড় সাপটা সম্বন্ধে। রাতের বেলায় সেই রহস্যময় শব্দ অর্থাৎ ভাল্লুকের কান্নার কথা শুনে তিনি বড় বড় চোখ করে বললেন, 'কে জানে বাপু ওটা কীসের আওয়াজ ছিল। রাত্তিরে যে আবার বাহাদুরি করে দেখতে বেরোওনি তাই রক্ষে। যা ডানপিটে সব।'

গতকাল ফেরার পথে রামচন্দ্রপুর থানায় থেমে দারোগাবাবুর হাতে বিগ্রহ সমর্পণ করে তাঁকে ক্রোমের ব্যাপারটা জানিয়েছিলাম (নিকেল সম্বন্ধে অবিশ্যি কিছুই বলিনি)। চন্দ্রজিৎ সিং-এর কথা শুনে দারোগাবাবু স্পষ্টই বললেন যে ওই পাহাড়ে সিং-এর কোনো মাইনিং রাইট নেই, এবং এই বেআইনি কারবার তিনি অচিরেই ঘুচোবেন। বিগ্রহর ব্যাপারে এই

কিছুক্ষণ হল খবর এসেছে যে বাবু খগেশ্বর দেব দু-একদিনের মধ্যে নিজেই এসে ডাকুর হাতে টাকাটা তুলে দেবেন।

আমরা চারজন গল্পগুজব করছি এমন সময় চাকর এসে খবর দিল যে রতনের ফোন এসেছে, ত্রিপাঠী সাহেবের কাছ থেকে। ফোন সেরে রতন একগাল হাসি নিয়ে ফিরে এসে বলল, 'পেয়েছে। ওই ছাইরঙা পাথরে নিকেল পেয়েছে ত্রিপাঠী।

আমি ও ডাকু লাফ দিয়ে উঠে রতনকে জড়িয়ে ধরলাম।

'থ্রি চিয়ারস্ ফর দা হিরো!' ডাকু চেঁচিয়ে উঠল।

রতন বলল, 'কেন বাপু, আমি একা কেন? তোরা দুজনই বা কীসে কম?'

কথাটা খুব ভুল বলেনি রতন। ডাকু দেব-বাড়ির বিগ্রহ উদ্ধার করেছে, আর আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের গুহাগৃহ আবিষ্কার করেছি। সত্যিই। আমরা তিনজনেই তো হিরো।

বোসদা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার শুনলাম তাঁর গলা খাক্‌রানি। কিছু বলবেন কি? আমরা তিনজনেই তাঁর দিকে চাইলাম। কফির পেয়ালাটা হাত থেকে নামিয়ে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বোসদা গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমার কথা ভুলে যেও না ব্রাদার। আমিও যে একজন হিরো! অবিশ্যি তোমাদর বৌদির কাছে। কিন্তু তাঁর কাছে হিরো হওয়াটা যে কত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট সে তো তোমরা বুঝবে না! আজ সকালেই বারো পাতার একখানা চিঠি দিয়েছি তাকে, আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের বর্ণনা দিয়ে। আর বাকিটা শোনাব সামনের মাসে ছুটি নিয়ে বাড়ি গেলে।'

রতন এবার জয়ধ্বনি দিল—'থ্রি চিয়ারস ফর কেল্লাপাহাড়!'

আমরা বাকি তিনজনে হুঙ্কার ছাড়লাম—'হিপ্ হিপ্ হুর-রে!'